শতবর্ষের আলোয়

অসীমা মৈত্র
সম্পাদিত

চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং
৮/সি, ট্যামার লেন,
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
পরেশ চক্রবর্তী
চক্রবর্তী অ্যাণ্ড কোং
৮/সি, ট্যামার লেন,
কলিকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রফুল্ল কুমার বক্সী
নিউ প্রিণ্টার্স
২০৯/সি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
নিতাই দে

প্রথম প্রকাশ :
রথযাত্রা
৩১শে আষাঢ় ১৩৭৩
১৬ই জুলাই ১৯৬৬

দাম : পনেরো টাকা

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যাঁরা স্মরণীয় এবং বরণীয়, সুদীর্ঘকালের ব্যবধানেও যাঁদের কর্ম ও চিন্তাধারা উত্তরকালের মানুষকে পথ নির্দেশে সহায়তা ক'রেছে এবং ক'রবে তাঁদের জীবন ও কর্মের ইতিহাস নিঃসন্দেহে অনুশীলন ও আলোচনা যোগ্য।

বাংলা দেশের সৌভাগ্য যে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যেসব মনীষীরা বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন তাঁদের নিরলস সাধনায় বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি বর্তমান আকৃতি লাভ ক'রেছে।

এই দেশ পরাধীন ছিল, পরাধীনতার নাগপাশে বদ্ধমানুষ স্বাভাবিক কারণেই মুক্তির পথ সন্ধান ক'রেছে। দেশের মুক্তিসংগ্রামের সঙ্গে জনশিক্ষা ও জনকল্যাণ এইসব মনীষীদের ধ্যানের বস্তু ছিল।

পূর্বসূরীদের কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম। তাই তাঁদের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে এবং অন্যান্য যেসব মহাজনের মূল্যায়ন করা হয়েছে তার কিছু একত্র ক'রে পাঠকের কাছে উপস্থিত করার বাসনা ছিল। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় এই সংকনগ্রন্থে সংগৃহীত রচনাবলী শ্রদ্ধাকুসুমাঞ্জলির মত শতবর্ষের ব্যবধানেও যাঁদের স্মৃতি আজও অম্লান তাঁদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত।

জীবনে প্রেরণা লাভের অন্যতম উপায় জীবনীগ্রন্থ পাঠ করা। প্রখ্যাত মনীষীদের জীবনকথা পাঠক সমাজে সর্বকালেই তাই সমাদরযোগ্য। এই সংকলনগ্রন্থে সংযোজিত রচনাবলী অবশ্য কেবলমাত্র জীবনকথা নয়; সংক্ষেপে একটি শতাব্দীকালের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাওয়া যাবে এই সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলি থেকে। বর্তমান কাল গতিবেগের কাল, মানুষের সময় অতি অল্প, সেই অতি সংক্ষিপ্ত সময়টুকুর মধ্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভের জন্য তাই সহজ পন্থার কথা সর্বাগ্রে মনে জাগে। এই গ্রন্থে সংকলিত রচনাগুলিতে অতি সহজে সরস এবং সরল ভঙ্গীতে মনীষীদের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন ধারার সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেওয়ার প্রয়াস ক'রেছেন লেখকবৃন্দ।

অসংখ্য দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ এবং দুর্লভ তথ্য আহরণ ক'রে এইসব প্রবন্ধ যাঁরা লিখেছেন বাংলা সাহিত্যে তাঁরা বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

আমার সৌভাগ্য, তাঁরা তাঁদের রচনা ব্যবহার করিতে দিয়ে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন।

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি মুখ্যত: ক'লকাতা-কেন্দ্রিক। বাংলা দেশ যতদিন অবিভক্ত ছিল ততদিন সমগ্র বাংলার মানুষ এই ক'লকাতার দিকেই প্রেরণার প্রয়োজনে তাকিয়ে থাকতেন। সাহিত্য, সমাজ ও জনকল্যাণের ক্ষেত্রে যে সব মনীষীর বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল তাঁদের জীবনেতিহাসই একটি বৃহৎকালের চলমান ইতিহাস।

পূর্বেই উল্লেখ ক'রেছি শ্রদ্ধা নিবেদন যাঁরা ক'রেছেন সেই সব বিদগ্ধজনের পাণ্ডিত্য ও মনীষার নূতন পরিচয়ের প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। শুধু এইটুকু বিশেষভাবে লক্ষ্য করা গেছে যে প্রতিটি লেখকই অসামান্য শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের শতবার্ষিকী শ্রদ্ধা নিবেদন ক'রেছেন। প্রতিটি রচনার মধ্যেই আলোচিত মনীষীদের চিত্রকল্প (image) নিখুঁতভাবে প্রকাশিত। এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রতিটি রচনার বৈশিষ্ট্য এই।

সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনের দায়দায়িত্ব অনেক। এ যে এক দুরূহ কাজ তা নিসংশয়ে বলা যায়। যাঁদের বিষয় এই সংকলনগ্রন্থে লেখা হ'য়েছে—তাঁদের কর্মময় জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে যাতে একটা ধারণা হয় এবং সেই সঙ্গে রাজনৈতিক, সামাজিক ও সমসাময়িক ইতিহাসকে পাঠকদের কাছে উপস্থিত করা যায়, তার দিকে লক্ষ রাখতে হয়েছে। কিন্তু স্বল্পপরিসরে পূর্ণাঙ্গ একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে কারণে এই জাতীয় সংকলন-গ্রন্থের আরো কয়েকটি খণ্ড প্রকাশের অভিপ্রায় আছে।

এই সংকলনে শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র সেনের 'রামপ্রসাদ সেন ও ঈশ্বরগুপ্ত', শ্রীযুত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'রামমোহন রায় ও বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন', ড. সুশীল রায়ের 'মাইকেল মধুসূদন', শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশীর 'বঙ্কিমচন্দ্র', ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ : শেষ অধ্যায়' ও অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা', প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি ভিন্ন স্বাদের এবং অন্যান্য প্রবন্ধগুলির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক থাকলেও সমপর্যায়ভুক্ত নয়। উপরোক্ত প্রবন্ধগুলিতে জীবন ও সাহিত্য নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা স্থান পায়নি। এর প্রথম কারণ রামমোহন, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দ সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে নানা ভাবে নানা

জনে আলোচনা করেছেন, বহু গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে; বহু প্রবন্ধ ও নিবন্ধে এইসব মনীষীদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা ও গবেষণা হতে দেখা যায়। সে কারণে বিশেষ এক দৃষ্টিকোণ থেকে উপরোক্ত প্রবন্ধগুলি রচিত হয়েছে এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই সকল প্রবন্ধ চিন্তাশীল পাঠক-মনকে সহজেই আকৃষ্ট করবে। রামমোহনকে ভারতবর্ষের মানুষ ধর্মগুরু বা ধর্মপ্রচারক হিসেবেই দেখে এসেছেন। তা যদি না হবে তবে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী বিশেষ এক ধর্মসম্প্রদায় কর্তৃক উদ্‌যাপিত হবে কেন? এই বক্তব্য রেখেছেন শ্রীযুত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। প্রকৃতপক্ষে রামমোহন ছিলেন সমাজ-সংস্কারক, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের অধিনায়ক।

'মাইকেল মধুসূদন' প্রবন্ধে ড সুশীল রায় ক্ষোভ প্রকাশ ক'রেছেন বাংলা সাহিত্যে মধুসূদনের অমর অবদানের কথা সবাই স্বীকার করেছেন, অথচ তাঁর যথাযোগ্য স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই হয় নি। মধুসূদন কবি ও নাট্যকার। তাঁর জীবনটাই ছিল বিয়োগান্ত নাটক। কবি সুশীল রায় সেই জীবননাট্যের একটি মাত্র দৃশ্য এখানে অবতারণা ক'রেছেন।

শ্রীযুত প্রমথনাথ বিশী বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও জীবনবেদ নিয়ে সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বা সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা করা হয় নি। কেননা স্বল্প পরিসরে তা সম্ভবও নয়। সে কারণে দেখা যায় প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত বিশী এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মোপলব্ধির একটি দিক উপস্থাপনা ক'রেছেন।

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অনুরূপ দীর্ঘ প্রবন্ধ এই সংকলনে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। ড. নীহাররঞ্জন রায়ের 'রবীন্দ্রনাথ : শেষ অধ্যায়' প্রবন্ধটি এই সংকলনে সংযোজিত ক'রেছি; জন্ম ও মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে তাঁর কাব্য ও সাহিত্যে যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন—তারই বিশদ আলোচনা এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর যে শূন্যতা আমরা উপলব্ধি ক'রেছি—এ হ'চ্ছে তারই অভিব্যক্তি। মৃত্যু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান ধারণা এই প্রবন্ধে মূর্ত হয়ে উঠেছে। নিঃসন্দেহে বলা যায় এই প্রবন্ধটি বাংলা সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ।

এরপর উল্লেখযোগ্য হ'চ্ছে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসুর 'বিবেকানন্দের

স্বদেশচিন্তা'। বিবেকানন্দের জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগ এই প্রবন্ধের অন্তর্গত। ধর্ম-প্রচারক সমাজসংস্কারক পরিব্রাজক সাধক বিবেকানন্দকে আমরা জেনে এসেছি, কিন্তু তাঁর মধ্যে যে স্বাদেশিকতা এবং রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল—তারই প্রকাশ এই প্রবন্ধে। শতবার্ষিকী শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের মুহূর্তে বিবেকানন্দকে বাংলা সাহিত্যের পাঠকের কাছে দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দের রূপটি সামগ্রিকভাবে উপস্থিত ক'রে অধ্যাপক বসু নিঃসন্দেহে পাঠকবর্গের ধন্যবাদার্হ হবেন।

ড. ভবতোষ দত্তের 'দীনেশচন্দ্র ও ইতিহাস চর্চার প্রথম যুগ' প্রবন্ধটিতে বাংলা সাহিত্য অবলম্বনে জাতীয় সমাজের পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার যে প্রচেষ্টা তা শুধু সাহিত্যসম্ভার নয় বা প্রত্নতাত্ত্বিকের আবিষ্কারও নয়, তা হ'চ্ছে ইতিহাস ও সাহিত্যের সমন্বয়ে এক গবেষণার ফসল। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় দীনেশচন্দ্রের উদ্যম যে সংহত রূপ লাভ ক'রেছিল সেই বিষয়ে ড. ভবতোষ দত্ত এই প্রবন্ধে বিশদভাবে আলোচনা ক'রেছেন।

এই সংকলনের অন্যান্য প্রবন্ধগুলিতে বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট মনস্বীদের জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বিশদ আলোচনা আছে। প্রয়োজনবোধে সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী সংযোজিত করা হয়েছে। এ ছাড়া এই সংকলনের অন্যান্য প্রবন্ধগুলি আপন স্বকীয়তায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

এই সংকলনের অধিকাংশ প্রবন্ধ ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী পত্রিকা, দেশ, চতুরঙ্গ, বৈতানিক, আনন্দবাজার পত্রিকা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কয়েকটি প্রবন্ধ এই সংকলনের জন্য বিশেষভাবে লিখিত হয়েছে। বিশ্বস্ততার সঙ্গে এই সংকলন সম্পাদন করার চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু মুদ্রণকালে কিছু ত্রুটি র'য়ে গেছে। কয়েকটি মুদ্রণপ্রমাদ ও অন্যবিধ ত্রুটিবিচ্যুতি থাকাও অস্বাভাবিক নয়। আমার বিনীত অনুরোধ, পাঠকবর্গ যেন ঐ সব ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা করেন।

পরিশেষে এই সংকলনে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের প্রত্যেককে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাঁদের পূর্ণ সহযোগিতা ব্যতিরেকে এই গ্রন্থ সম্পাদন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না। শ্রীযুত মুণীন্দ্রনাথ রায়, শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা ভারতী রায় যথাক্রমে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও

ড. রথীন্দ্রনাথ রায়ের প্রবন্ধ এই সংকলনে প্রকাশের জন্য আমাকে অনুমতি দিয়েছেন। এজন্য আমি তাঁদের আমার হার্দ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ড. সুশীল রায় ও শ্রী ভবানী মুখোপাধ্যায় আমাকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়ে সাহায্য ক'রেছেন। এজন্য আমি তাঁদের কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

শ্রী রমাপতি বসু এই সংকলন সম্পাদনায় আমাকে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন। তাঁর উৎসাহ ও প্রেরণা ব্যাতিরেকে এ সংকলন সম্পাদন করা আমার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব হতো না। এই বিষয়ে তাঁর ঋণ যে অপরিশোধেয় তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি।

এই গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের পাঠাকবর্গ যদি সহৃদয়ভাবে গ্রহণ করেন তবে আমার শ্রম সার্থক বলে মনে করব।

অসীমা মৈত্র

রথযাত্রা
৩১শে আষাঢ় ১৩৭৩
১০১, মনোহর পুকুর রোড
কলিকাতা-২৯

বি ষ য় সূ চী

রামপ্রসাদ সেন ১৭২০-১৭৮১
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১৮১২-১৮৫৯

প্রবোধচন্দ্র সেন

অনেকেরই ধারণা আছে যে, কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২—৫৯) ছিলেন অনেকাংশেই ভারতচন্দ্রের (১৭০৬—৬০) অনুবর্তী। সম্ভবতঃ তার মূল কারণ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য। ঈশ্বরচন্দ্রের 'কবিতাসংগ্রহ' পুস্তকের (১২৯২, আশ্বিন ১৫) ভূমিকায় তাঁর জীবন-চরিত ও কবিত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"ভারতচন্দ্রী ধরণটা তাঁহার অনেক ছিল বটে,—অনেক স্থলে তিনি ভারতচন্দ্রের অনুগামী মাত্র, কিন্তু আর একটা ধরণ ছিল যা কখন বাঙলা ভাষায় ছিল না, যাহা পাইয়া আজ বাঙলার ভাষা তেজস্বিনী হইয়াছে।"

—কবিতাসংগ্রহ : ভূমিকা, পৃ ২৫।

অতঃপর বসুমতী সংস্করণ ঈশ্বরচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর (১৩০৬ আশ্বিন ১৫) 'মুখবন্ধে' সম্পাদক কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন লেখেন—

"ঈশ্বর গুপ্তের রচনা-ভঙ্গিমায়, শব্দপ্রয়োগে, অলংকারবিন্যাসে অনেকটা ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভঙ্গী পাওয়া যায়। তেমনি পদলালিত্য, তেমনি রসপ্রাচুর্য, তেমনি শব্দাড়ম্বর। ভারতচন্দ্র এবং ঈশ্বর গুপ্ত বাঙলা পদ্য-সাহিত্যের আদিগুরু বলিলেও দোষ হয় না।"

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী, ১৩০৬) মুখবন্ধ।

তার অনেক কাল পরে 'কাব্যবিতান' গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী 'নব্যযুগের প্রথম কবি' ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বলেন—

"তাঁহার কাব্যশিল্পের আদর্শ ছিল ভারতচন্দ্র। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তখন না ছিল ভারতের যুগ, তাঁহার না ছিল ভারতের প্রতিভা।"

—'কাব্যবিতান' (১৩৬৩ চৈত্র) মুখবন্ধ।

ঈশ্বরচন্দ্র কোন্ কোন্ বিষয়ে এবং কি পরিমাণে ভারতচন্দ্রের শিল্পাদর্শের অনুসরণ করেছিলেন তা বিশ্লেষণ ও বিচার সাপেক্ষ। এ বিষয়ে তথ্যনিষ্ঠ ও ব্যাপক আলোচনার সার্থকতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গের পক্ষে তা আবশ্যক নয়।

ব্যাপক আলোচনার অভাব থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্রের শিল্পাদর্শে ভারতচন্দ্রের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতা আছে। কিন্তু তাঁর রচনায় রামপ্রসাদের (১৭২০—৮১) প্রভাব সম্বন্ধে সে চেতনারও পরিচয় পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে কোন আলোচনা আমার চোখে পড়েনি। অথচ ঈশ্বরচন্দ্র যে অনেক ক্ষেত্রেই রামপ্রসাদের অনুবর্তী ছিলেন তার সংশয়াতীত প্রমাণ আছে। তারই একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বর্তমান আলোচনার অভিপ্রায়।

এই আলোচনায় প্রধানতঃ যেসব গ্রন্থের উপরে নির্ভর করেছি, মূল বিষয় অবতারণার পূর্বে সেগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন।—

রামপ্রসাদ

১। মাসিক সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত (১২৬০ পৌষ, মাঘ ও চৈত্র) ঈশ্বরচন্দ্রকৃত রামপ্রসাদ সেনের জীবন বৃত্তান্ত ও রচনাসংকলন। ভবতোষ দত্ত সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত রচিত কবি জীবনী' গ্রন্থে (১৯৫৮) পুনঃ প্রকাশিত। এই গ্রন্থখানি বর্তমান প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। ২। রামপ্রসাদ সেনের গ্রন্থাবলী (বসুমতী), ষষ্ঠ সংস্করণ। তারিখ নেই। ৩। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত রচিত 'সাধক কবি রামপ্রসাদ' (সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী-সম্বলিত), পৃ ১৯৫৪।

ঈশ্বরচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'কবিতা সংগ্রহ। সংবাদ প্রভাকর হইতে সংগৃহীত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত কবিতাবলী।' —পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত, মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৮৮। এই গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে রচিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' বিষয়ক প্রবন্ধটির (৮০ পৃষ্ঠা) মূল্যবত্তা সুবিদিত। এই গ্রন্থে ধৃত পাঠ ঈশ্বরচন্দ্রের অন্যান্য রচনা সংকলনের পাঠ অপেক্ষা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। এই গ্রন্থের পুনঃপ্রকাশ বাঞ্ছনীয়। ২। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত 'বোধেন্দুবিকাশ নাটক'। প্রথম ভাগ (প্রথম তিন অঙ্ক)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪০। কবির অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়নি। ৩। মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী' দ্বিতীয় খণ্ড। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৬৮। তারিখ…

এই গ্রন্থের ষড়ঙ্ক ‘বোধেন্দুবিকাশ’ নাটকটি সমগ্র ভাবেই প্রকাশিত য়েছে (পৃঃ ১—২৭৪)। তা ছাড়া অনেকগুলি কবিতাও এই খণ্ডে ংকলিত হয়েছে। (পৃঃ ২৭৫—৩৬৮)।

৪। কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন-সম্পাদিত ‘কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী’ বসুমতী)। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৭০। প্রকাশ ১৩০৬। ‘মুখবন্ধে’র তারিখ ১৫ই আশ্বিন, ১৩০৬ সাল’।

এই গ্রন্থাবলীর অন্য একটি সংস্করণও আমি দেখেছি। এটিতে মুখবন্ধের ারিখ আছে ‘১৫ই আশ্বিন, ১৩০৮’। ১৩১৪ সালে পুনর্মুদ্রিত। সম্পাদক ালীপ্রসন্ন-কৃত মুখবন্ধের বক্তব্য একই আছে, তবে তাঁর ভাষায় কিছু কিছু ংস্কার করা হয়েছে। বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৬২। এই সংস্করণের ‘বিবিধ’ বভাগে পূর্ববর্তী সংস্করণের কতকগুলি কবিতা বর্জিত ও তার স্থলে কতকগুলি নূতন কবিতা সংকলিত হয়েছে। মুখবন্ধে এই গ্রহণ-বর্জনের কোনো হেতু নির্দেশ করা হয়নি।

৫। বসুমতী সাহিত্য-মন্দির প্রকাশিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের গ্রন্থাবলী (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে)। সম্পাদকের নাম ও তারিখ নেই। এটিতে সংকলিত রচনার সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, এই উভয়ের রচনাসংগ্রহগুলিতেই কিছু কিছু পাঠভেদ দেখা যায়। রামপ্রসাদের রচনার পাঠভেদ অনেক বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র-সম্পাদিত ঈশ্বরচন্দ্রের ‘কবিতা সংগ্রহে’র পাঠ নিঃসন্দেহে পরবর্তী সংগ্রহের পাঠের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। পক্ষান্তরে ঈশ্বরচন্দ্র-ধৃত ও সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত রামপ্রসাদের রচনার পাঠ নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। সে পাঠে অনেক স্থলেই অর্থ হয় না। তা ছাড়া এমন ছন্দোদোষও আছে যা রামপ্রসাদের রচনার পক্ষে স্বাভাবিক বলে মনে করা যায় না। তা ছাড়া রামপ্রসাদী রচনার অন্যান্য সংকলনেও অনেক পাঠভেদ দেখা যায়। সব পাঠ মিলিয়ে যথার্থ পাঠ নির্ণয় করা প্রচুর শ্রমসাধ্য ও গবেষণাসাপেক্ষ হলেও বাংলা সাহিত্যের পক্ষে তা একটি অবশ্য করণীয় কাজ। যা হক, র্তমান প্রবন্ধে আমাকে নিজের বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করে যথাসম্ভব াতর্কতা সহকারে পাঠ নির্বাচন করে নিতে হয়েছে। যেসব পাঠ বিতর্কের বষয় বলে বোধ হয়েছে সেগুলি বর্জন করে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ অংশই উদ্ধৃত করেছি।

২.

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের কোনো কোনো রচনার কিছু কিছু প্রত্যক্ষ প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন—

কুপুত্র অনেক হয়,
কুমাতা তো কেহ নয়, মা গো।

—'কবিতা সংগ্রহ', নীলকর (পঞ্চম গীত), পৃঃ ১১৫।

এই ছত্র দুটি অনিবার্য-রূপেই রামপ্রসাদী গানের নিম্নোক্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দেয়।

কুপুত্র অনেক হয় মা,
কুমাতা নয় কখনো ত।
—মা আমায় ঘুরাবে কত

দুই। ভিটে গেল যথা তথা,
'বল মা তারা দাঁড়াই কোথা',
রামপ্রসাদী গীত গেয়ে শেষ
কাঁদতে হবে বসে ঘাটে।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পৌষড়ার গীত,[১] পৃ ১৬৩।

স্মরণীয় রামপ্রসাদের গান—

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করি হেথা॥

আর একটি গানেরও প্রথম দুই পংক্তি ঠিক এ রকম। কেবল 'তারা'র স্থলে আছে 'আমি'। দ্রষ্টব্য যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-প্রণীত সাধক কবি রামপ্রসাদ' গ্রন্থে (১৯৫৪) সংকলিত পদাবলী, ১৫১×৫২। বসুমতী সংস্করণ গ্রন্থাবলীতে দুটি গানেই (১২৯—৩০) আছে 'আমি' অথচ সূচীপত্রে দুই স্থলেই আছে 'তারা'।

তিন। মহামায়া কেন তুমি, এত মায়া ধর?
বাজীকরের মেয়ের মত,
বাজী কেন কর?

—'বোধেন্দুবিকাস' (রামচন্দ্র গুপ্ত), ৩য় অঙ্ক, পৃ ১২২।

স্মরণীয় রামপ্রসাদের গান—

১ ১৩০৮ সালের সংস্করণে এই রচনাটির নাম ছিল 'পৌষপার্বণ গীতি'। ১৩০৬ সালের সংস্করণে এটি ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'কবিতা সংগ্রহেও না।

মন গরিবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যামা,
যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥
—মন গরিবের কি দোষ আছে।

চার। সর্বঘটে বিরাজ করে,
যাবে বলে সর্বগত।
মন শুদ্ধ মনে শুদ্ধ রে তার
হোয়ে থাকো অনুগত॥

—'বোধেন্দুবিকাশ' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৫ম অঙ্ক, পৃ ২৩২।

এই উক্তিটি রামপ্রসাদী বাণীরই প্রতিধ্বনি মাত্র। রামপ্রসাদের বাণী এই—

শ্রীরামপ্রসাদ রটে
মা বিরাজে সর্বঘটে,
ওরে অন্ধআঁখি দেখ কাকে
তিমিরে তিমির হরা।
—এমন দিন কি হবে তারা

উদ্ধৃত চারটি গানের একটিও সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত রামপ্রসাদের রচনা সংকলনে ধরা হয়নি। এবার এমন একটি গানের দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যা ঈশ্বরচন্দ্রের সংকলনেও পাওয়া যায়।

পাঁচ। যতন্ করে রতন্ পেলেম্,
মতন্ মতন্ বাছে বাছে।
আমি কাঁচা সোনার মুখ দেখেছি,
আর কি ভুলি ঝুঁটো কাঁচে॥

—'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃ ২৭১।

এটিতে স্পষ্টতঃই রামপ্রসাদের নিম্ন লিখিত কথাগুলির ছায়াপাত ঘটেছে—

প্রসাদের মন্ হও যদি মন্,
কর্মে কেন হওরে চাসা।
ওরে মতন্ মতন্, কর যতন্
রতন্ পাবে অতি খাসা॥

—মন করো না সুখের আশা, 'কবিজীবনী', পৃ ৫৩।

এখানে ভাষাগত সাদৃশ্যই বিশেষভাবে লক্ষিতব্য। উল্লেখ করা উচিত যে, 'মতন্ মতন্' পাঠ ঈশ্বরচন্দ্রেরই। অন্যান্য সংকলনে আছে 'মনের মতন'।

এই দৃষ্টান্তগুলি সবই রামপ্রসাদের সাধন-সংগীত থেকে সংকলিত। ভালো করে সন্ধান করলে এ রকম আরও দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে আশা করি। রামপ্রসাদের সমরসংগীত থেকেও এ রকম ছায়াপাতের অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। 'বোধেন্দুবিকাস' নাটক তৃতীয় অঙ্কের 'কে রে বামা বারিদ-বরণী' এবং 'কে রে বামা ষোড়শী রূপসী' ইত্যাদি দুটি গানেই অনেকগুলি রামপ্রসাদী গানের ভাব ও ভাষার যুগপৎ সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। ছন্দ-আলোচনার প্রসঙ্গে তা দেখানো যাবে। তবু নমুনা হিসাবে এখানে দুটি দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল।

'কে রে বামা বারিদবরণী' ইত্যাদি প্রথম গানটিতে আছে—

হের হে ভূপ, কি অপরূপ,
অনুপম রূপ, নাহি স্বরূপ,
মদন নিধন করণ কারণ
চরণ শরণ লয়।

এটিতে স্পষ্টতঃই রামপ্রসাদী গানের নিম্নোদ্ধৃত দুটি উক্তির আভাস পাওয়া যায়।

১। মরি কিবা অপরূপ,
নিরখ দনুজ ভূপ,
সুরী কি অসুরী কি পন্নগী কি মানুষী।
—কে মোহিনী ভালে কালশশী, 'কবিজীবনী' পৃ ৭২।

২। মরি হেরি এ কি রূপ,
দেখ দেখ ভূপ,
রসসুধাকূপ
বদনখানি।
—ও কে রে মনোমোহিনী, কবি জীবনী' পৃ ৯৩।

বোধেন্দুবিকাসের পূর্বোক্ত দ্বিতীয় গানটির প্রথমেই আছে—

কে রে বামা ষোড়শী রূপসী,
সুরেশী এ যে, নহে মানুষী,

'ভালে শিশুশশী', করে শোভে অসি,
'রূপ মসী', চারু ভাস।

এটিতে রামপ্রসাদের নিম্নোক্ত দুটি গানের ছায়াপাত লক্ষণীয়।

১। নীল কমলদলনীজতাস্য,
তড়িতজড়িত মধুর হাস্য,
লজ্জিত কুচ অপ্রকাশ্য,
'ভালে শিশুশশী'।

—শ্যামা বামা গুণধামা, 'কবিজীবনী', পৃ ৭০।

২। শবশিশু ইষু শ্রুতিতলে শোভে,
বাম করে মুণ্ড অসি।
বামেতর কর যাচে অভয় বর,
বরাঙ্গনা 'রূপ মসী'॥
—এলো চিকুর নিকর, নরকর কটি তটে

' এই শেষ গানটি ঈশ্বরচন্দ্রের সংকলনে নেই।

ঈশ্বরচন্দ্রের চিন্তায় ভারতচন্দ্রের ভাব ও ভাষার এ রকম বা এতখানি প্রত্যক্ষ প্রতিফলন বা ছায়াপাত ঘটেছে কিনা তা বিচার করে দেখিনি। দেখার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে।

শুধু ভাব ও ভাষা নয়, রামপ্রসাদী সুরের বিশিষ্টতাও ঈশ্বরচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিল। তার প্রমাণ এই যে, তিনি অন্তত: পাঁচটি গান রামপ্রসাদী গানের ভঙ্গিতে রচনা করেছিলেন এবং সেগুলি যে রামপ্রসাদী সুরে গেয় এমন স্পষ্ট নির্দেশও দিয়েছিলেন ওই গানগুলির উপরে। যথা—

১। সেথা, ঢের আছে তোর রাঙা ছেলে—'কবিতা সংগ্রহ', নীলকর (পঞ্চম গীত), পৃ ১১৪।

২। অহংকারে অন্ধ হয়ে
'অহং' গীতটি গেও না রে

৩। মন ভাব তারে মনে মনে

৪। মহামোহের মোহ ছেড়ে
মন যদি হও মনের মত

'বোধেন্দুবিকাস' (মণীন্দ্রকৃষ্ণ), ৫ম অঙ্ক, পৃঃ ২৩০—৩১।

৫। এ জগতে কি আর আছে।

—পূর্বোক্ত, ৬ষ্ঠ অঙ্ক, পৃঃ ২৭০।

ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে রামপ্রসাদের ভাব, ভাষা ও শিল্পাদর্শের প্রভাব যে উপেক্ষণীয় নয়, আশা করি প্রাথমিক সত্য হিসাবে তা নিঃসন্দেহেই প্রতিপন্ন হয়েছে। অতঃপর সে প্রভাবের যথার্থ স্বরূপ কি তার বিশদতর পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হব।

৩.

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বিভিন্ন উপলক্ষে যেসব অভিমত প্রকাশ করেছেন, তার থেকে সহজেই বোঝা যাবে যে ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদের প্রতিই ঈশ্বরচন্দ্র অধিকতর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। উক্ত প্রকার অভিমত সংকলনের পূর্বে দুটি বিশেষ তথ্যের কথা মনে রাখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর সাহিত্য-জীবনের প্রায় আরম্ভকালেই রামপ্রসাদের 'কালী কীর্তন' গ্রন্থখানি সম্পাদন করেন (১৮৩৩) এখানিই তাঁর প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন—

"ঐ অপূর্ব গীতগ্রন্থের অবৈকল্যরূপে ও প্রাচুর্যরূপে ২ বহুকাল-স্থায়িতার্থ আমি আকরস্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তন পুস্তক মুদ্রিতকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহাতে… গ্রন্থকর্তার মহাকীর্তি চিরস্থায়িনী হয় এবং আমারও এতাবৎ পরিশ্রমের সুফলসিদ্ধি হয়।"

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, 'সাধক-কবি, রামপ্রসাদ' (১৯৫৪), পৃঃ ৩০৯—১০।

এই উক্তির মধ্যেই রামপ্রসাদের এই গীতগ্রন্থটি সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের সনিষ্ঠ ও সতর্ক আগ্রহ প্রকাশ পেয়েছে। কালীকীর্তনে তিনি শুধু 'অপূর্ব গীতগ্রন্থ' বলেই নিরস্ত হননি। তাকে তিনি রামপ্রসাদের 'মহাকীর্তি' বলেও বর্ণনা করেছেন এবং সেই মহাকীর্তিকে 'চিরস্থায়িনী' করবার অভিলাষও ব্যক্ত করেছেন। মনে রাখতে হবে তখন ঈশ্বরচন্দ্রের বয়স একুশ বৎসর মাত্র।

২ ও 'প্রাচুর্যরূপে' কথা দুটি আছে সাহিত্যসাধক চরিতমালার দশম পুস্তক 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' গ্রন্থে। যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থে এই দুটি কথা বোধ করি অসাবধানতা-বশতঃই বাদ গিয়াছে।

দ্বিতীয় স্মরণীয় বিষয় এই যে, অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সে ঈশ্বরচন্দ্র যখন মাসিক 'সংবাদ প্রভাকরে' অতীত কবিদের জীবনী-প্রকাশে ব্রতী হন তখন সর্বাগ্রেই প্রকাশ করেন কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জীবন-বৃত্তান্ত।

উভয় ক্ষেত্রেই রামপ্রসাদের এই যে অগ্রাধিকার দান, এটা তাৎপর্যহীন নাও হতে পারে। মনে হয় অল্প বয়স থেকে পরিণত বয়স পর্যন্ত রামপ্রসাদের মহিমা তাঁর মনকে অধিকার করে ছিল। বাসভূমি এবং জীবনকালের দিক থেকে ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদ যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের নিকটতর ছিলেন, হৃদয় ভাবের দিক থেকেও তেমনি তিনি তাঁর অন্তরের বেশি কাছাকাছি ছিলেন।

এবার ঈশ্বরচন্দ্রের এই মনোভাবের প্রমাণ হিসাবে তাঁর কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। উক্তিগুলি প্রায় সবই মাসিক সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত এবং শ্রীমান্ ভবতোষ দত্ত-সম্পাদিত 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিজীবনী' গ্রন্থে (১৯৫৮) সংকলিত। বিষয়বস্তুর কালক্রম এবং পাঠকের পক্ষে সহজলভ্যতার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রত্যেকটি উক্তির সঙ্গে সেটির উভয়বিধ বৎসরেই নির্দেশ দেওয়া গেল।

১। বঙ্গদেশের মধ্যে যত মহাশয় কবিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে রামপ্রসাদ সেনকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়াই গণ্য করিতে হইবে, কারণ তিনি সকল রসের রসিক, প্রেমিক, ভাবুক ও ভক্ত এবং জ্ঞানী ছিলেন,...ইহার পদ একটিও অদ্যপি পুরাতন হইল না, নিয়তই নূতনভাবে পরিচিত হইতেছে, যখনি যাহা শুনা যায় তখনি তাহা নূতন বোধ হয়, গায়কেরা যখন গান করেন তখন শোতৃবর্গের কর্ণে কর্ণে সুধা প্রবেশ করিতে থাকে।"

—সংবাদ প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১, 'কবিজীবনী', পৃ ৪৭।

২। "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় বাহাদুরের সভায় যদিও সর্বশাস্ত্রজ্ঞ বুধগণ ও ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি কবি ও অন্যান্য বিষয়ের অনেক গুণিলোক নিয়তই অবস্থান করিতেন, যদিও ইঁহারা নিজ নিজ গুণাংশে স্ব স্ব প্রধান ছিলেন, তথাচ তিনি কুমারহট্ট নিবাসি বৈদ্যকুলোদ্ভব এই রামপ্রসাদ সেনের প্রণীত পদ, কালীকীর্তন এবং বিদ্যাসুন্দরের কবিতা সকল লোকমুখে শ্রবণ করে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইতেন, এবং ইঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া গণ্য করিতেন।"

—সংবাদ প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১, 'কবিজীবনী', পৃ ৫৭-৫৮।

৩। "দশ বৎসর পর্যন্ত সংকল্প করিয়া ক্রমশঃ অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রায় দেড় বৎসর গত হইল আমি এই কার্যের [পুরাতন কবিদের জীবন-চরিত সংগ্রহ ও প্রকাশ] পথপ্রদর্শক হইয়াছি অর্থাৎ সর্বাগ্রেই অদ্বিতীয় মহাকবি কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের 'জীবন-বৃত্তান্ত' এবং তাঁহার প্রণীত ...পদাবলী ১২৬০ সালের পৌষ মাসের প্রথম দিবসীয় প্রভাকরে প্রকটন করিয়াছি, তৎপাঠে সকলেই মুগ্ধ হইয়াছেন।"

—'ভারতচন্দ্রের জীবন-বৃত্তান্ত'; ভূমিকা ১৩৬২ আষাঢ় ১, 'কবিজীবনী', পৃ ২২৯-৩০।

প্রথম দুটি উদ্ধৃতিতেই রামপ্রসাদকে 'সর্বশ্রেষ্ঠ' বলা হয়েছে। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে রামপ্রসাদকে স্পষ্টতঃই ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর অপেক্ষাও উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে। তা ছাড়া 'ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের 'জীবন-বৃত্তান্ত' গ্রন্থের ভূমিকাতেই যে রামপ্রসাদকে 'অদ্বিতীয়' মহাকবি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাতেও নিঃসন্দেহে বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্রের মতে রামপ্রসাদের স্থান ভারতচন্দ্রেরও উপরে এবং সে জন্যেই সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত কবিচরিতমালায় রামপ্রসাদের জীবন-বৃত্তান্ত 'সর্বাগ্রে প্রকটন করা হয়েছিল।

পূর্বে বলেছি, ঈশ্বরচন্দ্র অল্প বয়স থেকেই রামপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করতেন। তাঁর এক প্রমাণ 'কালীকীর্তন' প্রকাশ (১৮৩৩)। তা ছাড়া, তার আরও দু একটি প্রমাণ আছে। সংবাদ প্রভাকরে (১২৬০ পৌষ ১। ১৮৫৩ ডিসেম্বর ১৫) প্রকাশিত 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন'এর জীবন-বৃত্তান্তে ঈশ্বরচন্দ্র জানান—

পঞ্চবিংশতিবর্ষ অতীত হইল আমরা রামপ্রসাদি পদ্য সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

—'কবিজীবনী', পৃ ৬৪।

তার প্রায় দুই বৎসর পরে সংবাদ প্রভাকরে (১৮৫৪ অক্টোবর ১৭) প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় যে, ঈশ্বরচন্দ্র এই 'মহাত্মা'র [রামপ্রসাদের] 'জীবনচরিত' গ্রন্থাকারে প্রকাশেরও অভিলাষ করেছিলেন।[৩]

৩। কিন্তু তাঁর এই অভিলাষ পূর্ণ হয়নি। রামপ্রসাদের জীবনচরিত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি।

এই বিজ্ঞাপনে আরও বলা হয়—

'এই বিষয় সংগ্রহ করণার্থ আমরা বিংশতি বৎসরাবধি গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছি।"

—সাহিত্য সাধকচরিতমালা—১০, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত', পৃঃ ৫০।

এর থেকেই বোঝা যায়, কি গভীর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সহকারে ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের জীবন-বৃত্তান্ত ও রচনা সংকলনে ব্রতী হয়েছিলেন।

৪.

রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের এত গভীর অনুরাগের কারণ কি, স্বভাবতঃই তাও জানতে ইচ্ছা হয়। রামপ্রসাদ ছিলেন 'কুমারহট্টনিবাসী বৈদ্যকুলোদ্ভব,' আর ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন কুমারহট্টের অদূরবর্তী কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ানিবাসী, তিনিও বৈদ্যকুলোদ্ভব। এই নৈকট্য এবং সাজাত্যবোধই ঈশ্বরচন্দ্রের এমন শ্রদ্ধা ও আগ্রহের একমাত্র কারণ বলে মনে করা সমীচীন নয়। দুইজনই কবি, দুইজনের জীবনবোধেও সাদৃশ্য আছে। ধর্মবোধ জীবনবোধের ভিত্তি। তাঁদের এই ধর্মবোধের সাদৃশ্যের কথা বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন। রামপ্রসাদের ধর্মবোধ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্র বারবার যে-সব অভিমত ব্যক্ত করেছেন তার থেকেও বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয়। শুধু তাই নয়, রামপ্রসাদের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের সুগভীর শ্রদ্ধাও প্রকাশ পায়। এইজন্যই ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদকে শুধু সর্বশ্রেষ্ঠ বা অদ্বিতীয় 'মহাকবি' বলেই নিরস্ত হননি, তাঁকে একাধিকবার 'মহাত্মা' বলেও অভিহিত করেছেন। এ বিষয়ে ব্যাপক ও গভীরভাবে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। যথাস্থানে এ-বিষয়ে আরও একটু পরিচয় দেওয়া যাবে। ঈশ্বরচন্দ্রের আন্তরিক সংগীতপ্রীতিও তাঁর এই অনুরাগের অন্যতম কারণ। কিন্তু সবচেয়ে বড় কারণ বোধ করি তাঁর সহজাত কাব্যভাব ও রসগ্রাহিতা। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের যে-উক্তিটি সর্বপ্রথমে উদ্ধৃত হয়েছে, তার মধ্যেই তাঁর এই ভাব ও রসগ্রাহিতার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে। এস্থলে আরও দু-একটি উক্তি উদ্ধৃত করলেই ঈশ্বরচন্দ্রের গুণগ্রাহিতার সত্য পরিচয় পাওয়া যাবে।—

১। "রামপ্রসাদী পদসকল রত্নাকরবৎ যত্নপূর্বক তাহার ভিতরে যত প্রবেশ করা যায়, ততই অমূল্য রত্ন লাভ হইতে থাকে"

—সংবাদপ্রভাকর, ১২৬০ আশ্বিন ১, 'কবিজীবনী' পৃঃ ৩৩৮।

২। "ভারতচন্দ্রী বিদ্যাসুন্দরের ন্যায় তাঁহার বিদ্যাসুন্দর না হইতে পারে, ফলে তিনি কবিরঞ্জনের [রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দরের] এক-এক স্থলে এমত সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা ভারতচন্দ্রী রচনার অপেক্ষা অনেক অংশেই উৎকৃষ্ট, বিশেষতঃ যেখানে পরমার্থপ্রসঙ্গ এবং কালী নামের গন্ধ পাইয়াছিলেন সেই সেই স্থানে রচনার শেষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই মহাশয় যে কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছেন, তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম, ফলে তাঁহার পদ সর্বাপেক্ষাই উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্টের উপর উৎকৃষ্ট, তেমন উৎকৃষ্ট আর কিছুই নাই।...

এই মহাশয় আগমনী সপ্তমী বিজয়া রাসলীলা কৃষ্ণলীলা শিবলীলা যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহাই অতি সুন্দর হইয়াছে, বিশেষতঃ বীর রসের কবিতা অর্থাৎ ভগবতীর রণবর্ণায়-ঘটিত পদাবলীর তুলনা দিবার স্থান দেখিতে পাই না।"

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০ পৌষ ১, 'কবিজীবনী' পৃঃ ৫৮-৫৯ এবং ৬৬-৬৭।

আশা করি সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেও এই অনুমান করা অসংগত হবে না যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় ভারতচন্দ্রের চেয়ে রামপ্রসাদের প্রভাব গভীরতর হওয়াই স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত। বস্তুতঃ রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার পারস্পরিক তুলনা করলে এই অনুমানের সত্যতাই প্রতীয়মান হবে, অন্তত, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় রামপ্রসাদের গভীর প্রভাব সম্বন্ধে সকল সন্দেহের নিরসন হবে। এ-প্রভাব ভাবে, ভাষায়, অলংকার ও ছন্দে। অতঃপর একে একে এসব প্রভাব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাবে।

৫.

কিন্তু তৎপূর্বে এসব প্রভাবের সাধারণ প্রকৃতি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীন কবিদের জীবনবৃত্তান্ত ও রচনা-সংকলনের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র এক স্থানে এই মন্তব্য করেন।—

"কতকগুলীন যুবক, যাঁহারা বিলিতি বিদ্যা অভ্যাস ও বিলিতি কবিতার চালনাপূর্বক কেবল বিলিতি রসিকতাই শিক্ষা করিয়াছেন, তাহারা বাঙ্গালা কবিতার রসজ্ঞ কিরূপে হইতে পারেন? কারণ প্রথমাবধি তাহার অনুশীলন হয় নাই, কিছুই শুনেন নাই।"

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬১ অগ্রহায়ণ ১, কবিজীবনী, পৃঃ ৩৪৪-৪৫।

এর থেকে বোঝা যায়, খাঁটি বাংলা সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগই ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের অন্তরের মূল প্রেরণা। আর, এই প্রেরণার বশবর্তী হয়েই তিনি রামপ্রসাদের প্রতি এমন শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। কারণ বিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল রামপ্রসাদের মধ্যেই। ভারতচন্দ্র ছিলেন কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি, তাঁর রচনায় পাই একটা সাহিত্যিক আভিজাত্য ও শৈল্পিক কৃত্রিমতা, সাধারণের পক্ষে তা দুরধিগম্য। আর রামপ্রসাদ ছিলেন বাঙালির জাতীয় কবি, তাঁর রচনায়, বিশেষতঃ তাঁর পদগুলিতে কোনো কৃত্রিমতা বা ভেজাল নেই, তাতে সর্বসাধারণের সমান অধিকার। তাঁর ভাষা সকলের মুখের ভাষা, তাঁর ছন্দও চলতি ভাষারই ছন্দ, তাঁর অলংকার দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতাজাত এবং তাঁর ভাব সর্বসাধারণের উপলব্ধিগম্য। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্য বিশেষভাবে তাঁর সাধিত সংগীতমূর্তি সম্বন্ধেই প্রযোজ্য, সব রচনা সম্বন্ধে নয়। এই গানগুলিই তাঁকে অমরতা দান করেছে তাঁকে জাতীয় কবির আসনে বসিয়েছে। তিনি সাধারণের কবি, অথচ অনন্যসাধারণ। এই বিশিষ্টতাই ঈশ্বরচন্দ্রকে তার প্রতি এমনভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের আর একটি উক্তি উদ্ধৃত করি, তাতে রামপ্রসাদের এই বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া যাবে।—

"কবিতা বিষয়ে রামপ্রসাদ সেনের অলৌকিক শক্তি ও অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ইনি চক্ষে যখন যাহা দেখিতেন এবং ইঁহার অন্তঃকরণে যখন যাহা উদয় হইত, তৎক্ষণাৎ তাহাই রচনা করিতেন, কস্মিন্ কালে দৎ-কলম লইয়া বসেন নাই। মুখ হইতে যেসমস্ত বাক্য নির্গত হইত তাহাই কবিতা হইত। তিনি পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন।"

—সংবাদ প্রভাকর ১২৬০ পৌষ ১, কবিজীবনী পৃঃ ৪৮।

রামপ্রসাদের অনুগামী ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক পরিমাণে এই গুণগুলির অধিকারী হয়েছিলেন। এইজন্যই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—

"আজিকার দিনের...বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধ হয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের, আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালা।"

—'কবিতা সংগ্রহ', ভূমিকা পৃঃ ৩।

অর্থাৎ রামপ্রসাদের ন্যায় ঈশ্বরচন্দ্রও 'খাঁটি বাঙ্গালী কবি, বিশুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির প্রতিভূ।

৬.

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাবগত সাদৃশ্যের প্রধান সূত্র ধর্ম। রামপ্রসাদকে ঈশ্বরচন্দ্র বারবার 'মহাত্মা' বলে সুখ্যাতি করেছেন এবং তাঁকে 'পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক' বলে বর্ণনা করেছেন। পক্ষান্তরে বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বরচন্দ্র ছিলেন 'ধর্মাত্মা' ধর্মভাবই তাঁর চরিত্রর মূলকথা। এসম্বন্ধে তিনি বলেন—

"পরমার্থ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গদ্যে-পদ্যে যত লিখিয়াছেন এত আর কোন বিষয়েই বোধহয় লিখেন নাই।...এই সকল গদ্যপদ্যে প্রণিধান করিয়া দেখিলে, আমরা বুঝিতে পারিব যে ঈশ্বর গুপ্তের ধর্ম একটা কৃত্রিম ভান ছিল না। ঈশ্বরে তাঁর আন্তরিক ভক্তি ছিল। বলিতে কি, তাঁহার গূঢ় পুত্রবৎ অকৃত্রিম প্রেম দেখিয়া চক্ষের জল রাখা যায় না·।'

—'কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা (কবিত্ব) পৃঃ ৬৬-৬৭।"

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের এই ধর্ম প্রাণতা ও ভাব সাদৃশ্যের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি এই—

"বাঙ্গালার দুইজন সাধক আমাদের বড় নিকট। দুইজনই বৈদ্য, দুইজনই কবি। এক রামপ্রসাদ সেন, আর-এক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ইঁহারা কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না। কেহই ঈশ্বরকে প্রভু, সখা বা কান্তভাবে দেখেন নাই। রামপ্রসাদ ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ মাতৃভাবে দেখিয়া ভক্তি সাধিত করিয়াছিলেন—ঈশ্বরচন্দ্র পিতৃভাবে। রামপ্রসাদের মাতৃপ্রেমে আর ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃপ্রেমে ভেদ বড় অল্প।"

—'কবিতা সংগ্রহ', ভূমিকা (কবিতা), পৃঃ ৬৮-৬৯।

এই দুইজনের ধর্মভাগবত সাদৃশ্য সম্বন্ধে অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রতি রামপ্রসাদের মাতৃভাব ও ঈশ্বরচন্দ্রের পিতৃভাব সম্বন্ধে অধিকতর বিশ্লেষন ও আলোচনার অবকাশ ও প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা বিস্তৃত আলোচনা থেকে বিরত রইলাম। উভয়ের ধর্মভাবের মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতিভা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সাধারণ মন্তব্য এই।—

"যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন।"

—পূর্ববৎ পৃঃ ৭৬।

এই অগ্রবর্তিতার অন্যতম দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বলেন—

"ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মে ও সমকালিক লোকদিগের অগ্রবর্তী ছিলেন। তিনি হিন্দু ছিলেন, কিন্তু তখনকার লোকদিগের ন্যায় উপধর্মকে হিন্দুধর্ম বলিতেন না। এখন যাহা বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম বলিয়া শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত অনেকেই গৃহীত করিতেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত সেই বিশুদ্ধ পরম মঙ্গলময় হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই ধর্মের যথার্থ মর্ম কি, তাহা অবগত হইবার জন্য, তিনি সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ হইয়াও অধ্যাপকের সাহায্যে বেদান্তাদি দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং বুদ্ধির অসাধারণ প্রাখর্যহেতু সে সকলে যে তাঁহার বেশ অধিকার জন্মিয়াছিল, তাঁহার প্রণীত গদ্যে পদ্যে তাহা বিশেষ জানা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত এক সময়ে ব্রাহ্ম ছিলেন। আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত ছিলেন, এবং তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য ছিলেন। ব্রাহ্মদিগের সঙ্গে সমবেত হইয়া বক্তৃতা উপাসনাদি করিতেন। এজন্য শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট তিনি পরিচিত ছিলেন এবং আদৃত হইতেন।"

—পূর্ববৎ, পৃঃ ৭৮-৭৯।

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাবলী পাঠেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমত সমর্থিত হয়। তিনি কোনো উপধর্মে বা সাম্প্রদায়িক ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর স্বীকৃত ধর্ম ছিল বিশ্বজনীন। তিনি ছিলেন একেশ্বরবাদী। বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তাঁর উপাস্য। সাকার ঈশ্বরকল্পনায়, মূর্তি পূজায় ও ধর্মগত আচার-অনুষ্ঠানাদিতে তাঁর আস্থা ছিল না। শুধু তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ নয়, তাঁর 'বোধেন্দুবিকাশ' নাটক থেকেও এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়।

কিন্তু এ বিষয়ে তাঁকে সময়ের অগ্রবর্তী বলা যায় কিনা সন্দেহ। তৎকালীন সাধারণ হিন্দুর তুলনায় অগ্রবর্তী হলেও তখনকার যশস্বী ব্যক্তিদের তুলনায় তাঁকে অগ্রবর্তী বলা যায় না। রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথ যে হিসাবে আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র সে হিসাবে আপন

কালের অগ্রবর্তী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁদের অনুবর্তীই ছিলেন। ঈশ্বরকে পিতৃভাবে দেখা বোধহয় এই অনুবর্তনেরই ফল।

কিন্তু রামপ্রসাদকে নিঃসন্দেহেই আপন সময়ের অগ্রবর্তী বলা যায়। রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের বহু পূর্বেই তিনি যে ধর্মাদর্শকে প্রতিষ্ঠা দান করেছিলেন, বাংলার ইতিহাসে তা একটি বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর কোনো সহায়সম্বল ছিল না। শুধু সহজাত হৃদয়প্রবৃত্তি ও কণ্ঠনিঃসৃত গানের সম্বল নিয়ে তিনি বাংলাদেশের মনোজগতে যে নিঃশব্দ ধর্মবিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, ইতিহাসে তার তুলনা বিরল। পরবর্তী শতাধিক বৎসরে বাংলাদেশে ধর্মের যে প্রবল আলোড়ন দেখা দিয়েছিল, তার সুনিশ্চিত ভূমিকা রচিত হয়েছিল রামপ্রসাদের গানের দ্বারা। তার মধ্যে সুগভীর অনুভূতি আছে, সংশয়হীন সত্য আছে, হৃদয়জয়ের দুর্নিবার শক্তি আছে—অথচ তার কোনো বহিঃপ্রকাশ নেই, আড়ম্বর নেই। রামপ্রসাদের ধর্মভূমিকার স্বরূপ ও গুরুত্ব প্রথম অনুভব করেন ঈশ্বরচন্দ্র। বস্তুতঃ ধর্মানুভূতির ক্ষেত্রে তিনি রামপ্রসাদেরই যথার্থ অনুবর্তী। এই অনুবর্তিতাই তাঁকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের অনুবর্তন করতে সহায়তা করেছিল। ছোটবেলা থেকে রামপ্রসাদের গান শুনতে শুনতে তাঁর হৃদয়ে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল, তাতে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের উপ্ত বীজ অঙ্কুরিত হতে বেশি সময় লাগেনি।

এবার রামপ্রসাদের ধর্মাদর্শ সম্বন্ধে ঈশ্বরচন্দ্রের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করছি। আশা করি তার থেকে পূর্বোক্ত অভিমতের সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।

১। নিরাকার বাদীরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার জ্ঞান ও উপাসনা করেন, ইনি কালীনাম উচ্চারণপূর্বক তাঁহার আরাধনা উপাসনা করিয়াছেন। উভয় পক্ষেরই উদ্দেশ্যই এক। যথার্থভাবে ব্রহ্মোপাসনা উভয়পক্ষের তুল্য হইতেছে। তাঁহারা যেমন তীর্থপর্যটন ক্রিয়াকর্ম গ্রহণ করেন না ইনিও তদনুরূপ করিয়াছেন।

...সেন তদাত্মক স্বীয় কবিতায় স্পষ্টই ব্যক্ত করিয়াছেন—যিনি জ্ঞানী তাঁহার সন্ধ্যাপূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন করে না।

—সংবাদ প্রভাকর ১৩৬০, আশ্বিন ১, 'কবিজীবনী' পৃঃ ৩৩৭-৩৮।

২। তিনি পরমার্থপথের একজন প্রধান পথিক ছিলেন, অতি সামান্য বিষয়সকল লইয়া ঈশ্বর প্রসঙ্গে তাহার বর্ণনা করিতেন, এই মহাশয় সদানন্দ পুরুষ ছিলেন, ব্রহ্মচিন্তা ব্যতীত তাঁহার অন্তঃকরণে অন্যচিন্তা বা অন্য

চিন্তা মাত্রই ছিল না, বিষয়বিশিষ্ট সাংসারিক সুখকে অত্যন্ত হেয় জ্ঞান করিতেন।···তিনি যে এক উচ্চ বিষয়ের বিষয়ী ছিলেন তাহাতে সহজেই সমস্ত বিষয়কে তুচ্ছ বোধ হইত, কেননা সমুদয় অসার ভাবিয়া কেবল কালী-নাম সার করিয়াছিলেন, সুতরাং যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে পরম প্রকৃতির উপাসনা করে অতি কুৎসিৎ যৎসামান্য রূপাসোনার উপাসনা তাঁহার মনে কি প্রকারে ভাল লাগিতে পারে ?

—সংবাদ প্রভাকর ১২৬০, পৌষ ১, 'কবিজীবনী' পৃঃ ৫৮।

৩। ইনি ক্রিয়াকাণ্ড কিছুই মান্য করিতেন না, ইঁহার সকল অবস্থার কবিতার দ্বারাই তাহার বিশিষ্টরূপ প্রমাণ হইয়াছে। ইনি তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষ ছিলেন, ফলভোগবিরাগী হইয়া প্রীতিচিত্তে গীতচ্ছলে পরমপূজ্য পরমেশ্বরের পূজা করিতেন। রামপ্রসাদ পদের অধিকাংশ জ্ঞানযুক্ত প্রেমভক্তিরসে পরিপূরিত। নিরাকারবাদীরা 'ব্রহ্ম' শব্দ উল্লেখপূর্বক যাঁহার উপাসনা করেন ইনি কালীনাম উচ্চারণ করত তাঁহার আরাধনা ও উপাসনা করিতেন, ইহাতে পুরুষ আর প্রকৃতি অথবা পরমেশ্বর বা পরমেশ্বরী এই নামান্তর জন্য ভাব, রস, ভক্তি, প্রেম এবং জ্ঞানগত বৈলক্ষণ্য কিছুই হইতে পারে না, কারণ উভয়পক্ষের উদ্দেশ্য এক এবং যথার্থপক্ষে উভয়েরি কর্ম ও অভিপ্রায় এক হইতেছে।

—পূর্ববৎ, 'কবিজীবনী' পৃঃ ৬২।

৪। যদিও রামপ্রসাদ সেন প্রতি গানেই কালী, দুর্গা, তারা, শিবে ইত্যাদি দেবীর নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং ঐ ঐ নাম বদনে অহর্নিশি উচ্চারণ করিতেন, ফলতঃ তিনি এক ঈশ্বরবাদী ছিলেন পরব্রহ্মের কাল্পনিক মূর্তি ও রূপাদি মনে মনে ঘৃণা করিতেন, তবে দেশকালপাত্র বিবেচনানুসারে বাহ্যে কালী কালী শব্দ করিতেন তেঁহ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে ছিলেন এবং তাঁহার অধিকারে বাস করিতেন, সুতরাং ভীত হইয়া প্রচলিত ধর্মানুযায়ী প্রকাশ্য উপাসনাদি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, এতদ্ভিন্ন তিনি জগদীশ্বরের নিকটে দোষী হইতে পারেন নাই, কারণ জগদন্তরাত্মা তাঁহার আন্তরিক ভাব জানিতেন, লোকে দুর্গাই বলুক আর ঈশ্বরই বলুক বা খোদাই বলুক অথবা গডই বলুক, সকলিই তাঁহার উদ্দেশ্য বলিয়া থাকে ইহাতে প্রকৃত কর্মের হানি হয় না। যথা গোলাব পুষ্পকে যে নামে উল্লেখ করা যাউক না কেন তাহার সৌরভের লাঘব হয় না। অপর সেনকবির কালীনামাদি

উচ্চারণ যে মৌখিক মাত্র তাহা তাঁহার পশ্চাল্লিখিত গানে প্রামাণ্য হইতেছে।

মন কর কি তত্ত্ব তারে।
ওরে মন উন্মত্ত আঁধার ঘরে।
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত
অভাবে কি ধরতে পারে।
প্রসাদ বলে আমি মাতরিভাবে
তত্ত্ব করি যাঁরে
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি
বুঝরে মন ঠারেঠোরে।

—সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, মাঘ, ১, 'কবিজীবনী', পৃঃ ৮২।

রামপ্রসাদের গানগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র যে উদার বিশ্বজনীন ধর্মাদর্শের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সে আদর্শের প্রতি তার নিজের যে আন্তরিক অনুমোদন ছিল তা এই উদ্ধৃতিগুলির ভাষাতে সুস্পষ্টরূপেই প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শ যে মূলতঃ অভিন্ন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোক্ত অভিমত যে সত্য তাতে সন্দেহ থাকে না।

প্রশ্ন হতে পারে রামপ্রসাদী ধর্মের ঈশ্বরচন্দ্রকৃত ব্যাখ্যা নির্ভরযোগ্য কিনা। অর্থাৎ তা ঈশ্বরচন্দ্রের আরোপিত স্বীয় মতের প্রতিরূপমাত্র কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ হতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে এসব ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র প্রায় সর্বত্রই প্রশংসনীয় তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিপরায়ণতা ও ইতিহাস-চেতনার পরিচয় দিয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কেননা প্রতি পদেই তিনি রামপ্রসাদের গান উদ্ধৃত করে নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। রামপ্রসাদের পদাবলীর সামগ্রিক পর্যালোচনা করলেও ঈশ্বর-চন্দ্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য বলেই বিবেচিত হবে। এ স্থলে উক্ত পদাবলী থেকে কয়েকটি মাত্র অংশ উদ্ধৃত করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।—

আর কায কি আমার কাশী।
ওর কালীপদ কোকনদ
তীর্থ রাশি রাশি॥
গয়ায় করে পিণ্ডদান
পিতৃঋণে পায় ত্রাণ,

যে করে কালীর ধ্যান
তার গয়া শুনে হাসি ॥
কাশীতে গেলেই মুক্তি—
বটে সে শিবের উক্তি ;
সকলের মূল ভক্তি,
মুক্তি তার দাসী ॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে—
করুণানিধির বলে
চতুর্বর্গ করতলে
ভাবলে এলোকেশী ॥
—'কবিজীবনী', পৃঃ ৩৩৬

মা আমার অন্তরে আছে ।···
প্রসাদ বলে আমার হৃদয় অমল কমল সাঁচ ।
তুমি সেই সাঁচে নির্মিতা হোয়ে
মনোময়ী হোয়ে নাচ ॥
—পূর্ববৎ, পৃঃ ৭৮ ।

প্রসাদ বলে ব্রহ্ম নিরূপণের কথা
দেঁতোর হাসি ।
আমার ব্রহ্মময়ী সকল ঘরে,
পদে গঙ্গা গয়া কাশী ॥
—পূর্ববৎ, পৃঃ ৭৫ ।

এমন দিন কি হবে তারা ।
(যবে) ত্যজিব সব ভেদাভেদ,
ঘুচে যাবে মনের খেদ,
ওরে শত শত সত্য বেদ,
তারা আমার নিরাকারা ॥
শ্রীরামপ্রসাদে রটে
মা বিরাজে সর্বঘটে—
ওরে অন্ধ আঁখি দেখ মাকে
তিমিরে তিমিরহরা ॥
—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী—৭১ ।

মন তোমার এই ভ্রম গেল না।...
ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি,
জেনেও কি তাই—জান না ॥
কোন প্রাণে তাঁর মাটির মূর্তি
গড়িয়ে করিস উপাসনা ॥

—পূর্ববৎ, পদাবলী—৭৮।

ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও অনুরূপ মনোভাবের অভাব নেই। এখানে কয়েকটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত হল।—

লোকাচারে দেশাচারে
জাতিপ্রথা ব্যবহারে নাহি হয় সত্যের প্রকাশ।
সত্যের হইলে দাস
এ সকল হয় নাশ,
সমাজেতে করে উপহাস ॥
সমাজেতে যদি রই
সত্যসভা ছাড়া হই,
তোমা-ছাড়া হতে তবে হয়।
সত্য আর লোকাচার
আলো আর অন্ধকার,
একাধারে কেমনেতে রয়?
যদ্যপি তোমায় স্মরি
সত্যের সাধনা করি,
দেশ তায় দ্বেষ করে কত।
অনাচারী নিজে যারা
অনাচারী বলে তারা,
হরি হরে ভেবে জ্ঞান হত ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), তত্ত্ব, পৃঃ ২৫।

এক ভিন্ন নাহি আর,
তিনি সংসারের সার,
আত্মরূপে সবাকার
হৃদয়ে উদয়।

অনিত্য বিষয়বিত্ত.
নিত্যরূপে ভাব নিত্য,
ভক্তিভয়ে ভজ চিত্ত,
নিত্য নিরাময়।

—পূর্ববৎ, শরীর অনিত্য, পৃঃ ১০।

বিবেক কাজল প'রে দৃষ্টি অভিনব।
বোধহয় ব্রহ্মময় সমুদয় ভব॥

—পূর্ববৎ, মনের প্রতি উপদেশ, পৃঃ ৪২।

তাই বলি ভাই, এক বিনা নাই,
একের পূজাই ধর।
সদা এক-জ্ঞান থেকে এক-ধ্যানে
জীবন সফল কর॥

—পূর্ববৎ, তত্ত্বজ্ঞান, পৃঃ ৪৪।

কেহ কহে জগতের পিতা তুমি ধাতা।
কেহ কহে ব্রহ্মময়ী জগতের মাতা॥
মাতা হও পিতা হও যে হও সে হও।
হলে তুমি একমাত্র তুমি ছাড়া নও॥

—পূর্ববৎ, নিবেদন, পৃঃ ৪৯।

একেতেই সব হয়,
একেতেই সব লয়,
একেতেই একময় সব একাকার।
এক বিনা আর নাহি এক বিনা আর॥

—পূর্ববৎ, তত্ত্ববোধ, পৃঃ ৮১।

পেয়েছি পরম নিধি,
না মানি নিষেধ-বিধি,
উপরোধ অনুরোধ নাই।
আমি, তুমি, তিনি, উনি,
আর নাহি ভেদ গণি
এ জগতে সমান সবাই॥

এই আমি আমি নই,
এই আমি আমি হই,
হইলাম আমিই আমার।

ব্রহ্মময় সমুদয়,
ব্রহ্মছাড়া কিছু নয়,
ব্রহ্মময় অখিল সংসার।

—পূর্ববৎ, ব্রহ্মময়, পৃঃ ৯৩।

৭.

আর উদ্ধৃতি বাড়িয়ে লাভ নেই। আশা করি এর থেকেই বোঝা যাবে যে, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মাদর্শ তথা জীবনবোধ মূলতঃ অভিন্ন। উভয়ের ধর্মভাব নাই আসলে ভারতীয় ব্রহ্মবিদ্যার উপরে প্রতিষ্ঠিত। আর, উভয়েই সে বিদ্যাকে নিছক তত্ত্বজ্ঞনের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে জীবনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে আগ্রহী। এটাই হল আধুনিক ভারতের ধর্ম-সাধনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ দিক থেকে বিচার করলেও বোঝা যাবে যে,—রামপ্রসাদকেই আপন কালের অগ্রবর্তী বলা যায়, ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তা বলা যায় না। রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্মভাবনায় যে মূলগত ঐক্য লক্ষিত হয় তা নিতান্তই একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। অন্ততঃ আংশিকভাবে এটা ঈশ্বরচন্দ্রের আবাল্য মনোবিকাশের উপরে রামপ্রসাদের গতিধার প্রায় অলক্ষিত অথচ সুগভীর প্রভাবের ফল।

এখানে বলা প্রয়োজন যে, ঈশ্বরচন্দ্রের তত্ত্বভাবনা অনেকাংশে রামপ্রসাদের অনুরূপ হলেও তাঁর কবিভাবনায় স্বাতন্ত্র্য ছিল। তার কবিভাবনায় রূপকল্পনারও স্থান ছিল। সে ক্ষেত্রে দেখি শিবের ভাবমূর্তি তাঁর কল্পনাকে সবচেয়ে বেশি উদ্দীপ্ত করত। যেমন—

জগতের অধীশ্বর মহেশ্বর হন।
জগতের অন্তরাত্মা নিজে নারায়ণ॥
উভয়ে অভেদ তাঁরা শাস্ত্রে শুনি তাই।
বাস্তবিক আমাতে সে দেবজ্ঞান নাই॥
তথাপিও শশিখণ্ড ভূষণ যাঁহার।

সদাই অচলা ভক্তি তাঁতেই আমার ॥
মহাযোগী জ্যোতির্ময় যোগে অনুরত।
কাজেই তাঁহার প্রেমে মন হয় রত ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী) মনের প্রতি উপদেশ, পৃঃ ২৪৭।

এ প্রসঙ্গে অধিকতর অগ্রসর হওয়া অনাবশ্যক। তবে এখানে এটুকুমাত্র বলা যেতে পারে যে কবিকল্পনার ক্ষেত্রে শিবের প্রতি এই যে অন্তরের টান, আধুনিক বাংলা-সাহিত্যে তাঁর প্রথম প্রকাশ ঘটেছে বোধ করি ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ পরিণতি হয়েছে রবীন্দ্র-সাহিত্যে।

রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্র, উভয়েরই প্রধান উপজীব্য ছিল ধর্ম। তাই অপেক্ষাকৃত বিশদভাবেই এ বিষয়ের আলোচনা করা গেল।

এই দুই কবির রচনাগত সাদৃশ্য শুধু যে ধর্মভাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। ভাষা অলংকার, ছন্দ প্রভৃতি সাহিত্যশিল্পের ক্ষেত্রেও তাঁদের মধ্যে আশ্চর্য রকম মিল দেখা যায়। অতঃপর আমরা একে একে এই কাব্যাঙ্গগত সাদৃশ্যের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অগ্রসর হব।

সংস্কৃতির প্রধান বাহন ভাষা। তাই রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষা সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা অসংগত হবে না। ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যের তৃতীয় খণ্ডে "মানসিংহের দিল্লীতে উপস্থিতি"-প্রসঙ্গে বলেন—

'পড়িয়াছি সেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি ॥
না রবে প্রসাদগুণে না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল ॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে।
যে হৌক ভাষা, কাব্য রস লয়ে ॥'

রাজসভার অভিজাত কবির এই উক্তিতে জ্ঞানাভিমান ও অনাদরের সুর যেন একটু বেশি মাত্রাতেই প্রকাশ পেয়েছেন। পক্ষান্তরে অনভিজাত ও নিরভিমান রামপ্রসাদের পদগুলিতে যে সহজ প্রসাদগুণ ও রসালতা স্বতঃপ্রকাশ ভারতচন্দ্রের রচনায় তা দুর্লভ। অথচ রামপ্রসাদের রচনাও কম 'যাবনীমিশাল' নয়। যেমন—

মনরে কৃষি-কাজ জান না।
এমন মানব-'জমিন' রইল পতিত
'আবাদ' করলে ফলতো সোনা॥
আমায় দেও মা 'তবিলদারী'।
আমি 'নিমকহারাম' নই শঙ্করী॥

রামপ্রসাদের রচনায় 'যাবনী' শব্দের নিঃসংকোচ প্রয়োগ একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। 'মানব-জমিন' শব্দে বিশুদ্ধ সংস্কৃত ও আরবী শব্দের মধ্যে যে অপূর্ব সৌভ্রাত্রবন্ধন ঘটেছে, বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। গুরুচণ্ডালী পদ্ধতি রামপ্রসাদের রচনার দোষ নয়, গুণ। রামপ্রসাদের প্রতিভাবলে এটা 'দোষ হয়েও গুণ হৈল'।

রামপ্রসাদের ভাষার যে গুণ ও যে বৈশিষ্ট্য অনেক পরিমাণে ঈশ্বরচন্দ্রের ভাষারও সেই গুণে, সেই বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচনাতেও 'যাবনী' শব্দের অভাব নেই। যেমন—'ইংরাজী নববর্ষ' (১৮৫২) কবিতার এই বিখ্যাত পংক্তিটি—

'বিবিজান চলে যান লবেজান কোরে।'

এর শুধু অলংকারের ঝংকারটুকু নয়, দেশী কথার সঙ্গে বিদেশী কথার মিশোলটুকুও রমনীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় চলতি বাংলার সঙ্গে সংস্কৃত, আরবি-ফারসি ও ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে অজস্র পরিমাণে। এই মিশ্রণ অনেক স্থলেই বেমালুম। এই সব মিলেই খাঁটি বাংলা। এই বাংলা তিনি পেয়েছিলেন অংশতঃ ভারতচন্দ্র ও মুখ্যতঃ রামপ্রসাদের উত্তরাধিকার হিসাবে।

'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গলায়, এমন বাঙ্গালীর প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখেন নাই।'

—'কবিতা সংগ্রহ', ভূমিকা পৃঃ ৭৪।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই মন্তব্য রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সমভাবে প্রযোজ্য। এই দুই কবির ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনার প্রয়োজনীতা আছে।

৮.

অলংকার প্রয়োগেও ঈশ্বরচন্দ্র যে অনেক পরিমাণই রামপ্রসাদের অনুবর্তী তার নিঃশয় প্রমাণ আছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই নজরে পড়ে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় অর্থালংকারের

বিরলতা। এই বিরলতার দ্বারা কল্পনার দীনতাই সূচিত হয়। এই জন্যই তাঁর রচিত কবিতা পড়তে অনেক সময় রসহীন বক্তব্যসার গদ্য প্রবন্ধের মত বোধ হয়। কল্পনা তখন অলংকারের দৈন্যই তার প্রধান কারণ। কেন না অলংকার তো কাব্যের বহিরঙ্গ বা ভূষণমাত্র নয়, কাব্যাত্মার প্রকাশ-রূপেরই নাম অলংকার। এই হিসাবে রামপ্রসাদের স্থান ঈশ্বরচন্দ্রের অনেক উপরে। তাঁর হৃদয়ানুভূতি প্রায় সর্বত্রই অলংকারের রূপ নিয়েই প্রকাশ পায়।

কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র অলংকারের আশ্রয় নিয়েছেন, সে সব স্থলে তিনি প্রায় রামপ্রসাদের পথেই চলেছেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তিনি এক স্থানে বলেছেন যে, তিনি 'অতি সামান্য সকল বিষয় লইয়া ঈশ্বর-প্রসঙ্গে তাহারি বর্ণনা করিতেন।' রামপ্রসাদের পদাবলীর সঙ্গে যাঁদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে তাঁরাই ঈশ্বরচন্দ্রের এই উক্তির সত্যতা স্বীকার করবেন তবু পূর্ণতার খাতিরে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ওর মন চড়কী, ভ্রমণ কর, এ ঘোর সংসারে।
ওরে মায়া-ডোরে বড়শী গাঁথা, স্নেহ বল যারে।

—কবিজীবনী, পৃঃ ৫৫।

ধৈর্য খোঁটা ধর্ম বেড়, এ দেহের চৌদিক ঘেরেছে।
এমন কাল চোরে কি করতে পারে মহাকাল রক্ষক হয়েছে।

—পূর্ববৎ, পৃঃ ৬২।

এসেছিলাম ভবের হাটে,
হাট করে বসেছি ঘাটে,
ওমা শ্রীসূর্য বসিল পাটে, নেয়ে লবে গো।
দশের ভরা ভোরে লয়ে
দুঃখীজনে ফেলে যায়,
ওমা তার ঠাঁই যে কড়ি চায়, কোথা পাবে গো।

—পূর্ববৎ, পৃঃ ৬৫।

মা আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ-ঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা,
পাক দিতেছ অবিরত

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী পৃঃ ১২৪।

মনরে তুমি কৃষিকাজ জান না।
মন মানব-জমিন রইল পতিত,
আবাদ করলে ফলত সোনা।
—পূর্ববৎ, পদাবলী, পৃঃ ১২৭।

অলংকার রচনায় ঈশ্বরচন্দ্রও অনেক ক্ষেত্রে শাস্ত্রসম্মত চিরাগত উপমাস্থলগুলি বর্জন করে নিত্যপরিচিত অথচ অবহেলিত তুচ্ছ বিষয়েরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ কথা কারও অজানা নেই। তবুও কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিলে এ কথার সত্যতা উপলব্ধির সহায়তা হবে। দৃষ্টান্তগুলি সবই বসুমতী-সংস্করণ গ্রন্থাবলী (প্রচলিত) থেকে সংকলিত।—

লোভ নাহি থেকে থাকে খাই তাই চোটে।
পিটেপুলি পেচে যেন ছিটে-গুলি ফোটে॥
* * *
কর্তাদের গালগল্প গুড়ুক টানিয়া।
কাঁটালের গুঁড়িপ্রায় ভুড়ি এলাইয়া॥
—'কবিতা সংগ্রহ', পৌষপার্বণ, পৃঃ ৮০।

ঈশ্বরচন্দ্রের দৃষ্টিতে সামান্য আনারসও দেখা দিয়েছে অসামান্য রূপ নিয়ে।—

ঈষৎ শ্যামল রূপ, চক্ষু সব গায়।
নীলকান্ত-মণিহার চাঁদের গলায়॥
সকল নয়ন-মাঝে রক্ত-আভা আছে।
বোধ হয় রূপসীর চক্ষু উঠিয়াছে॥

নীলকান্তমনির তুলনাটাতে নূতনত্ব নেই। কিন্তু রূপসীর চোখ-ওঠার তুলনাটা অসাধারণ। এ রকম সাদৃশ্য কল্পনায় ঈশ্বরচন্দ্র অদ্বিতীয়।

ফুলকপির বর্ণনাট্যও অভিনব নয়।—

মনোহর ফুলকপি, পাতাযুক্ত তায়।
সাটিনের কাব্য যেন বাবুদের গায়॥
—হেমন্তে বিবিধ খাদ্য, পৃঃ ১৫১।

খয়রা মাছও স্মরণীয় হয়ে রয়েছে ঈশ্বরচন্দ্রের তুলনার গুণে।—

নয়ন জুড়ায় দেখে অতি প্রেমকর।
খয়রার পেট যেন ময়রার ঘর॥
—পূর্ববৎ, পৃঃ ১৫৯।

মিলন প্রার্থনায় কালিনীর উক্তি।—

পান-খয়েরের প্রায় তোমায় আমায়।
উভয়ে একত্র যোগ, কত ভোগ তায়॥

—মানভঞ্জন, পৃঃ ১৮৬।

'ঋতুপতি' বর্ষার বেশবর্ণনাট্যও উপভোগ্য। গায়ে তার ঢিলে-আস্তিন সাটিনের জামা, গলায় সোনার হার, আর পায়ে জরির লপেটা।—

সবুজ মেঘের দল ঢল ঢল ছল ছল
হত বল প্রবল অনিলে।
স্থির চক্ষে দেখা যায়, সাটিনের কাবা গায়,
আস্তিন হয়েছে ঢিলা
সোনার দামিনী-হার গলায় দুলিছে তার,
আহা মরি কত শোভা তায়।
সেফালিকা প্রস্ফুটিত অতিশয় সুশোভিত
জরির লপেটা লতা পায়॥

—বর্ষা, পৃঃ ২১৫।

এরকম কল্পনার দৃষ্টি কবি ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল।

রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্র যে চিরাভ্যস্ত উপমাদি অলংকার প্রয়োগেও অপটু ছিলেন না তা বলা বাহুল্য। পূর্বে যে সব দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে এবং পরেও যে সব দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হবে তার প্রতি একটু মন দিলেই এ কথা বোঝা যাবে। তবু আশু উপলব্ধির জন্য এখানে আরও কয়েকটি নমুনা দিচ্ছি।

প্রথমে রামপ্রসাদ—

আসার আশা আশা কেবল আসামাত্র হোলো।
চিত্রের কমলে যেমন ভৃঙ্গ ভুলে গেলো॥

—'কবিজীবনী', পৃঃ ৯৭।

ত্যজমনা, কুজন-ভুজঙ্গম-সঙ্গ।
কাল মত্তমাতঙ্গের না কর আতঙ্গ॥

অন্ধস্কন্ধে অন্ধ চড়ে,
উভয়েতে কূপে পড়ে,
কর্মিকে কি কর্ম ছাড়ে,
তার কি প্রসঙ্গ ॥

—পূর্ববৎ পৃঃ ৩৪০।

ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে।

* * *

জ্ঞানসমুদ্রের মাঝে রে মন,
শক্তিরূপা মুক্তা ফলে ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী—১২১।

এবার ঈশ্বরচন্দ্র—

হেরে সে বিমল মুখ নয়নে উপজে সুখ
যথা নিশা চাঁদের উদয়ে।
সে সুখদ শশধর সশাঙ্কিতা নিরন্তর
গুরু পরিবাদ-রাহু ভয়ে ॥

—কবিতা সংগ্রহ', প্রেমনৈরাশ্য, পৃঃ ২৬৮।

ভাবের করিয়া সৃষ্টি
প্রতি বাক্যে প্রীতি বৃষ্টি,
দৃষ্টিমেঘে দামিনী ঝলকে।
কিছু তার নহে বাঁকা, লজ্জার বসন ঢাকা
নয়নের পলকে পলকে ॥
থেকে থেকে আড়ে আড়ে
আড়চক্ষে দৃষ্টি ছাড়ে
ভাব দেখি ত্রিভুবন ভোলে।
চক্ষে শোভা নাহি তুল,
অর্ধফোটা পদ্মফুল,
পবনহিল্লোলে যেন দোলে ॥

—'কবিত সংগ্রহ', প্রলয়, : ২৭৩-৭৪।

কিন্তু এসব চিরপ্রয়োগসিদ্ধ অভিজাতবর্গীয় অলংকার রচনা রামপ্রসাদ বা ঈশ্বরচন্দ্রের আসল কৃতিত্বের বিষয় নয়। অনভিজাত ও অতিপরিচিত ও বস্তুকে অলংকাররূপে প্রয়োগ করে অপ্রত্যাশিত নূতনত্ব সৃষ্টিতেই তাঁদের আসল কৃতিত্ব। এ সব অনভ্যস্ত অলংকার প্রয়োগের দ্বারা সাহিত্যে যে নূতন রকমের রস উৎপন্ন হয় তার স্বাদবৈচিত্র্য আছে। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, এক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের সৃষ্ট রসেও স্বাদের পার্থক্য যথেষ্টই আছে। তার কারণ তাঁদের রসসৃষ্টির ক্ষেত্র ও লক্ষ্য পৃথক। যেমন,—রামপ্রসাদের বিষয় ধর্মগত এবং তার সুর অনেকাংশেই লিরিক ধরনের, আর ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার বিষয় বিচিত্র এবং লিরিক সুরের বিরলতা তাঁর রচনাবলীর একটি প্রধান অভাব। কিন্তু সে আলোচনা আমাদের পক্ষে অনাবশ্যক।

আমাদের পক্ষে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনার ক্ষেত্র ও লক্ষ্য বিভিন্ন হলেও তাঁদের অনুভূতি-প্রকাশ তথা অলংকারগত রসসৃষ্টির পদ্ধতি ছিল অভিন্ন। কবি চিত্তের বিষয়কে শ্রোতা বা পাঠকের চিত্তে সঞ্চারিত করবার প্রয়োজনে যে কোন তুচ্ছ আটপৌরে বস্তুকে অলংকাররূপে মেনে নেওয়াই হল সে পদ্ধতি। শব্দ বাছাই করার বেলায় যেমন, অলংকার রচনার বেলাতেও তেমনি চিরাগত সংস্কার ও প্রথা লঙ্ঘন করে অভিজাত-অনভিজাত-নির্বিবেশে যে-কোন বস্তুকে বিনা দ্বিধায় মর্যাদার আসনে স্থান দেওয়া, সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই হল আধুনিকতার একটি প্রধান লক্ষণ। এই সাহিত্যিক ডিমোক্রেসির যুগে অলংকার রচনার বেলাতেও গুরুচণ্ডালী বিধানের আর কোন বালাই নেই। এই হিসাবেও রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রকে আধুনিকতার অগ্রদূত বলে স্বীকার করতে হয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে কালক্রম তথা গুরুত্বের বিচারে অগ্রাধিকারের মর্যাদা রামপ্রসাদেরই প্রাপ্য।

দেখা গেল অর্থালংকার রচনায় রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের পদ্ধতি বহুলাংশ এক ধরনের হলেও একে অন্যের অনুবর্তী নন। অর্থাৎ একজনের উপরে অপর জনের কোন লক্ষণীয় প্রভাব নেই। কিন্তু শব্দালংকারের বেলায় একথা বলা চলে না। এক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্রের উপরে রামপ্রসাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। এখন তাই দেখাতে চেষ্টা করব।

একথা সুবিদিত যে, ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় একটি প্রধান দোষ তাঁর শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—

"শব্দচ্ছটায় অনুপ্রাসযমকের ঘটায় তাঁহার ভাবার্থ অনেক সময়ে একেবারে ঘুচিয়া মুছিয়া যায়।...ঈশ্বর গুপ্তের পূর্বেই কবিওয়ালার কবিতায়, পাঁচালীওয়ালার পাঁচালীতে ইহার বেশী বাড়াবাড়ি। দাশরথি রায় অনুপ্রাসযমকে বড় পটু—তাই তাঁর পাঁচালী লোকের এত প্রিয় ছিল এই অলংকারপ্রয়োগের পটুতায় ঈশ্বর গুপ্তের স্থান তার পরেই—এত অনুপ্রসযমক আর কোন বাঙ্গালীতে ব্যবহার করেনি। এখানেও মার্জিত রুচির অভাব জন্য বড় দুঃখ হয়।

ঈশ্বর গুপ্তের সময়-অসময় নাই বিষয়-অবিষয় নাই—একবার অনুপ্রাসযমকের ফোয়ারা খুলিলে আর বন্ধ হয় না। আর কোন দিকে দৃষ্টি থাকে না কেবল শব্দের দিকে।"

—কবিতা সংগ্রহ, ভূমিকা পৃঃ ৭১-৭২।

ঈশ্বরচন্দ্রের এই শব্দাড়ম্বরপ্রিয়তা ও অনুপ্রসযমকের প্রতি তাঁর এই আগ্রাহাতিশয্যের উৎস কোথায়, বঙ্কিমচন্দ্র সে সম্বন্ধে নীরব। অন্য অনেকের মত তাঁরও হয়ত ধারণা ছিল যে, পূর্বগামী কবিওয়ালা ও পাঁচালীওয়ালাদের প্রভাবেই তাঁর মধ্যে এই শব্দাড়ম্বর তথা শব্দানুপ্রাস-প্রিয়তা দেখা দিয়েছিল। এই ধারণার মধ্যে কিছু সত্য আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার বিশ্বাস এক্ষেত্রেও ঈশ্বরচন্দ্রের আদিগুরু ছিলেন রামপ্রসাদ। এ বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় যে দোষ, রামপ্রসাদের রচনারও সেই দোষ। রামপ্রসাদী রচনায় যমকানুপ্রাসবাহুল্য কম পীড়াদায়ক নয়।

এবার দৃষ্টান্ত দিয়ে উক্ত সিদ্ধান্তের সত্যতা প্রতিষ্ঠায় চেষ্টিতে হওয়া যাক। রামপ্রসাদের কালীকীর্তন কাব্যের প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের অনুরাগ ছিল তাঁর অল্প বয়স থেকেই একথা আগেই বলা হয়েছে। কাব্যের এক স্থানে আছে—

গিরিশ-গৃহিনী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিতকাঞ্চনকান্তি প্রথম বয়েস॥

* * *

জগদম্বারে, যব পূরে বেণু।
যব পূরে বেণু, ধায় বৎস ধেনু।
উড়ে পদরেণু, রেণু ঢাকে ভানু।
ভ্যবে ভোর তনু। ইত্যাদি —'কবি জীবনী' পৃঃ ৬১।

এখানেই ঈশ্বরচন্দ্রের অনুপ্রাস-প্রীতির আদি-উৎস। এই উদ্ধৃতির দুই অংশে দু রকম অনুপ্রাস, এটাও লক্ষণীয়। ঈশ্বরচন্দ্রের রচনাতেও এই দু রকম অনুপ্রাস দেখা যায়। রামপ্রসাদের 'কষিতকাঞ্চনকান্তি' কথাটিতে ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন রসসৃষ্টির প্রয়োজনে যে রকম অদ্ভুত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন তা সত্যই উপভোগ্য।

কষিতকাঞ্চনকান্তি কমনীয় কায়।
গাল-ভরা গোঁপ-দাড়ি তপস্বীর প্রায় ॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), এণ্ডাওয়ালা তপস্যা কাছ, পৃঃ ১২৯।

ধিক্ ধিক্ তোরে বলি রে তনয়,
বুঝিলাম তোরা আমার ত নয়,
এমন করিতে উচিত নয়,
প্রভুরে লইলি যমের আলয়,
ইহা দেখি আমি বসিয়ে হে ॥

রামপ্রসাদ কহিছে, শুন মা জানকী,
রামের মহিমা তুমি না জান কি,
এখনি উঠিবে রাঘব ধনকি,
প্রবোধ মান মা কমল কানকী,
দেখিবে নয়ন ভরিয়ে গো ॥

—'কবি জীবনী', পৃঃ ৮৪।

এখানে 'তনয়' ও 'জানকী' শব্দে যমক অলংকার প্রয়োগের দ্বারা চমক সৃষ্টির প্রয়াসটুকুই শুধু লক্ষণীয় নয়, অনুপ্রাসের খাতিরে 'কানকী' ও 'ধানকি'র ন্যায় অর্থহীন শব্দ রচনায় হাস্যকর কিম্বা বিরক্তিকর প্রয়াসটুকুও লক্ষণীয়। এ ক্ষেত্রেও রামপ্রসাদ দাশরথি রায় তথা ঈশ্বরচন্দ্রের পথপ্রদর্শক। এ রকম প্রয়াস দেখে মনে হয়,—

"অনুপ্রাস-যমকের অনুরোধে অর্থের ভিতর কি ছাইভস্ম থাকিয়া যায়, কবি তাহার প্রতি কিছুমাত্র অনুধাবন করিতেছেন না দেখিয়া অনেক সময় রাগ হয়, দুঃখ হয়, হাসি পায়, দয়া হয়, পড়িতে আর প্রবৃত্তি হয় না।"

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও অনেক স্থলেই

সমভাবে প্রযোজ্য। ছন্দ-আলোচনা-প্রসঙ্গে এরকম কিছু দৃষ্টান্ত যথাস্থানে উদ্ধৃত করা যাবে।

যা হক, 'তনয়' শব্দ নিয়ে উক্ত প্রকার ছেলেখেলার দৃষ্টান্তটির প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের—

'দোষের ত নয় তবে ঘোষের তনয়।'

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী)' বড়দিন, পৃঃ ১৩১।

পংক্তিটির কথা স্বভাবতঃই মনে আসে। রামপ্রসাদের রচনা থেকে এরকম যমক প্রয়োগের আর একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।—

কাহার নারী হে, চিনিতে নারি রে,
যোজিত করেছে ছিন্নবেশে।

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), পদাবলী—১৯৩।

এর সঙ্গে তুলনীয় ঈশ্বরচন্দ্রের এই দুই পংক্তি।—

আমার কি বল গিরি, আমি জেতে নারী।
আমার কি বল গিরি, আমি যেতে নারি॥

—গ্রন্থাবলী (বসুমতী), মেনকার কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয়, পৃঃ ২৮৬।

ভাল করে খুঁজলে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের রচনায় এরকম সাদৃশ্যের আরও অনেক দৃষ্টান্তই পাওয়া যাবে বলে মনে করি।

রামপ্রসাদের এই বিখ্যাত পদটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।—

এমন দিন কি হবে তারা,
যবে তারা তারা বলে
তারা বেয়ে পড়বে ধারা॥

—পদাবলী--৭১।

এখানে 'তারা বেয়ে' না লিখে 'নয়ন বেয়ে' লিখলে ক্ষতি হত না, হয়ত ভালই হত। কিন্তু কবি যমক রচনার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। পূর্বে দেখেছি তাঁর অনুপ্রাসের মোহও কম ছিল না। তার আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বর্তমান প্রসঙ্গ শেষ করছি।

প্রসাদ বলে পাষাণ মেয়ে,
আসন দে মা ফিরে চেয়ে,
আমি ভাসান দিলাম গুণ গেয়ে
ভবার্ণবে গো।

—'কবি জীবনী', পৃঃ ৬৫

এ প্রসঙ্গে শেষ কথা এই যে, ঈশ্বরচন্দ্র সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় রামপ্রসাদের যেসব রচনা বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে সংকলন করেছিলেন এবং যেগুলির প্রশংসায় তিনি বারবার উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন, সেগুলির মধ্যে এরকম যমক-অনুপ্রাস নিয়ে খেলার বহু নিদর্শন আছে। হয়তো এটাও সেগুলির প্রতি তাঁর আকৃষ্ট হবার একটা বড় কারণ।

যা হক, রামপ্রসাদের রচনাই যে ঈশ্বরচন্দ্রের শব্দালংকার প্রীতির একটি প্রধান উৎসস্থল, আশা করি এখন সে বিষয়ে সন্দেহের আর বিশেষ অবকাশ নেই।

ছন্দো রচনায় ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, সে আলোচনারও সার্থকতা আছে। কিন্তু সংক্ষিপ্ত আলোচনায় ও বিষয়টির গুরুত্ব রক্ষা সম্ভব নয়। তাই ছন্দের ক্ষেত্রে রামপ্রসাদ ও ঈশ্বরচন্দ্রের আপেক্ষিক কৃতিত্বের বিষয় স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচিত হল।

রামমোহন রায় ১৭৭৪—১৮৩৩

নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

রামমোহন রায় ও বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন

১৯৩৩ সালে বাংলাদেশে যখন রামমোহন রায় মৃত্যু শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়, তখন তার নেতৃত্বে এগিয়ে এসেছিলেন কলকাতার ব্রাহ্মসমাজ। বিশ্ববিদ্যালয় বা বাংলার সারস্বত সমাজ সে ঘটনাকে জাতীয় অনুষ্ঠানে পরিণত করেননি। এ থেকে এই কথাই অনুমান করতে হবে যে রামমোহনের সামগ্রিক পরিচয় বাঙালী তখনো আবিষ্কার করেননি, যদিও ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুস্তিকাটি আগেই লিখিত ও প্রকাশিত হয়েছিল এবং রবীন্দ্রনাথের একাধিক নিবন্ধে রামমোহনের জীবন ও কর্মের অন্তরঙ্গ রূপটি গভীর অনুরাগের সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

আসলে রামমোহনের প্রগতিবাদী আন্দোলনকে তাঁর সমসাময়িক সমাজ ফিরিঙ্গীকরণেরই প্রকারভেদ মাত্র মনে করেছিলেন এবং উপনিষদ ও অদ্বৈত বেদান্তের বুলি মুখে নিয়ে তিনি খৃষ্টানী ঢঙে দেশকে নূতন করে ঢেলে সাজাতে চাইছেন, এই কথাই তাঁরা সাড়ম্বরে প্রচার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, রাধাকান্ত দেব, রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যোগে রক্ষণশীল সমাজ একটি পালটা শিবিরও তৈরী করেছিলেন, নব্য হিন্দু অভ্যুত্থানের আন্দোলনে রামমোহনকে পর্যুদস্ত করতে। এই দলের পৃষ্ঠ-পোষকতায় শাস্ত্র গ্রন্থাদির ব্যাপক প্রচার হয়েছিল দেশে এবং এঁদের সমর্থকদের উদ্যোগেই কোন কোন ধর্মগুরু সেদিন সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার রূপেও পরিগণিত হয়েছিলেন।

সমগ্র উনবিংশ শতাব্দী জুড়েই একটা দ্বিধা বিভক্ত মানসিকতা কাজ করেছে আমাদের সমাজে এবং একশ বছরেও তার শেষ হয়নি। একদিকে হয়েছে সতীদাহ নিবারণ, বহু বিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্তন, জাতিভেদ অপসারণ, নারীশিক্ষা প্রচলন, ইতিহাস ও বিজ্ঞানসিদ্ধ জীবনদর্শন অনুসরণ ইত্যাদির পক্ষে ব্যাপক প্রচার, অন্যদিকে হয়েছে সমাজের সাবেকী কাঠামো বহাল রাখার ও সনাতন শিক্ষাদীক্ষায় জল সিঞ্চনে তাকে পুনরুজ্জীবিত করারও প্রয়াস। দুইয়ের বর্গফল হিসেবে জাতীয় সত্তা তিন পা

এগিয়েছে, দু পা পেছিয়েছে। অর্থাৎ যে বেগে ও যতটা পরিমাণে অগ্রসর হবার কথা তা হয়নি। রামমোহনকেও তাই ঠিক ঠিক বোঝাবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়নি দেশে।

তার মানে রামমোহন যে নূতন যুগ ও জীবনচেতনা এনেছিলেন আমাদের মাটিতে, তা আমাদের সংস্কৃতিকে মধ্যযুগ থেকে এযুগে পা বাড়াতে একক ভাবে পর্যাপ্ত সহায়তা করলেও, তার স্বরূপটা ধরতে পারেননি অনেকেই। প্রতিরোধের শিবিরটা পূর্বাপর অক্ষুন্ন তেজে মাথা তুলে থেকেছে বলেই, রামমোহন ও তাঁর মতবাদের পূর্ণ চেহারাটা পরিস্ফুট হয়নি মানুষের সামনে। অবস্থা প্রায় একই থেকেছে, বলতে গেলে, তাঁর মৃত্যুর একশ বছর পরেও। অল্প সংখ্যক মননশীল মানুষ অবশ্য তাঁকে চিনেছেন ও বুঝেছেন। কিন্তু বেশীরভাগ সাধারণ হিন্দুর কাছেই তিনি হয়ে থেকেছেন স্বধর্মদ্বেষী ব্রেম্ম ক্রেস্তান। আগেই বলেছি এদুইকে তাঁর সমসাময়িকরা সমর্থবোধক মনে করতেন।

২

সুখের কথা যে রামমোহন প্রতিভার সমগ্র রূপটি এবং তাঁর মননশীলতার প্রকৃত তাৎপর্য দেশবাসীকে বুঝিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল ও বিপিনচন্দ্র পাল। তাতেই আমরা জানতে পেরেছিলাম যে রামমোহন রায় শুধু একজন মহৎ মানুষ নন, তিনিই ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক মানুষ। তিনিই প্রথম বলেছিলেন যে ধর্ম ও সমাজের জন্যে মানুষ নয়, মানুষের জন্যেই ধর্ম ও সমাজ। সুতরাং মানুষের যাত্রাপথ যদি ওদের অনড় স্থবিরতায় ব্যাহত হয়, তাহলে ওদের ভাঙতে হবে। এই ভাঙার হাতিয়ার হল জীবনভিত্তিক শিক্ষায়, যার প্রধান দুটি পাঠ্যবস্তু হল বিজ্ঞান এবং ইতিহাস। এই নূতন শিক্ষাধারার স্বীকৃতিই রামমোহনের শ্রেষ্ঠ দান, এর জোরেই হয়েছে আমাদের ইতিহাসে পটপরিবর্তন।

কিন্তু আগেই বলেছি, রামমোহনের সঙ্গে সঙ্গেই মাথা তুলেছিল শক্তিশালী আর একটি বিরোধী শিবিরও এবং তাঁদের পুরোভাগেও বিশিষ্ট মানুষরা ছিলেন। ফলে অবিশ্রাম ভাঙাগড়ার স্রোতেই আবর্তিত হয়েছে আমাদের সমাজচেতনা। একদিকে এসেছে বিশুদ্ধ যুক্তিবাদ, যা বিজ্ঞানের অনুগামী, অন্যদিকে এসেছে নূতন ভক্তিবাদ, যা পুরান শাক্ত ও বৈষ্ণবাদর্শকে শিক্ষিত

সমাজের সামনে নূতন করে ধরেছে। দুটি ধারা পরস্পর বিরোধী খাতে একে অন্যকে স্পর্শ না করেও এগিয়েছে, আবার দুইয়ের মধ্যে বারবার সমন্বয়েরও প্রয়াস হয়েছে। উনিশ শতকের বাংলা সংস্কৃতির একাত্মিক একটা মূর্তি খুঁজে বের করা কঠিন।

একদিকে দেখতে পাই বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের মত প্রায় নাস্তিক বস্তুবাদী মানুষরা রয়েছেন, যাঁরা মনুষ্যকল্যাণকেই সবার বড় ভাবতেন, অন্যদিকে আবার দেখি পরমহংস, বিজয়কৃষ্ণ ও গোপাল ঠাকুর প্রমুখ ভক্ত মানুষরা রয়েছেন, যাঁরা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ শুনতেন এবং ঈশ্বরাবতার রূপে বহুজনের পূজো পেতেন। এই মিশ্র মানসিকতা আমাদের প্রতিফলিত হয়েছে সেদিনের সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য, সবদিকেই। অর্থাৎ একাত্মিক একটা দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবন-দর্শন সমগ্র জাতিকে অগ্রগামিতার পথে চালিত করেনি। এর ফলে ভাল মন্দ যা হবার হয়েছে। কিন্তু জিনিষটা পরিষ্কার করে বোঝার প্রয়োজন আছে। গোলে হরিবোল দিয়ে উনিশ শতকী রেনেশাঁসের যে ব্যাখ্যা করা হয়, তা এখন সংশোধনের সময় এসেছে।

সেদিনের সামাজিক জীবন ধারা লক্ষ্য করুন। একদিকে যে শাস্ত্র তাবৎ পার্থিব বস্তুকে মায়ামাত্র বলে, তা পড়ান রহিতের প্রস্তাব করা হচ্ছে, অন্যদিকে ঐহিক ভোগসুখ পরিহার করে পরমার্থ সন্ধানের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। একদিকে সিপাহী বিদ্রোহকে জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ জ্ঞানে স্বাগত জানান হচ্ছে, অন্যদিকে লছমী বাঈ ও তাঁতিয়া তোপীর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করা হচ্ছে এবং নেটিভ ফাইডেলিটির ওপর বই লিখে ইংরেজের প্রতি আনুগত্য জানান হচ্ছে। একদিকে চাষী রায়তের স্বার্থে সংবাদপত্রে তুমুল আন্দোলন চলছে, অন্যদিকে জমিদার, মহাজন ও মঠাধীশদের স্বার্থ আগলানর প্রচণ্ড চেষ্টা চলছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলন ও চলছে, তার গতিরোধের জন্যে গ্রামে শহরে চলছে অবিরাম লাঠালাঠিও।

৩

এই মিশ্র মানসিকতার ঘোর বিশ শতকের প্রথম তিন দশকেও ষোল আনা কাটে নি বলে, পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন রামমোহনের মৃত্যু শতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়, বেশীর ভাগ হিন্দু তাকে তখন ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের উৎসব

ভেবেছিলেন। অবশ্য তাঁরা রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। এদেশে পাশ্চাত্যধারার শিক্ষা প্রবর্তক, সতীদাহ নিবারক এবং প্রথম আমলের শক্তিশালী একজন বাংলা গদ্য লেখক বলে তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন তাঁরা। তাঁর সত্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার উল্লেখ করে প্রবন্ধটি লিখতেন তাঁরা। কিন্তু তাঁর মননশীলতা ও ব্যক্তিত্বের যথার্থস্বরূপ তাঁরা বোঝেননি, কেন না গোড়া থেকেই তাঁর প্রতিকূলে খাড়া ছিল আমাদের সমাজ মনস্তত্ত্ব।

আসলে আমাদের ইতিহাসে রামমোহনের ভূমিকা ছিল বিপ্লবীর। তিনি জরাজীর্ণ পুরাতন ইমারতকে মেরামত করে একালের উপযোগী করতে চাননি, তাকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে নূতন করে গড়তে চেয়েছিলেন। একথা ঠিক যে তিনি উপনিষদ থেকে একেশ্বর তত্ত্ব আহরণ করে তার বনিয়াদের উপর ব্রাহ্মসমাজ তুলেছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্য খৃষ্টীয় ও ঐস্লামিক ধর্ম চেতনার মধ্যে একটা সমন্বয়ের সূত্রও খুঁজছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ধার্মিক ছিলেন না। আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্বন্ধে ডিরাজিও, ডেভিড হেয়ার এবং বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমারের মতই মুক্তাত্মা ছিলেন তিনি। তাই স্বর্গের চেয়ে পৃথিবী এবং ঈশ্বরের চেয়ে মানুষ ছিল তাঁর বৃহত্তম অনুধ্যানের বস্তু। এই অনুধ্যানেই হল তাঁর খাঁটি পরিচয়।

অর্থাৎ রামমোহনের মানবতা ধর্মভিত্তিক ছিল না, তাই তাঁর অনুপ্রেরণা থেকে দেশে জেগেছিল ইতিহাসনিষ্ঠা, বিজ্ঞান সন্ধিৎসা ও সাহিত্যপ্রীতি। ধর্ম পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন করেছিলেন তাঁর বিরোধী শিবির। তাই দেখি মননধর্মে বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, মাইকেল ও হরিশমুখুজ্যে তাঁর যত কাছের, কেশব, বঙ্কিম বা তাঁদের ভাবি উত্তরাধীকারীদ্বয়, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দ তা নন। এই শেষোক্ত চারজনই অবশ্য সমন্বয়বাদী এবং সেকালের সঙ্গে একালের, ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছিলেন তাঁরা। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে সমাজ মানসে তা রক্ষণশীলতার বাতাবরণকেই দৃঢ় করেছে। বিশুদ্ধ মানবাত্মা দৃষ্টি বা বিজ্ঞানাশ্রিত জীবন জিজ্ঞাসা উদ্রিক্ত করেনি। প্রকৃতপক্ষে এই শেষোক্ত দলের অন্তশ্চেতনায় উদ্দীপনা এসেছিল উল্টো শিবির থেকে, রামমোহন রায় থেকে নয়।

রামমোহন প্রসঙ্গে তাঁর উত্তর-পুরুষদের মধ্যে শুধু একজনের কথা মনে হয় আমার। তিনি রবীন্দ্রনাথ। ধর্মাশ্রিত জাতীয়তা দিয়ে যাত্রা সুরু

করেছিলেন তিনিও একথা ঠিক। কিন্তু এ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আন্তর্জাতিকতায় উন্নীত হয়েছিলেন তিনি মধ্য বয়সেই এবং শেষ অধ্যায়ে বিজ্ঞানবোধি ও নিরীশ্বর বস্তুবাদকে কবুল করেই প্রমাণ করেছিলেন যে তাঁর আত্মা ছিল চির চলন্ত। রামমোহন ছিলেন এমনি চলিষ্ণু মনের অধিকারী, তাই ফরাসী বিপ্লব তাঁকে উদ্দীপ্ত করেছিল, স্পেনীয় উপনিবেশের বন্ধনমুক্তি উৎসাহ দিয়েছিল তাঁকে। তাই জেরেমি বেন্থামের সঙ্গে পত্রালাপ ও পাদ্রী এডামের সঙ্গে হিন্দু বনাম খৃষ্টীয় একেশ্বরবাদমূলক বিতর্কে আনন্দ পেয়েছিলেন তিনি। তাই দূর বৃটেনে বসেও নিরাকার পরমব্রহ্ম নয়, ভারতের নিরন্ন চাষীও বিড়ম্বিত হিন্দু বিধবাই অধিকার করে থেকেছিল তাঁর চিত্ত। দীর্ঘতর জীবন পেলে হয়ত তিনিও মিল বেন্থাম এবং হিউমের সহযাত্রী রূপেই এদেশের মানসিকতাকে নূতন করে গড়তেন এবং ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তকরূপে তাঁর যে পরিচয় তার মূলোচ্ছেদ করে যেতেন। কিন্তু সে সুযোগই হয়নি তাঁর।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০—১৮৯১

নমিতা চক্রবর্তী

ঈশ্বরচন্দ্র জন্মেছিলেন প্রাচীনপন্থী পরিবারে। তার পরিবেশের চতুর্দিকে ছিল রক্ষণশীলতার সুদৃঢ় প্রাচীর। সেদিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরের ছেলে যজন-যাজন নিয়ে থাকতেন টোল খুলে অধ্যাপনা এবং নব্যদলকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করতেন অনেক পণ্ডিত। অধিক দূর অগ্রসর হলে, রাজধানীর ধর্মসভার নেতৃবৃন্দের বক্তব্যের পোষকতা করবার জন্যে শাস্ত্রবিচার এবং কোন কোন বিচার সভার শাস্ত্রীয় অনুশাসনের ব্যাখ্যাও করতেন পণ্ডিত সমাজ। যে অচল শিলাখণ্ড তখন সমস্ত প্রগতির পথকে রুদ্ধ করেছিল তার প্রধান রক্ষক ছিলেন এঁরা।

এইরূপ পরিবেশ ও পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ঈশ্বরচন্দ্র যে হয়েছিলেন বাংলাদেশের নবজাগরণের একজন বিশিষ্ট ধারক ও বাহক, তা পরমাশ্চর্যের বিষয় কিন্তু তাঁর পারিবারিক ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেই সকল বিস্ময়ের অবসান হয়। তিনি রক্ষণশীল পরিবারে জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু সেখানে একই দুর্বার গতিস্রোত বর্তমান ছিল। নিজের ঘরে গতানুগতিক জীবনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, পিতামহ কেউ স্থির থাকতে পারেননি। পিতামহ রামজয় পরিণত যৌবনে ঘরের বন্ধন ছিন্ন করে বেরিয়েছিলেন পথে। উদার আকাশ, সামাজিক অনুশাসনমুক্ত পরিবেশ পর্যটকের মনকে বোধহয় বহু সংস্কার হতে মুক্তি দিয়েছিল।

তাপপর পিতা ঠাকুরদাস ঘর ছেড়ে পথে বের হলেন অনতিক্রান্ত কৈশরে। দারিদ্র্য তাকে প্রেরণা দিয়েছিল সত্য, কিন্তু সেদিন বাংলার পল্লীতে তেমন দারিদ্র্যক্লিষ্ট বহু বালকই ছিল। তারা দারিদ্র্য নিবারণের জন্যে অর্থ উপার্জনের আশায় ঘর ছেড়ে অজ্ঞাত পথে বের হবার স্বপ্নও দেখেনি। ঠাকুরদাস রামজয়ের পুত্র। পিতার ন্যায় পুত্রকেও ডাক দিয়েছিল পথ। প্রাচীনত্বের ধারক ঠাকুরদাস, কিন্তু গতিশীল পথিক। গতিবেগ তাঁকে প্রাচীনত্বের স্থবিরতা হতে মুক্তি এনেছিল।

এই পরিবারের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মালেন ঈশ্বরচন্দ্র। তিনিও কৈশোরে এলেন কলিকাতায় শিক্ষা গ্রহণের জন্য। রাজধানীতে তখন

প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সংঘাত চলেছে। প্রাচীন সব কিছু ভাঙবার উত্তেজনাকর পাগল 'ইয়ং বেঙ্গল', আর কঠিন অবরোধ রচনা করেছে প্রাচীন সমাজ। একটা মহাপ্লাবনের বেগে কাঁপছে বাংলাদেশ, কাঁপছে বাঙালী। আবার নিজের অজ্ঞাতসারেই প্রস্তুত হচ্ছে নবযুগের জন্য। ঈশ্বরচন্দ্র অনুভব করলেন এই বেগ এবং স্পন্দন।

জন্মসূত্রে তিনি যে তেজ এবং গতি-তৃষ্ণার অধিকারী হয়েছিলেন তাই তাঁর চরিত্রকে সুদৃঢ় কিন্তু প্রগতিশীল করেছিল, আর পরিবেশ আনল সংস্কারমুক্তির চেতনা। প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার প্রভাবে গঠিত বিদ্যাসাগরের চরিত্র মাঝে মাঝে রহস্যময় বলে মনে হয়। একদিকে 'দয়া' শব্দ তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ধন্য হয়েছে, অন্যদিকে আপোষহীন অনমনীয় মনোবৃত্তি এই মহাপুরুষকে অতিরিক্ত কঠিন করে তুলেছে। মাঝে মাঝে আমাদের মনে হয়, বিদ্যাসাগর কেবল নীতি এবং সত্য দিয়ে গঠিত একটি কঠিন মানুষ! কিন্তু, আবার তখনই দেখি দীন অন্ত্যজ রমণীর রুক্ষকেশে তৈলসিঞ্চন করছেন মায়ের মমতায় দয়ার সাগর। এই মহান চরিত্র বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত্রে' বলেছেন :

"বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। কারণ, দয়াবৃত্তি আমাদের অশ্রুপাতপ্রবণ বাঙালি হৃদয়কে যত শীঘ্র প্রশংসায় বিচলিত করতে পারে, এমন আর কিছু নহে। কিন্তু বিদ্যাসাগরের দয়ায় কেবল যে বাঙালি জনসুলভ হৃদয়ের কোমলতা প্রকাশ পায় তাহা নহে, তাহাতে বাঙালিদুর্লভ চরিত্রের বলশালিতারও পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার দয়া কেবল একটা প্রকৃতির ক্ষণিক উত্তেজনা মাত্র নহে, তাহার মধ্যে একটা সচেষ্ট আত্মশক্তির অচল কর্তৃত্ব সর্বদাই বিরাজ করিত বলিয়াই তাহা এমন মহিমাশালিনী। এ দয়া অন্যের কষ্ট লাঘবের চেষ্টায় আপনাকে কঠিন কষ্টে ফেলিতে মুহূর্তকালের জন্য কুণ্ঠিত হইত না।...পরের উপকার কার্যে তিনি আপনার সমস্ত বল ও উৎসাহ প্রয়োগ করিতেন। ইহার মধ্যেও তাঁহার আজন্মকালের একটা জিদ প্রকাশ পাইত। সাধারণত আমাদের দয়ার মধ্যে এই জিদ না থাকাতে তাহা সংকীর্ণ ও স্বল্পফলপ্রসূ হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়, তাহা পৌরুষমহত্ত্ব লাভ করে না।

কারণ, দয়া বিশেষরূপে স্ত্রীলোকের নহে, প্রকৃত দয়া যথার্থ পুরুষেরই ধর্ম। দয়ার বিধান পূর্ণরূপে পালন করিতে হইলে দৃঢ়বীর্য এবং কঠিন

অধ্যবসায় আবশ্যক, তাহাতে অনেক সময় সুদূরব্যাপী সুদীর্ঘ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করিয়া চলিতে হয় ; তাহা কেবল ক্ষণকালের আত্মত্যাগের দ্বারা প্রবৃত্তির উচ্ছ্বাসনিবৃত্তি এবং হৃদয়ের ভাব লাঘব করা নহে ; তাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া নানা বাধা অতিক্রম করিয়া দুরূহ উদ্দেশ্যসিদ্ধির অপেক্ষায় রাখে।"

দয়া যদি নারী হয়, তবে বলিষ্ঠ পৌরুষের আশ্রয় ব্যতীত সে তো কখনই স্বমহিমায় প্রকাশিত হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বলেছেন যে, ক্ষণিকের৷ উচ্ছ্বাসনিবৃত্তির সঙ্গে দয়ার সম্পর্ক নেই। দীর্ঘদিনের আত্ম-ত্যাগ এবং আত্মনিপীড়নের দাবী নিয়ে দয়া এসে প্রকৃত পুরুষের নিকট উপস্থিত হয়।

কেবল রবীন্দ্রনাথ নন তাঁর পূর্বে বাংলার দু'জন কবি বিদ্যাসাগরের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন। মধুসূদন বলেছেন :

"The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an English man, and the heart of a Bengalee mother".

কবি হেমচন্দ্রের ভাষায় :

'উৎসাহে গ্যাসের শিখা, দার্ঢ্যে শালকড়ি' এবং 'স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা, পারিজাত ঘ্রাণে'।

হেমচন্দ্রের 'স্বাতন্ত্র্যে শেঁকুল কাঁটা' কথাটি আমাদের মনে একটু আপত্তি এনে দেয় আবার যখন প্রান্তরে বহু গুল্মের মধ্যে 'শিঁয়াকুল কাঁটা' গাছটিকে নিজের কণ্টক আবেষ্টনীতে অন্যগুলির নিকট হতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে দেখি, তখন মনে হয় হয়তো কবির উক্তি যথার্থ। কিন্তু একথা ভুলতে পারি না যে, যে মহিলার পরিমণ্ডল ঈশ্বরচন্দ্রকে সাধারণ মানুষ হতে পৃথক করে দিয়েছিল তা কণ্টক নয়, একটা বিরাট বলিষ্ঠতা।

বিদ্যাসাগর স্বতন্ত্র ছিলেন কেবল মানসিক গঠনে নয় ; বেশ-বাস আচার-আচারণও তার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বহন করত। উত্তরীয় আর চটি তাঁকে নব্যদল হতে পৃথক করেছিল। রাজপুরুষদের নিকটেও তিনি এই বেশেই উপস্থিত হতেন। প্রতিবাদ করে বিফলকাম হয়ে ইংরেজ বিদ্যাসাগরের বৈশিষ্ট্যব্যঞ্জক বেশকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ বর্ধমানের মহারাজা তাঁকে বীরসিংহ গ্রাম তালুক-রূপে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র তা গ্রহণ করেননি। রামমোহনের পুত্র, ঈশ্বরচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রামপ্রসাদ রায় বিধবাবিবাহ প্রচলন চেষ্টার

প্রতিজ্ঞা-পত্রে স্বাক্ষর করে ও কোন বিবাহস্থলে উপস্থিত হতে সঙ্কোচ বোধ করায় ঈশ্বরচন্দ্র তাকে কঠিন ধিক্কার দিয়েছিলেন।

দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর মধ্যে স্নেহের অফুরন্ত নির্ঝর ছিল। বন্ধুগৃহের ক্ষুদ্র বালিকা প্রভাবতীর অকাল মৃত্যু হলে তিনি যে রচনাটি 'প্রভাবতী সম্ভাষণ' নামে বৈশাখ সংখ্যার (১২৯৯) 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশ করেছিলেন সেটি লক্ষ্য করলেও আমরা তাঁর অন্তরের অপূর্ব বাৎসল্যরসের পরিচয় পাই। তিনি লিখেছিলেন:

"বৎসে প্রভাবতী! তুমি দয়া, মমতা ও বিবেচনায় বিসর্জ্জন দিয়া এ জন্মের মত সহসা, সকলের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইয়াছি। কিন্তু আমি, অনন্যচিত্ত হইয়া, অবিচলিত স্নেহভরে তোমার চিন্তায় নিরন্তর এরূপ নিবিষ্ট থাকি যে, তুমি, এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত, আমার দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইতে পার নাই।···

"···তোমার অদ্ভুত মনোহর মূর্ত্তি চিরদিনের নিমিত্ত, আমার চিত্তপটে চিত্রিত থাকিবেক। কালক্রমে পাছে তোমার বিস্মৃত হই, এই আশঙ্কায়, তোমার যারপর নাই চিত্তহারিণী ও চমৎকারিণী লীলা সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম।···"

"বৎসে! তোমায় আর অধিক বিরক্ত করিব না; একমাত্র বাসনা ব্যক্ত করিয়া বিরত হই—যদি তুমি পুনরায় নরলোকে আবির্ভূত হও, দোহাই ধর্ম্মের এইটি করিও, যাঁহারা তোমার স্নেহপাশে বদ্ধ হইবেন, যেন তাঁহাদিগকে, আমাদের মত, অবিরত, দুঃসহ শোকদহনে দগ্ধ হইয়া যাবজ্জীবন যাতনা ভোগ করিতে না হয়।"

ফরাসীদেশে মধুসূদন দত্ত যখন অপরিসীম অর্থাভাবের সম্মুখীন হয়ে ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে পত্র লেখেন, তাতেও তিনি লিখে-ছিলেন, 'বাঙালি মায়ের মত যাঁর কোমল হৃদয়' তাঁর কাছে মধুসূদন সাহায্য প্রার্থনা করছেন।

মমতার মত ঈশ্বরচন্দ্রের তেজের কথাও তো সর্বজনবিদিত এই সম্বন্ধে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বলেছেন:

"মানব চরিত্রের প্রভাব যে কি জিনিষ, উগ্র-উৎকট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজীয়ান পুরুষগণ ধনবলে হীন হইয়াও যে সমাজ মধ্যে কিরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন, তাহা আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখিয়া

জানিয়াছি। সেই দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, যাঁহার পিতার দশ বার টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বাল্যকালে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে থাকিতেন, তিনি এক সময় নিজ তেজে সমগ্র বঙ্গসমাজকে কিরূপ কাঁপাইয়া গিয়াছেন। তাহা স্মরণ করিলে মন বিস্মিত ও স্তব্ধ হয়। তিনি এক সময়ে আমাকে বলিয়াছিলেন—'ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই, যাহার নাকে এই চটিজুতা—শুদ্ধ পায়ে টক্ করিয়া লাথি না মারিতে পারি'। আমি তখন অনুভব করিয়াছিলাম এবং এখনও অনুভব করিতেছি যে, তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য। তাঁহার চরিত্রের তেজ এমন ছিল যে, তাঁহার নিকট ক্ষমতা-শালী রাজারাও নগণ্য ব্যক্তির মধ্যে।"

আমরা দেখেছি এই তেজের জন্যই বিন্দুমাত্র ইতস্তত: না করে ঈশ্বরচন্দ্র সরকারী কর্ম ত্যাগ করেছিলেন। ইন্‌স্পেকটর প্র্যাট বিদায় নেবার পর যখন তাঁকে স্কুল পরিদর্শকের কাজ না দিয়ে তৎস্থলে একজন ইয়োরোপীয়কে নেওয়া হল তখন লেফ্‌টেনান্ট গভর্ণর হ্যালিডের সমস্ত অনুরোধ তুচ্ছ করে ঈশ্বরচন্দ্র পদত্যাগ করলেন। সংস্কৃত কলেজ নিয়েও তিনি ডঃ ব্যালেণ্টাইনের পত্রের নির্ভীক সমালোচনা করেছিলেন। সরকারী অসন্তুষ্টির কথা চিন্তাও করেন নি। কেবল সরকার নয়, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন প্রসঙ্গে তিনি অনুজ শম্ভুচন্দ্রকে লিখিছিলেন :

"...আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি, নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত বা আবশ্যক বোধ হইবেক তাহা করিব ; লোকের বা কটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না।"

এই কথা ক'টির মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের আদর্শ নিহিত আছে। তিনি নিজের বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে যাকে সমাজ বা ব্যক্তির মঙ্গল বলে ধারণা করতেন, তার সিদ্ধির জন্য নিজের সমস্ত শুভাশুভ সম্বন্ধে জ্ঞানশূন্য হয়ে কর্মপথে প্রবৃত্ত হতেন। এই জন্যই ঈশ্বরচন্দ্র প্রচুর অসুবিধার সৃষ্টি হবে জেনেও সরকারী অনুমোদনের অপেক্ষা না করেই গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মঙ্গল চিন্তা করে তিনি তাদের জন্য আধুনিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করেছিলেন এবং শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণবংশের প্রতিভূ হয়েও বেদান্তকে 'ভ্রান্ত দর্শন' বলতে কুণ্ঠিত হননি। কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের আদর্শের সঙ্গে অন্যের চিন্তার কিম্বা কর্মের সংঘর্ষ উপস্থিত হত, তিনি যদি মনে করতেন

তাঁর সহকর্মিগণ ন্যায় পথে চলছেন না, বিনা দ্বিধায় তখন আরব্ধ কর্ম হতে সরে আসতেন।

হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুইটি ফণ্ডের সঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্রের সম্পর্ক ত্যাগ, এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য ঈশ্বরচন্দ্র যথেষ্ট পরিশ্রম করেছিলেন, কিন্তু যখন দেখলেন কর্মকর্তাদের মধ্যে প্রকৃত কর্মের অপেক্ষা কর্তৃত্ব ইচ্ছাই অধিক তখন আদর্শবাদী পুরুষ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন। ডিরেক্টরদের কাছে লিখিত পত্রের শেষাংশে তিনি লিখলেন :

"...এই ফণ্ডের সংস্থান ও উন্নতি সম্পাদন বিষয় আমি যথাসাধ্য চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি। উত্তরকালে আপনাদের ফলভোগের প্রত্যাশা আছে; আমি সে প্রত্যাশা রাখি না। যে ব্যক্তি যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন, সে দেশের হিতসাধনে সাধ্যানুসারে সচেষ্ট ও যত্নবান হওয়া, তাঁহার পরম ধর্ম্ম ও তাঁহার জীবনের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্ম; কেবল এই বিবেচনায় আমি তাদৃশী চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি, এতদ্ভিন্ন এ বিষয় আমার আর কিছুমাত্র স্বার্থসম্বন্ধ ছিল না। বলিলে আপনারা বিশ্বাস করিবেন কিনা জানি না; কিন্তু না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেছি না, এই ফণ্ডের উপর, আপনাদিগের সকলকার অপেক্ষা আমার অধিক মায়া। আমায়, সেই মায়া কাটাইয়া, ফণ্ডের সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে, সেই জন্য আমার অন্তঃকরণে কত কষ্ট হইতেছে, তাহা আমার অন্তরাত্মাই জানেন। যাহাদের হস্তে আপনারা কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছেন, তাহারা সরল পথে চলেন না। এমন স্থলে, এ বিষয়ে লিপ্ত থাকিলে, উত্তরকালে কলঙ্কভোগী হইতে ও ধর্ম্মদ্বারে অপরাধী হইতে হইবে; কেবল এই ভয়ে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া, নিতান্ত দুঃখিত মনে, নিতান্ত অনিচ্ছা পূর্ব্বক, আমার এ সংস্রব ত্যাগ করিতে হইতেছে।"

এই চিঠিখানি দেখলে বোঝা যায় ঈশ্বরচন্দ্র নিজের গঠিত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আপোষে করতে না পেরে দূরে সরে আসতেন সত্য, কিন্তু তাঁর হৃদয় বেদনায় ভরে যেত।

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর চরিত্র সম্যক প্রণিধান করবার জন্য কোন সদাজাগ্রত চক্ষু ছিল না। তিনি লিখিছেন :

"আমার কেবল আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগরের বস্‌ওয়েল্ কেহ ছিল না:

তাঁহার মনের তীক্ষ্ণতা, সবলতা, গভীরতা ও সহৃদয়তা তাঁহার বাক্যালাপের মধ্যে প্রতিদিন অজস্র বিকীর্ণ হইয়া গেছে, অদ্য সে আর উদ্ধার করিবার উপায় নাই। বসওয়েল্ না থাকিলেও জন্‌সনের মনুষ্যত্ব লোক সমাজে স্থায়ী আদর্শ দান করিতে পারিত না।"

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মক্ষেত্র ছিল সমাজ। রাজনীতি হতে তিনি দূরে ছিলেন. শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কারের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন এবং জন্মসূত্রে প্রাপ্ত তাঁর প্রবল একনিষ্ঠা, যা সময়ে সময়ে জেদ বলে মনে হয়েছে, তার সাহায্যে সফলতা অর্জন করেছেন। বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব কর্মক্ষেত্রে অপ্রতিহত হলে তবেই তিনি অগ্রসর হতে পারতেন, না হলে নিজেকে সেক্ষেত্রে হতে সংবরণ করে নিতেন। তাঁর এই অনমনীয়তার মধ্যে যে একটি আদর্শ আছে, তা উপলব্ধি করবার জন্যই একজন বসওয়েলের প্রয়োজন ছিল।

ঈশ্বরচন্দ্রের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর দয়া, মাতৃবক্ষ-সঞ্জাত মমতা-ধারার ন্যায় যে একদা বাঙালিকে অভিষিক্ত করেছিল এবং তাঁর তেজস্বিতা, যে তেজ বাংলাদেশে দুর্লভ সে সব সম্বন্ধে কত ঘটনার প্রমাণ সামনে এসে উপস্থিত হয়। একটি কথা কিন্তু জানবার জন্য জিজ্ঞাসা-উদ্যত হলেও ভাল করে জানা যায় না। কথাটি হল ঈশ্বরচন্দ্রের ধর্ম কি ছিল। নিঃসন্দেহ যে তিনি হিন্দু, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। কিন্তু সেই ধর্ম কোন রূপে তাঁর হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েছিল? আমরা কর্মবীর ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখলাম বাংলার গ্রামে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার করতে। সমাজ সংস্কারক হয়ে পড়লেন তিনি সমাজের সঙ্গে। তাঁর মমতার কোলে আশ্রয় পেল আদ্বিজচণ্ডাল। কিন্তু কোনও দেবদ্বারে প্রণত ঈশ্বরচন্দ্রকে দেখতে পেলাম না তো। অবশ্য না দেখবার কারণ, তিনি মানুষকে ভালবেসে তার পূজাতেই নিজেকে অর্পণ করেছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে কিরূপ নিরপেক্ষ মনোভাব ছিল সে বিষয় রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্র পড়লেই স্পষ্ট বোঝা যায়। তখন ব্রাহ্মধর্মের অভ্যুত্থানের ত্যাগ করা বড় দায়; সে-যে বাসা বেঁধে থাকে মর্মমূলে, সঞ্চরণ করে রক্তধারায়। তাই কন্যার বিবাহ দেবেন তিনি—ব্রাহ্ম না হিন্দু পদ্ধতিতে? বন্ধু ঈশ্বরচন্দ্রের নিকট পরামর্শ চাইলেন রাজনারায়ণ। বিদ্যাসাগর জানালেন:

"আপনার কন্যার বিবাহ বিষয়ে অনেক বিবেচনায় করিয়াছি; কিন্তু

আপনাকে কি পরামর্শ দিব, কিছু স্থির করিতে পারি নাই। ফল কথা এই যে, এরূপ বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া কোনক্রমেই সহজ ব্যাপার নহে। প্রথমতঃ আপনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ব্রাহ্মধর্মে আপনার যেরূপ শ্রদ্ধা আছে, তাহাতে দেবেন্দ্রবাবু যে প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিয়াছেন, যদি তাহা ব্রাহ্মধর্মের অনুযায়িনী বলিয়া আপনার বোধ থাকে, তাহা হইলে এ প্রণালী অনুসারেই আপনার কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্বতোভাবে বিধেয়। দ্বিতীয়তঃ যদি আপনি দেবেন্দ্রবাবুর অবলম্বিত প্রণালী পরিত্যাগপূর্বক প্রাচীন প্রণালী অনুসারে কন্যার বিবাহ দেন, তাহা হইলে ব্রাহ্ম-বিবাহ প্রচলিত হওয়ার পক্ষে বিলক্ষণ ব্যাঘাত জন্মিবেক। তৃতীয়তঃ ব্রাহ্ম-প্রণালীতে কন্যার বিবাহ দিলে ঐ বিবাহ সর্বাংশে সিদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হইবেক কি না, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না। এই সমস্ত কারণে আমি এ বিষয়ে সহসা আপনাকে কোন পরামর্শ দিতে উৎসুক বা সমর্থ নহি। এই মাত্র পরামর্শ দিতে পারি যে, আপনি সহসা কোন পক্ষ অবলম্বন করিবেন না।

উপস্থিত বিষয়ে আমার প্রকৃত বক্তব্য এই যে, এরূপ বিষয়ে অন্যের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করা বিধেয় নহে। ঈদৃশ স্থলে নিজের অন্তঃকরণে অনুধাবন করিয়া যে রূপ বোধ হয়, তদনুসারে কর্ম করাই কর্তব্য। কারণ যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, সে ব্যক্তি নিজের যেরূপ মত ও অভিপ্রায়, তদনুসারেই পরামর্শ দিবেন, আপনার হিতাহিত বা কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে তত দৃষ্টি রাখিবেন না।"

বিদ্যাসাগরের নিজের অন্তরে যে সত্য প্রকটিত হ'ত তার ঊর্ধ্বে যে কোন ধর্মমতকে স্থান দিতেন না একথাই পত্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। কালী, শিব, নারায়ণ কিম্বা নিরাকার পরমব্রহ্ম, ক্রুশবিদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট কেহই ঈশ্বরচন্দ্রের মনকে আবদ্ধ করে রাখতে পারেননি। তিনি পূজা করেছেন মানুষকে। মানুষকে ভালবাসতেন বলেই ঈশ্বরচন্দ্র শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ-সংস্কার ব্রতী হয়েছিলেন। যাকে ভালবাসেন তাকেই মুক্তি দেবেন। মুক্তি দেশে শিক্ষাহীনতার তামস ও দারিদ্র্যের দুঃখ হতে; তাই ইংরেজী শিক্ষার জন্য এত আকিঞ্চন মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য উদ্যম। নারীকে স্বকীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে তাই তো স্ত্রীশিক্ষার জন্য এত প্রচেষ্টা, আত্মক্ষয়কারী সংগ্রাম।

ঈশ্বরচন্দ্রের সমস্ত প্রেরণার মূলে ছিল এক অত্যুগ্র মানবপ্রেম তাই তিনি

সমাজের হিতকারী 'তত্ত্ববোধিনী'র পরিচালকদের ধর্মমত কিম্বা আদর্শের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে, 'তত্ত্ববোধিনী'কে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রবল চেষ্টা করেছেন।

বাঙালির মনকে শিক্ষিত করার জন্য তিনি পাঠ্য পুস্তক রচনা করলেন, সাহিত্যের উপযুক্ত ভাষাও সৃষ্টি করলেন। প্রসাদগুণ, ওজস্বিতা এবং গাঢ়বন্ধতা লাভ করে বাংলাভাষা সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। এই সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের নিকট বাঙালির জাতীয় ঋণ স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"ভাষার একটা প্রকাশ মননের দিকে এবং জ্ঞানের তথ্য সংগ্রহের দিকে, অর্থাৎ বিজ্ঞানে তত্ত্বজ্ঞানে ইতিহাসে ; আর একটা প্রকাশ ভাবের বাহনরূপে রসসৃষ্টিতে ; এই শেষোক্ত ভাষাকেই বিশেষ করে বলা যায় সাহিত্যের ভাষা। বাংলায় এই ভাষাই দ্বিধাবিহীন মূর্তিতে প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে বিদ্যাসাগরের লেখনীতে।···

···সৃষ্টিকর্তারূপে বিদ্যাসাগরের যে স্মরণীয়তা আজও বাংলা ভাষার মধ্যে সজীব শক্তিতে সঞ্চারিত, তাকে নানা নব নব পরিণতির অন্তরালে অতিক্রম করে সম্মানের অর্ঘ্য নিবেদন করা বাঙালির নিত্যকৃত্যের মধ্যে যেন গণ্য হয়।"

জনশিক্ষা, সমাজসংস্কার প্রভৃতি নানা বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র পঞ্চাশখানিরও অধিক পুস্তক রচনা করেছিলেন। সবল, সাবলীল, ওজোগুণ-সমন্বিত, আবার রঙ্গ-ব্যঙ্গাত্মক—সকল প্রকার রচনাতেই বিদ্যাসাগরের সমান অধিকার ছিল। যেমন অফুরন্ত কর্মশক্তি, তেমনি তার প্রকাশ। নিজেকে নিঃস্ব করে ঈশ্বরচন্দ্র সমাজসেবায় ও শিক্ষাবিস্তারে উপার্জিত অর্থ দান করেছেন আর প্রতিভার ভাণ্ডার উজার করে সেবা করেছেন বাংলা ভাষায়।

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে নিঃস্ব বিশেষণটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। যে দানবীর কৌপীনসম্বল হয়ে আপনার দাক্ষিণ্য অপরকে সমৃদ্ধ করেন, তাঁরও দানের বিনিময়ে কিছু প্রাপ্তি আছে। একেবারে দেউলে হয়ে যান না তিনি। গ্রহীতার কৃতজ্ঞতায় দাতার অন্তর পূর্ণ হয়ে যায়। তাঁর কর্মশক্তি অফুরন্ত হয়ে ওঠে॥

সমস্ত জীবন ভরে বিদ্যাসাগর দেশবাসীর জন্য যত কাজ করেছেন তার জন্য বাঙালি বিদ্যাসাগর-প্রয়াণে পিতৃবিয়োগ-ব্যথা অনুভব করেছিল সত্য, কিন্তু রাশি রাশি কৃতঘ্নতা ও অকৃতজ্ঞতার আঘাত তাঁর মনকে শেষ জীবনে

বিষাক্ত করে দিয়েছিল। যে মানুষকে তিনি বড় ভালবাসতেন, তাদের অনেকেরই প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে আশ্রয় খুঁজেছিলেন।

মানুষকে ভালবাসার পরিবর্তে কিছুটা আঘাত যে সহ্য করতেই হয়, প্রেমের প্রতিদানে মৃত্যু-উপহার পেয়ে যীশুখ্রীষ্ট এই সত্য আমাদের শিখিয়ে গেছেন। কিন্তু মানুষের শত অকৃতজ্ঞতা, অবিচার সহ্য করলেও মহাপুরুষদের হৃদয় মধুক্ষরণ কখনো বন্ধ হয়ে যায় না। সকল কর্মের শেষে একটি পরম-আশ্রয় তাঁদের জন্য শান্তির নীড় রচনা করে রাখে, যোগান দেয় জীবন-স্রোতের।

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মময় জীবনে দেখতে পাই অফুরন্ত এক শক্তির স্রোতে তাঁকে কর্মে প্রবৃত্তি দান করছে। মানুষের প্রতি তাঁর যে গভীর প্রীতি, তা হতেই এই শক্তির উদ্ভব হয়েছে। জীবনকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন তিনি, জীবনের পশ্চাতে কি আছে, সে রহস্যের সন্ধান আবশ্যক মনে করেননি। তাঁর উদ্দেশও বোধ হয় তিনি পান ।

পূর্বে আমরা দেখেছি যে, কোন আপোষ কিম্বা মধ্যপন্থা গ্রহণ ঈশ্বরচন্দ্রের নীতিবিরোধী ছিল। অবশ্য যুক্তিবাদের কঠিন পথে চলেও তিনি হৃদয়কে শুষ্ক উপবাসী রাখেননি। মানুষের প্রতি ভালবাসায়, তাদের দুঃখে ঈশ্বরচন্দ্রের অশ্রু ঝরেছে। আকণ্ঠ ঋণে নিমজ্জিত হয়েও তিনি দান করেছেন। কিন্তু এই অতুল প্রেমের পরিবর্তে মানুষ যখন তাঁকে অকৃতজ্ঞতার নিষ্ঠুর আঘাত করল, তখন মর্মকোষ শুষ্ক হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র যেন নিঃসম্বল, দেউলিয়া হয়ে পড়লেন।

এই দুর্দিনে তাঁকে রক্ষা করতে পারতেন তাঁর স্রষ্টা। আপনাকে সংহত করে যদি ক্ষণিকের জন্য ঈশ্বরচন্দ্র ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হতে পারতেন, তবে দেখতেন মানুষের মধ্য দিয়ে তিনি অনন্তরূপী ভগবানকেই ভালবেসেছেন। সেই অভাবনীয়ের একটি রূপ রুদ্র, অপরটি করুণাঘন দাক্ষিণ্যমূর্তি। একটি নয়ন কৃতঘ্নতা বর্ষণ করলেও অপর নেত্রে পরমাপ্রীতি। তখন ঈশ্বরচন্দ্র উপলব্ধি করতে পারতেন যে, তাঁর কোন কর্ম নিষ্ফল হয়নি, সমস্ত দানই প্রতিদানে মনকে পূর্ণ করে দিয়েছে। কিন্তু এই অনুভূতি সম্ভব হয়নি বলেই মানুষকে ভালবেসে ঈশ্বরচন্দ্র জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে যেন প্রায়-মানববিদ্বেষী হয়ে উঠলেন। একটি মহাপরিণাম, একটি সুখময় সমাপ্তিতে তাঁর জীবন-উৎসর্গ বিলীন হতে পারল না।

মানব-হৃদয়ের এই রহস্য, সকল দিয়ে ও সকলি ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষার কথা রামমোহন জেনেছিলেন। তাই হৃদয়ের সমস্ত প্রকোষ্ঠগুলি মুক্তি দিয়ে পূর্ণ করে, তবেই তিনি কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন আর তাঁর আশ্রয় ছিল নির্বিকার ব্রহ্ম। দেশবাসীর অকৃতজ্ঞতা, স্বজনের বিরূপতা ঈশ্বরচন্দ্র হতে রামমোহনকে শতগুণে বিদ্ধ করেছিল, কিন্তু তিনি আহত কিম্বা মানববিদ্বেষী হয়ে ওঠেননি। কার সাধ্য ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও প্রতিকূলতার আঘাতে রামমোহনকে মানববিদ্বেষী করে তুলবে! তিনি পরব্রহ্মের আশ্রয় নিয়েছিলেন, যে-ব্রহ্ম সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত হয়ে রামমোহনের পূজা গ্রহণ করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের যদি এরূপ কোন আশ্রয় থাকত তাহলে মানুষের আঘাত তাঁকেও মোটেই স্পর্শ করতে পারত না। জীবনের শেষবেলায় পৌঁছে ক্রমাগত অকৃতজ্ঞতার আঘাতে ক্লান্ত মানবপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্রকে কখনই বলতে হত না: "সে আমার নিন্দে করলে কেন, আমি ত তার কোন উপকার করিনি।"

ঈশ্বরচন্দ্রের ঘাতপ্রতিঘাত-সঙ্কুল জীবন ধীরে ধীরে সমাপ্তির দিকে অগ্রসর হয়ে আসছিল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের পুণ্য নাম প্রত্যেক বাঙালি, কেবল বন্ধু ও সহযোগী নন, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষও শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। বাঙালির হৃদয়ের স্বতউৎসারিত শ্রদ্ধা তাঁকে সম্মানিত করেছিল।

ইতিপূর্বে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ঈশ্বরচন্দ্রকে ইংলণ্ডের রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অনারারি মেম্বাররূপে নির্বাচিত করে বাঙালি-দুর্লভ সম্মান প্রদর্শন করেছিলেন। এবার ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে, রাজকার্য হতে অবসর গ্রহণ করবার কুড়ি বৎসর পর, ভারত সরকার ঈশ্বরচন্দ্রকে সি, আই, ই, উপাধি দ্বারা ভূষিত করলেন।

অবশ্য বাংলার লেফটেনান্ট গভর্ণর স্যার রিচার্ড টেম্পেলের সময়েও (১লা জানুয়ারী ১৮৭৭) ঈশ্বরচন্দ্রকে একটি সম্মানলিপি প্রদান করা হয়েছিল। লিপিটির মর্ম ছিল।

"বিধবাবিবাহ আন্দোলনের নেতা এবং ভারতীয় প্রগতিশীল সমাজের মুখপাত্র-রূপে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে এই মানপত্রটি প্রদান করা হল।" শারীরিক অসুস্থতাকে সরকারী কর্ম হতে অবসর গ্রহণের সময়, ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর পদত্যাগের কারণ বলে প্রকাশ করেছেন। অবশ্য

আধা সরকারী পত্রে লর্ড হ্যালিডেকে একথাও তিনি বলেছেন যে, অসুস্থতা পদত্যাগের একটি কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। কিন্তু তাঁর শরীর যথার্থই অসুস্থ হয়েছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ডিরেক্টর অব ইনস্ট্রাকসন শ্রীঅ্যাটকিন্সন্ ভারতবন্ধু মেরী কার্পেন্টার ও ঈশ্বরচন্দ্রকে নিয়ে যখন উত্তরপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের পরিদর্শনে যান, তখন ফিরবার পথে গাড়ী উলটিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র পড়ে গিয়েছিলেন এবং যকৃতে গুরুতর আঘাত লাগে। ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ে, এবং যে ভয়ানক ব্যাধি ঈশ্বরচন্দ্রকে মৃত্যুপথে নিয়ে গিয়েছিল, এই ভয়ানক আঘাতই তার প্রধান কারণ।

পীড়িত হয়ে ঈশ্বরচন্দ্র শারীরিক অসুবিধার কথা একবার ও চিন্তা করেননি, অক্লান্ত পরিশ্রমে দেশের সেবা করেছেন। তারপর যখন শরীর একেবারে বিকল হয়ে পড়ল, দেহ কঙ্কালসার হয়ে গেল, তখন শ্রমসাধ্য কাজ বাধ্য হয়েই ত্যাগ করতে লাগলেন। মধুপুরের নিকট কার্মাটারে নির্জন সাঁওতাল পল্লীতে ঈশ্বরচন্দ্র একখানি বাংলো-বাড়ী নির্মাণ করেছিলেন, এই স্থানটিই তাঁর বিশ্রাম-নিকেতন হয়ে উঠল। দেহ-রোগ-জর্জর, মন আধুনিক সভ্যতাপুষ্ট মানুষের অকৃতজ্ঞতায় আহত ; কেবল আধুনিক সভ্যতা বর্জিত দরিদ্র সাঁওতালদের ভালবাসাই তাঁকে সঞ্জীবিত করে তুলত। সাঁওতালদের অন্নদান বস্ত্রদান আর শিক্ষাদান করে ঈশ্বরচন্দ্র যে তৃপ্তি পেয়েছিলেন ; আমাদের তথাকথিত সুসভ্য বাঙালি সমাজ তাঁকে সে তৃপ্তি দিতে পারেনি।

আমরা পূর্বেই দেখেছি কার্মাটারে সাঁওতাল বালকদের শিক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র নিজব্যয়ে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, তাদের অন্যান্য ব্যবস্থার প্রতিও ঈশ্বরচন্দ্রের সতর্ক দৃষ্টি ছিল এবং শেষ ইচ্ছা-পত্রে কার্মাটারের গৃহরক্ষকের জন্যও তিনি অর্থ দিয়ে গিয়েছেন।

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বাংলাদেশের বড় দুর্দিন। দয়ার সাগর পৃথিবীকে দীনা করে বিদায় নিলেন। শ্রাবণ মাস। বর্ষার মধ্যে সেদিন কি কেউ শ্যামসমারোহ লক্ষ্য করেছিল! সেদিন তো সমস্ত আকাশ বেদনা-বিহ্বল ধরণীর দুঃখে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, বর্ষণে ছিল প্রকৃতির অশ্রু।

ক'দিন হতেই অবস্থা খারাপ হয়ে আসছিল। পঁচিশ বৎসর পূর্বে যার

প্রথম পদক্ষেপ ঘটেছিল দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে, সে এতদিনে বিদ্যাসাগরের উপর পূর্ণ অধিকার স্থাপন করল। রাত্রি আড়াইটার সময় সত্তর বৎসর বয়সে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান ইহলোক ত্যাগ করলেন।

এই বৎসরের ২৭শে আগস্ট বাংলার লেফটেনাণ্ট গভর্ণর সার চার্লস এলিয়টের সভাপতিত্বে কলকাতার টাউনহলে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হল। দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের স্মৃতি চিরস্থায়ী করবার জন্য সমস্ত বাংলাদেশ উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। সুতরাং সভার প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল কি উপায়ে ঈশ্বরচন্দ্রের স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রাখা যেতে পারে।

সভার বহু আলোচনা হল এবং তার ফলেই সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ—তিনি শিক্ষায়তনটিকে অচল মধ্যযুগ হতে আধুনিকত্বে উত্তীর্ণ করে দিয়েছিলেন, তাঁর একটি প্রস্তরমূর্তি কলেজ-ভবনে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রিয়তমা এবং প্রেমকে চিরস্থায়িত্ব দান করবার উদ্দেশ্যে সম্রাট সাজাহান তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। স্থাপত্যশিল্পের অপূর্ব নিদর্শন তাজমহল। দর্শক দেখে—নিষ্প্রাণ প্রস্তর সৌন্দর্যকে কালজয়ী করেছে। বহুপত্নীক বিলাসী সম্রাটের প্রেমের নিদর্শন বলে তাজমহলকে হয়ত দু'একজন অনুভব করে; অন্যথা সৌন্দর্য রসিকের তীর্থভূমি তাজমহল।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্য যদি একটি মর্মর প্রস্তর খচিত স্মৃতি-সৌধ রচিত হত তাহলে দেশ-দেশান্তর হতে বুঝি জ্ঞানভিক্ষুর দল বাংলার পণ্ডিতের স্মৃতিসৌধ দর্শনের জন্য তীর্থযাত্রায় আসতেন! তাজমহলে আছে শিল্পীর অপূর্ব নৈপুণ্যের প্রকাশ, বিদ্যাসাগর-স্মৃতি মন্দিরে থাকত-বাংলার অখ্যাত একটি গ্রামের এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ বালকের দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরে পরিণত হবার, দেশকে, মানুষকে সর্বস্ব দিয়ে ভালবাসার ইতিহাস।

বিদ্যাসাগরের উপযুক্ত স্মৃতি-সৌধ রচিত হয় নি, হয় নি জাতির জনক রামমোহনের ও কোন স্মৃতিমন্দির। গোলদীঘির পাড়ে দেখতে পাই আমরা, অনাদৃত প্রস্তরমূর্তি বিদ্যাসাগর বসে আছেন। দেখছেন নির্নিমেষ প্রস্তরচক্ষু দিয়ে তাঁর বাংলার ছাত্রদলকে, যাদের জন্য একদিন নিঃস্ব, দরিদ্র হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বৎসরে একদিন, স্মরণোৎসব উপলক্ষ্যে এই প্রস্তরমূর্তিকে নির্মাণ করে কেউ পুষ্পমাল্যে অর্চনা করে এসে। পদপ্রান্ত জলে ওঠে একটি ধূপশিখা—বিশ্রব্ধ হৃদয়ের উপহার। কিন্তু এ-দেবতার মন্দির নেই।

আধুনিক চিন্তাবিদগণ বলবেন, অতীত দিনের কর্মবীরদের স্মৃতিস্তম্ভ রচনা করতে হলে, সমস্ত দেশ ভরে যাবে সমাধি মন্দিরে। কিন্তু কোনও দেশে, কোনও যুগে কি জন্মায় রামমোহন, বিদ্যাসাগরের মত লক্ষ লক্ষ সন্তান—যাঁদের স্মৃতি-সৌধ রচিত হলে, জীবিতদের আর পা ফেলবার স্থান থাকবে না? এসব মানুষ ক্ষণজন্মা। এদের জন্য দু'একটি স্মৃতি-সৌধ নির্মিত হয়ে থাক না দেশের কিছু স্থান জুড়ে। মানুষ সেখানে আসবে, কিছু দেবে, ফিরে যাবে কিছু নিয়ে।

ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে শেষ কথাটি বলেছেন রবীন্দ্রনাথ:

"...বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজের সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে ফলদান করিতেন: কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভা-সমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত পীড়িত অনাথ অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার মহৎ চরিত্রের যে অক্ষয়বট বঙ্গভূমিতে রোপন করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙ্গালিজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে। আমরা সেইখানে আসিয়া আমাদের তুচ্ছতা, ক্ষুদ্রতা, নিষ্ফল আড়ম্বর ভুলিয়া, সূক্ষ্মতম তর্কজাল এবং স্থূলতম জড়ত্ব বিচ্ছিন্ন করিয়া, সরল সবল অটল মহোত্বের শিক্ষালাভ করিয়া যাইব। আজ আমরা বিদ্যাসাগরকে কেবল বিদ্যা ও দয়ার আধার বলিয়া জানি; এই বৃহৎ পৃথিবীর সংস্রবে আসিয়া যতই আমরা মানুষ হইয়া উঠিব, ততই আমরা পুরুষের মতো দুর্গম বিস্তীর্ণ কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে থাকিব, বিচিত্র শৌর্য মহত্ত্বের সহিত যতই আমাদের প্রত্যক্ষ সন্নিহিত ভাবে পরিচয় হইবে, ততই আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে অনুভব করিতে থাকিব যে, দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব এবং যতই তাহা অনুভব করিব ততই আমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ ও বিধাতার উদ্দেশ্য সফল হইবে, এবং বিদ্যাসাগরের চরিত্র বাঙালির জাতীয় জীবনে চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিবে।"

এমন করে ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্র আর কেউ বিশ্লেষণ করেছেন বলে আমরা জানি না। দয়া নয়, শিক্ষা নয়, এক বলিষ্ঠ পৌরুষ দিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালির

জাতীয়চরিত্রের ভীরু অপবাদ ক্ষালন করেছেন। তাঁর সমস্ত কর্ম এবং চিন্তার মধ্যে আছে এই বীর্যের পরিচয়। মায়ের যত মমতায় ঈশ্বরচন্দ্র বাঙালিকে লালন করেছেন, কিন্তু পালন করেছেন পিতার কাঠিন্য দিয়ে। কোনদিন কোন দুর্বলতাকে তিনি ক্ষমা করেননি, প্রশ্রয়ও দেন নি। নিজের একমাত্র পুত্র নারায়ণচন্দ্র সম্বন্ধে আমরা এই কাঠিন্য লক্ষ্য করেছি। অনুতপ্ত পুত্র পরপর পিতার পদে প্রণত হয়েছেন ; স্নেহ করুণায় সমস্ত মন সিক্ত হয়ে গেলে ও ঈশ্বরচন্দ্র কখনো দুর্বল হন'নি। এই সবলতাই বিদ্যাসাগর চরিত্রের প্রধান গৌরব।

ঈশ্বরচন্দ্রের আবির্ভাবের উপর বহু বৎসরের পলিমাটি পড়েছে। কত চিন্তানায়ক, কর্মবীর বাংলাদেশের ইতিহাসে নিজেদের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন, কিন্তু বীরসিংহের সিংহশিশু বিদ্যাসাগরের স্মৃতি কারো প্রকাশেই ছায়াচ্ছন্ন হয়নি। অমৃত উৎস হতে সমুদ্ভূত যে-জীবন কখনো অবসন্ন হতে জানে না, ঈশ্বরচন্দ্র সেই জীবন নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। কর্মযজ্ঞ আরম্ভ করে যজ্ঞেশ্বর তাতে জীবন-সমিধ আহুতি দিয়ে গেছেন। বাঙালি অনির্বাণ জীবনাগ্নির উত্তরাধিকারী হয়েছে, সেই শিখা সঞ্চারিত হয়েছে আমাদের জাতীয় জীবনে। বিদ্যাসাগরের উত্তরাকারী বাঙালির শ্রান্তির অবকাশ, বিশ্রামের আয়োজন নেই।

ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১৮২২-১৮৯১

কল্যান কুমার দাশগুপ্ত

ঘটনা হিসাবে বিস্ময়কর হলেও একথা সত্য প্রতীচী লেখকদের কলমেই ভারতবর্ষের ইতিহাস জন্মলাভ করে। অন্তত সমকালীন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আনুপূর্বিকভাবে রচনার চেষ্টার জন্য প্রতীচ্যের লেখকদের কাছে আমাদের ঋণ অনস্বীকার্য। ১৭৮৩ সালে স্যার উইলিঅম জোন্স-এর ভারত-আগমন এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে দু'টি স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ-সন্ধিৎসার সূত্রপাতের সঙ্গে ঘটনা দু'টির যোগ ঘনিষ্ঠ। ১৭৮৮ সালে 'এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে' গবেষণার ফসলবাহী "এশিয়াটিক রিসার্চেস" পত্রের আত্মপ্রকাশে এই কথাই প্রমাণিত হল : এশিয়া তথা ভারতবর্ষেরও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি আছে এবং তা পুরাতন ব'লে পর্যাপ্ত গবেষণার বিষয়ীভূত। আরও পরে বেরোল 'কোয়ার্টার্লি জার্নাল' (১৮২১) 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' (১৮২৯) এবং 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৮৩২)। নতুন আবিষ্কার মূল্যবান ও ধারণা-সিদ্ধান্তে দেদীপ্যমান এই পত্রিকা দু'টি ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করল। স্যার উইলিঅম জোন্স, যিনি ভারতবর্ষের উন্নত সভ্যতায় বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, 'এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীতত্ত্ব তথা ভারতবিদ্যাগবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এবং সেই বনিয়াদের উপর হর্ম্যনির্মাণের দায়িত্ব নিলেন যাঁরা তাঁরাও বিদেশী : উইলকিন্স, উইলসন, কোলব্রুক, জেমস প্রিন্সেপ, কানিংহাম, ম্যাক্স মূলার, মনিয়ার উইলিঅমস—অনেক নামের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই বিদেশী মনীষিবৃন্দের কাছ থেকেই ভারতবাসী শুনল তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। শুনে উপলব্ধি করল অন্য সভ্য দেশের মতো তারও অতীত আছে। এবং হয়তো উৎসাহিত ভবিষ্যতও।

জোন্স-প্রিন্সেপ-কানিংহামের বিপরীত মেরুতে ছিলেন একশ্রেণীর প্রতীচী লেখক : জেমস মিল, ওঅর্ড, মার্শম্যান। এঁরা ছিলেন আত্মতুষ্ট, অহংদৃপ্ত। ভারতবর্ষের মতো একটা অসভ্য দেশকে তাঁরা সভ্য করেছেন নানাভাবে

এই কথাটার প্রচারণাতেই তাঁদের সমস্ত প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের এই উচ্চমন্য দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয়দের মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার করল এবং সেই বিরক্তির সঙ্গে অনিবার্যভাবেই স্বদেশপ্রেম উন্মীলিত হল। ইতিমধ্যে জোন্স-উইলসন-কোলব্রুক-প্রিন্সেপ প্রমুখের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। সেই তথ্য উপকরণ দিয়েই মিল-মার্শম্যানদের উচ্চমন্যতাকে আঘাত দেওয়া যায়। সুতরাং মার্শম্যানের "হিস্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া" বা "হিস্ট্রী অফ বেঙ্গল" জাতীয় গ্রন্থের আদর্শে স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন কি? নতুনভাবে স্বদেশের ইতিহাস রচনা করতে হবে। প্রমাণ, ১৮৫৭ সালে নীলমণি বসাক বাংলায় লেখা এ দেশের পুরাবৃত্তের অভাব দূর করার জন্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" লিখলেন। দু'বছর বাদে ১৮৬০ সালে একজন কেদারনাথ দত্ত 'স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত কলম'-এ স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেলেন; নাম "ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

সংক্ষেপে এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু থেকেই বাংলাদেশে একটি স্বদেশচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল।[১] এই সম্প্রদায়ের অনেকেই সুগৃহীতনামা, দু'চারজন যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মধুসূদন দত্ত। এই অবিস্মরণীয়দের কর্মে কৃতিত্বে মনীষায় ভাস্বর উনিশ শতকী বাংলার ইতিহাসের পাতায় আর-একটি শ্রদ্ধেয় নাম: রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

১ এই স্বদেশচেতনা ও ইতিহাসবোধের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণীয় উক্তি: 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।...যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি ছিল, যেখানে নৈষধচরিত-গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথশিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।'

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের বইর বিজ্ঞাপনেও এই ধরনের কথা শোনা যায়: 'এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত।......এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, এইজন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না, ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি মিথ্যা এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন, অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।'

পূর্ব কলকাতার শুঁড়ার এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারী রাজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরেজি স্কুলে এবং গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব সমাপন করে তিনি পনেরো বছর বয়সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। চার বছর পড়াশোনা করার পর তিনি কলেজের বিদেশী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদহেতু কলেজ ছেড়ে দেন। সমসাময়িক শিক্ষাবিষয়ক সরকারী প্রতিবেদনে রাজেন্দ্রলালকে মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেতে দেখা যায়। কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ তিনি একটি রৌপ্যপদক ও পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজ ছাড়ার পর রাজেন্দ্রলাল কিছুদিন আইনশাস্ত্র পড়েছিলেন। তারপর তিনি ভাষাশিক্ষায় মনঃসংযোগ করেন। ফার্সী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দুতে তিনি প্রশংসনীয় পারঙ্গমতা অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধাবলিই তার প্রমাণ।

তাঁর একান্ত জীবন সম্পর্কে উল্লেখনীয় এই, ১৮৩৯ সালের আগস্ট মাসে তিনি নিমতলার ধর্মদাস দত্তের কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পরে সৌদামিনী দেবী পরলোকগমন করেন। আনুমানিক আটত্রিশ বছর বয়সে রাজেন্দ্রলাল ভবানীপুরের কালীধন সরকারের কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। ভুবনমোহিনীর গর্ভে রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল নামে রাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৩

অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দু'একটি ঘটনাই মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে হাজির হয়। রাজেন্দ্রলালের জীবনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০৲ টাকা বেতনে সোসাইটির সহকারী কর্মসচিব ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে দশ বছর তিনি কাজ করেছিলেন, কিন্তু এই দশ বছরের কর্মকালই তাঁর চিন্তাজীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। সোসাইটিতে তিনি বহু প্রাচীতত্ত্বজ্ঞের সান্নিধ্যে যেমন আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহও তাঁর জ্ঞানার্জনের পক্ষে পরম সহায়ক হয়েছিল। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে

রাজেন্দ্রলাল ওঅর্ডস ইন্‌স্টিটিউশন-এর পরিচালকপদে যোগদান করলেও এশিয়াটিকে সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। ঐ বৎসরে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে সোসাইটির সাধারণ সদস্য বলে ঘোষণা করা হয় এবং জুন মাসে তাঁকে সোসাইটির কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মনোনীত করা হয়। সেকালে কোন ভারতীয়ের পক্ষে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়া বিশেষ সম্মানের বিষয় ছিল। রাজেন্দ্রলাল অনুরূপ সম্মানিত ভারতীয়দের অন্যতম ছিলেন।

৪

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদানের দু'বছর পরে, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে, রাজেন্দ্রলাল গবেষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐ বছরের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের জানুআরি সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ Inscription from the Vijaya Mandir, Udaypur প্রকাশিত হয়। ১৮৪৮-এর নভেম্বর মাসে তিনি কামন্দক-কৃত নীতিসার নামে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি সংক্রান্ত সুপ্রাচীন গ্রন্থের একটি পুঁথির প্রতি সোসাইটির কর্মসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেজর কিটো নামে একজন বিদ্যোৎসাহী ঐ মূল্যবান পুঁথিটি সোসাইটিকে উপহার দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের বিদ্যাবত্তায় আস্থাশীল সোসাইটির কর্মসচিব ও কাউন্সিল-সদস্যরা সোসাইটি প্রবর্তিত Bibliotheca Indica নামে গ্রন্থমালায় পুঁথিটি প্রকাশের সিদ্ধান্তই শুধু গ্রহণ করেননি, তাঁর উপর সমগ্র পুঁথিটি সম্পাদনের ভারও অর্পণ করেন। ১৮৮৪ সালে উপরি-উক্ত গ্রন্থমালায় কামন্দকীয় "নীতিসার" প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থমালায় রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ" ১-৩ খণ্ড (১৮৫৯, ৬০, ৯০) "তৈত্তিরীয় আরণ্যক" (১৮৭২), "ঐতরেয় আরণ্যক" (১৮৭৬), "ললিতবিস্তর" (১৮৭৭), "বায়ুপুরাণ", ১-২ খণ্ড (১৮৮০, ৮৬) "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" (১৮৮৮) প্রভৃতি আরও কয়েকটি সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল পরিচিত ও জ্ঞাত পুঁথি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নতুন পুঁথির সন্ধানেও তাঁর উৎসাহ ও প্রয়াস ছিল অপরিসীম। তাঁর এই সন্ধান-কার্যের ফলে অনেক নতুন ও মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুঁথিগুলি সম্পর্কে তিনি *Notices*

of Sanskrit Manuscripts নামে একটি পরিচিতি-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ন'টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি রাজেন্দ্রলালের বিদ্যোৎসাহিতা ও পরিশ্রমের প্রদীপ্ত প্রমাণ। ঐ সময়ের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহ-ভুক্ত পুঁথি, বিকানীরের মহারাজার গ্রন্থাগারভুক্ত পুঁথি অযোধ্যায় প্রাপ্ত পুঁথি প্রভৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি পরিচিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পুঁথিসংগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন-গ্রন্থগুলিরও উল্লেখ করা যায়।

৫

ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলালের চারিখানি স্মরণীয় বই : দুখণ্ডে প্রকাশিত *The Antiquities of Orissa* (প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮৮০), *Buddh Gaya, the hermitage of Sakya Muni* (১৮৭৮), দুখণ্ডে প্রকাশিত *Indo-Aryans* (১৮৮১) এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepel* (১৮৮২)। সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাবে তাঁর অন্যান্য বইগুলির মূল্য হ্রাস পেলেও প্রথম ও চতুর্থ বই দুটি উপকরণের ঐশ্বর্যে এখনো পণ্ডিতমহলের সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

১৮৬৮-৬৯ সালের শীতকালে বাংলা দেশের তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্ণর গ্রে সাহেব রাজেন্দ্রলালের উপর উড়িষ্যার মন্দিরগুলি সম্পর্কে সরজমিনে বিস্তৃত তথ্য ও উপকরণ আহরণের ভার অর্পণ করেন। কয়েকজন কারিগর ও শিল্পীকে নিয়ে তিনি ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক প্রভৃতি মন্দির-নন্দিত স্থানগুলিতে যান উদ্দেশ্য : মন্দিরগুলি পর্যবেক্ষণ এবং সেই কারিগর ও সঙ্গে শিল্পীদের দিয়ে মন্দিরগুলির শিল্পানুকৃতি ও মন্দিরগত অলঙ্করণের নিদর্শন প্রস্তুত করা। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি সম্পর্কে যতখানি বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসংগ্রহ-ও-বিশ্লেষণ সেকালে সম্ভব ছিল, রাজেন্দ্রলাল তার নিঃসন্দিগ্ধ স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে উড়িষ্যার প্রত্নবস্তুসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি বিভিন্ন মন্দির ও প্রত্নবস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনার গ্রন্থনায় প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা'য় প্রাচীন সাহিত্যে উড়িষ্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলি সমাহৃত হয়েছে। এবং ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস, উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, ভাস্কর ও স্থাপত্যগত অলংকরণ, ভাস্কর্য-নিদর্শন থেকে উড়িষ্যার মন্দিরনির্মাতাদের সামাজিক অবস্থা, উড়িষ্যার শিল্পকলার

বিবর্ধন-বিবর্তনে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় দান খণ্ডটির অবশিষ্ট পাঁচটি পরিচ্ছেদে স্থানলাভ করেছে। দ্বিতীয় খণ্ড খণ্ডগিরির প্রত্নুনিদর্শন, এবং ভুবনেশ্বর পুরী, কোনারক ও সত্যবাড়ি এবং দর্পণ, জাজপুর, অলতি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরনিচয় সম্পর্কে তথ্যবহুল আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

The Antiquites of Orissa পরিশ্রম ও মনীষার হার্দ্য সমন্বয়ে, ভারতীয় কলমে ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে স্মরণীয় কীর্তি।

রাজেন্দ্রলালের আর-একটি গ্রন্থ *Buddh Gaya, the hermitage of Sakyamuni*. এই গ্রন্থে অবশ্য *The Antiquities of Orissa*-র মতো সুপ্রসিদ্ধ নয়। মৌলিকতার দিক থেকেও এটি খুব উল্লেখনীয় নয়। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেও সেকথা স্বীকার করে বলেছেন, গ্রন্থটির অধিকাংশ উপাদান তিনি তাঁর পূর্বসূরী কিটো, কানিংহাম ও অন্যান্যদের বুদ্ধগয়া-সংক্রান্ত রচনাবলি থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রন্থপ্রণয়নে মৌলিক তথ্যানুসন্ধানীর চাইতে পরিচিত তথ্যসংগ্রাহকের ভূমিকাকেই প্রধানত বেছে নিয়েছেন। তবে মূলত পূর্বসূরীদের আবিষ্কৃত তথ্যকে ভিত্তি করলেও সব সময় তিনি তাদের ব্যবহারে নির্বিচার নন, প্রয়োজনমতো কোন কোন তথ্যকে যাচাই করে পূর্বসূরীদের অভিমত সিদ্ধান্তের উপর নতুন আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিসাবে কিটো কানিংহাম অবশ্যই শ্রদ্ধেয় কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের সমস্ত মতই যে অভ্রান্ত নয়, ১৮৭৮ সালে—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের শৈশবাবস্থায়-এ কথা একজন ভারতীয়ের পক্ষে প্রশংসনীয় নয় কি?

দু'খণ্ডে প্রকাশিত *The Indo-Aryans* ভারতের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন। *The Antiquities of Orissa* গ্রন্থেরও কিছু কিছু অংশ এতে স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য বিস্ময়কর একদিকে জটিল নন্দনতত্ত্ব বা প্রাচীন ভারতের মন্দির-স্থাপত্য, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে সুরাপান—নানা ধরণের বিষয় অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধগুলি রাজেন্দ্রলালের অধ্যয়নের বিস্তৃতিই শুধু প্রমাণ করে না, সেই সঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও কিছুটা ঐতিহাসিকসুলভ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে বিদ্যমান।

গৃহীতনামা হজসন সাহেব নেপাল থেকে ৩৮১ বাণ্ডিল সংস্কৃতে লেখা প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কার করে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের উপর যুগান্তকারী

আলোকসম্পাত করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে ৮৫ বাণ্ডিল হজসন কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে দেন। সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি আর্থার গ্রোট পুঁথিগুলির প্রামাণিকতা ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে স্থির-নিশ্চয় হয়ে সেগুলিকে অবিলম্বে বিদ্বজ্জনসমক্ষে প্রকাশ করিতে ব্যগ্র হলেন। তিনি পুঁথিগুলিকে পরীক্ষা এবং তাদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও লিপিবদ্ধ করার ভার রাজেন্দ্রলালের উপর অর্পণ করলেন। হরিনাথ বিদ্যারত্ন, রামনাথ তর্করত্ন এবং কামখ্যানাথ তর্কবাগীশ নামে তিনজন পণ্ডিতের সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল সমস্ত পুঁথি পরীক্ষণ ও বিষয়বস্তু সংকলনকার্য শেষ করে ফেললেন। তাঁর এই অসাধারণ পরিশ্রমের ফল চতুর্থ গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* এখানে মনে রাখা দরকার, সমস্ত পুঁথিই যে উক্ত তিনজন পড়েছিলেন বা তাদের বিষয়বস্তু সংকলন করেছিলেন তা নয়, রাজেন্দ্রলাল নিজেও অনেক পুঁথি পড়ে তাদের সারসংগ্রহ করেছিলেন। এই সময় রাজেন্দ্রলাল অসুস্থ হয়ে পড়লে (সম্ভবত অত্যধিক পরিশ্রমে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। এবং মোট ১৬টি বড় পুঁথির বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনুবাদ করে দেন।[১] পরবর্তীকালে পুঁথিসংগ্রহ, পুঁথির বর্ণনাত্মক সূচীসংকলন ইত্যাদি কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-অসাধারণ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়েছিলেন, রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে সংযোগে তার উৎসভূমি নিহিত, এ কথা মনে করাটা খুব একটা অন্যায় হবে না। সংক্ষেপে, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। আয়তনেই শুধু নয়, উপাদানের প্রাচুর্যে ও ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যে এটি মহাগ্রন্থের মর্যাদা দাবী করতে পারে এবং আজও এ গ্রন্থ পণ্ডিতমহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজেন্দ্রলালের এই গ্রন্থভুক্ত 'মহাবস্তু অবদান এর কুশের কাহিনী (পৃ. ১৪২-৪৫) থেকে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে তাঁর "রাজা" (১৯১০)। ও "শাপমোচন" (১৯৩১) এবং "চণ্ডালিকা"র (১৯৩৩) কাঠামো নিয়েছিলেন।[২] এ ছাড়া

[১] গ্রন্থের সূচীপত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনূদিত অংশগুলির পুঁথিসংখ্যার পাশে H.P.S. ও আদ্যক্ষর আছে।

[২] মূল গল্পে নায়ক এবং নায়িকা কুশ এবং তদীয় পত্নী সুদর্শনা। 'রাজা'র সুদর্শনা নাম অপরিবর্তিত কিন্তু নায়ক শুধুমাত্র 'রাজা' বলে অভিহিত। 'শাপমোচন'-এ কুশ এবং সুদর্শনা অরুণেশ্বর এবং কমলিকায় নামান্তরিত হয়েছেন। 'অরূপরতন' (১৯২০) 'রাজা'র-ই ভিন্নতর সংস্করণ।

আরও কিছু কবিতার জন্যও—যেমন, 'পরিশোধ' (বজ্রসেন ও শ্যামার কাহিনী) রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থের কাছে ঋণী।

৬

শুধু ইংরেজী নয়, মাতৃভাষাকেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর ইতিহাস-সাধনার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এ দিক থেকে রাজেন্দ্রলাল উনিশ শতকের স্বদেশচেতন বাঙালী সমাজের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে যে সাময়িকপত্রের প্রকাশ ঘটল, তার পরিচয়-ই হল 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিকপত্র'। ইংরেজিতে যাকে বলে পেনি ম্যাগাজিন, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ছিল তা-ই এবং বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম সচিত্র ও সর্বঙ্কর পত্রিকা। 'যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করিতে পারে' সেই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই রাজেন্দ্রলাল পত্রিকাটি বার করেছিলেন। এবং পত্রিকাটি যে এ বিষয়ে কী আশ্চর্য সার্থকতার সামীপ্য লাভ করেছিল, "জীবনস্মৃতি"র পাঠকমাত্রই তা জানেন। এবং "জীবনস্মৃতি" রচনাকালে যখন কবি আক্ষেপ ক'রে বলেন—

'এই ধরণের কাগজ একখানিও নাই কেন।...সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না' ('জীবন-স্মৃতি', বিশেষ সংস্করণ, ৬৩)।

তখন বোঝা যায় সার্থক সম্পাদক হিসাবেও রাজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের কতকখানি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বস্তুত, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বাঙালীর ইতিহাসচেতনার উদ্বোধন-বিবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটি শুধুমাত্র এদেশের ইতিহাস-ভূগোল বা পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনা প্রকাশেই ক্ষান্ত ছিল না, পরন্তু সমগ্র বিশ্বই ছিল "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এর বলয়-ধৃত। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র পাঠক তাই কাশ্মীরদেশের, হলকরাজ্যের, বা রোহিলাদিগের ইতিহাসের সঙ্গে আরব লোক দ্বারা পারশ্যদেশের পরাজয়ের বা রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস জানবার দুর্লভ সুযোগ অর্জন করেছিল। তা ছাড়া "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এ দেশের কীর্তিমান পুরুষদের জীবন-চরিত আলোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে সমুচ্চ আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিল, সে কথাও এ সূত্রে স্মরণীয়।

উদাহরণস্বরূপ "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এ 'ক্রমশঃ প্রকটিত' শিবাজীর জীবনলেখ্য—নবেম্বর ১৮৬০ সালে "শিবাজীর চরিত্র" নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত—রচনার উল্লেখ করা যায়। রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ বা অশোক সম্পর্কিত প্রসঙ্গে (ঐ প্রবন্ধে অশোকের অনুশাসনের ব্যাখ্যা ও ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রতিলিপি প্রদত্ত হয়েছিল) প্রকাশ করে রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেকালের জ্ঞানলিপ্সু বঙ্গভাষীদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন হয়েছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর ঐতিহাসিক রচনার পাশাপাশি দেশবিদেশের পশুপাখির সচিত্র বর্ণনা ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, নানাবিধ শিল্পদ্রব্যসংক্রান্ত আলোচনা সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থাদির বিশ্লেষণমূলক পরিচিতি প্রভৃতি স্থান পেত। এবং এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য, সাময়িকপত্রে গ্রন্থ-সমালোচনার রীতি প্রবর্তনের সম্মান রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। বিশ্লেষণাত্মক ও বৈদগ্ধ্যগর্ভ গ্রন্থ-সমালোচনার যে কয়েকটি নমুনা আলোচ্য পত্রিকা থেকে পাওয়া গেছে, এ কালের মননশীল গ্রন্থ সমালোচকেরাও তাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেবেন ব'লে আমার বিশ্বাস।

১৮৬১ সালে "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে "রহস্য সন্দর্ভ নামে অনুরূপ একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রায় ন বছর চলার পরে পত্রিকাটি উঠে যায়।

স্বদেশী কলমে দেশের ইতিহাস রচনা প্রয়োজন, প্রয়োজন শুধু নয় জাতীয় কর্তব্য—উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই এই বোধ বাঙালীচিত্তে উন্মীলিত হ'তে শুরু করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় (প্রতিষ্ঠাকাল ১৬ অগষ্ট ১৮৪৩) 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা' (১৭৭১ শকাব্দ, ৭১ সংখ্যা) বা 'ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্বকালীন বাণিজ্যবিবরণ' (ঐ, ৭৮ সংখ্যা) জাতীয় প্রবন্ধ বাঙালীর স্বদেশচেতনা ও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার পরিচয়বাহী। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর প্রকাশের মূলে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র আদার্শ অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র তৈরী জমির উপর "বঙ্গদর্শন" (১২৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) আবির্ভাব তাই স্বভাবী ঘটনা হিসাবেই পরিগণ্য। ইতিহাস-চেতনা জাতীয় জাগরণের ভিত্তিভূমি, উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে সেই চেতনা সঞ্চারে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা তিনটি

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যভাবে, "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল নবজাগ্রত দেশবুদ্ধ বঙ্গমনীষার প্রতিনিধিদের অন্যতম।

৭

শুধু ইতিহাসেই নয়, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা লক্ষণীয়। "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত সমাজ'-এর (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ) প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। ১২৮৯ সালে ২রা শ্রাবণ সমাজের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রলাল বাংলা বানানের উন্নতি সাধন, ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামগুলির বানানে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ, ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের যথার্থ অনুবাদ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। 'সারস্বত সমাজ' সল্লায়ু নিয়ে এসেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষ নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।[১] রাজেন্দ্রলালের মাতৃ-ভাষাপ্রীতি, বৈদগ্ধ্য এবং কর্মৈষণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাগর্ভ উক্তি: "তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্তমান সাহিত্য পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।'[২]

রাজেন্দ্রলাল কিছু কিছু ভৌগোলিক পরিভাষিক শব্দের অনুবাদ করেছিলেন যেমন Isthmus = সঙ্কটস্থান, peninsula = প্রায়দ্বীপ ইত্যাদি।[৩] 'প্রাকৃত ভূগোল' নামে তিনি যে ভূবিদ্যাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন (প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) তার শেষের দিকে একটি 'পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট' আছে। তা ছাড়া ১৮৫০-৫৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি ছোটবড় মানচিত্র

১ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১২৭

২ জীবনস্মৃতি, পৃ. ১২৮

৩ মন্মথনাথ ঘোষ-রচিত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ", পৃ. ১১২

বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন এবং 'বঙ্গাক্ষরে সর্বপ্রথমে এ দেশের মানচিত্র প্রকাশের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য।' ব্যাকরণে ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর আগ্রহের পরিচয়স্বরূপ 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' (প্রকাশকাল ১৮৬২) পুস্তিকটির উল্লেখ করা যায়। "পত্রকৌমুদী" (প্রকাশকাল ১৮৬৩) নামে আর-একটি বইতে তিনি বিভিন্ন সম্পর্কীয় লোককে ও প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে চিঠি লেখা উচিত তা শেখাবার জন্য কয়েকটি আদর্শ চিঠির সংকলন করেছেন। এই সব বই ছাড়া "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ"-র বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য রচনায় তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর জিজ্ঞাসা ও পারঙ্গমতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা এবং যুক্তির কষ্টিপাথরে জানা জিনিসকে যাচাই ক'রে নেওয়ার বাসনা মননবিত্ত লেখকের পরিচয়পত্র এবং এ দিক রাজেন্দ্রলাল বাঙালী তথা ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন।

৮

রাজেন্দ্রলাল যে সেকালের ভারতীয় মনীষীদের অন্যতম ছিলেন, দেশ-বিদেশের নানা পণ্ডিত ও বিভিন্ন বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান সে কথা নিঃসংশয়িতভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। যে-'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভাপতি-পদ আজও বিদ্বজ্জনমাত্রেরই কাঙ্ক্ষণীয়, রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সেই পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এবং এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই, রাজেন্দ্রলালই 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রথম ভারতীয় সভাপতি। ইতিপূর্বে ১৮৫৭ এবং ১৮২৫ সালে তিনি 'সাসাসাইটি'র কর্মসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' তাঁকে তাদের সম্মানিত সদস্য মনোনীত করেছিলেন। এ ছাড়া 'জার্মান ওরিয়েন্টাল সোসাইটি', 'আমেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি', 'এথ্‌নোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বার্লিন' প্রভৃতি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সম্মানিত অথবা সংযোগ-সদস্যরূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৭৬ খ্রীব্দাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ এবং ১৮৭৮ সালে সরকার তাঁকে যথাক্রমে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই' খেতাব দেন। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এইসব খেতাব উপাধির সাংসারিক মূল্য আপাতদর্শন ব'লে উল্লেখ করা থাক সেই তথ্যটি যে-তথ্যে রাজেন্দ্রলাল একজন বিদেশী বুধপ্রবর কর্তৃক সশ্রদ্ধ স্বীকৃত। ম্যাক্সমুলার নামে প্রাতঃস্মর্তব্য সেই মনীষী রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বলেছেন :

He is a Pandit by profession, but he is, at the same time, a scholar and critic in our sense of the word...Our Sanskrit scholars in Europe will have to pull hard, if, with such man as Babu Rajendralal in the field, they are not to be distanced in the race of scolarship.

কলিকাত মিউনিসিপ্যাল কমিটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্মানিত ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে রাজেন্দ্রলাল এ কথাও প্রমাণ করেছিলেন, ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপির বাইরেও তাঁর সজীব দৃষ্টি ছিল। দেশের প্রবহমান জীবনধারায় তিনিও যে একজন অংশীদার, নানাভাবে তার নির্ভুল প্রমাণ দিয়ে খ্যাতি ও গৌরবের কোলে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

৯

স্বদেশবৃত্ত-চর্চার সূচনাপর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবির্ভাব। একদিকে জোন্স-কোলব্রুক-প্রিন্সেপ প্রমুখ বিদেশী ভারতবন্ধুদের রচনা-ধৃত গৌরবময় ব্যাখ্যান, অন্যদিকে মিল-মার্শম্যানদের ভারতনিন্দা ও স্বাজাত্যগর্ব : দু'য়ের মাঝখানে ধীরে ধীরে ভারত-ইতিহাস চর্চার ডাঙা জাগতে শুরু করেছে। সে-ডাঙায় স্বদেশী ঐতিহাসিকদের পদক্ষেপ তখনও ভীরু, দ্বিধাগ্রস্ত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে, কিন্তু যে দু চারখানা বই বেরিয়েছে তার অধিকাংশই, নীলমণি বসাকের কথায়, 'ইংরেজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না।' নীলমণি বসাকের এই উক্তি উচ্চারণ-কাল ১৮৫৭, সিপাহী বিদ্রোহের বছর। রাজেন্দ্রলাল তখন গবেষকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র পত্রিকায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

Bibliotheca Indica-য় তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক (১৮৫৪) সম্পাদনা করেছেন এবং 'সোসাইটি'র প্রত্নসংগ্রহের তালিকা (১৮৪৯), বই ও মানচিত্রের তালিকা (১৮৫৬) এবং 'জার্নাল'-এর প্রথম চব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর সূচী (১৮৫৬) প্রস্তুত করেছেন। রাজেন্দ্রলালের বেশির ভাগ কাজ ১৮৬০ সালের পরে এবং তাঁর প্রধান রচনাবলীর কালসীমা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ-বিধৃত। এই সময়-সীমার মধ্যেই তাঁর বিখ্যাত *The Antiquities of Orissa* এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রণালীবদ্ধ আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা তখন সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে দোলায়িত, কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা এবং ফলত যুক্তিসহ কাঠামোর অভাব, তদুপরি প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞান-সম্মত রচনাপদ্ধতির অনুপস্থিতি। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ। প্রিন্সেপ, কিটো, কানিংহাম প্রমুখ বিদেশী প্রত্নশাস্ত্রীদের চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক মূল্যবান আবিষ্কার সম্ভব এবং সেগুলির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। এঁদের কাছ থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করলেন রাজেন্দ্রলাল। উপাদান, আরও উপাদান চাই, এবং নিজের চোখে সে সব উপাদান পরীক্ষার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কাজে নামবার ব্রত গ্রহণ করলেন।

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর বহু পরে ইতিহাস-রচনার রীতি-পদ্ধতির উন্নয়ন-সংক্রান্ত অজস্র আলোচনার মধ্যে একটি কণ্ঠস্বর শ্রুত হলো : ইতিহাস-সৌধ নির্মান করতে হবে গোড়া থেকে উপরের দিকে ('from the bottom up')। এবং প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিস্তৃত তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ ক'রে ও ঐ সব জায়গার আঞ্চলিক গুরুত্বের কথা মনে রেখে এই কাজ করতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র দেশের ইতিহাস রচনা করার আগে সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস রচনায়, অন্তত সে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের, দিকে মনঃসংযোগ করতে হবে। সমাপতন কি না বলতে পারব না, ১৮৬৮-৯ সালে আঞ্চলিক ইতিহাসের বিস্তারিত উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা

১ The American History Association প্রকাশিত ও Caroline F. Ware সম্পাদিত *The Cultural Approach to History* (Columbia University 1940) পৃ. ২৭৫ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থভুক্ত The Value of Local History প্রবন্ধ-লেখকের মতে : In writing cultural history, local historical research must take rank as a basic discipline পৃ. ২৮৬।

উপলব্ধি করে রাজেন্দ্রলাল সদলবলে উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন। উড়িষ্যার প্রত্নকীর্তিগুলি সরজমিনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যবেক্ষণ করে তা থেকে ভারতের সামাজিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ ছিল তাঁর অভিষ্ট। তাঁর নিজের কথাতেই :

In prosecuting my researches I had a two-fold object in view ; in the first place to carry out the directions of the Lord Canning, as laid in his memorable resolution on the antiquities of India, that is to say, to secure 'an accurate description,—illustrated by plans, measurements, drawings, or photographs, and by copies of inscriptions—of such remains as most deserve notice, with the history of them so far as it may be traceable, and a record of the traditions that are retained regarding them' ; and in the second place to notice prominently such points in them as were calculated to throw any special light on the *social history of the ages* to which they referred. For this purpose, Sir Gardner Wilkinson's learned work on the 'Ancient Egyptions' has served me for a guide. (ইটালিকস আমার) *Antiquities of Orissa*, Vol. I, preface, p. 1.

রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস-দৃষ্টি যে ভারতের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল, স্যার গার্ডনারের *Ancient Egyptians*-এর আদর্শে উড়িষ্যার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস রচনা-প্রচেষ্টাতে তার পরিচয় নিহিত।

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতিহাস রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্টভাবে তাঁর উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। সে উক্তি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঐতিহাসিকরূপে দ্রষ্টব্য বস্তুর নিখুঁত ও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য এবং ও কর্তব্যের সুষ্ঠু সমাধা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ক্রমশ মনোযোগী ও যত্নশীল হ'য়ে উঠেছেন। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ঐতিহাসিকসুলভ দ্রষ্টব্য বস্তু প্রত্নকীর্তি-সংক্রান্ত কিংবদন্তী স্থানীয় জনশ্রুতি ইত্যাদির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন ; যেমন 'মাদলা পঞ্জী' নামে উড়িষ্যার মন্দির-সংক্রান্ত পুরাবিবরণগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রমাণিক বলে কখনো নস্যাৎ করেননি এবং 'মাদলা পঞ্জী' যে একেবারে

মূল্যহীন নয় পরবর্তী গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে। শেষত, প্রত্নকীর্তিকে নিছক বস্তুমূল্যে গ্রহণ করা অর্থহীন কারণ প্রত্নকীর্তিগুলি, যেমন উড়িষ্যার মন্দির ও ভাস্কর্য, সমসাময়িক কালের দর্পণ। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে, একজন ভারতীয়ের মধ্যে এই আধুনিক ঐতিহাসিকসুলভ ইতিহাস-বোধের উপস্থিতি নিঃসন্দেহেই বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণের যোগ্য। আরও অবাক হ'তে হয় যখন দেখি, সেই ভারতীয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টিবলয়ে শুধু স্বদেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব এসে ধরা দিয়েছে সেই বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর স্বদেশবৃত্তকে স্থাপানের প্রয়াস পাচ্ছেন। প্রাচীন উড়িষ্যার সামাজিক ইতিহাস রচনায় যেমন তিনি স্যার গার্ডনারের বইকে আদর্শ করছেন তেমনি উড়িষ্যার শিল্পকলা অধ্যয়নের সময় ওয়েস্টম্যাকটের *Handbook of Sculpture* বা লিবকি-র *The History of Art* ও *The History of Sculpture*-এর কথা মনে রেখেছেন।

পুনরুক্তির সুরে বলি, যে সময় রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিকের কলম হাতে নিয়েছিলেন, দেশীয় ইতিহাসচর্চার তখন শৈশবাবস্থা, তথ্য অপ্রচুর, রচনা পদ্ধতি অজ্ঞাত। উড়িষ্যা-সংক্রান্ত মহাগ্রন্থের গোড়ায় তিনি তথ্যের অপ্রতুলতার কথা মেনে নিয়ে বলেছেন: মানুষের অন্বেষণের সীমা নেই, আপাতদৃষ্টিতে নিরাশ হবার মতো ক্ষেত্রেও মানুষ শুধু অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কাজ করতে পারে। বলাই বাহুল্য, এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল না হ'লে রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক হিসাবে কীর্তিমান ও স্মরণীয় হতেন না।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, ভারতের ইতিহাসচর্চায় অন্যতম পথিকৃতের সম্মান কি রাজেন্দ্রলালের পাপ্য? এ প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহেই সম্মতিসূচক। উড়িষ্যায় তাঁর আগে কোন প্রত্নসন্ধীর পদার্পণ ঘটেনি বা উড়িষ্যার প্রাচীন নিদর্শনাদি নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি এমন নয়, কিন্তু সমগ্র প্রাচীন উড়িষ্যাকে তার বর্ণবৈভবে আমাদের দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। উড়িষ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থে ১৮৮০ অবধি প্রাপ্ত তাবৎ প্রত্ন-নিদর্শনের বিশদ বিবরণই শুধু লিপিবদ্ধ হয়নি, নানা শিল্পবস্তুর রেখাচিত্র ও আলেকচিত্রেও এই গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান। রাজেন্দ্রলালের পর উড়িষ্যা সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এখনো উড়িষ্যার ইতিহাস প্রণয়নেচ্ছুককে রাজেন্দ্রলালের বইয় সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। রাজেন্দ্রলালের

অপর গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য ক'রে বলা যায়, ভারতের সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস রচয়িতা মাত্রেরই এটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রাথমিক ভিত্তি যদিচ হজসন রচিত এবং যদিচ হজসন-এর পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধারে তিনজন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলালকে সাহায্য করেছিলেন,[১] তবু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন এই গ্রন্থ রাজেন্দ্রলালের, একান্তভাবে রাজেন্দ্রলালেরই, কীর্তি। রসিক ভোক্তা সুস্বাদু ব্যঞ্জনের কৃতিত্ব রন্ধনশিল্পীকেই দিয়ে থাকেন তেল-নুন সরবরাহকারীকে নয়। ইতিহাস রচনার পথ-প্রস্তুতির কাজে রাজেন্দ্রলালকে অসামান্য পরিশ্রমী অংশ নিতে হয়েছিল। এবং সেই কাজে রাজেন্দ্রলাল যদি কিছু ভুল-ত্রুটি ক'রে থাকেন তবে তা নিশ্চয় ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু আমার হাতের কাছেই এমন তথ্য আছে যা প্রমাণ করে, সে সব ভুলত্রুটি উপাদানের স্বল্পতা বা অসম্পূর্ণতাজনিত, রাজেন্দ্রলালের বিচারবোধ থেকে তারা জন্মায়নি। পরন্তু, ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির বলে রাজেন্দ্রলাল সেদিন এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, যেগুলি পরবর্তী কালে অধিকতর তথ্য উপাদানের দ্বারা সপ্রমাণ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়। ফার্গুসন-এর মতো ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একজন প্রমাণপুরুষের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন ক'রে রাজেন্দ্রলাল তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়ে বলে-ছিলেন, ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি এই ভারতবর্ষেই; আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরে ভারতীয় গ্রীক স্থপতির কাছে পাথরের সাহায্যে বাড়ি তৈরি করার বিদ্যা শিখেছিল ফার্গুসনের এ মন্তব্য ঐতিহাসিকসুলভ নয়।[২]

১এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'তখনকার কালের মহত্ত্বিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে, 'আমিই বুঝি কৃতী আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র।' কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন একদিন সে মনে করিয়া বসিত, 'লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।' 'জীবনস্মৃতি,' পৃ. ১২৯।

২ রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে ফার্গুসনের বিতর্ক তাঁর *The Antiquities of Orissa*-র প্রথম খণ্ডে এবং *Indo-Aryans*-এর প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে। ফার্গুসন পরে রাজেন্দ্রলালের মত মেনে নিয়ে বলেছিলেন, Indians knew the use of stone and did use it in the construction of walls and plinths and bridges before the time of Alexander.

বলাই বাহুল্য, আদি ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতীয় স্থাপত্যের দেশীয় ভিত্তিভূমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করেছে। ফার্গুসনের মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক রাজেন্দ্রলালের পরিচয় দেয়। এই আত্মবিশ্বাস ছিল ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলালের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য। আর তা যুক্তিবুদ্ধির উপর সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথ্যের বিশদ সংগ্রহ, তথ্যের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ, অতঃপর বিশ্লেষণ নির্ভর তথ্যের বিন্যাস ও সামান্য-করণ—ঐতিহাসিকসুলভ এই কাজগুলি করতে গিয়ে যদি তাঁকে বিখ্যাত কীর্তিমান পণ্ডিতদের (প্রায়শ বিদেশী) বিরোধিতা করতে হত, তা হ'লে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না ক'রে নিজের যুক্তি ও আত্মবিশ্বাসের হাতিয়ার নিয়ে সেই সব প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, তাঁদের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন। এ বিরোধিতার সময় তিনি তাঁদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা দেখাতেন, এ কথা যেন আমরা ভুলেও মনে না করি। তাঁর বিতর্ক জ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে কখনও ব্যক্তিকে স্পর্শ করেনি।

প্রসঙ্গক্রমে আমি 'তথ্যের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ অংশে নিরাসক্ত' এবং 'যুক্তি-বুদ্ধি' শব্দবন্ধের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রাচীন ঐতিহ্য, কিংবদন্তী, গল্পগাথা প্রভৃতিকে রাজেন্দ্রলাল আদৌ অবজ্ঞা করতেন না, কারণ তাঁর মতে ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে ইতিহাসের উপাদানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব, বিশেষত যে সমাজের মধ্যে তাদের জন্ম ও বিবর্ধন, সেই সমাজের চেহারা পেতে তাদের সাহায্য অনস্বীকার্য। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জীর প্রতি অনেকখানি আস্থাবান ছিলেন এবং পুরীর মন্দির সম্পর্কে পুরী স্কুলের হেডমাষ্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লেখা চিঠির এক জায়গায় বলেছেন, 'আমার মতে গাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা। এবং তাঁহার সময় হন্টার সাহেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং তৎকালের মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।'[১] প্রাচীন ঐতিহ্য, কিংবদন্তী ইত্যাদি যে একেবারে মূল্যহীন নয়, তা পরে সপ্রমাণ হয়েছে যদিচ তারা প্রধানত সমর্থক উপাদানের মূল্যেই বিশিষ্ট। আশ্চর্য এই, সেকালের অনেক দেশপ্রেমী লেখকের মতো তিনি কখনও ঐসব কিংবদন্তী গল্পগাথাকে অভ্রান্ত তথ্য বা ইতিহাস রচনার

১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজেন্দ্রলাল মিত্র" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, তৃতীয় খণ্ড) পুস্তিকার ৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেননি। নিরাসক্তদৃষ্টিতে তিনি তাদের বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদান সংগ্রহ করে অন্যবিধ আকরলব্ধ তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কাজে লাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি দেশপ্রেমের উপরে ইতিহাস ও ইতিহাস-সত্যকে স্থান দিয়েছেন। সেই কারণেই জেমস প্রিন্সেপ-এর মতো প্রাজ্ঞ জন যখন সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে পালি গল্পগাথাকে বিশ্বাস্য ও ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদানরূপে স্বীকার ক'রে মন্তব্য করেন[১] :

·· If the rationality of a story be a fair test of its genuineness, which few will deny, the Pali record will here bear away the palm.

তখন রাজেন্দ্রলাল তাদের 'legendary and full of romantic fables' রূপে বর্ণনা ক'রে বলেন :

Plausibility is no proof in law, nor can it be its history. If we admit the reverse of the position, we have to accept all the Society novels and stories of the day as history. ·

সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে রাজেন্দ্রলাল একালের ইতিহাসব্রতীদের কাছে হয়তো নামমাত্র। রাজেন্দ্রলালের রচনায় ত্রুটি নির্ণয়, তাঁর কোন কোন সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপাদন আজ হয়তো দুঃসাধ্য নয়। তাঁর সময় থেকে ভারতবিদ্যা তথ্যে তত্ত্বে প্রয়োগপদ্ধতিতে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। ভারতবিদ্যার এই প্রগতি দর্শনের জন্য রাজেন্দ্রলাল যদি পুনর্বার জন্ম নেন, তা হ'লে তিনি নিজেই উনিশ শতকের রাজেন্দ্রলালের সমালোচনায় তৎপর হ'য়ে নতুন ক'রে উড়িষ্যার বা বুদ্ধগয়ার ইতিহাস লিখবেন। সেই সঙ্গে তিনি নতুন তথ্যের আলোকে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টিতে রচিত সিদ্ধান্তের নির্ভুল প্রতিষ্ঠায় পরিতৃপ্ত হবেন। জানি রাজেন্দ্রলালের সেই সব নির্ভুল সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ সমাপতন ব'লে পাশ কাটাতে চাইবেন, কিন্তু এক হিসেবে পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারও কোন না কোনভাবে সমাপতন নয় কি? সময় পরিবেশ এবং কর্মোপাদন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কর্মসাধকের বিরূপ সমালোচনা একধরনের অক্ষমতা। ইতিহাসচর্চার শৈশবাবস্থায় রাজেন্দ্রলালের আবির্ভাব, তথ্য-উপাদানের অপ্রতুলতার মধ্যে

১ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* পৃ. XXXVIII.

তাঁকে ইতিহাস রচনার রাস্তা তৈরি ক'রে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফলত, তাঁর দোষ-ত্রুটি-স্খলন পথিকৃতের। এবং পথিকৃতের দুরূহ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব'লেই বোধ করি তিনি "বুদ্ধগয়া" গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন :

I feel myself under great obligation to my predecessors for the assistance I have derived from their researches. If in the discharge of my self-imposed tasks it has become necessary for me occasionally to question the correctness of their opinions, my object has been to serve the cause of truth, and not to find fault with them As pioneers traversing a new and untrodden path, they had grave difficulties to overcome and mistakes and misconceptions were under the circumstances unavoidable.

মাঝে-মধ্যে সন্দেহ জাগে, হয়তো রাজেন্দ্রলালের মনে কোন ত্রুটিসন্ধী উত্তরপুরুষের ছায়াপাত ঘটেছিল।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত ১৮২৪-১৮৭৩

সুশীল রায়

শ্রীমধুসূদন তাঁর জীবিতকালে বাংলার অধিবাসীবৃন্দের দ্বারা কতটা অভিনন্দিত হয়েছেন, তার সঠিক হিসাব পাওয়া না গেলেও আমরা এটুকু প্রমাণ পেয়েছি যে, তিনি তখনই সার্থক কবি বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন মধুসূদনের সাহিত্য-জীবন মোটামুটিভাবে ধরতে গেলে মাত্র সাত বছর। এই সংক্ষিপ্ত সাত বছরের সাহিত্যিক দান দিয়েই তিনি বাংলার সমস্ত হৃদয় জয় করে নিয়েছেন।

যে পথ সহজ ও স্বাভাবিক, সে পথে চলায় মধুসূদন অভ্যস্ত ছিলেন না। তিনি নিজের চলার জন্য নূতন পথ নির্মাণ করে নেওয়ারই পক্ষপাতী ছিলেন। যখন তাঁর কবিত্বশক্তির স্ফূরণ হয়নি, তাঁর কোনো কবিতা কোনো সুধীর নিকট সুখ্যাতি লাভ করেনি, তখনো তিনি নিজেকে চিনতে পেরেছিলেন। তিনি জানতেন, তাঁর আপনার মধ্যে লুক্কায়িত আছে একটি সার্থক কবি। এই আত্মপ্রত্যয় তাঁর ছিল বলেই তিনি কবিযশঃপ্রার্থী হয়েও দুঃসাহসিক অভিযান করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি প্রথমেই হাত দিলেন 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য' রচনায় এবং এ রচনা হল অমিত্রাক্ষর ছন্দে। রাজনারায়ণ বসু তখন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার লেখক। মধুসূদন তাঁকে লিখলেন, ওই পত্রিকায় রাজনারায়ণ যেন এই কাব্য-গ্রন্থটির সমালোচনা লেখেন, কিন্তু

"If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend."

এইখানেই লেখকের আত্মপ্রত্যয়ের চরম প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে কাব্য লিখে তিনি 'যশের মন্দিরে' প্রবেশের জন্যে প্রথম সোপানারোহণ করলেন, সেই কাব্য যদি নিন্দিত হয় বা অস্বীকৃত হয় তাতে তাঁর কিছু যায়-আসে না। এই কাব্য দিয়ে যদি তেমন কিছু না হয়, পরবর্তী কোনো কাব্য রচনার দ্বারা তিনি অমরত্ব লাভ যে করবেনই— এ বিশ্বাস তাঁর ছিল। মধুসূদনকে তাই আমরা সহজ কবি, সাধক কবি বা স্বভাব কবি বলে মনে করিনে, আমরা তাঁকে আত্মবিশ্বাসের কবি বলে জেনেছি।

মধুসূদন তাঁর জীবিত কালে দেশবাসী দ্বারা কতটা স্বীকৃত হয়েছেন, তার হিসাবের কথা বলছিলাম। স্বীকৃত তিনি তখনই হয়েছেন, কেননা সেইকালেই বিভিন্ন মতের ও বিভিন্ন পথের জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির দ্বারা তিনি প্রশংসিত হয়েছেন এবং বছর দশের মধ্যেই এই গ্রন্থের তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। কবিতা গ্রন্থের সংস্করণের কথা আজকাল আমাদের কল্পনার বাইরে; কিন্তু তখন মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্য 'মেঘনাদ-বধ' বাংলায় নূতন আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই কারণেই নূতন ও অপরিচিত ছন্দে লেখা মধুসূদনের কাব্যের এমন চাহিদা হবে— এতে আশ্চর্য হওয়ার অবশ্য কিছু নেই। কিন্তু আশ্চর্য হতে হয় কেবল এই কারণে যে, এমন একজন ধর্মভ্রষ্ট সাহেবী আদব-কায়দা-দুরন্ত বাংলাভাষা-জ্ঞানহীন ব্যক্তি বাংলায় কাব্য রচনা করে বাংলার সুধী ও সাধারণকে বিস্মিত ও চমকিত করে দিলো কী করে?

মধুসূদন জানতেন, তিনি একজন সাচ্চা কবি। তাই মিলের শ্রুতি-মধুরতা পরিহার করতে তিনি বিন্দুবিসর্গ ভীত হননি। যে কন্যার দেহে লাবণ্য না থাকে, তারই প্রয়োজন হয় অলঙ্কারের; যে কণ্ঠে সুরের মধুরতা থাকে সামান্য, তারই গানের সঙ্গে বাজে ঐকতান। মধুসূদনের কাব্যলক্ষ্মী লাবণ্যময়ী, তাঁর কল্পনা শ্রীময়ী, সুতরাং বাহ্য আড়ম্বরের প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি, মধুসূদন বলেছেন—

"A true poet will always succeed best in blank verse, as a bad one in rhyme."

তাঁর সমসাময়িককালে মধুসূদন স্বীকৃত হয়েছেন, কিন্তু তাঁর লোকান্তরের পর যতদিন গত হচ্ছে, ততই তিনি ক্রমশঃ সর্বজনবন্দনীয় হয়ে উঠছেন। এর হেতু কী? এর হেতু হচ্ছে তিনি বাংলার তথা ভারতের আত্মার পরম আত্মীয় কবি ছিলেন। তিনি বাহিরে পরম বিদেশী, ভিতরে তিনি চরম স্বদেশী। তাঁর কাব্যে তাঁর মাতৃভূমির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রতিধ্বনি নিয়ত বেজে চলেছে। তিনি আত্মবিশ্বাসের কবি এবং সেই সঙ্গে তিনি ভারতের একজন জাতীয়-কবি।

তাঁর জীবনের প্রথম উচ্চাশা ছিল বিলাত-গমন। কিছু বেশী বয়সে তাঁর এই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। তখন এক পাকা সাহেবের বেশে তিনি ইংলণ্ডে গমন করেন; কিন্তু সেখানে গিয়েও তিনি সেই দেশের রীতি-নীতি আচার আচরণ দ্বারা এতটুকু আকৃষ্ট হন নি; তখনো তাঁর মন স্বদেশে, স্বদেশের

পূজায় পার্বণে, স্বদেশের কবি ও গুণীদের মধ্যে পড়েছিল; তাঁর মন পড়ে ছিল ভারতের মহাকাব্যে—রামায়ণে-মহাভারতে এবং তাঁর স্বদেশের নদী কপোতাক্ষের কূলে—

> সতত, হে নদ তুমি পড় মোর মনে।
> সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে।

তাঁর স্বপ্নের দেশ ইংলণ্ড এবং সেই দেশের স্বনামধন্য নদী টেমস্ মধুসূদনের হৃদয় হরণ করতে পারেনি। টেম্‌সের কলতান অতিক্রম করে কপোতাক্ষের জলকল্লোল ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সর্বাঙ্গে। প্রবাসের বেদনা তিনি তাঁর এই স্বদেশীয় নদীর কলকল-ধ্বনিতেই যেন প্রশমিত করতে পেরেছিলেন। তাঁর চতুর্দশপদী কবিতাবলী তাঁর স্বদেশের অভিনন্দনের কবিতা। বিদেশে বাসকালে রচিত এই কবিতাগুচ্ছই মধুসূদনের অন্তরাত্মার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—"অনুকূল পবন বহিতেছে, জাতীয়-পতাকা উড়াইয়া দাও, তাহার উপর নাম লিখ-শ্রীমধুসূদন।" আজ আমাদের দেশে প্রকৃতই অনুকূল পবন প্রবহমান, আজ আমাদের দেশে আমাদের জাতীয়-পতাকা সত্যই উড্‌ডীন হয়েছে, আজ সেই পতাকার উপর শ্রীমধুসূদনের নাম যদি সুস্পষ্টরূপে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে জাতীয়-জীবনে আমাদের সেই নিশান নূতন নিশানা দিতে পারবে। ইংলণ্ডের ঘোর দুর্দিন দেখে কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ মিল্‌টনকে আহ্বান করেছিলেন, আমাদের দেশেও আজ দুর্দিন চারিদিকেই দেখা দিয়েছে, এই দিনে মধুসূদনের উদ্দেশ্যে আমাদেরও বলতে ইচ্ছে হয়—

"Thou shouldst be living at this hour."

এমন একজন কবি সত্যই আজ প্রয়োজন, যিনি আমাদের জাতীয়-জীবনে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে আমাদের সকলকে সজাগ ও সচেতন করে তুলতে পারবেন; যিনি তাঁর জীবনের কর্ম দিয়ে জীবনধর্ম প্রচার করতে পারবেন, যিনি বিদেশের চেয়ে স্বদেশকে শ্রেয়তর আসন দেবার মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারবেন। আমাদের মধ্যে দীনতা হীনতা দূর করে দিয়ে যিনি বলতে পারবেন—

"Don't spare me because I am your friend."

যদি প্রকৃত বন্ধু হয়ে থাক, তাহলে আমাদের মধ্যে যে দোষ আছে, যে

ত্রুটি আছে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে ; তা না হলে দোষ-ত্রুটি শোধন করার সুযোগ পাওয়া যাবে না। কিন্তু বর্তমানকালে আমাদের চিন্তার ধারা গিয়েছে বদলে ; একালে আমাদের কোনো পরম সুহৃদ যদি আমাদের কোনো রচনার সামান্য ত্রুটির কথাও উল্লেখ করেন তাহলে তৎক্ষণাৎ আমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি এবং পরম সুহৃদকে চরম শত্রু জ্ঞান করি ; তার পরিণাম যা হবার তা আমরা চাক্ষুষই দেখতে পাচ্ছি ; দেখতে পাচ্ছি আমাদের ব্যাবহারিক জীবনের সঙ্গে আমাদের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ক্রমাবনতি। এই হারে ও এই গতিকে যদি আমরা নিম্নাভিমুখী হই তাহলে অচিরকালে আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছব, তা সহজেই অনুমান করা যায়।

বাংলার এমন দুর্দিনে বাংলার একান্ত প্রয়োজন এমনই এক সর্বনিয়ম-লঙ্ঘনকারী ব্যক্তিত্ব— যার নাম শ্রীমধুসূদন।

মধুসূদনকে মহাকবি বললে তাঁর পরিপূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি কেবল কয়েকটি সুকাব্য এবং কয়েকটি সুকবিতা রচনা করেই শ্রীমধুসূদনরূপে পরিচিত হননি। যে পথেই তিনি অগ্রসর হয়েছেন, সেই পথই তিনি স্বয়ং রচনা করে নিয়েছেন ; মহাজনগণ যে পথের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন, সেই নিশানা ধরে তিনি চলেছেন বটে, কিন্তু চলার জন্যে পথ রচনা করে নিয়েছেন নিজে। রামের চেয়ে রাবণকে তিনি অধিক সম্মান দিয়েছেন—এ পথ তাঁর নিজের পথ এবং এটি দুঃসাহসিক পথ, কিন্তু রামায়ণের মূল কাহিনী অবলম্বনে রচিত তাঁর কাব্য, এইজন্যে ঋণ স্বীকারে তিনি অকৃপণ। দুঃসাহসী সর্বনিয়মলঙ্ঘনকারী উচ্ছৃঙ্খল বলে খ্যাত সেই কবি তখন বিনয়ে বিনম্র হয়ে গিয়েছেন—

> নমি আমি কবিগুরু তব পদাম্বুজে
> বাল্মীকি ! হে ভারতের শিরঃচূড়ামণি,
> তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্রসঙ্গমে
> দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে

যে কবি কোন নিয়মের দাস নন, তিনি এখানে নিজেকে দীনতম দাসরূপে জ্ঞান করতেও কুণ্ঠিত হননি। যিনি বাগ্‌দেবীকে আহ্বান করে বলেছেন—

> গাইব মা, বীররসে ভাসি
> মহাগীত।

সেই বীররসের কবির কণ্ঠে সুমধুর ললিতরসও প্রবাহিত হয়েছে,

সখি রে, বন অতি রম্মিত হইল—
ফুল ফুটনে।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, এখানে তার থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে দিই—

"The farce [একেই কি বলে সভ্যতা ?] is exquisite and it is an wonder to me how the author could paint so humourous a picture with one hand while the other was busy with depicting the Miltonic grandeur of Tilottama."

আমরাও তাই ভাবি, আমাদের কাছেও আজ পর্যন্ত এটি বিস্ময়ের। যে হাত দিয়ে রাবণের বীরত্ব অঙ্কন করা হয়েছে, সেই হাতেই 'বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী' ধারী রাবণের বিলাপ ধ্বনিত করা হল কী করে ? কী করে বীরাঙ্গনা এবং ব্রজাঙ্গনা পাশাপাশি তাদের মনের আবেদন বিভিন্ন সুরে ও বিভিন্ন বেদনায় নিবেদন করল ?

মধুসূদনের পোশাক আসলে যেন পোশাক ছিল না ; নিজেকে লুকিয়ে রাখার জন্যে ওটি ছিল একটি আচ্ছাদন। সেই আচ্ছাদনের অন্তরালে যে পুরুষটি ছিলেন, তিনি বিশদ বস্ত্র বিশদ উত্তরী পরিহিত শ্রীমধুসূদন স্বয়ং। আমাদের এক একবার মনে হয়, মধুসূদন রাবণের দ্বারা যে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, তিনি রাবণের চরিত্রের সঙ্গে নিজের চরিত্রের সামঞ্জস্য দেখতে পেয়েছিলেন। কোনো দৈব আশীর্বাদের দ্বারা পরিপুষ্ট না হয়ে কেবল নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করে রাবণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। দৈব অনুগ্রহের কথা তো ওঠেই না, বরঞ্চ ভগবান যেন অপ্রসন্নই ছিলেন তাঁর প্রতি, ভগবতীর অনুরোধে শঙ্কর তখন নিষ্ক্রিয়, এই সুযোগে রাম তাঁর বীরত্বের পরকাষ্ঠা দেখালেন। আত্মবিশ্বাসের কবি মধুসূদনও কারো অনুগ্রহের উপর নির্ভর না করে কেবল নিজ বাহুবলের উপর ভরসা রেখেই দুরন্ত অভিযানে নির্গত হয়েছিল। স্বদেশবৎসল রাবণ যেমন লঙ্কার প্রতি দরদী, মধুসূদনও সেইরূপ তাঁর স্বদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সেই স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্যে বাংলার কাব্যক্ষেত্রে তিনি নূতন কাব্যাঙ্কুর রোপণ করলেন—অমিত্রাক্ষর।

মধুসূদনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, যে নবছন্দ তিনি বাংলায় দান করে গেছেন উত্তরকালে সেই ছন্দ প্রতিভাবান কবিদের হাতে পড়ে আরো উন্নত এবং আরো শ্রীসম্পন্ন হবে। কিন্তু অদ্যাবধি অমিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রে কোনো নূতন প্রতিভার উদ্যোগ দেখা যায়নি। সেইজন্যেই মনে হয়, মধুসূদন উল্কাসম যে অগ্নিপ্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তেমন প্রতিভার আবির্ভাব বুঝি আর বাংলায় হয় নি। কিন্তু তার জন্যে আক্ষেপের কারণ নেই, মধু-ছন্দই আজও বাংলাকে মধুময় করে রেখেছে। আজ বঙ্গবাসী তাঁর অনুরোধ স্মরণ করে তাঁর সমাধিস্থলে গিয়ে মিলিত হয়, শুভ্র পাষাণ-ফলক ভেদ করে সেই অনুরোধ নীরবে ধ্বনিত হয়—

দাঁড়াও পথিকবর জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে।

তাঁর তিরোধান দিবসে নতশিরে সেই সমাধির পাদমূলে বাংলার কাব্য রসিকেরা নিয়মিত মিলিত হন।

এই সমাধিমন্দিরের কিছু দূরে ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড। প্রায় শতবর্ষ আগের কথা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত এখানে বাস করতেন। এখানে বাস করা নয়, এই অমর কবির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়টি বছর অতিবাহিত হয়েছে এখানে। এই সেই বাসগৃহ, যে গৃহে বসে তিনি রচনা করেছেন মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী, একেই কি বলে সভ্যতা ?, বুড়ো শালিকের ঘড়ে রোঁ ; এবং এই সেই গৃহ, যে গৃহে বসে তিনি রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটকদ্বয়ের ইংরেজী অনুবাদকার্য সমাধা করেন। মধুসূদনের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ এই গৃহেই। এই গৃহই কবিকে আকর্ষণ করে নিভৃত আশ্রয় দান করল, এই গৃহের প্রতিটি প্রাচীর যেন উৎকণ্ঠ আগ্রহে অপেক্ষা করছিল কবিকে অমরত্ব দেবার আকুলতায়। স্রোতের শ্যাওলার মতো ঘাট থেকে ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছিল যে মূলহীন তরু, অকস্মাৎ সে পেয়ে গেল যেন শিকড়ের সন্ধান ও মৃত্তিকার স্নেহ। সেই মূল্যহীন তরু ক্রমে দেখা দিল বিরাট মহীরুহরূপে। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন ভিন্ন নামে, কলকাতায় ফিরে এসে পুলিস কোর্টে চাকরি নিয়ে তিনি হলেন Mr Data ; অচিরে সে সব নাম মুছে দিয়ে এই গৃহে এসে তিনি হয়ে উঠলেন দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন। ৬নং লোয়ার চিৎপুর

রোডের এই ভবনটি ছিল একটি ভবনই। মধুসূদন নিজের প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করে সেই ভবনকে করে তুললেন এক পবিত্র কীর্তিমন্দির।

এই কীর্তিমন্দিরের সোপানাবলী অতিক্রম করে ঘুরে ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ। কবির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে বহুদিন আগে। তবু মনে হল মন্দিরের সর্বত্র এখনো যেন বেজে চলেছে বহুদূরাগত একটি আকুল আবেদনের মত সেই কণ্ঠ—

> তুমিও আইস, দেবী, তুমি মধুকরী
> কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
> লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

মধুসূদন যে কীর্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, গৌড়জন সেই মন্দিরে মধুচক্র রচনার জন্য ব্যগ্র! এই ভবনটি জাতীয়-স্মৃতিসৌধরূপে সংরক্ষিত হোক, গৌড়জনের আজ এই আকাঙ্ক্ষা।

বর্তমানে চিৎপুর রোড জনারণ্যে ও যানারণ্যে আচ্ছন্ন। শতাধিক বছর আগের কলিকাতায় চিৎপুরের এ চেহারা ছিল না। কথিত আছে চিত্তেশ্বরী দেবীর নাম থেকেই এ রাস্তার নাম হচ্ছে চিৎপুর। এই অঞ্চলে চিত্তেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবীমূর্তির সম্মুখে নরবলিও প্রচলিত ছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল শনিবার অমাবস্যার রাত্রে নাকি এখানে নরবলি হয়। এই ঘটনার প্রায় সত্তর বছর পরে মধুসূদন এখানে বসবাস আরম্ভ করেন, ১৮৫৯ সালে। সত্তর বছরে এই অঞ্চলে তেমন পরিবর্তন হয়নি বলে ধরা যায়। নরবলিপ্রথা রহিত হলেও এ অঞ্চল তখনো অবশ্যই নিভৃত ও শান্ত ছিল।

কিন্তু এখন চিৎপুরের চেহারা আলাদা। ট্রামে, বাসে, রিক্শায়, ঠেলাগাড়ীতে আর পুলিশের বাঁশীতে ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড এখন উচ্চকিত।

১৯৫৫ সালের ১০ই জানুয়ারীর কথা আজ মনে পড়ে। বেলা দুপুর। এই গৃহের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলাম, নীচতলায় ফুটপাতের গা বরাবর পাশাপাশি চারটে বড় বড় দরজা—প্রত্যেক দরজার মাথায় একটা করে সাইন বোর্ড লাগানো। চারটে দোকানই এক জাতের—হার্মোনিয়ম, তবলা, ফ্লুট, সেতার, এসরাজ আর তানপুরা নিয়ে ফলাও কারবার। পাশেই

ভিতরে যাবার প্যাসেজ। এই সরু রাস্তা ধরে একটু এগোতেই উপরে যাবার সিঁড়ি। মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে উপরে উঠছি—

সম্মুখ সমরে পড়ি বীরচূড়ামণি
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে,—

এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই রেলিঙেই কতদিন হাত রেখেছেন মধুসূদন। রেলিঙ হাত দিয়েই ঐ কথা মনে হল, একটু যেন থমকে থেমে গেলাম।

ডান দিকে অনুচ্চ ছাতের ওপারে প্রাক্তন রন্ধনশালা। বাম দিকে ঘুরে গিয়েছে সিঁড়ি। সম্মুখে বারান্দা। হলঘরে ঢোকবার দরজা। এই ঘরে এসে বসতেন মধুসূদনের অতিথি ও অভ্যাগত। তাঁর আবাল্যসুহৃদ গৌরদাস বসাক. কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সম্ভবত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও এসেছেন এখানে।

মধুসূদনের শয়নকক্ষ ও যে ঘরে বসে তিনি লিখতেন, ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। কবিভার্যা হেনরিয়েটার পিয়ানোটা ছিল কোথায়, আর কোন্ জায়গায় ছিল কবির কাব্যরচনার সরঞ্জাম—তাঁর টেবিল এবং তাঁর কলম—ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগলাম। এই সেই ঘর, যেখানে পদচারণা করতে করতে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি মুখে মুখে রচনা করতেন তাঁর কাব্য। আর ওইখানে বসে সমাগত পণ্ডিতেরা লিখে যেতেন—

স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়?

ধূলিধূসরিত আজ সমস্ত ঘর। কিন্তু তবুও কোনো আক্ষেপ নেই। এই ঘরের প্রতিটি ধূলিকণার তাঁর কণ্ঠ যেন প্রতিধ্বনিত। প্রমীলার আস্ফালন, রাবণের খেদ, শ্রীরামের বিলাপ, সরমার সমবেদনা, বিভিন্ন সুরে স্তনিত হয়ে উঠছে। মধুসূদনের পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাজছে যেন বীর নারীর দর্পিত কণ্ঠ—

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

আবার এরই সঙ্গে গুঞ্জরিত হচ্ছে কোমল কান্তপদাবলী—

সখি রে, বন অতি রমিত হইল
ফুল ফুটনে।

সূর্যের আলোর প্রসাদে যেমন বিকশিত হয় চন্দ্র, মধুসূদনের প্রতিভার প্রভায় তেমনি ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড আলোকোদ্ভাসিত। স্থাণুর ললাটে স্থান পাবার যোগ্য সেই চন্দ্র আজ ভূতলে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এস্থান ত্যাগ করে কবি চলে গেছেন, আজ এর দ্বিতলটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামো কারখানা হয়েছে।

এই কারখানার মালিক আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে একে একে সব কয়টি ঘর দেখালেন। কোন্‌টা ছিল কবির কোন্ ঘর বুঝিয়ে দিলেন, এখন চেনার উপায় নেই। পার্টিশান দিয়ে হলঘরটি খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে।

বললাম, এটা জাতীয়-স্মৃতিমন্দির হচ্ছে জানেন নিশ্চয়?

—জানি। এটা আনন্দের কথা।

—আপনারা তাহলে যাবেন কোথায়?

—নূতন জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

কারবারী লোকের মুখে এমন কথা শুনব আশা করিনি। কথাটা শুনে ভালো লাগলো।

এই বাড়িটার মালিক হচ্ছেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর। মধুসূদন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরেরই ভাড়াটে ছিলেন। সেই আমলে যে বাড়ীর নম্বর ছিল ৬, আশ্চর্যের কথা, কলকাতা শহরের এত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সত্ত্বেও সে বাড়িটার নম্বরের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।

কোর্টে হেড ক্লার্করূপে কর্মগ্রহণ করেন এবং ১নং দমদম রোডস্থ কিশোরী চাঁদ মিত্রের উদ্যান বাটিকায় বাস করতেন। কিন্তু—"কেরানীরূপে মধুসূদনকে অধিককাল থাকিতে হয় নাই। অনতিবিলম্বেই তিনি উক্ত আদালতের দ্বিভাষিকের পদে উন্নীত হন। এই পদ লাভ করিয়া তিনি কিশোরী চাঁদের উদ্যান বাটিকা পরিত্যাগপূর্বক তদানীন্তন লালবাজার পুলিশ কোর্টের পূর্বপারে লোয়ার চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত (৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড) দ্বিতল ভবন ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন।"—'মধুস্মৃতি'

বর্তমানে লালবাজার থানা যে স্থানে অবস্থিত ঐ স্থানেই ছিল পুলিস কোর্ট। রাস্তার অপর পারেই মধুসূদনের এই গৃহ। তিনি "দুই চারি পদক্ষেপেই" অফিসে গিয়ে পৌঁছতেন। (Walked in a trice to his

office.) এই গৃহে এসেই তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয়েছে, তাঁর শক্তির বিকাশ এই গৃহেই। এই গৃহ বঙ্গ সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্র।

১৮৬২ সালে ব্যারিষ্টার হবার জন্যে মধুসুদন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেই সময়ই এই গৃহের সঙ্গে তার বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁর প্রতিভাও যেন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই গৃহ মধুসূদনের জীবনে এসেছিল একটি পরম আশীর্বাদরূপে। এই গৃহ একটি স্মরণীয় কীর্তি মন্দির ও স্মৃতিসৌধ।

৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের দ্বিতল থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলাম। মনে হল, যেন নির্বাসিত হলাম একটি পবিত্র পীঠস্থান থেকে ; মঞ্জুগুঞ্জরণে ঐ গৃহটিকে সান্ত্বনা দিয়ে যেন বেজে উঠল একটি কণ্ঠস্বর :

'মধু—যার মধুধ্বনি কহে কেন কাঁদ ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন ?'

মধুসূদনের এই বাসগৃহটির গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না। সেই জন্যে সে সম্বন্ধেও সামান্য দু-একটি কথা এই সুযোগে লেখা গেল। তাঁর রচনাও যেমন ভারতীয়-সম্পদ, এই গৃহটিও তেমনি জাতীয়-সম্পদ রূপে গণ্য করা হোক—বাংলাদেশের সাহিত্যিকবৃন্দ এই রকম উদ্যোগ করেছিলেন। কাজও অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে ওঠেনি। (এ বিষয়ে বিস্তারিতভাবে 'ধ্রুপদী' পত্রিকার ১৩৭৩ সাল সংখ্যায় সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে)। ভবিষ্যতে যদি কেউ এই আরব্ধ কাজটি সুসম্পন্ন করতে পারেন তাহলে তিনি একটি জাতীয়-কর্তব্য পালন করবেন।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত—কবি। জন্ম—১৮২৪ খৃঃ ; ২৫ শে জানুয়ারী যশোহর কপোতাক্ষ নদীর তীরে সাগরদাঁড়ী গ্রামে। পিতা রাজনারায়ণ দত্ত, মাতা জাহ্নবী দেবী। শিক্ষা—হিন্দু কলেজের জুনিয়র পরীক্ষা (১৮৩৩), সিনিয়র পরীক্ষা (১৮৪১), খৃষ্টধর্ম গ্রহণ (১৮৪৩, ৯ই মে), বিশপ কলেজ (১৮৪৪)। কর্ম—ইংরাজী অধ্যাপক. মাদ্রাজ মেল অরফ্যান এ্যাসইলাম (১৮৪৮)। প্রথম বিবহ—রেবেকা ম্যাক্টাভিস (১৮৪৯), দ্বিতীয় বিবাহ—হেনরিয়েটা (১৮৫৫)। প্রথম কাব্য রচনা—Captive Ladie (১৮৪৯, এপ্রিল)। সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্ম—Madras Circulator & General Chronicle Athenaeum, Spectator. প্রধান সম্পাদক—Athenaeum (কিছুদিন)। প্রকাশক ও সম্পাদক—Hindu Chronicle (১৮৫১)। সম্পাদক—Hindu Patriot (১৮৬২)। শিক্ষক Madras University High School Dept. (১৮৪৯—৫৬)। মাদ্রাজ হইতে কলিকাতা প্রত্যাবর্তন (১৮৫৬), পুলিশ কোর্টে চাকুরী লাভ (১৮৫৬), এবং সদর আইন পরীক্ষা। কিছুকাল পুলিশ কোর্টের Interpreter, পিতৃ-সম্পত্তি উদ্ধার, বৈষয়িক ব্যবস্থা ও ইউরোপ যাত্রা (১৮৬২ , ৯ই জুন), ব্যারিষ্টারী

পরীক্ষায় সাফল্য (১৮৬৬; ১৭ই নভেম্বর), স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও আইন ব্যবসায় (১৮৬৭-৭০), কলিকাতা হাইকোর্টে চাকুরী—অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষকের পদ (১৮৭০), দুই বৎসর পর পুনরায় ব্যারিষ্টারী। পঞ্চকোটের আইন উপদেষ্টা (১৮৭২)। গ্রন্থ শর্মিষ্ঠা নাটক (১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা ? (১৮৬০), বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০), তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য, ১ম (১৮৬১), ২য় (ঐ) ব্রজাঙ্গনা কাব্য (১৮৬১), কৃষ্ণকুমারী নাটক (১৮৬১), বীরাঙ্গনা কাব্য (১৮৬২), চতুর্দশপদী কবিতাবলী (১৮৬৬), হেক্টর বধ (১৮৭১), মায়াকানন (১৮৭৪), The Captive Ladie (১৮৪৯), The Anglo Saxon & The Hindu (মাদ্রাজ, ১৮৫৪), Ratnavali (১৮৫৮), Sermistha (১৮৫৯), Nildarpan or The Indigo Planting Mirror.

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)

প্রমথনাথ বিশী

অত্যুচ্চ গিরিমালাকে দেশের জলবিভাজন রেখা বলা হয়। হিমালয় ভারতবর্ষের জলবিভাজন রেখা। হিমালয়ের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ সমূহে বাধাপ্রাপ্ত জলধর মেঘ দক্ষিণ বৃষ্টিরূপে পতিত হয়. উত্তর দিকে যায় না। তার ফলে হিমালয়ের দক্ষিণে ও উত্তর ভূপ্রকৃতির ভিন্ন রূপ ; দক্ষিণাঞ্চল উর্বর ও শ্যামল, উত্তরাঞ্চল শুষ্ক ও কঠিন ; একদিকে গাঙ্গেয় উপত্যকা, অন্য দিকে তিব্বতের মালভূমি। লেখক সম্বন্ধেও এই রূপক প্রযোজ্য হতে পারে। বিদেশী সাহিত্যরথীগণের মধ্যে আপাতত মহাকবি গ্যয়টের নামোল্লেখ করলেই চলবে। ১৭৮৭-৮৯ সালে ইটালী ভ্রমণের ফলে তাঁর মনে ও শিল্প ধারণায় যে পরিবর্তন ঘটে তাকে গ্যয়টে জীবনের জলবিভাজন রেখা বলা চলে। ইটালী ভ্রমণের আগে ও পরে রচিত সাহিত্যে গুরুতর প্রভেদ দেখা যায় ; সে প্রভেদ গাঙ্গেয় উপত্যকা ও তিব্বতের মালভূমির ন্যায় উর্বর ও অনুর্বর না হতে পারে, তবে তাদের প্রকৃতি এক নয়। জলবিভাজন রেখাই তার কারণ।

রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন যে. বারে বারে ঋতু পরিবর্তনের পালা ঘটেছে তাঁর কাব্যে। এখন, ঋতু পরিবর্তন স্বভাবের নিয়মে ঘটে, তার মধ্যে একটা নিয়ম খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। ঋতুভেদে ফসলের ভেদ অনিবার্য। এ সব পরিবর্তনকে জলবিভাজন রেখা বল উচিত হবে না। যে বিরাট পরিবর্তনকে তাঁর কাব্য মহাদেশের জলবিভাজন রেখা বলা যেতে পারে যে গ্যয়টের ইটালী ভ্রমণের মতো তা একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথের ১৯১২-১৩ সালে পাশ্চাত্ত্য গোলার্ধ ভ্রমণজনিত অভিজ্ঞতা রবীন্দ্র কাব্যের সুনিশ্চিত জলবিভাজন রেখা। এই রেখার দুদিকের ভূপ্রকৃতি স্বতন্ত্র। গীতাঞ্জলি ও বলাকার আবহাওয়া এক নয়।

এখন জিজ্ঞাস্য বঙ্কিম সাহিত্যে এ রকম কোন জলবিভাজন রেখা আছে যার ফলে ও যার দুদিকে ভূপ্রকৃতি ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে? আমার বিশ্বাস, আছে। কমলাকান্তের দপ্তর বঙ্কিম সাহিত্যের সেই জলবিভাজন রেখা। বিষয়টাকে আরও একটু পরিষ্কার করে বলা উচিত। জলবিভাজন

রেখা বলতে একটি মাত্র অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গকে বোঝায় না ; বোঝায় অত্যুচ্চ শৃঙ্গ বিশিষ্ট গিরিমালাকে। সেই গিরিমালার একটি অত্যুচ্চ শিখর কমলাকান্তের দপ্তর। উচ্চতম কি না জানি না তবে বিখ্যাততম। লোকরহস্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি, সাম্য. কৃষ্ণচরিত্র এবং ধর্মতত্ত্ব বা অনুশীলন প্রভৃতি বহু শিখর সমন্বিত গিরিমালা বঙ্গদর্শনরূপ শিরদাঁড়াকে অনুসরণ করে বঙ্কিম পৃথিবীর মানদণ্ডের মতো পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। এই গিরিপ্রাচীরে কল্পনার জলধরমালা অল্পবিস্তর বাধাপ্রাপ্ত, নিম্নতর শৃঙ্গে অল্প, উচ্চতর শৃঙ্গে বিস্তর ; কমলাকান্তের দপ্তরে বিস্তরতম। সাম্য, লোকরহস্য ও ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলির স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেননা, এসব রচনায় প্রকাশিত ভাব ও বিষয়ের সব সমাহার ঘটেছে কমাকান্তের দপ্তরে। সংক্ষেপে বললে অন্যায় হয় না যে, কমলাকান্তের দপ্তরের পূর্বে বা সমকালে লিখিত যাবতীয় প্রবন্ধাদির সার যে কমলাকান্তের দপ্তরে নিক্ষিপ্ত। পরবর্তী কালে লিখিত কৃষ্ণ চরিত্র ও অনুশীলনের প্রেরণা ও বিষয় কিছু স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্রের রহস্যভেদ করতে পারলে সাম্য গ্রন্থ পুনর্মুদ্রণে বঙ্কিমের অনিচ্ছার কারণ বুঝতে পারা যাবে। মূল সাম্য গ্রন্থভুক্ত বঙ্গদেশের কৃষক বিস্তারিত আকারে পরবর্তী কালে লেখক প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সাম্য গ্রন্থের তত্ত্বাংশকে আর তিনি প্রকাশযোগ্য মনে করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জগতে সাম্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাতা তিনজন মহাপুরুষ : শাক্য সিংহ, যীশু ও রুসো। সাম্য গ্রন্থের অন্তর্গত স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতা পরিচ্ছেদের প্রেরণাদাতা জন স্টুয়ার্ট মিল। পরবর্তীকালে ঐ তিন মহাপুরুষের গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর সংশয় জন্মেছে ; রুসোকে তিনি একেবারেই পরিত্যাগ করেছেন ; শাক্য সিংহ ও যীশুর গুরুত্বও হ্রাস পেয়েছে ; নূতন অভ্যুদয় ঘটেছে শ্রীকৃষ্ণের। মিলের বদলে গীতা ; যীশু ও বুদ্ধের বাণীর বদলে মহাভারত, সর্বোপরি শ্রীকৃষ্ণ। সাম্যের সাম্যতত্ত্ব বারো আনা রকম ইউরোপীয় ; গীতা, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব এ অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে। এই তিনের প্রেরণায় পরবর্তী জীবনে সাম্যের স্থলে এসেছে ধর্ম বা অনুশীলন। ধর্ম পূর্ণতর, সাম্য একাংশমাত্র। এখানে আমরা সাম্য গ্রন্থের আলোচনায় নিযুক্ত নই, কাজেই বিস্তারিত ব্যাখ্যা অনাবশ্যক, কেবল প্রসঙ্গে এসে পড়েছি মাত্র। সে প্রসঙ্গে কমলাকান্তের দপ্তরের জলবিভাজন দায়িত্ব।

জলবিভাজন রেখার একদিকে দুর্গেশনন্দিনী থেকে কৃষ্ণকান্তের উইল; অন্য দিকে আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরানী ও সীতারাম। এ দুই শ্রেণীর উপন্যাসের প্রকৃতিভেদ সহজেই চোখে পড়ে, যদিচ ভেদের স্বরূপ ও কারণ সব সময়ে চোখে পড়ে না। সেই কারণটা যথাসাধ্য এখানে বিবৃত করে স্বরূপের আলোচনা যথাস্থানের জন্য রেখে দেব। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে আনন্দমঠ প্রভৃতি তিনখানি মাত্র উপন্যাসের উল্লেখ করলাম কেন, পরিবর্ধিত ইন্দিরা ও রাজসিংহ অনুল্লিখিত থাকলো কেন? এ আলোচনাও যথাস্থানের জন্য রেখে দিয়ে এখানে আভাসে এইটুকু মাত্র বলা যেতে পারে যে, এ দুখানি উপন্যাসে কমলাকান্ত পূর্ব এবং কমলাকান্ত উত্তর দুই ধারার, বিশ্বাসের ও শিল্পরীতির মিলন ঘটেছে। জলবিভাজন রেখার প্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্প রীতি ও ধারণায় যে পার্থক্য ঘটলো, সে আলোচনায় নামবার আগে জলবিভাজন রেখার গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা আবশ্যক।

বর্তমানে যে গ্রন্থ কমলাকান্তের দপ্তরে বা কমলাকান্ত নামে প্রচলিত তা বিভিন্ন সময়ে লিখিত অনেক পর্যায়ের রচনার সমাহার। প্রথম ও প্রধান অংশ কমলাকান্তের দপ্তর, ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৫ সালের মধ্যে বঙ্গ-দর্শনে প্রকাশিত হয়েছিল। পুনঃপ্রকাশিত বঙ্গদর্শনে কমলাকান্ত রচিত তিনটি রচনা, গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে তিনটি ভেঙে চারটি রচনা প্রকাশিত হয়। এ ১৮৭৭-৭৮ সালের কথা। ১৮৮২ সালে ঢেঁকি ও কাকাতুয়া নামে নিবন্ধ দুটি বঙ্গদর্শনে অস্থপ্রকাশ করে। আর অবশেষে কমলাকান্তের জোবানবন্দী, এ-ও ১৮৮২ সালের কথা। ১৮৮৫ (?) সালে সমগ্র পর্যায় দপ্তর, পত্র ও জবানবন্দী কমলাকান্ত নামধারণ করে। কাজেই কমলাকান্ত নিবন্ধগুলির রচনা বা প্রকাশকাল ১৮৭২ থেকে ১৮৮২ সাল। এই দশ বছর কালের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তার ইতিহাসে যে উত্থানপতন ও বিবর্তন ঘটেছে কমলাকান্তকে তার খসড়া বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

দপ্তর অংশে প্রকাশিত চন্দ্রালোকে, স্ত্রীলোকের রূপ ও মশক অপরের রচনা, শেষোক্তটি দপ্তর গ্রন্থে স্থান পায় নি; প্রথম দুটি সে গৌরব লাভ করলেও আমরা তাদের আলোচনা করবো না। কমলাকান্তের পত্রাংশে কি লিখব? পলিটিক্স এবং বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব নামে নিবন্ধত্রয় কমলাকান্ত ব্যক্তিত্বের বিভূতিমণ্ডিত। কিন্তু বুড়ো বয়সের কথা ও কমলাকান্তের বিদায়

সর্বাংশে কমলাকান্তের ব্যক্তিত্বমণ্ডিত বলে মনে হয় না। লেখক বলেছেন, "বুড়ো বয়সের কথা যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নাম যুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও কমলাকান্তের পত্র মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি।" শেষোক্ত রচনা দুটিতে কমলাকান্ত ব্যক্তিত্বের আংশিক গুণ মাত্র আছে; সেই অনবদ্য ভাষাভঙ্গী, সেই হাসি-কান্নার দোয়োখা দৃষ্টি কমলাকান্তের রচনায় যা নাকি অপরিহার্য গুণ অবশ্যই তার অভাব নাই। কিন্তু কমলাকান্তের চিরন্তন আশাবাদ এখানে কোথায়? সায়াহ্নের নৈরাশ্যের ছায়ায়, নৈশবিষাদের আভাসে রচনা দুটি ম্লান কেন?

"ভাল হউক বা না হউক, প্রাচীনের জন্য উপায় নাই। তোমার তরঙ্গিনী হেমাঙ্গিনী সুরঙ্গিণী কুরঙ্গিণী বল, আর আমার দিকে ঘেঁষিবে না। তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফুয়ারবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না। তোমার দর্শন, বিজ্ঞান, সকলই অসার—সকলই অন্ধের মৃগয়া। আজিকার বর্ষার দুর্দিনে, আজি এ কাল রাত্রির শেষ কুলগ্নে, এ নক্ষত্রহীন অমাবস্যার নিশির মেঘাগমে, আমায় কে রাখিবে? এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখর বাহিনী বৈতারণীর আবর্তভীষণ উপকূলে, এ দুস্তর পারাপারের প্রথম তরঙ্গমালার প্রঘাতে, আর আমায় কে রক্ষা করিবে? অতিবেগে প্রবল বাতাস বহিতেছে, অন্ধকার প্রভো! চারি দিকেই অন্ধকার! আমার এ ক্ষুদ্রভেলা দুষ্কৃতির ভরে বড় ভারি হইয়াছে। আমায় কে রক্ষা করিবে?"

এ কি দপ্তরের কমলাকান্ত? "প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী, ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণ এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত। অনন্ত কাল সেই মহা সঙ্গীত সহিব মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।"

এ দুই কি এক ব্যক্তির মুখনিঃসৃত? প্রীতি যার কাছে ঈশ্বর স্বরূপ, মনুষ্য স্বরূপ তার নৈরাশ্যের তো হেতু নাই। তবে এমন পরিবর্তন কেন? দপ্তরের পরস্মৈপদী কমলাকান্ত পত্রে এমন আত্মনেপদী হতে গেল কেন? কমলাকান্তে বিদায় শীর্ষকে এ প্রভেদ আরও প্রকট। "সত্য বটে, আমি তখনও একা, এখনও একা, কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র, এখন আমি একায় আধখানা।" "একায় এক সহস্র আর একায় আধখানা।" এই প্রভেদকেই পরস্মৈপদী ও আত্মনেপদী বলে উল্লেখ করেছি। এই প্রভেদের দুটি কারণ অনুমান করি। লিখিতে আরম্ভ করবার সময়ে

কমলাকান্ত ব্যক্তিত্বকে আলগোছে মাত্র আরোপ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, তাই এখনে কমলাকান্তের কলম আছে, অন্তরটি নাই। কিন্তু আসল কারণ গভীরতর। ১৮৭২ সালের পরে দশ বছরের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটেছে; সাম্যের অন্যতম জনক রুসো বিদায় নিয়েছে, স্ত্রী স্বাধীনতার মিলন বিদায় নিয়েছে: "তোমার মিল, কোমত, স্পেন্সর, ফুয়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না।" দশ বছরের মধ্যে রুসো, মিল কোমত প্রভৃতি নক্ষত্র অস্তমিত, তার বদলে আকাশ ভাস্বর করে উদিত, গীতা, মহাভারত, শ্রীকৃষ্ণ। প্রভেদের হেতু আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে যদি হিসাব করে দেখি যে, সাম্য ও দপ্তর সমকালীন রচনা আর আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরাণীর সমকালীন পত্র দু'খানি। কমলাকান্তের হয়তো পরিবর্তন হয় নি, অন্তত পরিবর্তন হওয়া উচিত নয়; তবে কমলাকান্ত স্রষ্টার পরিবর্তন ঘটেছে, সেই পরিবর্তন প্রতিফলিত কমলাকান্তের চরিত্রে। কমলাকান্ত যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিকল্প ব্যক্তিত্ব এ তার একটি অতিরিক্ত প্রমাণ।

অবশ্য জোবানবন্দীতে কমলাকান্তের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ প্রকট, তার হাস্যরস, ভাষাভঙ্গী ফিলজফি মায় তার মুদ্রাদোষগুলি সমস্তই হৃদয়গ্রাহীভাবে দেদীপ্যমান।

কমলাকান্ত বলিল, "পূর্বকালে মহারাজ শোনজিৎকে এক ব্রাহ্মণ বলিয়াছিল যে, বৎস, গোপস্বামী ও তস্কর ইহাদের মধ্যে যে ধেনুর দুগ্ধপান করে, সেই তাহার যথার্থ অধিকারী। অন্যের তাহার উপর মমতা প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই হল ভীষ্মদেব ঠাকুরের Hindu Law, আর ইহাই এখনকার ইউরোপের International Law। যদি সভ্য ও উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে। গো শব্দে ধেনুই বুঝ আর পৃথিবীই বুঝ, ইনি তস্কর, ভোগ্যা সেকেন্দার হইতে রণজিৎ সিংহ পর্যন্ত সকল তস্করই ইহার প্রমাণ। Right of Conquest যদি একটা Right হয় তবে Right of theft কি একটা Right নয়? অতএব হে প্রসন্ন, গোপকন্যে। তুমি আইন মতে কার্য করো। ঐতিহাসিক রাজনীতির অনুবর্তী হও। চোরকে গোরু ছাড়িয়া দাও।"

কমলাকান্তের ব্যক্তিত্ব সর্বাংশে অক্ষুণ্ণ আছে, তাকে অন্য ব্যক্তি বলে ভুল করবার উপায় কী? কৃষ্ণকান্ত রায় মৃত্যুকালে বললে বলতে পারতো,

"এ ভবনদীর তপ্ত সৈকতে, প্রখর বাহিনী বৈতরণীর আবর্ত ভীষণ উপকূলে" ইত্যাদি, কিন্তু অদ্যাবধি বঙ্গদেশে এমন দ্বিতীয় কেহ জন্মগ্রহন করে নি, যে জোবানবন্দীর উক্তগুলি করবে? এ উক্তি একমাত্র তাতেই সম্ভব যে কমলাকান্ত বিড়াল নিবন্ধ রচনা করেছে, একমাত্র তাতেই সম্ভব যে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য বঙ্গদেশের কৃষক, রামধনপোদ প্রভৃতি রচনা করেছেন। এ দুই ব্যক্তির সমত্বের এ আরও একটা অতিরিক্ত প্রমাণ।

১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন প্রকাশের কিছু পরে কমলাকান্তের দপ্তর নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে। মাঝে বৎসর কাল বন্ধ থেকে বঙ্গ দর্শন পুনঃপ্রকাশিত হলে আবার কমলাকান্তের রচনা আত্মপ্রকাশ করে। বস্তুত বঙ্গদর্শন পত্র এবং কমলাকান্তের রচনা (দপ্তর, পত্র ও জোবানবন্দী) সমান্তরাল ধারায় চলে। কালক্রমে বঙ্গদর্শনের চিন্তাধারায় যে প্রভেদ ঘটেছে সেই প্রভেদ কমলাকান্ত প্রতিফলিত, কারণ এ দুয়েরই মূলে বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্ত অভিন্ন।

বঙ্গদর্শন প্রকাশকালে ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালীর উপরে বেন্থাম, মিল, কোমত প্রভৃতির প্রবল প্রভাব। বাংলাদেশে ইংরেজী শিক্ষার প্রভাবের ইতিহাস পর্যালোচনা বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। এদেশে পাদ্রীগণ শত চেষ্টা করেও কাউকে ইংরাজী শেখাতে বা খ্রীষ্টান করতে পারে নি, কিম্বা সে কৃতিত্ব এমন অকিঞ্চিৎকর যে আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। বরঞ্চ অনেক সময়ে উল্টো প্রতিক্রিয়া ঘটেছে। কেরী সাহেব এদেশের কাউকে ইংরাজী শেখাতে না পেরে নিজে বাংলা শিখতে বাধ্য হলেন।

ইংরাজী শেখাবার দ্বিতীয় চেষ্টা হয়েছে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা, কিম্বা তাদের চেষ্টাকেই প্রথম বলা উচিত, পাদ্রীদের চেষ্টা তার পরে। এ প্রচেষ্টা কতকগুলি ইংরেজী শব্দ মুখস্থ করায় সীমাবদ্ধ ছিল—যার কৌতুকজনক বিবরণ পাওয়া যাবে রাজনারায়ণ বসু রচিত 'একাল আর সেকাল' গ্রন্থে। ইংরাজী শিক্ষার তৃতীয় চেষ্টা আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করলো, এর মূলে রামমোহন' প্রভৃতি ভারতীয় এবং হেয়ার প্রমুখ ইংরেজ। এ'রা কেউ পাদ্রী বা ব্যবসায়ী নন। হেয়ারের ঘড়ির ব্যবসা সত্ত্বেও তাকে "ব্যবসায়ী" গণ্য করা উচিত হবে না; ধর্মের ও অর্থের টানে যা সম্ভব হয় নি, সাহিত্যের ও আইডিয়ার টানে তা এমন সফল হল যে দেখতে দেখতে এক প্রজন্ম কালের মধ্যে মরা গাঙে বান এসে কূল

ছাপিয়ে গেল। মোটামুটি এই সময়টাকে ১৮১৭ থেকে ১৮৪০ পর্যন্ত ধরা যায়, তাহলেই কাছাকাছি পাওয়া যাবে, হেয়ারের মৃত্যু, মধুসূদনের খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ ও দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা। প্রথম দুটো এক দিকের হিসাব, শেষেরটা অন্য দিকের; একদিকে ইংরাজী শিক্ষার সাফল্য ও উন্মাদনা; অন্য দিকে দেশের শাস্ত্র সাহিত্য ঐতিহ্যের প্রতি শুভ আকর্ষণ। প্রত্যেক আন্দোলন নিজ দেহে বিপরীত আন্দোলনের বীজ বহন করে। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষার দ্বিতীয় প্রজন্মের ছাত্র।

প্রথম প্রজন্মের ছাত্রগণের উপরে সার্বভৌম প্রভাব ছিল ফরাসী বিপ্লবের বাণী। সে বাণী নাস্তিকের ও জ্ঞানকৈবল্যের। ইংরেজের রপ্তানী মালের সঙ্গে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ফরাসী বিপ্লবের বাণী কিঞ্চিৎ পরিমাণ ইঙ্গীভূত হয়ে বাঙালী ছাত্রদের কাছে এসে পৌঁছিল। এ বাণীতে কাউকে খ্রীষ্টান করে না; যদি কেউ খ্রীষ্টান হয়ে থাকে তবে তার কারণ ভিন্ন। পাদ্রীদের কাছে থেকে বাইবেল উপহার নিয়েছিল জানতে পেরে হেয়ার সাহেব বেত মেরেছিলেন ছাত্রদের। ডিরোজিও এবং রিচার্ডসনের পক্ষে কাউকে খ্রীষ্টান হতে বলা অসম্ভব, অবশ্য ভিন্ন কারণে। তবে যে মধুসূদন, কৃষ্ণমোহন জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রভৃতি অনেক মেধাবী ছাত্র ধর্মান্তর গ্রহণ করেছিল তার কারণ আলোচনাযোগ্য। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্বর্গের মধ্যে প্রথম দুটার আকর্ষণ যদি ব্যর্থ হয়ে থাকে তবু আরো দুটো হাতে থাকে। কৃষ্ণমোহন যদি পরিণত বয়সে ভক্ত খ্রীষ্টান হয়ে থাকেন তাতেই প্রমাণ হয় না যে ধর্মান্তর গ্রহণকালে তিনি খ্রীষ্টধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন, বড় জোর প্রমাণ হয় প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। সেকালের নাস্তিকের হাওয়ায় ছাত্ররা আপাদমস্তক অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল কি স্বধর্মে, কি পরধর্মে।

বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি ইংরাজী শিক্ষার দ্বিতীয় প্রজন্মের ছাত্র বলা যায়, তবে এই প্রজন্মের আবহাওয়ায় কিছু মিল, কিছু অমিল দেখতে পাওয়া যাবে। নাস্তিক কাটেনি, তবে বিশ্বাস করবার ইচ্ছা দেখা দিতে শুরু করেছে; ফরাসী বিপ্লবের বদলে এসেছে মিলের ডিমোক্রেসি; রুসো তখনো আছেন, তবে নিস্তেজ, কিছুদিনের মধ্যেই বিদায় নেবেন, মিল কোমতের আসনও বিচলিত; "তোমার মিল কোমত স্পেন্সর ফুয়রবাক মনোরঞ্জন করিতে পারে না।"

ইংরাজী শিক্ষার তৃতীয় প্রজন্মে বা ঐ যুগে গীতা ও মহাভারতের অভ্যুদয় ঘটলো। উপনিষদের অভ্যুদয় আগেই ঘটেছে রামমোহন ও দেবেন্দ্রনাথের কল্যাণে। গীতা ও মহাভারতের অভ্যুদয়ের কারণ অনেকটা যুগধর্ম, অনেকটা বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং। বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর চিন্তায় রবীন্দ্র-সাহিত্যে তো বটেই, উপনিষদের স্থায়ী আসন ক'রে দেবার কৃতিত্ব রবীন্দ্রনাথের। বর্তমান জগতের দুর্মোচ্য ও জটিল সমস্যা সমাধানে উপনিষদকে কষ্টিপাথররূপে ব্যবহার করেছেন রবীন্দ্রনাথ। সর্বক্ষেত্রে সমান সাফল্য লাভ সম্ভব হয়নি স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা চলে যে, উপনিষদকে ব্যবহারিক জীবনে নামিয়ে আনাবার ফলে তার উপরে নূতনভাবে আস্থা স্থাপন করেছে মানুষ আর তার পরিণামে আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে ব্যবধান কমে এসেছে।

গীতা সম্বন্ধে প্রায় অনুরূপ কাজ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। গীতা চিরকাল ভারতের আধ্যাত্মিক যাত্রাপথের ধ্রুবতারা। কিন্তু রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে গীতার গৌরবময় আসন করে দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। গীতা সাধুসন্ন্যাসী ও গৃহীদের পথপ্রদর্শক গ্রন্থ। গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়ার আগে কণ্ঠে বিরাজ করতো এই মহাগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র দেখালেন যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও গীতার প্রযোজ্যতা আছে। বঙ্কিম পরবর্তী কালে গীতা যে রাজনৈতিক নেতা ও কর্মিগণের পথপ্রদর্থক হ'য়ে উঠলো তা স্পষ্টত বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রভাবে। দেবী চৌধুরানীর প্রভাবে গীতা রাজনীতিকগণের Friend, Philosopher and Guide হ'য়ে উঠলো। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষায় গীতা যে নূতন মাত্রা বা Dimension লাভ করলো, তা আজও অব্যাহত আছে—যদিচ Marxism একটি চিন্তার সূত্রে পরিণত হওয়ার ফলে তার ব্যাপকতা হয়তো কিছু কমেছে। ভারতীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিমেয় দানের মধ্যে গীতাকে নূতন তাৎপর্যদান একটি প্রধান। অবশ্য মহাত্মা গান্ধীরও পথপ্রদর্শক গীতা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সাহায্য ছাড়াই তিনি গীতার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন। তবে এখানে গান্ধীজীর দৃষ্টান্ত অপ্রাসঙ্গিক, যেহেতু তিনি মূলত রাজনীতিক নন, সাধক। বঙ্কিমচন্দ্র সাধক নন ফিলজাফার বা শিক্ষাদাতা মাত্র। এর পরে ইংরাজী শিক্ষার চতুর্থ প্রজন্ম যুগ, যার প্রধান পুরুষ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কিন্তু এখানে সে প্রসঙ্গে প্রবেশ অনাবশ্যক। আমাদের বক্তব্য এই যে, বঙ্গদর্শন ও কমলাকান্ত

ইংরাজী শিক্ষার দ্বিতীয় ও তৃতীয় যুগের সন্ধিক্ষণের রচনা। সূচনায় তাঁর রুসো, কোমত, মিল; অন্তিমে গীতা, মহাভারত ও শ্রীকৃষ্ণ; সূচনায় সাম্যতত্ত্ব অন্তিমে ধর্মতত্ত্ব, অর্থাৎ অনুশীলন; রুসো থেকে শ্রীকৃষ্ণ সংক্রমণের চিহ্ন বক্ষে ধারণ ক'রে আছে বঙ্গদর্শন—কমলাকান্ত। এই কথাগুলি সম্বন্ধে অবহিত হ'য়ে কমলাকান্ত আলোচনায় প্রবেশ করা অত্যাবশ্যক।

কমলাকান্তের দপ্তরের ভূমিকা বা মুখপত্ররূপে গ্রহণ করা উচিত একা নিবন্ধটিকে।

"আমি একা, তাই এই সংগীতে আমার শরীর কণ্টকিত হইল। এই বহু জনাকীর্ণ নগরী মধ্যে, এই আনন্দময়, অনন্ত জনস্রোত মধ্যে, আমি একা। আমিও কেন ঐ অনন্ত জনস্রোত মধ্যে মিশিয়া এই বিশাল আনন্দ তরঙ্গতাড়িত জলবুদ্বুদসমূহের মধ্যে আর একটি বুদ্বুদ না হই? বিন্দু বিন্দু বারি লইয়া সমুদ্র; আমি বারিবিন্দু এ সমুদ্রে মিশাই না কেন?··· কেহ একা থাকিও না।··· পরের জন্য তোমার হৃদয়-কুসুমকে প্রস্ফুটিত করিও।" এই চিন্তাধারার পরিণামে—"সে গায়কেরা আর নাই, সে বয়স নাই, সে আশা নাই। কিন্তু তৎপরিবর্তে যাহা শুনিতেছি, তাহা অধিকতর প্রীতিকর। অনন্যসহায় একমাত্র গীতধ্বনিতে আমার কর্ণবিবর পরিপূরিত হইতেছে। প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী, ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সঙ্গীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য-হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্য জাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।"

এ ১৮৭৩ সালের কথা। ১৮৭৮ সালে যখন কমলাকান্ত বিদায় প্রার্থনা করে তখন এ ভাবের আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। তখন—"সত্য বটে, আমি তখনও একা, এখনও একা, কিন্তু তখন আমি একায় এক সহস্র, এখন আমি একায় আধখানা। তখন কমলাকান্ত বারিবিন্দু অনন্তসমুদ্রের অঙ্গীভূত ছিল, তখন নিঃসঙ্গ বারিবিন্দুরূপে সন্তপাতিতার মুখে নিরন্তর টলমল করে। আমার মন নিবন্ধেও ঐ একই কথা, একাকিত্বের দুঃখ। "পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নাই।" বারিবিন্দুর একমাত্র সুখ ও পরমগতি অনন্ত সমুদ্রের অঙ্গীভূত হওয়া। অন্য কোন সুখ নাই, অন্য কোন গতি নাই। সুখের অভ্রান্ত পথ কমলাকান্ত জানে। কিন্তু মানুষ তা বোঝে না, সুখের অন্য পথ আবিষ্কার করেছে বলে তার ধারণা। "ইংরেজী

শাসন ইংরেজী সভ্যতা ও ইংরেজী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মেটিরিয়েল প্রস্পারিটির উপর অনুরাগ আসিয়া দেশ উৎসন্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরেজ জাতি বাহ্যসম্পদ বড় ভালবাসেন, ইংরেজি সভ্যতার একটি প্রধান চিহ্ন, তাহারা আসিয়া এ দেশের বাহ্য সম্পদ সাধনেই নিযুক্ত, আমরা তাহাই ভালবাসিয়া আর সকল বিস্মৃত হইয়াছি। ভারতবর্ষের অন্যান্য দেবমূর্তিসকল মন্দিরচ্যুত হইয়াছে, সিন্ধু হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত কেবল বাহ্যসম্পদের পূজা আরম্ভ হইয়াছে। দেখ, কত বাণিজ্য বাড়িতেছে, দেখ, কেমন রেলওয়েতে জাল-নিবদ্ধ হইয়া উঠিল, দেখিতেছি, টেলিগ্রাম কেমন বস্তু! দেখিতেছি, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে, তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? তবে তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফ প্রভৃতি উপাড়িয়া জলে ফেলিয়া দাও, কমলাকান্ত শর্মা তাতে ক্ষতি বিবেচনা করিবেন না।"

বাহ্যসম্পদ সাধনার এ গেল চাঁদের পূর্ণিমার পিঠ; ইউটিলিটি বা উদর-দর্শন নিবন্ধটি পূর্ণিমা চাঁদের পূর্ণ প্রকট কলঙ্ক; কিন্তু এটুকু কালোই সব নয়, আছে পূর্ণিমা চাঁদের অপর পিঠের চিরতমিস্রা। বঙ্গদেশের কৃষক, রামধন পোদ প্রভৃতি প্রবন্ধে আছে বাহ্যসম্পদ সাধনার সেই ফাঁকির দিকটা। দপ্তরের বিড়াল নিবন্ধটি এ বিষয়ের ঘনীভূত ক্ষীর। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য যে আজ অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে যায়নি, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে দেশের মানুষের এক বিপুল অংশের মনোভাব তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কি ইংরেজী কি বাংলা, যে সংবাদপত্র, সাময়িক-পত্র, স্পীচ, ডিবেট লেকচর, যাহা কিছু পড়ি বা শুনি, তাহাতে এই বাহ্যসম্পদ ভিন্ন আর কোন বিষয়ের কোন কথা দেখিতে পাই না। হর হর বম্ বম্। বাহ্যসম্পদের পূজা কর। হর হর বম্ বম্। টাকার রাশির উপর টাকা ঢাল। টাকা ভক্তি, টাকা মুক্তি, টাকা নতি, টাকা গতি। টাকা ধর্ম, টাকা অর্থ, টাকা কাম, টাকা মোক্ষ। ও পথে যাইও না, দেশের টাকা কমিবে ও পথে যাও, দেশের টাকা বাড়িবে। বম্ বম্ হর হর। টাকা বাড়াও টাকা বাড়াও রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, অর্থ প্রসূতি ও মন্দিরে প্রণাম কর। যাতে টাকা বাড়ে, এমন কর; শূন্য হইতে টাকা বৃষ্টি হইতে থাকুক। টাকার ঝনঝনিতে ভারতবর্ষ পূরিয়া যাউক। মন! মন আবার কি? টাকা ছাড়া মন কি? টাকা ছাড়া আমাদের মন নাই; টাঁকশালে আমাদের মন ভাঙ্গে গড়ে। টাকাই বাহ্যসম্পদ। হর হর বম্ বম্! বাহ্যসম্পদের পূজা কর। এ পূজার তাম্রশ্মশ্রুধারী ইংরেজ নামে

ঋষিগণ পুরোহিত; এভান্ স্মিথ পুরান এবং মিল তন্ত্র হইতে এ পূজার মন্ত্র পড়িতে হয়; এ উৎসবে ইংরেজী সংবাদপত্রসকল ঢাক-ঢোল, বাংলা সংবাদ-পত্র কাঁসিদার: শিক্ষা এবং উৎসাহ ইহাতে নৈবেদ্য, এবং হৃদয় ইহাতে ছাগ-বলি। এ পূজার ফল, ইহলোকে ও পরলোকে অনন্ত নরক। তবে আইস, সবে মিলিয়া বাহ্যসম্পদের পূজা করি। আইস যশোগঙ্গার জলে ধৌত করিয়া বঞ্চনা-বিল্বদলে মিষ্টকথা-চন্দন মাখাইয়া এই মহাদেবের পূজা করি। বল হর হর বম্ বম্। বাহ্যসম্পদের পূজা করি। বাজা ভাই ঢাক-ঢোল —ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড় ছ্যাড়! বাজা ভাই কাঁসিদার— ট্যাং ট্যাং ট্যাং নাট্যাং নাট্যাং। আসুন পুরোহিত মহাশয়। মন্ত্র বলুন। আমাদের এই বহুকালের পুরাতন ঘৃতটুকু লইয়া স্বধা স্বাহা করিয়া আগুনে ঢালুন। কোথা ভাই ইউটেলিটেরিয়ান কামার। পাঁঠা হাড়িকাটে ফেলিয়াছি। একবার বাবা পঞ্চানন্দের নাম করিয়া, এক কোপে পাচার কর। হর হর বম্ বম্। কমলাকান্ত দাঁড়াইয়া আছে, মুড়িটি দিও। তোমরা স্বচ্ছন্দে পূজা কর।"

এতো আজকার দিনে দেশের বাস্তব অবস্থার ও মনোভাবের অবিকল চিত্র। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কল্যাণে একদল লোক সাধু অসাধু উপায়ে টাকা কামাচ্ছে, অন্য একদল লোকে তেমনি সুবিধা করতে পারছে না বলে বুক চাপড়ে সব খেয়ে ফেলল বলে শোরগোল তুলেছে আর অধিকাংশ লোক তণ্ডুলেন্ধন চেষ্টায় এমনি বিব্রত যে ব্যাপারটা কি হচ্ছে বুঝতে না পারায় হতবুদ্ধি। একই সঙ্গে বিপুল অর্থাগম ও অর্থাভাব, উল্লাস ও হাহাকার, আশা ও নৈরাশ্য। বাহ্য দেবতার ষোড়শপচার পূজার আড়ম্বরে অন্তর্দেবতা অন্তর্হিতপ্রায়।

বিড়াল নিবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যতত্ত্ব স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশিত। সমসাময়িক অন্যান্য রচনায় যা বিক্ষিপ্ত রূপে ও তত্ত্বরূপে প্রকাশিত বিড়াল নিবন্ধে সে সব ঘনীভূত এবং কমলাকান্ত ও বিড়ালের রক্ত-মাংশে সজীব।

"দেখ, আমি চোর বটে, কিন্তু আমি কি সাধ করিয়া চোর হইয়াছি? খাইতে পাইলে কে চোর হয়? দেখ যাঁহারা বড় বড় সাধু, চোরের নামে শিহরিয়া উঠেন, তাঁহারা অনেক চোর অপেক্ষা ও অধার্মিক।...তাঁহাদের প্রয়োজনাতীত ধন থাকিতেও চোরোর প্রতি যে মুখ তুলিয়া চাহেন না, ইহাতেই চোরে চুরি করে। অধর্ম চোরের নহে, চোরে যে চুরি করে, সে

অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শত গুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়; চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন? ...তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্য জাতীর রোগ. দরিদ্রের ক্ষুধা কেহ বোঝে না।...এ পৃথিবীর মৎস্য মাংসে আমাদের কিছু অধিকার আছে। খাইতে দাও, নহিলে চুরি করিব।...পাঁচশত দরিদ্রকে বঞ্চিত করিয়া একজনে পাঁচ শত লোকের আহার্য সংগ্রহ করিবে কেন?"

বিড়ালের যুক্তি শুনে কমলাকান্ত বলল, তোমার কথাগুলি ভারি সোশিয়ালিস্টিক। সমাজ বিশৃঙ্খলার মূল! যদি যাহার যত ক্ষমতা, সে তত ধন সঞ্চয় করিতে না পায়, অথবা সঞ্চয় করিয়া চোরের জ্বালায় নির্বিঘ্নে ভোগ করিতে না পায়, তবে কেহ আর ধন সঞ্চয়ে যত্ন করিবে না। তাহাতে সমাজের ধনবৃদ্ধি হইবে না।

মার্জার বলিল, না হইল তো আমার কি? সমাজের ধনবৃদ্ধির অর্থ ধনীর ধনবৃদ্ধি ধনীর ধনবৃদ্ধি না হইলে দরিদ্রের কি ক্ষতি?"

সাম্য গ্রন্থের নিম্নোক্ত উক্তিগুলি বিড়ালের উক্তির ভাষান্তর ছাড়া আর কিছুই নয়, "আর তুমি বড়লোক নহ তুমি সরিয়া দাঁড়াও, এ পৃথিবীর ভাল সামগ্রী কিছুই তোমার জন্য নয়। কেবল এই তীব্রঘাতী লোলায়মান বেত্র তোমার জন্য, বড়লোকের চিত্তরঞ্জনার্থ তোমার পৃষ্ঠের সঙ্গে মধ্যে মধ্যে ইহার আলাপ হইবে।" "অতএব পৃথিবীর সুখে তোমার যে অধিকার, নীচকুলোৎপন্নেরও সেই অধিকার। তাহার সুখের বিঘ্নকারী হইও না, মনে থাকে যেন, সেও তোমার ভাই, তোমার সমকক্ষ।···যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করিতেছেন পরাণ মণ্ডলও তাহার ন্যায়সঙ্গত অধিকারী।" এ বিবেকানন্দের বিখ্যাত উক্তির পূর্ব প্রতিধ্বনি।

"যে বসুন্ধরা কাহারও নহে, তাহা ভূমধ্যকারিবর্গ বণ্টন করিয়া লওয়াতে কি ফল ফলিতেছে, তাহা কিছু বলিতে হইল।"

বঙ্গদেশের কৃষক প্রবন্ধে—"দেশের মঙ্গল, কাহার মঙ্গল? তোমার আমার মঙ্গল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ, দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিজীবী। যেখানে তাহাদের মঙ্গল নাই, সেখানে দেশের কোন মঙ্গল নাই।"

"আমরা দেখাইলাম যে, দেশের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। অসাধারণ

কৃষিলক্ষ্মী দেশের প্রতি সুপ্রসন্না। তাঁহার কৃপায় অর্থ-বর্ষণ হইতেছে। সেই অর্থ রাজা, ভূস্বামী, বণিক, মহাজন সকলেই কুড়াইতেছে। অতএব সেই শ্রীবৃদ্ধিতে রাজা, ভূস্বামী বণিক, মহাজন সকলেরই শ্রীবৃদ্ধি। কেবল কৃষকের শ্রীবৃদ্ধি নাই। সহস্র লোকের মধ্যে কেবল নয় শত নিরানব্বই জনের তাহাতে শ্রীবৃদ্ধি নাই।"

রামধন পোদ প্রবন্ধে—"শ্রমজীবী, সাধারণ দরিদ্র লোকের বাহুবলই দেশের বল।"

বঙ্গদর্শনের পত্রসূচনায়—"যদি শক্তিমন্ত ব্যক্তিরা অশক্তদিগের দুঃখে দুঃখী সুখে সুখী না হইল, তবে কে আর তাহাদিগকে উদ্ধার করিবে? আর যদি আপামর সাধারণ উন্নত না হইল তবে, যাঁহারা শক্তিমন্ত, তাঁহাদিগেরই উন্নতি কোথায়? এরূপ কখনো কোন দেশে হয় নাই যে, ইতর লোক চিরকাল এক অবস্থায় রহিল, ভদ্রলোকদিগের অবিরত শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল।"

বঙ্গদর্শনের পত্র সূচনায় একথা লিখবার তাৎপর্য অত্যন্ত স্পষ্ট। ভদ্র ও ইতরগণের ব্যবধান যে দেশের পক্ষে শুভসূচী নয়, এই কথাটা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া। বস্তুত বঙ্গদর্শন ও কমলাকান্তের সমকালীন অধিকাংশ প্রবন্ধে নিবন্ধে সাম্যতত্ত্ব নানা আকারে ব্যক্ত হয়েছে। যে সব মহতী কথা অনেক পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর মুখে দেশের লোক শুনেছে—তাদের অনেকগুলিই প্রথম উচ্চারিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে। এ দেশ "গ্রাম্য-গাঁথা," গ্রামের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি এখন রাজনীতির একটি ধ্রুব বাক্যে পরিণত, তার সুস্পষ্ট সূচনা বঙ্কিমচন্দ্র।

এরকম আরও একটি ধ্রুব বাক্যের উল্লেখ করা যেতে পারে। "আবেদন আর নিবেদনের থালার রাজনীতিতে সিদ্ধি লাভ যে ঘটবে না এই সকল কথাটা বুঝতে দীর্ঘকাল কেটেছে ভারতীয় রাজনীতিকগণের। এর বিপরীত পন্থাটাই ধ্রুব পন্থা রাজনীতিকগণের মধ্যে প্রথম কে বা কারা বুঝেছিলেন সে আলোচনার ক্ষেত্র এখানে নয়। তবে যিনি বা যাঁরাই হোন ১৮৭৮ সালের আগে কেউ বুঝেছেন মনে হয় না—এক বঙ্কিমচন্দ্র ছাড়া। প্রমাণ কমলাকান্তের পত্রের অন্তর্গত পলিটিক্স ও বাঙালীর মনুষ্যত্ব [illegible]মে পত্র দুখানি। দেশ বলতে কি বোঝায়, রাজনীতির সিদ্ধির পথ বলতে কি বোঝায়—বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন সকলের আগে। আর শুধু

বুদ্ধি দিয়ে বোঝা নয়, হৃদয়ের বেদনা দিয়েও অনুভব করেছিলেন সেই সঙ্গে। আমার দুর্গোৎসব ও একটি গীত নিবন্ধদ্বয় এখনো অশ্রুময়, পড়বার সময়ে জোরে নিশ্বাস ফেলতে ভয় করে পাছে হার ছিঁড়ে চোখের জলের মুক্তাগুলি মাটিতে ঝরে পড়ে।

আমার দুর্গোৎসব, ও একটি গীত নামে নিবন্ধ দুটিতে স্বাধীনতা, জাতীয় গৌরব, জাতির অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আইডিয়াগুলি সন্নিবেশিত। আমার দুর্গোৎসব তখনো অলিখিত আনন্দমঠের সংক্ষিপ্ত পূর্বরূপ, আর-একটি গীত পূর্বে লিখিত এবং তখনো অলিখিত কতকগুলি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের মনোরম খসড়া। কমলাকান্তের রচনাগুলিকে (দপ্তর, পত্র ও জোবানবন্দী সমেত) বঙ্কিমচন্দ্রের মনের সূচীপত্র অথবা নির্ঘণ্ট বলে উল্লেখ করেছি অন্যত্র। অন্যান্য রচনায় তাঁর যে-সব আইডিয়া বিক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত এখানে যেন সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী। বঙ্কিমের বিপুল ও বিচিত্র রচনার মধ্যে প্রবেশ করতে অক্ষম পাঠক কমলাকান্ত পাঠ করলেই মোটামুটি বঙ্কিম সম্বন্ধে ধারণা করতে সমর্থ হবেন। এ বিষয়ে পরে আরো কিছু বলা যাবে।

আমার দুর্গোৎসবে বর্ণিত কাল-সমুদ্রোত্থিত দুর্গা প্রতিমা আর আনন্দ-মঠের মা-যা-হইবেন দশভুজা অভিন্ন। "সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম, সুবর্ণামণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি, এই মৃণ্ময়ী, মৃত্তিকারূপিণী, অনন্তরত্ন-ভূষিতা, এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা, রত্নমণ্ডিত দশভুজ, দশ দিক্, দশ দিকে প্রসারিত তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু বিমর্দিত পদাশ্রিত বীর জন কেশরী শত্রু নিপীড়নে নিযুক্ত। এ-মূর্তি এখন দেখিব না, আজি দেখিব না, কালি দেখিব না, কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না, কিন্তু একদিন দেখিব, দিগ্‌ভুজা নানা প্রহরণ প্রহারিণী, শত্রুমর্দিণী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী, দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিজ্ঞান মূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কাল-স্রোত মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা।"

আনন্দমঠে সত্যানন্দ মাতৃমূর্তি দেখাচ্ছেন মহেন্দ্রকে। "এই মা যা

হইবেন। দশভুজ দশ দিকে প্রসারিত তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত পদতলে শত্রুবিমর্দিত, পদাশ্রিত বীরকেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত। দিগ্ভুজা—" বলিতে বলিতে সত্যানন্দ গদগদকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। "দিগভুজা, নানা প্রহরণধারিণী শত্রুবিমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ ; এস, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম করি।"

দুই গ্রন্থের বর্ণনা এক ও অভিন্ন : বস্তুত আমার দুর্গোৎসবের মাতৃমূর্তির বর্ণনাই আনন্দমঠে উদ্ধৃত। আমার দুর্গোৎসবে কমলাকান্তের বক্তব্য দেশ-মূর্তিই দেবীমূর্তি ; বর্তমানে সেই দেবী কাল সাগর গর্ভে নিহিতা ; দেবীর সন্তানগণ যখন ভ্রাতৃবৎসল হবে, অধর্ম আলস্য ইন্দ্রিয় ভক্তি ত্যাগ করবে তখন তিনি প্রত্যক্ষ হ'য়ে দেখা দেবেন। আনন্দমঠের বক্তব্যও অন্যরূপ নয়।

"উভয়ে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া গাত্রোত্থান করিলে, মহেন্দ্র গদগদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, মার এ-মূর্তি কবে দেখিতে পাইব ?

ব্রহ্মচারী বলিলেন, যবে মার সকল সন্তান মা বলিয়া ডাকিবে, সেই দিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

তবে দুই বর্ণনায় একটুখানি প্রভেদ আছে, একটুখানি কিন্তু নগণ্য নয়। আমার দুর্গোৎসবে—"তোমায় কি বলিয়া ডাকিব মা ? ঐ ছয় কোটি মুণ্ড ঐ-পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব, এই ছয় কোটি কণ্ঠে ঐ নাম করিয়া হুঙ্কার করিবে, এই ছয় কোটি দেহ তোমার জন্য পতন করিব, না পারি, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদিব। এস মা গৃহে এস, যাঁহার ছয় কোটি সন্তান, তাঁহার ভাবনা কি ?"

আনন্দমঠে ছয় কোটি সাত কোটিতে পরিণত। "সপ্ত কোটি কণ্ঠ কলকল নিনাদ করালে, দ্বিসপ্ত কোটি ভুজৈর্ধৃত খরকরবালে।" ছয় সাত হওয়ার কারণ কি ? পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে বাংলা দেশের জনসংখ্যা নিশ্চয় এক কোটি বাড়েনি। এ সময়ে বাংলা দেশের জনসংখ্যা ছয় কোটি ছিল, বাংলা দেশের বিস্তারও ছিল বেশি। তবে ছয় কোটি সাত কোটি হল কেন ? ছন্দের খাতিরে ? কিংবা আর কিছু আছে ? এই আর কিছুর উদ্ধার সম্ভব হ'লে আনন্দমঠ সম্বন্ধে গুরুতর রহস্যভেদ সম্ভব হবে। যথাস্থানে সে চেষ্টা করা যাবে। গীতাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে প্রয়োগ যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের

একটা দান, তেমনি আর-একটি দান দেশমূর্তি ও দেবমূর্তির সাম্যকরণে। এরও আলোচনার যথার্থ স্থান আনন্দমঠ প্রসঙ্গ।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সাহিত্য সম্রাট। জন্ম—১২৪৫ বঙ্গ ১৩ই আষাঢ় (১৮৩৮খৃঃ ২৬এ জুন) নৈহাটির অন্তর্গত কাঁটাল পাড়ায়। মৃত্যু—১৩০০ বঙ্গ ২৬শে চৈত্র (১৮৯৪ খৃঃ ৮ই এপ্রিল)। পিতা—যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডিপুটি কালেক্টর), শিক্ষা—হুগলী কলেজ (মহম্মদ মহসিন কলেজ, ১৮৪১), জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা (১৮৫৪), সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা (১৮৫৬), এনট্র্যান্স পরীক্ষা (প্রেসিডেন্সি কলেজ, ১৮৫৭), বি. এ. (প্রেসিডেন্সি কলেজ) এই সময় চাকুরী করিতে করিতে বি. এল. (প্রেসিডেন্সি কলেজ ১৮৬৯)। কর্ম—ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর—বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে। অবসর গ্রহণ (১৮৯১. ১৪ই সেপ্টেম্বর)। কবিতা রচনা আরম্ভ—সংবাদ-প্রভাকর পত্রে। ইঁহার 'বন্দে মাতরম' গানে দেশবাসী ইঁহাকে ঋষি আখ্যায় ভূষিত করেন। প্রভাকর সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্তের কাছে ইঁহার বাংলা লেখার হাতে খড়ি। গ্রন্থ—ললিতা (গল্প, ১৮৫৮), দুর্গেশনন্দিনী (উ, ১৮৬৫), কপালকুণ্ডলা (উ, ১৮৬৬). মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), লোকরহস্য (১৮৭৪), বিজ্ঞান-রহস্য (১৮৭৫), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাধারানী (১৮৭৫), কমলাকান্তের দপ্তর (১৮৭৫), বিবিধ সমালোচনা (১৮৭৬), রজনী (১৮৭৭), উপকথা (ক্ষুদ্র উপন্যাস, ১৮৭৭), রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী (১৮৭৭), কবিতা পুস্তক (১৮৭৮), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), প্রবন্ধ পুস্তক (১৮৭৯). সাম্য (১৮৭৯), রাজসিংহ (ক্ষুদ্রকথা ১৮৮২), আনন্দমঠ (১৮৮২), মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত (১৮৮৪), দেবী চৌধুরাণী (১৮৮৪), ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস (১৮৮৬), কৃষ্ণচরিত্র ১ম (১৮৮৬), সীতারাম (১৮৮৭), বিবিধ প্রবন্ধ ১ম (১৮৮৭), ২য় (১৮৯২), ধর্মতত্ত্ব ১ম (১৮৮৮), সহজ রচনাশিক্ষা, সহজ ইংরেজী শিক্ষা, শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা (১৯০২) Rajmohan's Wife (১৯৩৫, মৃত্যুর পরে প্রকাশিত।) সম্পাদক—বঙ্গদর্শন (১৮৭২)।

বঙ্কিম সরণী হইতে সংগৃহীত

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭-১৯১৯

জীবন ও সাহিত্য

রমাপতি বসু

উনবিংশ শতক বাংলাদেশের সুবর্ণ শতক বলা যায়। সেই শতকে জন্মগ্রহণ করে নিজেদের কর্ম ও কৃতিত্বের জন্য অনেকেই আমাদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, সাংবাদিকতা, সমাজ-সংস্কার, স্বদেশচিন্তায়—এমনকি দেশের মুক্তির সংগ্রামে এক একজন নায়ক, রথী, মহারথী। যেদিকে তাকান যায়—সেদিকেই যেন এক একজন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

বিংশ শতাব্দীতে তাঁদের স্মরণ করার সময় এসেছে। কেননা—একদিকে বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অপরদিকে মানুষের মধ্যে কেবল অবিশ্বাস্য, নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধ। রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দেউলিয়া নেতৃত্ব আজকের দিনে সমাজ জীবনের কাঠামোকে ভেঙে-চুরে কেমন যেন করে দিয়েছে।

আজকের দিনে উনবিংশ শতাব্দীর সেই সব আদর্শবান, ন্যায়নিষ্ঠ, সত্যবাদী, তেজস্বী, স্বাধীনচেতা মনীষীদের কথা মনে পড়লে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা যুগপৎ মনে জাগে। ভয় হয়—এমন একদিন আসবে যখন আমাদের উত্তরপুরুষের কাছে এই মনীষীদের কর্মজীবন, ধর্মজীবন পুরানের গল্পের মতন মনে হবে। কেউ কেউ বা অবিশ্বাস করবে। আমার ছাত্রজীবনে আমি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' উপহার পেয়েছিলাম। ঐ বয়সে 'আত্মচরিত' পড়ার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি পড়তে ঠিক মন বসেনি। যেহেতু 'আত্মচরিত' বইটি উপহারের বই, সেইহেতু বইটি আমার কাছে সযত্নে ছিল। তারপর দীর্ঘদিন কেটে গেছে—একদিন পড়ার মতন কোন বই হাতের কাছে না থাকায় আমি শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' বইটি পড়তে শুরু করি।

'আত্মচরিত' বইটি আমি ঐ সময় সম্পূর্ণ পড়ে শেষ করি। শিবনাথ শাস্ত্রীর ভাষা যে এত জীবন্ত তা ইতিপূর্বে আমার জানা ছিল না। তা ছাড়া 'আত্মচরিতে' সে সময়কার সমাজব্যবস্থা, ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসার,

হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বিষয় পড়ে আমার শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জাগে।

ঐ সময় আমার বার বার মনে হয়েছে শিবনাথ শাস্ত্রী মনে প্রাণে বিপ্লবী ছিলেন। জীবনের প্রথম থেকেই তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর মত দয়াবান, সত্যবাদী, তেজীয়ান ও পণ্ডিতের বুঝি সহজে সন্ধান পাওয়া যায় না।

শিবনাথের জ্ঞাননিষ্ঠা, কর্তব্যপরায়ণতা ও স্বদেশানুরাগ আমার ওপর বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছিল।

সব চেয়ে মজার কথা শিবনাথ শাস্ত্রীব 'আত্মচরিত' বইটিকে আমি যেমন কৈশরে তাচ্ছিল্য করে ফেলে রেখেছিলাম, তেমনি যৌবনের প্রারম্ভে এই 'আত্মচরিত' আমার সব চেয়ে প্রিয় গ্রন্থ ছিল।

আমার বেশ মনে আছে '৪২ সালের আন্দোলনের সময় আমি যখন প্রেসিডেন্সী জেলে বন্দী ছিলাম সেই সময় শিবনাথ শাস্ত্রীর 'আত্মচরিত' বইটি আমি প্রায়ই পড়তাম। এই বইটি আমার নিত্য সঙ্গী ছিল।

শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র মজুমদার ও সতীন সেন আমাকে এই বই পড়ার জন্য মাঝে মাঝে ঠাট্টা করতেন। সুরেশদা আমাকে বলতেন, 'তুমি এবার ধর্ম প্রচারক হয়ে যাবে।'

এ কথা বলার যথেষ্ট কারণ ছিল। কেননা ১৯৩০ সালে বহু বিপ্লবী আধ্যাত্মিকবাদে আত্মমুক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন।

সতীনদা কিন্তু অন্য কথা বলতেন। তিনি বলতেন, 'চিরন্তন বিপ্লব' ব্যর্থ হলো। এবার সমাজে গিয়ে উঠবে।

আমি 'চিরন্তন বিপ্লবে' বিশ্বাসী ছিলাম এবং 'চতুর্থ আন্তর্জাতিক'-এর সমর্থক। সে কারণে ধর্মের প্রতি অনুরাগ প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ। সতীনদার কথায় ঐ ইংগিত ছিল।

কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি সতীনদাই আমাকে বলেছিলেন, 'শিবনাথের পাঠসাধনা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা আত্মোন্নতি যেমন লক্ষ্য ছিল তেমনি দারিদ্র্য, সুরাসক্তি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইংলণ্ডের জনহিতব্রতী কর্মিগণ

যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করে থাকেন—তা লক্ষ্য করে শিক্ষালাভ ও তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।'

এ ছাড়া 'আত্মচরিত' থেকেই জানা যায় :

শিবনাথ ইংলণ্ডে থাকাকালে বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান দেওয়া ও আসামে ভারতীয় কুলিদের প্রতি অত্যাচারের কথা বৃটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের অভিহিত করেছিলেন দাদাভাই নৌরজীর সহযোগিতায়। শিবনাথের এ প্রচেষ্টা সার্থক হয় এবং সেইসময় বৃটিশ পার্লামেণ্টে এই বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল।

সুরেশদা বলতেন, 'শিবনাথ শাস্ত্রী আদর্শ পুরুষ। স্বামীজী যেমন শেষ জীবনে বলেছিলেন, যদি আব একজন বিবেকানন্দ থাকত, তাহলে সে বুঝতে পারত, বিবেকান্দ কি করেছে। কালে অবশ্য অনেক বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করবে। কিন্তু আমি আজ বলছি, যদি আর একজন শিবনাথ শাস্ত্রী থাকতেন, তাহলে তিনি বুঝতেন শিবনাথ শাস্ত্রী দেশের জন্য, সমাজের জন্য ও জাতির জন্য কি করে গেছেন। কালে অবশ্য আর একটিও শিবনাথ শাস্ত্রী জন্মায়নি।'

সুরেশদার কথাটা যে কত সত্যি তা আজ বিশেষ করে উপলব্ধি করি। শিবনাথ ছিলেন প্রকৃত সংগঠক, নির্ভীক সাংবাদিক ও নিষ্ঠাবান সম্পাদক। তিনি আদর্শ পুরুষ ছিলেন। ধর্ম ও সমাজসেবায় উৎসর্গীকৃত একটি মহৎ জীবন।

২.

শিবনাথ বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। এঁর পূর্বপুরুষ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ উদ্গাতা। চব্বিশপরগনার মজিলপুরস্থ মাতুলালয়ে বাংলা ১২৫৩ সাল ১৯শে মাঘ, ইংরাজী ১৮৪৭ সাল ৩১শে জানুয়ারী রবিবার এঁর জন্ম হয়। 'আত্মজীবনী'তে দেখা যায় :

"সায়ংকালে যখন আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম, তখন সবে পূর্ণিমা গিয়া প্রতিপদের সঞ্চার হইতেছে। সেদিন আমার মাতামহ বাড়িতে আছেন। কন্যার পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শ্রবনমাত্র তিনি তাঁহার এক দৈবজ্ঞ জ্ঞাতি বন্ধুর ভবনে ধাবিত হইলেন। গৃহস্থ রমনীগনের শঙ্খধ্বনিতে পাড়া কাঁপিয়া যাইতে লাগিল। ওদিকে গ্রামে সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল যে, ন্যায়রত্নের

দৌহিত্র জন্মিয়াছে। মাতুলগৃহে সেই প্রথম শিশুবালকের আবির্ভাব। আমি ভূমিষ্ঠ হইয়াই মাতামহী ও তাঁহার জননী, দুই মামী, দুই মাসী (আর এক মাসী তখনো শিশু) ও গৃহস্থ অপর দুই একজন বিধবা, ইহাদের আদর ও অভ্যর্থনার ধন হইলাম।···আমার মামা আমার মাথা ও কপাল দেখিয়া বলিয়াছিলেন, আমার এই ভাগিনা বড় লোক হবে।"

শিবনাথের জীবনে তাঁর পিতার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রিয়পাত্র ছিলেন। শিবনাথ অকপটে স্বীকার করেছেন :

"বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অনেক গুণ তাঁহাতে ছিল। শুধু গুণ কেন, তাঁহার প্রকৃতির অনেক দোষ ও আমার পিতার প্রকৃতিতে ছিল। সেই তেজস্বিতা, সেই উৎকট ব্যক্তিত্ব, সেই অন্যায়ের প্রতি বিদ্বেষ, সেই আত্ম-মর্যাদাজ্ঞান, সেই পরদুঃখ কাতরতা, সকলি আমার পিতাতে ছিল ; আবার সেই স্বমতপ্রিয়তা, সেই ফলাফলের প্রতি দৃষ্টির অভাব, সেই আত্মপরীক্ষা ও আত্মসংশোধনের প্রয়াসভাব, তাহাও ছিল। কিন্তু মানবকুলের মধ্যে কে আছে, যে দোষেগুণে জড়িত নয়? আমার পিতার দোষ যাহা থাকে থাকুক ; ইহা নিশ্চিত কথা যে, শৈশব হইতে ঐ তেজস্বী অধর্মবিদ্বেষী ও সত্যানুরাগী মানুষের শাসনাধানে না থাকিলে, আমার চরিত্র গঠিত হইত না।"

শিবনাথের মা গোলকমনি দেবী ছিলেন ধর্মপরায়ণ নারী তিনি দারিদ্রের মধ্যে থেকেও ক্ষুদ্রতাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর মধ্যে কোমলতা ছিল, কিন্তু ভীরুতা ছিল না। স্বামী হরানন্দ ভট্টাচার্য সত্যবাদী, দৃঢ়চেতা ও পরোপকারী পুরুষ ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে গোলকমনি দেবীর ধর্মপরায়ণতা ও সুনীতির প্রভাব আরো বেশী করে দেখা গিয়েছিল। তাঁর মধ্যে স্বধর্মানুরাগ যেমন প্রবল ছিল, তেমনি পরধর্মের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। শিবনাথের উপর তাঁর মার প্রভাব যথেষ্ট ছিল। শৈশবে শিবনাথ মার কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁর কথাই এখানে উল্লেখ করছি :

"আমার শৈশবকাল হইতেই জননী তাহার হৃদয়ের সর্বোচ্চ ভাবগুলি আমার হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। প্রথমত, আমার বর্ণ-পরিচয় হইলেই এবং পড়িতে শিখিলেই তিনি এই নিয়ম করিয়াছিলেন

যে, যেদিন আমার পাঠশালা বা স্কুল থাকিত না, সেইদিন দুপুরবেলা তিনি আহারান্তে বিশ্রামার্থ শয়ন করিলে আমাকে কৃত্তিবাস রামায়ণ পাঠ করিয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত। যে স্থানটি অধিক মিষ্টি লাগিত, দিনের পর দিন বহুবার তাহা পাঠ করাইতেন, এবং মাতা-পুত্রে সে স্থানটি মুখস্থ আবৃত্তি করিতাম। তদবধি বহুকাল আমি রামায়ণের অনেক স্থল মুখস্থ বলিতে পারিতাম। এই দীর্ঘকাল পরে ও রামায়ণের কোন কোন দৃশ্যের ছবি যেন আমার চক্ষের সম্মুখে রহিয়াছে। এইরূপে, ব্রহ্মধর্মের ভাব পাইবার পূর্বে, রামায়ণের ধর্ম আমার ধর্ম ও রামায়ণের নীতি আমার নীতি ছিল। তখন রামায়ণের অপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আছে, ইহা কেহ বলিলে আমি সহ্য করিতে পারিতাম না।"

শিবনাথ যখন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন—তখন তাঁর বাবা তাঁর প্রতি অত্যান্ত রুষ্ট হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর বাবার প্রতি শ্রদ্ধাভাব কখন বিনষ্ট হয়নি। তিনি আত্মচরিতে লিখেছিলেন :

"পিতা ও মাতাতে কি প্রভেদ! পিতা আমাকে মারিবার জন্য গুণ্ডা ভাড়াতে কয়েক বৎসরে ২০।২২ টাকা ব্যয় করিলেন, আর জননী আমার জন্য ব্রত-নিয়মে প্রায় ঐ পরিমান অর্থ ব্যয় করিলেন।"

এ ছাড়া শিবনাথ একবার পীড়িত হয়ে জীবন সংশয় মনে করে মা-বাবার উদ্দেশ্যে এক চিঠি লেখেন। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত ও উপবীত ত্যাগের জন্য পিতা হরানন্দ ভট্টাচার্য প্রায় আটবৎসর কাল পুত্রের মুখ দর্শন করেননি। শোনা যায় শিবনাথ গ্রামে গেলে তাঁর পিতা ভাড়াটিয়া গুণ্ডা দিয়ে মারার অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গ্রামের মেয়েরা হরানন্দ ভট্টাচার্যের এই কাজের বিরুদ্ধে অভিমত জানালে শিবনাথের পিতা সে প্রায়স ত্যাগ করেন। কিন্তু পুত্রের মুখ দর্শন করবেন না এ ছিল তাঁর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। শিবনাথ অসুস্থ এবং শয্যাশায়ী।

শিবনাথ তাঁর চিঠিতে লিখেছিলেন :

"যদি উচিত বিবেচনা করেন, আসিয়া দেখা দিয়া আমাকে পদধূলি দিয়া যাইবেন। তাহা না হইলে এই বিদায়, পরলোকে দেখা হইবে।"

এই সময় শিবনাথের পিতা স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়ে পুত্রের কবিরাজী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। মা অবশ্য রোগশয্যার পাশে থাকতেন, কিন্তু

হরানন্দ ভট্টাচার্য শিবনাথেব মুখ দর্শন করেননি। তিনি তাঁর জ্ঞাতির বাসায় থেকে শিবনাথের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই প্রসংগে শিবনাথ লিখেছিলেন :

"পিতার এই ব্যবহারে আমার চক্ষে কত জল পড়িল। তৎপূর্বে এই আট বৎসর সংসারের আপদ বিপদে জ্ঞাতসারে আমার এক পয়সাও সাহায্য লন নাই। পরন্তু যদি কখনো জানিতে পারিয়াছেন যে, মায়ের হাত দিয়া গোপনে কিছু অর্থ সাহায্য করিতে চাহিতেছি, তখন তুমুল কাণ্ড করিয়াছেন। তিনি আমাকে একেবারে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই পতিত পুত্র যখন বিপদে পড়িয়া স্মরণ করিল, তখন আর সুস্থির থাকিতে পারিলেন না। দরিদ্র ব্রাহ্মণ, সম্বল নাই। যে সম্বল হাতের কাছে পাইলেন, তাহাই লইয়া ছুটিলেন। কি উদারতা? এই উদারতা তাঁহার প্রকৃতির এক মহা সদগুণ।"

এই সময়ে শিবনাথের মা পুত্রের কাছে থাকার জন্য গ্রামের জ্ঞাতি কুটুম্বরা কানাকানি ও দলাদলি করেছিল। শিবনাথের পিতা এই কথা শুনে গর্জে উঠেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'একঘরে করে করুক, আমার কর্তব্য কাজ আমি করেছি।'

শিবনাথের মামা দ্বারকাভূষণ বিদ্যাভূষণ 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ১৮৭৭ সালে ইনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় সোমপ্রকাশের কাজ ছাড়াও গ্রামের সংস্কৃত-ইংরাজি স্কুলের ভার শিবনাথের উপর দিয়ে তিনি কাশীবাসী হন। এই স্কুলের সম্পাদক ও হেডমাষ্টারের কাজের দায়িত্ব শিবনাথের উপর ন্যস্ত হয়। দ্বারকাভূষণ শিবনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মামার কর্তব্যকার্যে গাঢ় অভিনিবেশ এবং চিত্তের একাগ্রতা শিবনাথের চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়েছিল।

শিবনাথ এ কথা অকপটে স্বীকার করেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

"আমার পিতা-মাতার চরিত্রের পর আমার মাতুলের চরিত্র আমার চরিত্র গঠনের পক্ষে প্রধানরূপে কার্য করিয়াছে। তাঁহার জ্ঞাননিষ্ঠা, তাঁহার কর্তব্যপরায়ণতা, তাঁহার স্বদেশানুরাগ, তাঁহার অকপটচিত্ততা চিরদিন আমার মনে মুদ্রিত রহিয়াছে।"

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের বন্ধু। তা ছাড়া শিবনাথ ছিলেন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শিবনাথ শাস্ত্রীকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তিনি শিবনাথের পল্লীসংস্কার ও সমাজসংগঠনের কাজে উৎসাহ দিতেন। তাছাড়া বিধবা-বিবাহ প্রসংগেও শিবনাথের কার্যাবলি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুমোদন লাভ করতো।

কিন্তু শিবনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণে হরানন্দ ভট্টাচার্য যেমন দুঃখ পেয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও তেমনি দুঃখ পেয়েছিলেন।

শিবনাথের বাবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বলেছিলেন, 'মানুষ যেমন ছেলেকে যমকে দেয়, তেমনি আমি ছেলে কেশবকে দিয়েছি।'

এই কথা শুনে বিদ্যাসাগরের চোখে জল এসে গিয়েছিল। কিন্তু তবু শিবনাথ ত্যাজ্যপুত্র। হয়তো অর্থাভাবে পড়েছে ভেবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যখনই পথে ঘাটে শিবনাথকে দেখতেন—তখনই তিনি বলতেন, 'হ্যাঁরে—তোর কেমন করে চলে?

শিবনাথ সরকারী চাকরি ছেড়ে দেওয়ায় একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে গিয়ে বলেছিলেন, 'মশাই, পাজিটা এমন সুখের চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছে।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার উত্তরে বলেছিলেন, 'কোন পাজির কথা বলছ? সে তো আমার মনের মতন কাজ করেছে।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিবনাথ শাস্ত্রীর বিষয় কোন নিন্দাই সহ্য করতে পারতেন না। শিবনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের পর নানাজনে নানাভাবে বিদ্যাসাগরকে তাঁর বিরুদ্ধে বলতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ সব লোকদের মোটেই প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি শিবনাথের ব্রাহ্ম হয়ে যাওয়ার জন্য দুঃখ করতেন, কিন্তু তবু বলতেন, 'যাই বল, ওকে বুকে রাখলে আমার বুক ব্যথা করে না।'

শিবনাথ তাঁর 'প্রবন্ধাবালী' গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের বিষয় আরো অনেক কিছু লিখে গেছেন। এ থেকেই বোঝা যায় শিবনাথ বিদ্যাসাগরের প্রতি কত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

শিবনাথ জীবনে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ ছাড়া ছাত্র জীবন ও কর্মজীবনে বহু বিচিত্র চরিত্রের মানুষকে দেখে জীবন সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব অভিমত গড়ে উঠেছিল। দেশে ও বিদেশে নানা ধরণের মানুষ নানাভাবে তাঁর কাছে এসেছে। মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে পড়তেন বলে শিবনাথকে সেজন্য বহু খেসারত দিতে হয়েছিল। পতিতা নারী, দুঃস্থ স্ত্রীলোক দেখে তাঁর মন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত।

সমাজ সংস্কারের কাজে তিনি বহু নির্যাতন ভোগ করেছিলেন। তাঁকে বহু ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। জাতি গঠনে যে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে—তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলে দীর্ঘদিন শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। স্কুল ও কলেজ সংগঠনে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাই জাতীয় জীবনের ইতিহাসে শিবনাথ শাস্ত্রীর দান স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

৩

পূর্বেই বলেছি শৈশবে মাকে রামায়ণ পাঠ করে শোনানর সময় শিবনাথ মনে করতেন, 'রামায়ণের ধর্ম, আমার ধর্ম, রামায়ণের নীতি আমার নীতি।' এই সময় থেকেই শিবনাথের মনে ঈশ্বরের সত্তাতে বিশ্বাস জন্মায়। এজন্য দেখা যায় শেষজীবন পর্যন্ত শিবনাথের মনে ঈশ্বর ও পরকালের প্রতি অটুট বিশ্বাস ছিল।

শিবনাথের ধর্মজীবনের উন্মেষ হয় যখন তিনি ভবানীপুরে মহেশ চৌধুরীর বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করতেন। এই বাড়ির কাছেই ছিল ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা মন্দির। এই ব্রাহ্মসমাজে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র 'ডেস্টিনি অফ হিউম্যান লাইফ' বিষয়ে বক্তৃতা শুনে শিবনাথ মুগ্ধ হয়ে যান। সেই থেকে শিবনাথ প্রায়ই ব্রাহ্মসমাজে যেতেন বক্তৃতা ও উপদেশ শুনতে। এ ছাড়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অযোধ্যানাথ পাকড়াশির বক্তৃতা শুনে তিনি বিমোহিত হয়ে যান। তখন থেকেই শিবনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

এই সময় আর একটি কারণ ছিল। শিবনাথের এক বন্ধু ভবানীপুরে থাকতেন। তাঁর দাদা ছিলেন ব্রাহ্ম। তাঁর কাছ থেকেই ব্রাহ্মধর্মের নানাবিধ বিষয়ে জানার সুযোগ হয়েছিল শিবনাথের। তাঁর উপদেশ ও আলোচনা শিবনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়।

যে ধর্মজীবনের বীজ রামায়ণ পাঠে রোপিত হয়েছিল, সেই ধর্মজীবনের অঙ্কুরোদগম হয় যখন শিবনাথ ভবানীপুরে ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যাতায়াত শুরু করেন।

এরপর দেখা যায় শিবনাথের উপর কেশবচন্দ্রের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। শিবনাথ লিখেছেন :

'প্রার্থনা করিতে করিতে হৃদয়ে দুইটি পরিবর্তন দেখিতে পাইলাম। প্রথম, দুর্বলতার মধ্যে বল আসিল, আমি মনে সঙ্কল্প করিলাম, "কর্তব্য বুঝিবে যাহা, নির্ভয়ে করিব তাহা, যায় যাক থাকে থাক ধন প্রাণ মানরে।" আমি ধর্মের আদেশ ও হৃদয়বাসী ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলিবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। দ্বিতীয়, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজে ঈশ্বরের উপাসনাতে যাইব স্থির করিলাম, ও যাইতে আরম্ভ করিলাম। পাছে আমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেন, পাছে লোকের সঙ্গে আলাপ হয়, এই ভয়ে উপাসনা আরম্ভ হইলে যাইতাম ও উপাসনা ভাঙিবার অগ্রেই চলিয়া আসিতাম।' এরপর থেকেই দেখা যায় ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস শিবনাথের বাবা শিবনাথকে ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যেতে নিষেধ করায় শিবনাথ তাঁর বাবাকে বলেছিলেন,' বাবা আপনি জানেন আপনার আজ্ঞা কখন লঙ্গন করিনি। আপনার সকল আজ্ঞা পালন করতে রাজি আছি, কিন্তু আমার ধর্মজীবনে হাত দেবেন না। আমি ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাতে যাওয়া ত্যাগ করতে পারবো না।'

এই সময় শিবনাথ উমেশচন্দ্র দত্ত, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, অঘোরনাথ গুপ্ত, যোগোন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে বিশেষভাবে আসেন এবং ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন।

শিবনাথের ভাষায় ধর্মজীবনের সূত্রপাত সম্পর্কে জানা যায়:

'যাহা হউক, প্রার্থনার দ্বারা যেমন বল পাইলাম, তেমনি আশাও পাইলাম। আমার অন্তরাত্মা বলিতে লাগিল, ঈশ্বর তোমাকে পাপী বলিয়া ত্যাগ করিবেন না। আমার বোধ হয় পার্কারের সরস ও আশান্বিত উক্তি এ বিষয়ে অনেক পরিমাণে সাহায্য করিয়া থাকিবে। যাহা হউক, ব্যাকুল প্রার্থনা বিফলে যায় না তাহা আমি প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলাম। ভগবানের প্রেরণা প্রাণে পাইয়া মন আনন্দে মগ্ন হইতে লাগিল। তদবধি প্রার্থনাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তৎপরে আমি অনেক প্রলোভনে পড়িয়াছি, সময় সময় পতিত হইয়াছি, অনেক অন্ধকার দেখিয়াছি, কিন্তু প্রার্থনাতে বিশ্বাস আমাকে পরিত্যাগ করে নাই। সকল সংগ্রামের মধ্যে দুর্বলতাতে বল, নিরাশাতে আশা, নিরানন্দে আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সেই মঙ্গলময় পুরুষ তাঁহার দুর্বল সন্তানকে হাতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। যে ছেলেটা চলিতে পারে না, বার বার পড়িয়া যায়, তাহার

ধরার অপেক্ষা না রাখিয়া যেমন পিতা বা মাতাকে নিজেই সে ছেলের হাত শক্ত করিয়া ধরিতে হয়, তেমনি যেন মনে হয়, সেই মঙ্গলময় পুরুষ দেখিয়াছেন যে, এ পাপী ও দুর্বল মানুষটা নিজে ধরিয়া চলিতে পারে না, যখনি তাঁহাকে ভুলিতেছে, তখনি পতিত হইতেছে, তাই তিনি বার বার ধূলা ঝাড়িয়া চক্ষের জল মুছাইয়া তুলিয়া ধরিতেছেন।'

এই থেকেই শিবনাথের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি যে কত প্রগাঢ় ছিল তা স্পষ্ট প্রকাশ পায়। তাঁর আত্মোপলব্ধির এ হ'চ্ছে অভিব্যক্তি। ১৮৬৫ সাল থেকে ১৮৬৮ সালের শেষ পর্যন্ত শিবনাথের মন অন্তর্দ্বন্দে ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল। এই সময় তিনি নীতি ও ধর্মের উপদেশ আছে এমন কোন গ্রন্থ পেলে তার মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে যেতেন। তিনি বলতেন, 'ধর্মবিজ্ঞান অপেক্ষা ধর্মজীবন উপাদেয়, কেননা ধর্মজীবন মারফৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব।'

প্রবৃত্তিগুলিকে সব সময় বশীভূত করতে না পারায়—নিজের নানাপ্রকার দুর্বলতা থাকার জন্য শিবনাথ নিজেই নিজের মনের সংগে সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন।

মহর্ষির উপদেশ থেকে শিবনাথ প্রেরণা পেয়েছিলেন। উপদেশ শোনার পর শিবনাথ কেমন যেন হয়ে যেতেন। একটা আচ্ছন্ন ভাব তাঁর মনের উপর দৌরাত্ম্য করে বেড়াত। হেল্পসের 'ফ্রেণ্ডস ইন কাউন্সিল' ও নিউম্যানের 'সোল' এই সময় শিবনাথকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

১৮৬৯ সালের ২২শে আগষ্ট শিবনাথ প্রকাশ্যে উপবীত ত্যাগ ও দীক্ষা-গ্রহণ করেন। এই সময় 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় শিবনাথের কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। পিতার সংগে বিচ্ছেদের পর শিবনাথের মনে যে ভাব দেখা দিয়েছিল তা এই কবিতায় প্রকাশ পায়:

> 'ভাসায়ে জীবন তরী বিপত্তি সাগরে,
> যাই দেব ! দেখ দেখ রক্ষা কর আমারে।
> মোর পক্ষ ছিল যারা,
> বিপক্ষ হইল তারা,
> ঘেরিল সকল দিক অপবাদ-আঁধারে,
> বহিল প্রলয়-ঝড় মস্তকের উপরে।'

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর এবং সাধারণ সমাদরে শিবনাথের বেশ

কিছু দিন কেটে গেল। শিবনাথ উপাসনার সময় বেদীতে বসার অধিকারী হয়েছিলেন এবং তাঁর উপদেশাবলী শুনে ঈশ্বর ঘোষাল খুব প্রীত হন। তিনি শিবনাথকে ডেকে খৃষ্টীয় ধর্মের কথা উত্থাপন করেন এবং একটি বাইবেলও উপহার দিয়েছিলেন।

অন্যের ধর্মের প্রতি শিবনাথের কোনদিনই অশ্রদ্ধার ভাব ছিল না, তাই এক্ষেত্রেও তিনি কোন অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ না করে চলে এসেছিলেন।

শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। ভবানীপুরে সমাজের একজন সভ্যর শ্বশুর বাড়ি ছিল দক্ষিণেশ্বরে। তাঁর মুখ থেকেই শিবনাথ পরমহংসদেবের কথা প্রায় শুনতেন। শিবনাথ মনে মনে পরমহংসদেবকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এমন সময় 'মিরার' কাগজে দেখা গেল ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংগে দেখা করতে গিয়েছিলেন এবং তাঁহার সংগে দেখা করে কেশবচন্দ্র প্রীত হয়েছিলেন বলে সংবাদে প্রকাশ। এই সংবাদ পড়ার পর শিবনাথের পরমহংসদেবকে দেখার প্রবল ইচ্ছা হয় এবং তিনি ঐ ভদ্রলোককে সংগে করে একদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন। 'আত্মচরিতে' শিবনাথ শাস্ত্রী এই প্রসংগে যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃতি করছি :

'প্রথম দর্শনের দিন হইতে আমার প্রতি রামকৃষ্ণের বিশেষ ভালবাসার লক্ষণ দৃষ্ট হইল। আমিও তাঁহাকে দেখিয়া বিশেষ চমৎকৃত হইলাম। আর কোন মানুষ ধর্মসাধনার জন্য এত ক্লেশ স্বীকার করিয়াছেন কিনা জানি না। রামকৃষ্ণ আমাকে বলিলেন যে, তিনি কালীর মন্দিরের পুজারি ছিলেন। সেখানে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী আসিতেন। ধর্মসাধনার্থ তাঁহারা যিনি যাহা বলিতেন, সমুদয় তিনি করিয়া দেখিয়াছেন। এমন কি, এইরূপ সাধন করিতে করিতে তিনি ক্ষেপিয়া গিয়াছিলেন, কিছুদিন উন্মাদগ্রস্থ ছিলেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার একটা পীড়ার সঞ্চার হইয়াছিল যে, তাঁহার ভাবাবেশ হইলেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া যাইতেন। এই সংজ্ঞাহীন অবস্থাতে আমি তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি ; এমন কি অনেকদিন পরে আমাকে দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া ছুটিয়া আসিয়া আমার আলিঙ্গনের মধ্যেই তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া গিয়াছেন'।

সে থাক রামকৃষ্ণের সঙ্গে মিশিয়া এই একটি ভাব মনে আসিত যে ধর্ম

এক, রূপ ভিন্ন ভিন্ন মাত্র। ধর্মের এই উদারতা ও বিশ্বজনীনতা রামকৃষ্ণ কথায় কথায় ব্যক্ত করিতেন।'

এই মতবাদের সমর্থনে দেখা যায় শিবনাথ একবার তাঁর একজন খৃষ্টান পাদরী বন্ধুকে নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে গেছলেন। শিবনাথ পরমহংসদেবকে গিয়ে বললেন: আমার এক খৃষ্টান বন্ধু আপনাকে দেখতে এসেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই কথা শোনার পর মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে বললেন, যীশু খ্রীষ্টের চরণে আমার শত শত প্রণাম।

শিবনাথের পাদরী বন্ধুটি তা দেখে অবাক হয়ে গেলেন।

পাদরী বন্ধুটি তখন শ্রীরামকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস কয়লেন: যীশু খ্রীষ্ট সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন: কেন, ঈশ্বরের অবতার।

পাদরী তখন বললেন: ঈশ্বরের অবতার কি? শ্রীকৃষ্ণের মত?

শ্রীরামকৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন: হ্যাঁ, ঠিক তাই। ভগবানের অবতার অসংখ্য। যীশুও এক অবতার।

পাদরী তখন আবার জিজ্ঞেস করলেন: আপনি অবতার বলতে কি বোঝেন?

শ্রীরামকৃষ্ণ তখন বললেন: সে কেমন তা জানো? আমি শুনেছি, কোন কোন স্থানে সমুদ্রের জল জমে বরফ হয়। অনন্ত সমুদ্র পড়ে রয়েছে, এক জায়গায় কোন বিশেষ কারণে খানিকটা জল জমে গেল; ধরবার ছোঁবার মতো হল। অবতার যেন কতকটা সেইরূপ। অনন্ত শক্তি জগতে ব্যাপ্ত আছেন, কোন বিশেষ কারণে কোনো এক স্থানে খানিকটা ঐশী শক্তি মুর্তি ধারণ করলে, ধরবার ছোঁবার মতো হল। যীশু প্রভৃতি মহাজনদের যে কিছু শক্তি সে ঐশী শক্তি, সুতরাং তাঁরা ভগবানের অবতার।

শিবনাথ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে ধর্মের সার্বভৌমিকতার ভাব বিশেষরূপে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে এসে শিবনাথ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, ধর্মের বৈষম্য মানুষের সৃষ্টি। ঈশ্বরকে আরাধনার জন্য শুধু নানা পথ নানা মত।

যাই হোক, এর পরবর্তী কালে দেখা যায় শিবনাথ ভারত সভা স্থাপনে উদ্যোগী হন। আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শিবনাথ শাস্ত্রী- এই তিনজন প্রথমে উপলব্ধি করেন বাংলাদেশে মধ্যবিত্তদের জন্য

কোন রাজনৈতিক সভা নেই। বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভা ধনীদের উপযুক্ত। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যা ও প্রতিপত্তি যেমন বেড়ে চলেছে—তাতে উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক সভা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজনবোধে শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় অমৃতবাজারের মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ ও মনোমোহন ঘোষকে নিয়ে ভারত সভা গঠনে উদ্যোগী হন। এলবার্ট হলে প্রকাশ্য সভায় ভারত সভা স্থাপন পর্ব সমাধা হলো। আনন্দমোহন বসু সম্পাদক, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সহ সম্পাদক আর শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কয়েকজনকে নিয়ে কার্যকরী সমিতি।

যাঁর প্রেরণায় শিবনাথ উপবীত ত্যাগ করেছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন—সেই কেশবচন্দ্রের কর্মপদ্ধতি সমাজের সভ্যদের ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে এবং ব্রাহ্ম সমাজে ফাটল দেখা দেয়। এই সময় ঘননিবিষ্ট দল গঠনের জন্য শিবনাথ উদ্যোগী হন। স্থির হয় তাঁরা জীবনের কয়েকটি মূল সত্যকে ব্রতরূপে গ্রহণ করবেন। প্রথম, তাঁহারা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করবেন। দ্বিতীয়, তাঁহারা সরকারি চাকুরী করবেন না। তৃতীয়, পুরুষের ২১ বৎসর ও কন্যার ১৬ বৎসর পূর্ণ না হলে বিবাহ দেবেন না বা সেই বিবাহে পৌরহিত্য করবেন না। চতুর্থ, জাতিভেদ মানবেন না ইত্যাদি।

একদিন এক উপাসনার পর সকলেই প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করলেন। অগ্নিতে নিজেদের নাম লিখে অর্পণ করে এবং ঈশ্বরের নাম নিয়ে প্রদক্ষিণ করে সেদিনের অনুষ্ঠান পর্ব সমাপন হয়। শিবনাথের সঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল, আনন্দচন্দ্র মিত্র, সুন্দরীমোহন দাস প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্রাহ্মরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলেন।

এই সময় শিবনাথ শাস্ত্রী সরকারী চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে এবং ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে আত্মনিয়োগ করেন।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা ও 'তত্ত্বকৌমুদীর' প্রকাশ এই সময় স্মরণীয় ঘটনা। শিবনাথ শাস্ত্রীর অক্লান্ত পরিশ্রমে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। এই সমাজের নিয়মাবলী প্রণয়ন থেকে মুখপত্র প্রকাশনা ও সম্পাদনার কাজ শিবনাথকেই করতে হতো। সমাজের পত্রিকা, পুস্তকাদি মুদ্রন ও প্রচার ইত্যাদি সব কিছু দায়িত্ব ভার শিবনাথের উপর ন্যস্ত থাকায় —তাঁকে নিরন্তর ব্যস্ত থাকতে হতো।

শিবনাথের কর্মময় জীবন অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, তিনি সুসংগঠক

ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য তিনি সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন এবং বিদেশে প্রচার কার্য পরিচালনার জন্য তিনি ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর কর্মময় জীবন নিয়ে এই প্রবন্ধে সম্পূর্ণ আলোচনা সম্ভব নয়। তাঁর 'আত্মচরিত' ও 'ইংলণ্ডের ডায়রী' পড়লে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পর্কে অনেক কিছু জানা সম্ভব।

৪.

শিবনাথ শাস্ত্রী আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে দেখা যায় তিনি বিপ্লবী। অন্যায়ের সঙ্গে তিনি কখন আপোষ করেননি এবং যা সত্য তা অবলম্বন করেই পথ চলতে শিখেছিলেন। ইতিপূর্বে শিবনাথের কর্মজীবন ও ধর্মজীবন নিয়ে কিছু আলোচনা করেছি। এবার সাহিত্যজীবন নিয়ে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ করি।

শিবনাথ ছিলেন ঈশ্বর বিশ্বাসী। তাঁর রচনায় সেই সুর খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজি উভয় ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। কাজেই বাংলা রচনায় তাঁর ভাষায় দেখা যায় সারল্য, ঋজুতা ও স্বচ্ছন্দ গতি। ইংরেজি ভাষা জানার জন্য শব্দচয়ন যেমন নিখুঁত, তেমনি সব কিছুর প্রয়োগ পরিমিত। শিবনাথের রচনাশৈলীর বিশেষত্ব: ভাষা উপলব্ধিমূলক, সার্থক উপমা প্রয়োগ। আসলে সব কিছুই সংযত ও সুসমঞ্জস। এই সব কারণেই শিবনাথ শাস্ত্রীর রচনা পাঠক মনকে সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়।

ওঁর রচনা পড়েই আমার মনে হয়েছে:

শিবনাথ আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিবেষ্টিত থেকেও এক নিরাসক্ত মানুষ ছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ ও দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা এক নিরলস কর্মী। সাহিত্যে দেখা যায়—সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি এবং লাবণ্যদীপ্ত ভাষা। কোথাও পণ্ডিতী আতিশয্য রচনাকে ভারাক্রান্ত করে গতিরোধ করেনি।

প্রথম জীবনে কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু এবং পরবর্তীকালে উপন্যাস ও বহু প্রবন্ধ তিনি লিখে গেছেন।

'নির্বাসিতের বিলাপ' শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ। দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'পুষ্পমালা'। তারপর 'হিমাদ্রিকুসুম' ও 'পুষ্পাঞ্জলি' প্রকাশিত হয়। শিবনাথের কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত ও মাইকেলের প্রভাব দেখা যায়। সর্বশেষ কাব্যগ্রন্থ বোধ হয় 'ছায়াময়ী পরিণয়'। এটি একটি রূপক কাব্য।

শিবনাথের কাব্যে সমকালীন জীবনের প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। সম্যক উপলব্ধির ফসল হ'চ্ছে শিবনাথের কাব্য। এঁর প্রতিটি কবিতাই তাই হৃদয়গ্রাহী। অন্ধকার রাত্রে নিঃসঙ্গতার মধ্যে যে উপলব্ধি—তার প্রকাশ পায়:

"কি ঘোর গভীর নিশি। আঁধার সাগরে
মগ্ন ধরা; চারিদিকে এমনি সুস্থির।
প্রহরী কুকুর ডাকে; তার সেই রব
শহরের প্রান্ত হতে আর প্রান্তে যায়।
যেন প্রতিধ্বনি তার, প্রাসাদের মিলে
লোফালুফি করে; একি ভয়ংকর ভাব।
অগাধ জলধি তলে—শৈবাল কুহরে
কীটানু নিবসে যথা, আমি সেই রূপে
আঁধার সাগর গর্ভে—আপন কুটিরে
ডুবে আছি;......"

শিবনাথ ধর্ম ও কর্মের মধ্যে থেকেও তাঁর কবিসত্তাকে ক্ষুন্ন হতে দেননি। কবিতায় তাঁর আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। তাই তিনি 'পুষ্পমালা' প্রতাশিত হবার পর বলেছিলেন, 'এতে আমার প্রাণের কথা আছে।' শিবনাথের স্বদেশচিন্তা তাঁর কাব্যে প্রকাশ পায়। দেশের কল্যাণ ও মানব কল্যাণের চিন্তা তাঁর মনকে সব সময় আচ্ছন্ন করে রাখতো। পরাধীনতার গ্লানি মনকে অস্থির করে তুলেছিল বলে শিবনাথ তাঁর কবিতায় লিখেছেন:

"জ্ঞান পেয়ে যারা হয়েছে শিক্ষিত,
দেশের দুর্দশা তারাও বিস্মৃত,
জঘন্য আমোদে দেখি কাল হরে,
অকারণে বকে, হাসে হাহা করে,
নীচ পশু প্রায়, ইন্দ্রিয় সেবায়
মগ্ন নিরন্তর......"

অথবা

"হায়! জন্মভূমি! পুণ্যভূমি তুমি
দেও পুণ্য বারি দগ্ধ প্রাণে মাখি।

তুমি যার তরে খ্যাত এ সংসারে
আজ সে বিশ্বাস তাই লয়ে থাকি।"

একদিকে আক্ষেপ এবং অপরদিকে দেশের দুর্দশার কথা শিবনাথের মনকে বিচলিত করতো। চরিত্র গঠন ও ত্যাগ ছাড়া স্বরাজ লাভ সম্ভব নয়। তাই তিনি ত্যাগ ও সংযমের জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করে লিখেছিলেন :

'ইন্দ্রিয়ের দাস যেবা বার মাস
দেশের উদ্ধার তার কর্ম নয়।
ওরে পতিব্রতা বিধবা হইয়ে
যে রূপেতে থাক ব্রহ্মচর্য লয়ে,
আয় সে প্রকার থাকি শুদ্ধাচার
মৃত স্বাধীনতা-ধনে উদ্দেশিয়ে।"

শিবনাথের উপন্যাসগুলি সুখপাঠ্য। কি চরিত্র সৃষ্টি, কি আদর্শ। সবেরই মধ্যে শিবনাথকে স্পষ্ট খুঁজে পাওয়া যায়।

গ্রাম ভিত্তিক কাহিনী। বিধিলিপি কোথাও লঙ্ঘিত হয়নি। দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেও ঈশ্বরভক্তি কোথাও ম্লান হয়নি।

'নয়নতারা উপন্যাসটি শিবনাথের প্রথম উপন্যাস' 'মেজবৌ' বা 'যুগান্তর' অপেক্ষা ভিন্ন স্বাদের। বক্তব্য ও বেশ জোরাল।

'মেজবৌ' উপন্যাসে শিবনাথ লিখেছেন :

'বিধাতার কি দুরবগাহ বিধান, কখনও কখনও অতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি-দিগকেও অসহ্য ক্লেশ যাতনা ভোগ করিতে দেখি। তখন তাহাদের ধর্মানুরাগের জ্যোতিঃ ম্লান না হইয়া দ্বিগুণ উজ্জ্বলতা ধারণ করে।'

মেজেবৌ সর্বসান্ত হয়ে গিয়েছিল তার স্বামীর চিকিৎসা করিয়ে। দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার মত অবস্থায় পড়েও ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হারায়নি।

'যুগান্তর' উপন্যাসটি গ্রাম জীবনের বাস্তব ছবি। এই উপন্যাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : 'লেখক বঙ্গসাহিত্যে 'নশিপুর' নামক একটি গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন।'

কিন্তু 'নয়তারা' উপন্যাসটি আমার সর্বাপেক্ষা একটি প্রিয় উপন্যাস। সত্যিকথা বলতে কি শিবনাথের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলা যায়। এ কাহিনীর প্রধান কেন্দ্র কলকাতা ও চুঁচড়া।

নয়নতারা উচ্চশিক্ষিতা, সংগীত শিল্পী, গৃহকর্মে নিপুণা। দর্শন ও সাহিত্য সম্পর্কে আগ্রহী। সবচেয়ে বড় কথা নয়নতারা অসাধারণ ব্যক্তিত্ব-শালিনী। হরেনকে সে ভালবাসে। হরেনও শিক্ষিত। বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে মাস্টার ডিগ্রী পেয়েছে। পরোপকারী হৃদয়বান ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে পড়ে। ক্রিকেট খেলায় গোরাদের হারিয়ে দেয়। নায়ক হতে গেলে যে সব গুণ থাকা বাঞ্ছনীয় সবই আছে হরেনের।

তবু হরেনের সংগে নয়নতারার মিলন সম্ভব হলো না।

নিজের জীবন বিপন্ন করে হরেন জলমগ্না এক রমণীকে উদ্ধার করে। সেই উপলক্ষে হরেনকে সম্বর্দ্ধনা দেওয়া হয়েছে।

শিবনাথ এই প্রসংগে লিখেছেন:

'হরেন নয়নতারার সঙ্গে তাঁহার ঘরে গেলেন। গৃহে গিয়া নয়নতারা তাঁহার চেয়ারের নিকট নিজের চেয়ারটি টানিয়া লইয়া তাঁহার হাতে হাত-খানি দিয়া প্রেমোজ্জ্বল নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া যখন বলিলেন, "বলুন, আমার কাছে আজ কি চান?"

তখন হরেন্দ্রের মনে কি এক প্রকার বৈদ্যুতিক প্রবাহ বহিয়া গেল। সেই সরল ও সুস্নিগ্ধ দৃষ্টি মনপ্রাণকে সুধারসে ডুবাইয়া ফেলিল। তিনি বলিলেন, আপনার কাছে যা পেয়েছি ঢের হয়েছে, আর কিছুই চাই না।'

কিন্তু এ সত্ত্বেও হরেন্দ্র ও নয়নতারার মিলন সম্ভব হয়নি।

অভিমানে কাতর হরেন নয়নতারাকে লিখেছিল, 'যদি কখন উপযুক্ত হই তবে সাক্ষাৎ করিব।'

নয়নতারা তার উত্তরে জানিয়েছিল, 'আমিও আপনার নিকট জন্মের মতন বিদায় লইতেছি। তবে দুঃখ রহিল, যদিও অসার প্রেমের দ্বারা আপনাকে আবদ্ধ না করিতাম, তাহা হইলে এই অপমানটা সহ্য করিতে হইত না।'

এরপর নয়নতারা হরেন্দ্রকে মুক্তি দিয়ে মুঙ্গের চলে যায়। প্রেম থেকে ত্যাগের এত বড় দৃষ্টান্ত সচরাচর দেখা যায় না। নয়নতারা যে হরেন্দ্রকে কত ভালবাসত—তার প্রমাণ এই ত্যাগ। হরেন্দ্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময়। তাকে আগলে রাখা উচিত হবে না। এ কথা ভেবেই নয়নতারা এই ত্যাগ স্বীকার করেছিল।

'নয়নতারা' শিবনাথের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম বলা যায়। শুধু চরিত্রচিত্রন নয়, প্রেম মানুষকে মহান করে তোলে। এ নীতি এই উপন্যাসে সার্থকভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শিবনাথ দক্ষ শিল্পীর মতন 'নয়নতারাকে' সৃষ্টি করেছেন। আজও 'নয়নতারার' কথা মনে পড়লে মনটা ভারি হয়ে যায়।

এ ছাড়া 'বিধবার ছেলে' একটি অসম্পূর্ণ উপন্যাস শিবনাথ লিখেছিলেন যা তাঁর মৃত্যুর পর 'উমাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়।

শিবনাথের বহু প্রবন্ধ গ্রন্থ আছে। তাঁর প্রবন্ধগুলি চিন্তা ও ভাষার ঐশ্বর্যে মণ্ডিত। শিবনাথ শাস্ত্রী কবি, ঔপন্যাসিক অপেক্ষা প্রবন্ধকার হিসেবে সবচেয়ে পরিচিত। তাঁর গদ্য রচনা রীতি ও ভাষা বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বলা যায়। তাঁর রচনায় ধ্রুপদী চেতনার আভাস পাওয়া যায়।

শিবনাথের কর্মজীবন, ধর্মজীবনে যে প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়— তা এযুগে বিরল বলা যায়। বাংলা সাহিত্যে শিবনাথ শাস্ত্রীর দান অপরিসীম। কিন্তু শিবনাথ নিজে বিশ্বাস করতেন, আগে মানুষ তারপরে সাহিত্য।

তবু বলতে দ্বিধা নেই শিবনাথ সাহিত্যের সকল শাখায় তাঁর স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বাংলা ১৩২৫ ইংরাজি ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে বাহাত্তর বছর বয়সে কল্যাণব্রতী শিবনাথ শাস্ত্রীর কর্মময় জীবনের অবসান হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

কবিতা

নির্বাসিতের বিলাপ ১৮৬৮

পুষ্পমালা ১৮৭৫

হিমাদ্রিকুসুম ১৮৮৭

পুষ্পাঞ্জলি ১৮৮৮

ছায়াময়ী পরিণয় ১৮৮১

শিব নির্মাল্য ১৯২০

উপন্যাস

মেজবৌ ১৮৮০

যুগান্তর ১৮৯৫

নয়নতারা ১৮৯৯

বিধবার ছেলে ১৯১৬

শিশুসাহিত্য

উপকথা ১৯০৭

ছোটদের গল্প ১৯৬০

প্রবন্ধ

এই কি ব্রাহ্ম বিবাহ ১৮৭৮

গৃহধর্ম ১৮৮১

জাতিভেদ ১৮৮৩

রামমোহন রায় ১৮৮৬

বক্তৃতা স্তবক ১৮৮৮

সাধুজীবন ১৮৯০

সমাজরক্ষা ও সামাজিক উন্নতি ১৮৯৫

ধর্মজীবন ৬খণ্ড ১৮৯৯--১৯০১

মাঘোৎসব উপদেশ ১৯০২

মাঘোৎসব বক্তৃতা ১৯০৩

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ ১৯০৪

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র .৯১০

আত্মচরিত ১৯১৮

আত্মপরীক্ষা ১৯৫২

ইংলণ্ডের ডায়রী ১৯৫৭

ইংরেজী প্রবন্ধের বই

History of the Brahmo Samaj 2V 1911-12

Theism as universal religion 1907

The Mission of Brahmo Samaj 1910

Men I have seen 1919

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮-১৯০৮

রমেশচন্দ্রের রচনায় স্বদেশচিন্তা

বিজিত কুমার দত্ত

১

রমেশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি রচনা করবার কারণ বলেছেন এইভাবে,

পাঠক! একত্র বসিয়া এক একবার দেশীয় গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক ও প্রাচীন সময়ের বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করিয়াছি। যদি সেই কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি, তবেই যত্ন সফল হইয়াছে, নচেৎ আমার পুস্তকগুলি দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।

বস্তুত উনিশ শতকের লেখকবৃন্দ দ্বিবিধ দায়িত্ব অঙ্গীকার করেছিলেন। তাঁরা রচনা-কর্মকে কেবল আনন্দের সামগ্রী মনে করেননি। বরং নীতি-শিক্ষার যে আদর্শ, সাহিত্যেরও যে তাই লক্ষ্য এই সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। সেই কারণে সাহিত্য-রচনার মাধ্যমে তাঁরা জাতিকে জ্ঞানে, শিক্ষায়, স্বদেশচর্চায়, ভাষায়, শিল্পে, কর্মে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

ইংরেজের সংস্পর্শে জাতির চিত্ত যখন অনুপ্রাণিত হল তখন নিজেদের দৈন্য নিশ্চয়ই আমাদের পীড়িত করেছিল। এই পীড়ন নিয়ে বেশিদূর চলা যায় না। আমাদের অভাববোধ যখন জেগে উঠল তখন তার পূরণের জন্য নূতন মন্ত্রে দীক্ষিত হবার প্রয়োজন দেখা দিল। এই অভাব মেটানোর জন্য মনীষিবৃন্দ যেভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম করে গিয়েছেন সেখানেই রয়েছে তাঁদের যথার্থ স্বদেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে উনিশ শতকে যাঁরাই দেশগড়ার কাজে নেমেছিলেন তাঁদের সকল প্রচেষ্টার মূলে ছিল গভীর দেশপ্রীতি। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউ যখন ভারতবর্ষের তটে আঘাত করল তখন একদিকে আমরা অন্ধ আনুগত্য ত্যাগ করতে উদ্‌গ্রীব হলাম অন্যদিকে নূতন সংস্কৃতির নিরিখে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়েছি। রামমোহন থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সেই প্রচেষ্টার ইতিহাস। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ গ্রন্থে সে বিবরণ দিয়েছেন।

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে গ্র্যাণ্ট ডফের 'হিস্টারি অফ্ দি মার্হাট্টাস্' ও ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস টডের 'অ্যানালস অফ রাজস্থান' বার হবার পর বাঙালি ভারতবর্ষের বীরত্বের ইতিহাস কথঞ্চিৎ জানতে পারলে। এ দুটি গ্রন্থের সাহায্যে শিক্ষিত বাঙালি দেশীয় শৌর্য-বীর্যের পরিচয় পেলে। এটা সে যুগের পক্ষে স্মরণীয় বস্তু। কেননা পলাশির যুদ্ধের গ্লানি বাঙালিকে পীড়িত করেছিল। অথচ নিজেদের, শৌর্যবীর্যের কাহিনীর ইতিহাস তার জানা ছিল না। সেই কারণে এই দুটি গ্রন্থে শিবজীর ইতিহাস ও রাজপুত জাতির গরিমা প্রত্যক্ষ করে বাঙালি ভারতবাসী রূপে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লক্ষ্মণসেনের পরাজয় কাহিনী অত্যন্ত খেদের সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছিল। অন্যান্য লেখকও নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বেদনা অনুভব করেছিলেন। বীরত্বের প্রতি নবোদিত উৎসাহে নিজেকে বাঙালি অন্যান্য বীরজাতির সমকক্ষ দেখতে চেয়েছিল। স্বদেশ প্রেমের উৎস থেকে এই বীরত্বস্পৃহা উৎসারিত। মধুসূদনের সাহিত্যকর্মে এই চেতনার রেখাপাত ঘটেছিল। সকলেই জানি রাবণের সেই স্মরণীয় উক্তি 'জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?' এ ছাড়াও ইন্দ্রজিৎ-কে যখন সমস্ত লঙ্কাবাসী সৈন্যপত্যে বরণ করে নিল তখন যেভাবে 'বন্দী রাজপুরীকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিল তা সমস্ত জাতিকে নিশ্চয়ই অনুপ্রাণিত করেছিল। বীরধাত্রী লঙ্কাপুরীকে শোকাবেশ পরিহার করে আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হবার জন্য এই আহ্বান আসলে মধুসূদনের সময়ের শিক্ষিত বাঙালির ধ্যান ও ধারণার প্রতিধ্বনি। মধুসূদন মেঘনাদবধে যেভাবে স্বদেশচেতনার কথা জানিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র তাকেই আরও জীবনের কাছাকাছি নিয়ে আসতে চাইলেন বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে। বঙ্কিমচন্দ্র মৃণালিনী উপন্যাসে সে উদ্যোগ করলেন। কিন্তু ইতিহাসের অভাবে সে চেষ্টা তেমন সার্থকতা পেল না। তথাপি বীরেন্দ্রসিংহের মহৎ ত্যাগ ও আদর্শ-কামনা বঙ্কিমচন্দ্র অবিচলিত নিষ্ঠা নিয়ে বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমশিষ্য রমেশচন্দ্র 'বঙ্গবিজেতা' ও 'মাধবীকঙ্কণে' এই বাঙালির বীরত্ব স্মরণ করলেন।

বঙ্গবিজেতায় রাজা টোডরমল্লের কাহিনী বর্ণনা করবার ইচ্ছে থাকলেও রমেশচন্দ্র প্রাধান্য দিয়েছেন—বাঙালি বীর সুরেন্দ্রনাথের (ইন্দ্রনাথ) কাহিনীকে। বাঙলাদেশে যে সময়ে মোগল-পাঠান বিরোধ দেখা দিয়েছিল সে বিরোধের অবসানের পর মোগলদের মধ্যেই যে আত্মকলহ ছিল সে

প্রসঙ্গ বর্ণনার মধ্যে রমেশচন্দ্র ইন্দ্রনাথ কাহিনী জুড়ে দিলেন। কারণ ইতিহাসের অভাবে উপন্যাস রচনা করে রমেশচন্দ্র আত্মশ্লাঘা বোধ করে ছিলেন। স্বদেশচেতনার অন্যতম লক্ষণ আত্মমর্যাদাবোধ। এই আত্মমর্যাদা-বোধ আসে তখনই যখন নিজেকে আর পাঁচটা জাতির সমকক্ষ মনে করতে পারি। বাঙালিও যে শৌর্যবীর্যে হীন নয় এইটি প্রমাণ করবার দায়িত্ব আসে তখন টোডরমল্লের, বঙ্গবিজয়ে ইন্দ্রনাথ অন্যতম সাহায্যকারী ছিল। বীরত্ব প্রদর্শন করে সে বাঙালির গৌরব বাড়িয়েছিল। রাজা টোডরমল্লের স্বীকৃতিদানের মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্র এই সত্যটি প্রতিষ্ঠা করলেন। বঙ্গবিজেতায় যা ছিল অস্ফুট মাধবীকঙ্কণে তাই স্ফুটতর হল। মাধবীকঙ্কণে নরেন্দ্রনাথ মোগল ভ্রাতৃদ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিল। রাজপুত চারণ কবিদের গীতের মধ্যে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম নরেন্দ্রনাথ শুনতে পেল তা আসলে রমেশচন্দ্র সমস্ত বাঙালিকে শোনাতে চেয়েছিলেন। জন্মভূমির প্রতি সম্ভ্রমবোধ এবং জন্মভূমির ঐশ্বর্যে গৌরববোধ চারণকবি শুনিয়েছে। রমেশচন্দ্র নরেন্দ্রের জবানিতে শিক্ষিত বাঙালির ক্ষোভের দিকটিকে বেদনা করুণসুরে বলেছেন,

"স্বদেশেও মহাবল পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তবে সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দশা কেন? যুদ্ধই রাজপুতদিগের ব্যবসা; বালক, বৃদ্ধ সকলেই যুদ্ধশিক্ষা করে। তাহারা ধন দিয়াছে, প্রাণ দিয়াছে, তথাপি স্বাধীনতা বিসর্জন দেয় নাই। সে গৌরবগীত আজিও আরবলীর কন্দরে, উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিনী গঙ্গানদী তাহার গৌরব গীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা প্রজা সকলেই বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। জগতে তাহাদিগের নাম নাই, বীরমণ্ডলীর মধ্যে তাহাদিগের স্থান নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্বদেশের ঠাকুরকে ভক্তি নিবেদন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র স্বদেশের গৌরবকে পুনরুদ্ধার করতে চাইলেন। নিজভূমিতে পরবাসী হয়ে থাকার মধ্যে যে হীনতা ও হীনমন্যতা আছে সেকথা উনিশ শতকে বাঙালী বুঝতে পেরেছিল। দেশের প্রতি এই প্রীতি-পক্ষপাত থেকে জন্মায় প্রকৃত দেশচর্চার সূচনা। এই দুটি উপন্যাসে রমেশচন্দ্র বাঙালির যে বীর্যের কথা বলেছেন তা রচনার শৈথিল্যের জন্য অনেকটা প্রচারধর্মী হয়ে পড়েছে। তবে এ দুটি উপন্যাস থেকেই তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার, ধ্যান-ধারণার একটা

পরিচয় লাভ করতে পারি যে ত্রুটি লক্ষ্য করি সেইটি প্রথম পদক্ষেপের অনভ্যাসজনিত ভুল-ভ্রান্তি।

কিন্তু 'মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাতে' রমেশচন্দ্র যথার্থ দেশচর্চার ইঙ্গিতাটিকে গ্রন্থের কেন্দ্রীয় ঘটনা রূপে ন্যস্ত করলেন। শিবজীর পতনবন্ধুর-অভ্যুদয়ের পথটিকে লেখক সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সাহায্যে বর্ণনা করলেন। শিবজী যেভাবে অশিক্ষিত মাওয়ালী জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে রণনিপুণ করে তুললেন তা ইতিহাসে বিরল ঘটনা। রমেশচন্দ্র একটি চিঠিতে লিখেছিলেন,

At Geneva after visiting the endless works of sculpture, I went to the top of the hill and there stood before me massive and simple tomb of one of Italy's greatest sons, Joseph Mazzini. That immortal patriot, along with the statesman labour and the soldier Garibaldi, planned and effected the independence of Italy only the other day, and we heard of the battles of Solferino and Magenta being fought when we were in school.

তারপর তিনি বলেছেন, কৃতজ্ঞ ইটালি এই তিনজন দেশনেতাকে স্মরণে রাখবার জন্য রাস্তা, শহর, পার্ক ইত্যাদিতে তাঁদের প্রতিমূর্তি নির্মাণ করে রেখেছে। উনিশ শতকে রমেশচন্দ্র কৃতজ্ঞতা দিয়ে স্মরণ করলেন শিবজীকে। শতধাবিচ্ছিন্ন ইটালি এবং জার্মানী ম্যাটসিনি, কাভুর এবং গ্যারিবল্ডির ও বিসমার্কের নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। দেশগড়ার স্বপ্ন এঁরা সকলেই দেখেছিলেন। মনোবলের চূড়ান্ত রূপ দেখি গ্যারিবল্ডির জীবনে। রমেশচন্দ্রও শিবজীর মনোবলের প্রশংসা করেছেন। উপরোক্ত চিঠি থেকে জানতে পারি ছাত্র অবস্থায় রমেশচন্দ্র এঁদের কথা শুনেছিলেন। বস্তুত এই দেশনায়কবৃন্দ শিক্ষিত বাঙালির চিত্তকে স্পর্শ করেছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের জীবনীগুলিই তার প্রমাণ। নবীনচন্দ্র তাঁর ত্রয়ী কাব্যে এঁদের জীবনকথাই শ্রীকৃষ্ণের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও কৃষ্ণচরিত্রে এঁদের জীবনাদর্শের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রমেশচন্দ্র শিবজীর মধ্যে দেশনায়কের স্বপ্ন দেখতে পেলেন। এই কারণে শায়েস্তা খাঁর ঘটনা এবং রুদ্রপুর দুর্গ আক্রমণের বৃত্তান্ত রমেশচন্দ্রের রচনাকর্মে এতটা উজ্জ্বল এতটা আবেগদীপ্ত। মোগল সেনাপতি হয়েও জয়সিংহ শিবজীর প্রশংসা করেছেন।

'শীঘ্র কি বিলম্বে এই প্রাসাদতুল্য মোগলরাজ্য বোধ হয়; ধূলিসাৎ হইবে. তাহার পর পুনরায় হিন্দুর প্রাধান্য। মহারাষ্ট্রীয় জীবন অঙ্কুরিত হইতেছে. যৌবনতেজে বোধ হয়, ভারতবর্ষ প্লাবিত হইবে। শিবজী। আপনার স্বপ্ন স্বপ্ন নহে, ভবানী আপনাকে মিথ্যা উত্তেজনা করেন নাই।'

শিবজীর স্বপ্নকে অবলম্বন করেই যে এককালে মহারাষ্ট্র ও বাঙালীর মধ্যে রাখীবন্ধন স্থাপিত হয়েছিল সেকথা কারো অজানা নয়। রবীন্দ্রনাথ শিবাজী-উৎসবে শিবজীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে বৃহত্তর পটভূমিকায় দেখেছিলেন। রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাস বেরিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামের অনেক আগে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাশক্তির বিশালতা রমেশচন্দ্রের ছিল না। কিন্তু তিনিও যেভাবে রঘুনাথ হাবিলদারের রণদেব মূর্তি অঙ্কন করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের সিংহবাহিনী শ্রী-র কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন শত্রু কর্তৃক শিবজীর সৈন্যরা পর্যুদস্ত তখন রঘুনাথ হাবিলদারের অসমসাহসিকতা সে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। দেশচর্চায় এই স্থৈর্য ও সাহসের প্রয়োজন ছিল। উনবিংশ শতকে কয়েকটি নাটকে বাঙালির হীনবীর্যতার ব্যঙ্গের আকারে পরিবেশিত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় "ভারত-উদ্ধার" কাব্যে বাঙালির বীরত্বকে ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে কশাঘাত করেছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'রমেশচন্দ্র ঔপন্যাসিকগণ বাঙালি এবং ভারতবাসীর শৌর্যবীর্যের যথার্থ রূপটি জাতির সামনে তুলে ধরলেন। রমেশচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিতে যুদ্ধবর্ণনায় যে বাস্তব রূপ অঙ্কন করলেন তাও বইয়ের জগতের নয়। কিম্বা স্কটের অনুকরণ নয়। প্রকৃত দেশপ্রেরণা ছিল বলেই তিনি যুদ্ধের দৃশ্যগুলিকে জন্মভূমি রক্ষার জন্য আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তরূপে স্থাপন করেছেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি; পাঠান সেনাপতি রহমৎ খাঁর বীরত্বের দৃশ্যগুলি। রমেশচন্দ্র এই চরিত্রটিকেও সহানুভূতি দিয়ে অঙ্কন করেছেন। প্রথমে শিবজীর শত্রুর প্রশংসা একটা সংশয়ের অবকাশ এনে দেয়। কিন্তু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে আমাদের ঔপন্যাসিকেরা পাঠান বীরত্বকে শিরোপা দিয়েছেন বরাবর। বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছিলেন ওসমানকে। রমেশচন্দ্র রহমৎ খাঁকে। শিবজীর বন্দী হয়েও রহমৎ খাঁ পরাজয় মেনে নিলে না। রহমৎ খাঁ মৃত্যুদণ্ডের জন্য প্রস্তুত হল। তার নির্ভীক উক্তি শিবজীকে মুগ্ধ করে। শিবজী রহমৎ খাঁকে মুক্তি দিলেন। এতে দণ্ডিত এবং দণ্ডদাতার মহিমা স্বমর্যদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এখন পাঠানবীরের প্রতি এই সম্বন্ধ দৃষ্টির কারণ কি? আমাদের মনে হয় মোগলের বিরুদ্ধে পাঠানদের সংগ্রামকে বাঙালি লেখকবৃন্দ একটু ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছিলেন। মোগলদের দ্বারা শাসিত হওয়ার ফলে মোগলদেরই আমরা শত্রুপক্ষ মনে করেছি। পাঠানদের সংগ্রামের মধ্যে বিজিতের উত্থান প্রত্যাশিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে স্বদেশচেতনা জাগ্রত হল তা পাঠানবীরদের কর্মপ্রেরণার মধ্য দিয়ে কথঞ্চিৎ স্ফূর্তি পাবার চেষ্টা করলে। আরও একটি কথা। 'বিবিধার্থ' সংগ্রহে পাঠান জাতি সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধ বেরিয়েছিল তাতেও পাঠানদের প্রতি প্রশংসা উদ্গীত হয়েছে। বীরত্ব এবং "অতিথি সপর্যা" পাঠান চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র সেই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করেছিলেন।

মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতে রমেশচন্দ্র আরও একটি দুরূহ ব্রতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাও স্বদেশাত্মবোধেরই ফল। সেইটি এই। রমেশচন্দ্র যখন তাঁর উপন্যাসগুলি রচনায় ব্রতী হলেন তখন বাঙলা দেশে ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রটি প্রসারিত হয় নি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ মনীষী তখন ইতিহাস গবেষণার সূত্রপাত করেছেন মাত্র। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে বিচার করলে অবশ্য বলতে হয় এঁদেরও আগে ইতিহাসচর্চা শুরু হয়েছিল। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এঁরাই বাঙালিকে ঐতিহাসিক গবেষণায় দীক্ষিত করেছেন। এঁদের ইতিহাস চর্চার মূলসূত্রটি কি? সম্ভবত মিথ্যাময়ী ইতিবৃত্তের মুখরতাকে তিরস্কার করে যথার্থ ইতিহাসের স্থাপন। শিবজী সম্বন্ধে ডফ্ যে বইটি লিখলেন তাতে পক্ষপাত-দুষ্টতা ছিল। শিবজী সম্বন্ধে প্রশংসা থাকলেও ডফ্ সুযোগ পেলেই শিবজীর অবিমৃষ্যকারিতা এবং নিষ্ঠুরতার দিকগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। ভূদেব, রমেশচন্দ্র সেই মিথ্যা-ভাষণের জীর্ণতা থেকে শিবজীকে উদ্ধার করলেন। ভূদেবের মধ্যে সে প্রচেষ্টা ক্ষীণ ছিল। কেননা তিনি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রোমান্স রচনায় প্রয়াসী ছিলেন। রমেশচন্দ্রই শিবজীকে স্বচ্ছ ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। এ কাজ ঐতিহাসিকের। তিনি রচনা করেছেন উপন্যাস। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকেরা ইতিহাসের সত্যবস্তু উপন্যাসের পাত্রে পরিবেশনে আগ্রহী ছিলেন। কেবল আগ্রহই নয় এঁরা নিজেদের দায়িত্ব মনে করেছিলেন। রমেশচন্দ্র যে নিপুণতায় চন্দ্ররাও জুমলাদার কাহিনীটিকে শিবজী কাহিনীর সঙ্গে জুড়ে

দিয়েছিলেন তার মূলে বোধ করি এই প্রেরণা। চন্দ্ররাও-কে শিবজী হত্যা করেছিলেন। ডফ্ এই ব্যাপারটিকে বাড়িয়ে দেখেছিলেন। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্যকে অবিকৃত রেখেও এই ঘটনাটির মধ্য দিয়ে শিবজীর স্থির বুদ্ধির পরিচয়টিকে প্রকাশ করে দিলেন। 'জীবন-প্রভাতে' জয়সিংহ এবং শিবজীর সংলাপগুলি তাৎপর্যপূর্ণ। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ও এই প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছিলেন। কিন্তু রমেশচন্দ্র একে আরও ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী করে দিলেন। 'জীবনসন্ধ্যা'য় রাজপুত ঐশ্বর্য বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে রমেশচন্দ্র রাজপুতদের জ্ঞাতিবিরোধ প্রসঙ্গটি বিস্তৃত করেছেন। এর প্রয়োজন ছিল। নবীনচন্দ্র সেন তাঁর ত্রয়ী কাব্যে এই বিরোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিরোধের বিষময় ফল জাতির সামনে তুলে ধরবার প্রয়োজন ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে কখনও প্রকাশ্যে কখনও আড়ালে এই বিরোধ জেগে উঠত। ধর্মগত কিংবা শ্রেণীগত বিরোধ ঐক্যের প্রধান অন্তরায়। অথচ স্বদেশচেতনা তখনই সার্থক হতে পারে যখন তা সম্মিলিত প্রয়াসের মধ্য দিয়ে একটা ঐক্যবদ্ধ রূপ লাভ করতে পারে। রাণাপ্রতাপ সিংহ, তিলক সিংহ, দুর্জয় সিংহের মধ্যে সাহসের অভাব ছিল না। দেশ-প্রেমের জলন্ত আদর্শ তাঁদের কর্মে উৎসাহ দিত, কর্তব্যে এঁরা ছিলেন অটল। কিন্তু জ্ঞাতিবিরোধের রন্ধ্রপথে শনি প্রবেশ করল। ফলে একটা মহৎ জাতির পতন সূচিত হল। জয়সিংহ তা বুঝতে পেরেছিলেন। সেই কারণে শিবজীকে তিনি সাবধান করে দিয়েছিলেন। শিবজীর মধ্যে ছিল সহিষ্ণুতা, চাতুর্য, বীর্য, সাহস ও স্বজাতির প্রতি অপক্ষপাত আচরণ। স্বদেশপ্রেমের এইটি গোড়ার কথা। রমেশচন্দ্র তাকেই স্পষ্ট, উজ্জ্বল করে দেখালেন।

কিন্তু স্বদেশপ্রেম বলতে কেবলমাত্র বীরত্ব উন্মাদনাকেই বোঝায় না। জাতিগঠনের প্রয়োজনও রয়েছে। এই সকল উপন্যাসের মধ্যে সেই প্রচেষ্টা কোথাও স্পষ্টভাবে কোথাও ক্ষীণভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। 'বঙ্গবিজেতা' এবং 'মাধবীকঙ্কণে' রমেশচন্দ্র অপরিমিত লালসার বিকৃত রূপ প্রদর্শন করলেন। সুরেন্দ্রনাথের ভাগ্য বিপর্যয়ের মূলে ছিল জমিদার সতীশচন্দ্রের স্বার্থপরতা। "পাপপথে সর্বদাই ভয় সরল ধর্মপথ নিরাপদ ও নিষ্কণ্টক"— এই ধ্রুববাক্যের উদাহরণ সতীশচন্দ্র ইন্দ্রনাথ প্রভৃতি চরিত্র। দেশসেবায় চাই আত্মত্যাগ এবং স্বার্থবিসর্জন। এই আত্মত্যাগের ও স্বার্থ বিসর্জনের

পরিচয় পাই ইন্দ্রনাথের চরিত্রে। আর পাপপথের কলঙ্ক লিপ্ত হয়েছে সতীশচন্দ্রের আচার-আচরণে। শেষ পর্যন্ত সতীশচন্দ্র তার লোভের পরিণাম বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু তখন ফেরার পথ ছিল না।

দেশচর্চা অনেক সময় উত্তাপ উত্তেজনাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়, যদি না তা দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। রমেশচন্দ্রের আদর্শ নায়কেরা ধর্মবোধকে অস্বীকার করে নি। রমেশচন্দ্র যেভাবে ধর্মের ব্যাখ্যা করেছেন তাতে দেখতে পাই তাঁর ধর্মও উদার মানবনীতির উপর স্থাপিত। শিবজী অশিক্ষিত। কিন্তু ধর্মকে তিনি অবহেলা করেন নি। ধর্মবোধের জন্যই শিবজীর চরিত্র গড়ে উঠেছিল। যে ধর্ম বিভেদকে বড় করে না সকলের প্রতি সমদর্শী হতে শেখায় শিবজী সে ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছিল। কেবল ধর্মবোধ নয় রমেশচন্দ্রের কয়েকটি নারী চরিত্র যে ধৈর্য ও তিতিক্ষার পরিচয় দিয়েছে তাতে করেও তাঁর চরিত্রশক্তির উপর অটুট আস্থার কথা জানতে পারি। সরযূবালা, সাহিত্যের দিক দিয়ে বিচার করলে খুব উচ্চাঙ্গের নয়। কিন্তু রঘুনাথ হাবিলদারের জন্য তার দীর্ঘ প্রতীক্ষা আমাদের মুগ্ধ করে। রঘুনাথ যখন সত্যে প্রতিষ্ঠিত হল তখনই আসন্ন মিলনের ক্ষণটি উপস্থিত হয়েছিল। যশোবন্তের পত্নীর কাহিনী অবশ্য টডের রাজস্থান থেকে গৃহীত। রমেশচন্দ্রের পিতৃব্য শশিচন্দ্র এই মহিলাকে অবলম্বন করে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র ক্ষাত্রবীর্যের মহিমা এই নারীতে দেখতে পেয়েছিলেন। শিবজীর মাতৃভক্তিও উপেক্ষণীয় নয়। কতগুলি সনাতন আদর্শকে বিসর্জন দেওয়ার মধ্যে বীরত্ব নেই। রমেশচন্দ্র শিবজীর মাতৃ-ভক্তির মধ্য দিয়ে সেই কথাটাই বলেছেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে আর একভাবে স্বদেশপ্রীতি উদ্গীত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীতপ্রীতি কেবল রোমান্স-রস পরিবেশন করার জন্যই আসে না। বরং অতীতের সুখ-দুঃখ বিরহমিলনপূর্ণ জীবনকে বর্তমানের পাত্রে স্থাপন করে তারা জাতিকে আত্মস্থ হতে নির্দেশ দিয়ে থাকেন। 'বঙ্গবিজেতা' উপন্যাসে টোডরমল্লের বিচারসভার রাজনীতিক গুরুত্ব বিশেষ কিছু নেই। কিন্তু রমেশচন্দ্র এই বিচারসভাকে যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে করে অতীত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। নিবিড় মমত্ববোধ নিয়ে রমেশচন্দ্র এই দৃশ্যগুলি প্রকাশ করেছেন। অতীতে বাঙলার উৎসব ছিল, কবির সভা ছিল, লোকের মধ্যে আনন্দ ছিল, লোকের মধ্যে সংকীর্ণবুদ্ধি সময়ে সময়ে লুপ্ত হত। এই সকল কথা বলার

সার্থকতা এইখানে যে, বর্তমান কালে জীবনের সেই সতেজ প্রাণাবেগের স্বচ্ছ-প্রবাহ আসুক। স্কটও স্বদেশবাসীকে অতীতের গৌরবের দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে স্কটল্যাণ্ডবাসীকে সচেতন করেছিলেন। এই সব চিত্রের মধ্য দিয়ে জাতির আত্ম-সাক্ষাৎ হয়। মাধবীকঙ্কণে আছে এই রকম দৃশ্য শারদীয়া পূজার বর্ণনায়। দেশ যখন পরাধীন থাকে তখন স্বভাবতই "ছোটো ইংরেজে"র দংশন তীক্ষ্ণ হয়। রমেশচন্দ্র নিজেও এই দংশন অনুভব করেছিলেন। সেই কারণে দেশের মহিমাকে এইভাবে স্পষ্ট করে তুলতে হয়।

রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে ভীলদের প্রসঙ্গ মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে। ভীলরা রাজপুতদের কাছে পদানত। নিজ বাসভূমে পরবাসী তো বটেই। এমন কি তারা সমতলভূমি ছেড়ে পার্বত্যভূমি আশ্রয় করেছে। এই বিজিত জাতির করুণ আলেখ্য রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তেমন প্রাধান্য না পেলেও রমেশচন্দ্র ইঙ্গিতে তাদের কথা বলেছেন। তাকেই বিস্তৃত রূপ দিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী বিদ্রোহ উপন্যাসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটকেও এই প্রসঙ্গ সহানুভূতির সঙ্গে চিত্রিত হয়েছে :

সংসার সমাজ গ্রন্থ দুখানি একালের ইতিহাস। এ দুটি উপন্যাসে তিনি বিধবাবিবাহ এবং অসবর্ণ বিবাহ সমর্থন করেছেন। একদিকে প্রাচীন প্রথা নিয়মকে অঙ্গীকার করে রমেশচন্দ্র যেমন ঐতিহ্যকে স্বীকার করেছিলেন, তেমনই অন্যদিকে শিক্ষার ফলে যে সকল প্রাচীন প্রথা অযৌক্তিক বলে মনে হয়েছে তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। এ-বিষয়ে অবশ্য বিদ্যাসারের প্রেরণাই মূলে ছিল। রমেশচন্দ্রকে বিদ্যাসাগর স্নেহ করতেন। দেশচর্চায় বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন অসামান্য ঘটনা। কিন্তু রমেশচন্দ্রই প্রথম সাহিত্যে তাকে প্রকাশ করলেন। এইখানেই দেখি রমেশচন্দ্রের মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টি।

২

মহারাষ্ট্র-জীবনপ্রভাতের একস্থানে রমেশচন্দ্র বলেছেন।

নব্য পাঠক! তুমি ইলিয়দ্ ও ইনিয়দ্ পাঠ করিয়াছ, দান্তে ও সেক্সপীয়র, গেটে ও ইউগো পাঠ করিয়াছ, সাদী ও ফরদুসী পাঠ করিয়াছ, কিন্তু হৃদয় অন্বেষণ কর, হৃদয়ের অন্তরে কোন্ কথাগুলি সরসভাবপূর্ণ মনে হয়? হৃদয়

কোন কথায় অধিকতর আলোড়িত প্রোৎসাহিত বা মুগ্ধ হয়? ভীষ্মচার্যের অপূর্ব বীরত্ব কথা, দুঃখিনী সীতার অপূর্ব পাতিব্রত্য কথা, হিন্দুমাত্রেরই হৃদয়ের স্তরে স্তরে গ্রথিত রহিয়াছে, একথা যেন হিন্দুজাতি কখনও বিস্মৃত না হয়।

এই উক্তিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ উনবিংশ শতাব্দীতে বিদেশী সাহিত্যের ঐশ্বর্য ও সম্পদে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের তুলনায় ইংরেজি সাহিত্য অথবা ইউরোপের অন্যান্য সাহিত্যের ক্রমপরিণতি অনেক ব্যাপক ও বিশাল। 'ইয়ং বেঙ্গলে'র তরুণযুবকেরা পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-রস আকণ্ঠ পান করেছিলেন। ভাষায়, সাহিত্যে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে সর্বতো-ভাবে পাশ্চাত্ত্যরীতিকে স্বীকার করাটাই তদানীন্তন কালের শিক্ষিত যুবকদের বিশেষত্ব ছিল। যে গভীর আবেগে তাদের চিত্তভূমি বিলোড়িত হয়েছিল তার ফল যে সব সময় ভাল হয়েছে এমন বলি না। কিন্তু তাঁরা যে ধারা বাংলাদেশে প্রবাহিত করলেন তা অদৃষ্টপূর্ব এবং অভূতপূর্ব। যেখানে তাঁরা সার্থক হয়েছেন সেখানে বাংলাদেশ লাভবান হয়েছে, যেখানে তাঁরা ব্যর্থ হয়েছেন সেখানে পরবর্তীকালের লেখক এবং চিন্তানায়কেরা শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু বিনা স্বদেশী ভাষা বাঙালির আশা মিটতে পারে না। আর তাতে জাতীয় গৌরবও প্রতিষ্ঠিত হয় না। পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষা আমাদের কেবল বহির্মুখী করেনি, সে শিক্ষা অন্তর্মুখী করেছিল। আমাদের সাহিত্যের অভাবমোচনের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করলাম। ইলিয়দ ইনিয়দ নেই। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যে এপিকের রস পরিবেশন করবার চেষ্টা করলেন। সেক্সপীয়র নেই সত্য কথা। আমরা চেষ্টা করলাম নাটক সৃষ্টি করতে। ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপনের মূলে নিশ্চয়ই এই অভিমান ছিল। আমাদের সাহিত্যে উপন্যাস নেই। বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্স উপন্যাস রচনা শুরু করলেন। এইভাবে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সংস্পর্শে জাতিগত প্রেরণা এল। স্বদেশপ্রীতির অন্যতম ফলশ্রুতি হল এই। প্রত্নতত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করা হল। চিন্তায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর এলেন। রমেশচন্দ্র 'বঙ্কিমচন্দ্র ও আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্য' প্রবন্ধে বলেছেন :

'অর্ধ শতাব্দী পূর্বে আমাদের নিজের ধন প্রায় কিছু ছিল না, আমরা কাঙালীর ন্যায় ফিরিতাম, অদ্য আমাদের নিজের একটু [illegible]সঞ্চয় হইয়াছে। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র তাহার প্রধান আহরণ-কারী। এখন আমরা দর্প

করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যের কথা বলি, স্নেহ করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্যকে যত্ন করি, বাৎসল্যের সহিত বঙ্গীয় সাহিত্যকে পালন করি। ধনের সহিত একটু শক্তি হইয়াছে—রাজনীতিতে বল, প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে বল, সাহিত্য সম্বন্ধে বল প্রাচীন ধর্ম সম্বন্ধে বল, আমাদের নিজের ধনের একটু স্পর্ধা করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা কেবল বিদেশীয়দিগের স্তুতিবাদক নহি। দেশীয় আচার ব্যবহারে বীতরাগ নহি, দেশীয় ইতিহাসে মূর্খ নহি, এবং দেশীয় ধর্মে অবহেলা করি না।...এটি উন্নতির লক্ষণ, মঙ্গলের লক্ষণ।'

১৩০১ সালে রমেশচন্দ্র যে কথাগুলি প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, সে কথা তাঁর সম্বন্ধেও খাটে। ১৮৭২ সালে বঙ্গদর্শন বার হলে বাঙলা দেশ ব্যাপকভাবে জাতীয় উন্নতিতে আত্মনিয়োগ করলে। বঙ্কিমচন্দ্র বললেন, শিক্ষিত বাঙালি এক সম্প্রদায় চাইছেন ইংরেজিতে সব কিছু হোক আর এক সম্প্রদায় চাইছেন সব কিছু সংস্কৃতে হোক। একদলের মতে,

'যাহা কিছু বাঙ্গলা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয় অপাঠ্য নয় ত কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র ; ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গলায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি ?

অন্য দল সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডিত্যাভিমানীদিগের ভাষায় যেরূপ শ্রদ্ধা, তদ্বিষয়ে লিপিবাহুল্যের আবশ্যকতা নাই।'

সুতরাং যাঁরা বাঙলা ভাষায় সেযুগে চর্চা করছিলেন তাঁদের পথ রাজপথ ছিল না। বাঙলাভাষা যে জাতির সর্বজনগ্রাহ্যরূপ এ বোধ সকলের মধ্যে জন্মায়নি। সকলেই মনে করতেন কয়েকজন লোক শিক্ষিত হলেই আপনা আপনি অন্যান্য লোকেরা শিক্ষিত হয়ে উঠবে। অর্থাৎ "ফিল্টার ডৌনে"র ব্যবস্থা। বঙ্কিমচন্দ্র রসিকতাচ্ছলে বলেছেন,

'এতকাল শুষ্ক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা দেশ উচ্ছন্ন দিতেছিল এক্ষণে নব্য সম্প্রদায় জলযোগ করিয়া দেশ উদ্ধার করিবেন। কেননা, তাঁহাদিগের ছিদ্রগুণে ইতর লোক পর্যন্ত রসার্দ্র হইয়া উঠিবে।'

বঙ্কিমন্দ্র যে কি দুস্তর বাধা অতিক্রম করেছিলেন তা একালে বোঝা সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলাভাষা ও সাহিত্য রচনায় একাই ব্রতী হলেন না। রমেশচন্দ্র যে ধনসঞ্চয়ের কথা ও শক্তির প্রসঙ্গ এনেছিলেন তার মূলে ছিল বঙ্কিম অনুগামী সাহিত্যিকগণ। রমেশচন্দ্র এঁদের অন্যতম। জার্মান দার্শনিক লাইবনিংস তাঁর ভাষা বিষয়ক প্রবন্ধে বলেছিলেন যে, জাতীয়

চেতনা জাগলেই ভাষার মধ্যে জাতীয় সম্পদ লক্ষিত হয়। স্বদেশচর্চার ফলে আমাদের মধ্যে যে জাতীয় প্রেরণা জাগল তার প্রকাশ লক্ষ্য করি ভাষায়। কেবল ভাষায় নয় জাতীয় ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারে। রমেশচন্দ্র এ বিষয়ে রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। তিনি ঋগ্বেদের অনুবাদে ব্রতী হলেন। এই অনুবাদের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বাঙালির অগ্রসৃয়মান অংশের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্ফূর্তি ঘটল। উইলিয়ম জোন্সের উৎসাহ ও প্রেরণায় যার শুরু বিদ্যাসাগরের মাধ্যমে যে প্রেরণা জাতিকে উৎসাহিত ও সংস্কৃত ভাষা চর্চায় কৌতূহলী করে তুলল, রমেশচন্দ্রে এসে তা সৌন্দর্যমণ্ডিত হল। কালীপ্রসন্ন সিংহের উদ্যমের কথা এই প্রসঙ্গে অবশ্যই স্মরণীয়। রমেশচন্দ্র একদিকে চন্দ্রচূড় জটাজাল থেকে জাহ্নবীকে মুক্ত করে বাঙলাদেশে প্রবাহিত করলেন, অন্যদিকে রামায়ণ মহাভারতকে ইংরাজিতে অনুবাদ করে ভারতীয় মহাকাব্যের সৌন্দর্য বিদেশে পৌঁছে দিলেন। ভাবতে অবাক লাগে একই ব্যক্তির মধ্যে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রাচ্যবিদ্যার প্রতি মমত্ববোধ এসে মিলেছিল। তিনি বিদেশী এ দেশী এই উভয় ধারার সমন্বয় সাধন করলেন। ঋগ্বেদ অনুবাদ তাঁর আগে আর কেউ করেননি। এ বিষয়েও তিনি বঙ্কিমচন্দ্র কথিত পাণ্ডিত্যাভিমানীদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উৎসাহ এবং অন্তরের প্রেরণায় তিনি একাজে অগ্রসর হলেন। তিনি যে সার্থকতা পেয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদের অনুবাদের মূলে ছিল ঐতিহ্যনিষ্ঠা। জাতীয়তাবোধ কেবলমাত্র একটা idea নয়। তা ধ্যানগম্য বটে। তবুও কতকগুলি বিশেষ বস্তুকে অবলম্বন করেই সে ধ্যান রূপায়িত হয়। ঋগ্বেদের অনুবাদের মধ্য দিয়া পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যজাতির সঙ্গে সাধর্ম্য স্থাপিত হল। যে সমস্ত সভ্যতার চূড়া দেখে আমাদের বিস্ময় জাগে ঋগ্বেদ তার একটি চূড়া। রমেশচন্দ্র এই ঋগ্বেদ অনুবাদ করে প্রাচীন সভ্যজাতির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র স্থাপন করলেন। কেবল তাই নয় এই অনুবাদের ফলে বাঙলা-ভাষাও শক্তিশালী হল। যে পণ্ডিতবৃন্দ রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদকর্ম সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তাঁরা জানতেন না পণ্ডিতের আইন অমান্য করেই বাঙলাভাষার যাত্রা শুরু হয়েছিল। চৈতন্যদেবের সময় থেকে সেই আইন অমান্য আন্দোলনের শুরু। রমেশচন্দ্র প্রমুখ মনীষিবৃন্দ জাতির উদ্বোধনের দিনে এইভাবে জাতিকে গৌরবান্বিত করে তুললেন। ইলিয়দের যে প্রসঙ্গ

দিয়ে এই অংশের সূত্রপাত করেছিলাম তাও যে আমাদের আছে তা প্রমাণ করলেন রামায়ণ মহাভারত অনুবাদ করে। রমেশচন্দ্রের ঋগ্বেদ অনুবাদ সম্বন্ধে সেকালের Bengalee পত্রিকার এই মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য :

Modern india as it seeks to give effect to the lessons which it has learnt from the West draws nearer to its own ancient traditions and habits of life.

নবজীবন পত্রিকায় "ঋগ্বেদের দেবগণ" প্রবন্ধগুলিতে রমেশচন্দ্র এই সমস্ত দেবতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ঋগ্বেদ সংহিতার মূল্য নির্ধারণ করবার প্রয়াসও পেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের এ কাজে উৎসাহী ছিলেন। বঙ্কিম-গোষ্ঠীর লেখকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র গুরুর শিক্ষাকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন।

কেবল ঋগ্বেদ অনুবাদই নয় তিমি পণ্ডিতের সাহায্যে হিন্দুশাস্ত্রও সংকলিত ও অনুবাদ করেছিলেন। এ সকল কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করে তিনি আনন্দ পেতেন। বস্তুত কর্মে ও সৃষ্টিতে রমেশচন্দ্র দেশসেবার আদর্শটিকেই বড় করে ধরেছিলেন।

রমেশচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা Literarture of Bengal. এই গ্রন্থটি রচনা করে রমেশচন্দ্র প্রমাণ করলেন বাঙলা-সাহিত্যেও অবহেলার বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে রামগতি ন্যায়রত্নের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের পর রমেশচন্দ্রের গ্রন্থই সব দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। সেকালে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র স্মরণীয় নাম ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর। রমেশচন্দ্র প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করে অন্যান্য কবিদের প্রতিষ্ঠিত করলেন। ফলে বাঙালি তার অতীত ইতিহাস জানতে পারলে। উইলিয়ম হান্টার এই বইটিকে সমাদর করেছিলেন। সে সময়ের Englishman কাগজে বইটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়। দেশাত্মবোধ থেকেই যে এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে সেকথা Englishman কাগজে উল্লিখিত ছিল। ইংলিশম্যান কাগজের একটি মন্তব্য :

It will surprise many to learnt that Bengali has a literature worth writing about.

সেকালে Times পত্রিকাও গ্রন্থটির প্রশংসা করেছিল।

The conspicuous merit of his book is its frank acknow-

ledgement that no literary snccess which an Indian can make in English or any exotic tongue, is to be compared as regards its value to his countrymen with first class work in his own language. It is this instinct of literary patriotism which animates the best Bengali writers, and which has written a century created a prose literary languge for Bengal.

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে literary patriotism কথাগুলি লক্ষণীয়। বস্তুত সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করার মূলে গভীর দেশাত্মবোধ ক্রিয়াশীল হয়। ইতিহাসকে গ্রীক ঐতিহাসিকেরা Guardian Deity বলেছেন। রমেশচন্দ্র ইতিহাস রচনার দ্বারা আমাদের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করলেন।

৩

রমেশচন্দ্রের ইকনমিক হিস্টরি অফ্ ইণ্ডিয়া গ্রন্থ দুখানি সুপরিচিত। ভারতের অর্থনীতিবিদ্‌রা আজও এই বই দুখানিকে আকর গ্রন্থের মর্যাদা দিয়ে থাকেন। কিন্তু মনে হয় রমেশচন্দ্রের এ বিষয়ে প্রথম প্রচেষ্টার কথা আমরা স্মরণে বিশেষ রাখিনি। তাঁর Peasantry of Bengal বইখানি এককালে বাঙলা দেশে আলোড়ন এনেছিল। ১৮৭২ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ এই বিশ বছবের আয়োজনে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সঞ্জীবচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, লালবিহারী দে এবং রমেশচন্দ্র এই চারজনে বাঙলা দেশের কৃষকদের দুরবস্থার কথা জানালেন। সকলেই নিজের চিন্তা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করলেও এই মনীষীদের চিন্তাকর্মের মধ্যে একস্থানে ঐক্য ছিল। সে হচ্ছে সকলেরই বাঙলার নিরন্ন ও দরিদ্র প্রজাদের প্রতি সহানুভূতি। সঞ্জীবচন্দ্রের Bengal Ryot (১৮৬৪), বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদেশের কৃষক, রেভারেণ্ড লালবিহারী দে-র বেঙ্গল পেজাণ্ট লাইফ বা গোবিন্দ সামন্ত (১৮৭৪) এবং রমেশচন্দ্রের দি পেজান্ট্রি অফ্ বেঙ্গলে (১৮৭৫) বাঙলা দেশের রায়তদের নিদারুণ অবস্থা শিক্ষিত বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। নদীয়া ও পাবনা জেলার ভূমি ব্যবস্থার বিশৃঙ্খলা এই সময়েই সকলের নজরে আসে। রমেশচন্দ্র যখন এই বই লিখলেন তখন স্বভাবতই তাঁর গ্রন্থ সমাদর পেল।

দি পেজান্ট্রি অফ্ বেঙ্গল রমেশচন্দ্রের স্বদেশচর্চার অন্যতম নিদর্শন। মনে রাখতে হবে তখনকার দিনে সরকারের কাজের সমালোচনা করা সহজসাধ্য ব্যাপার ছিল না। এই বইটির মাধ্যমে রমেশচন্দ্র লক্ষ লক্ষ কৃষকের বেদনাকে মূর্ত করে তুললেন। রমেশচন্দ্র জানতেন এই বই ছাপা হলে তিনি ইংরাজ সরকারের অপ্রীতিভাজন হবেন। তথাপি তিনি বই ছাপালেন। এই বইটিতে তিনি সরকারকে রায়তদের মধ্যে যে জাগরণ এসেছে তার প্রতি লক্ষ্য করতে বলেন। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য যে সকল আইন প্রণয়ণ করা হয়েছে সেগুলি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র উৎসাহ বোধ করেন নি। যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সৃষ্টি হয়েছিল তিনিও সেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চেয়েছেন। তবে তার স্বরূপ আলাদা। পূর্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল সরকার ও জমিদারের মধ্যে বোঝাপড়া। রমেশচন্দ্র চেয়েছেন রায়ত ও জমিদারের মধ্যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হোক। জমিদারের অত্যাচারের কথা স্মরণে রেখেই রমেশচন্দ্র একথা বলেছিলেন। জমিদারের অধীনে রায়তদের অনন্তকালের বন্ধন মোচনের প্রয়াসী ছিলেন রমেশচন্দ্র। সেই কারণে তিনি বলেছেন :

Our rulers will not, cannot, once more degrade the raiyat to his pristine position of servitude under the zamindars—the only other measure then to heal the ill-feeling between two classes, and to put a stop to the mass of litigation that is eating into the very vitals of an agicultural population, is to raise the status of the raiyats. Let the rates of rent now payable be carefully ascertained after an extensive survey, and let such rates be declared fixed for ever.

এই থেকে বুঝতে পারি রমেশচন্দ্র তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালির চিন্তার সঙ্গে ঐকমত্য স্থাপন করেছিলেন। রমেশচন্দ্র জানতেন তাঁর এই মন্তব্য "a nest of hornets"দের উত্তেজিত করবে। কিন্তু তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর আশঙ্কাই ঠিক হল। কৃষ্ণদাস পাল হিন্দু পেট্রিয়টে এই বইটির বিরুদ্ধ সমালোচনা করলেন। তিনি আখ্যা দিলেন রমেশচন্দ্রের চিন্তাধারা "বিপ্লবধর্মী"। এখনকার দিনে বিপ্লব কথাটি আমরা শিথিলভাবে

প্রয়োগ করে থাকি। সেকালে রমেশচন্দ্রের চিন্তা যে বিপ্লবধর্মী আখ্যা পেয়েছিল তা থেকেই বুঝতে পারি এই বইটির গুরুত্ব কতখানি ছিল। কৃষ্ণদাস পাল রমেশচন্দ্রের ব্যক্তিগত শিক্ষা সম্বন্ধেও কটাক্ষপাত করেছিলেন। তিনি বলেছেন তখনকার দিনের কতিপয় যুবক যাঁরা কিছুকাল বিদেশে কাটিয়ে এসেছেন তাঁরা কতগুলি নূতন চিন্তা নিয়ে দেশে ফেরেন। কৃষ্ণদাস পাল এও লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই নব্য সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণ যুবকদের চেতনাই কার্যকরী হচ্ছে। এঁদের মধ্য দিয়ে যেন হিন্দু কলেজের ছাত্রদের স্বপ্নই প্রকাশ পাচ্ছে। কৃষ্ণদাস পাল যে আশঙ্কা করেছিলেন তা সত্যি। উদার মানবিকতাবোধ দেশচর্চার অন্যতম ফলশ্রুতি। রমেশচন্দ্র নিজেও Literarture of Bengal গ্রন্থে হিন্দু কলেজকে যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছেন। রমেশচন্দ্রের রচনাকর্মের এই প্রাথমিক পর্যায়ে যে রূপ দেখি তা পরবর্তী কালে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হলেও রায়তদের দুর্দশা সম্বন্ধে পরবর্তী কালেও তিনি সচেতন হয়েছিলেন। কৃষকদের সমর্থনে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করতে তিনি অক্লান্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদেশের কৃষক"-এ কল্পিত পরাণ মণ্ডলের দুঃখ কাহিনী বর্ণনা করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র ১৮৫১ সালের দশ আইনের সমালোচনা করেছিলেন, লালবিহারী গোবিন্দ সামন্তের বেদনাময় জীবনকে করুণভাবে উপস্থাপিত করেছেন। রমেশচন্দ্রও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়ে জমিদারী ব্যবস্থার ত্রুটি-বিচ্যুতি এবং প্রজাদের অবর্ণনীয় দুঃখ দুর্দশার কাহিনী উদ্‌ঘাটিত করলেন।

কেবলমাত্র বাঙলার কৃষক সম্প্রদায়ের প্রতিই যে রমেশচন্দ্রের সহানুভূতি ছিল তাই নয়। তিনি গোটা ভারতবর্ষের ভূমি ব্যবস্থা এবং অর্থনীতি নিয়েই আলোচনা করেছেন। "ভারতী" পত্রিকায় ভূমিকর আন্দোলনের ফলাফল (১৩০৯) প্রবন্ধে রমেশচন্দ্র স্পষ্টত সরকারকে দরিদ্র চাষীদের প্রতি সুবিচার করতে বলেছেন। রমেশচন্দ্রের বক্তব্য একটু দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতিযোগ্য।

'১৮৮০ এবং ১৯০০ সালে ফেমিন কমিশন যে সকল ব্যাপার প্রকাশিত করেন, তাহাতেও বড়লাট বাহাদুর দক্ষিণ ভারতের দীন অসহায় কৃষাণ ভূস্বামীদিগের উপর গভর্নমেন্টের দাবি সম্বন্ধে কোনপ্রকার স্পষ্ট, সরল এবং বোধগম্য সীমা নির্দিষ্ট করিলেন না। বড়লাট বাহাদুরের এইরূপ বিচারে আমরা নিতান্তই ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। কারণ কৃষিজীবি ব্যক্তিদিগের পক্ষে রাজা কতটা চাহিতে পারেন এবং কতটুকু তাহাদের নিজের থাকিবে, ইহা স্পষ্ট

জানা এবং বুঝিতে পারা ভারতবর্ষে যে পরিমাণে আবশ্যক বোধ হয় পৃথিবীর আর কোথাও এত নহে। রাজার দাবির অনিশ্চয়তা কৃষিকার্যকে একেবারে নির্জীব করিয়া ফেলে এবং এই সর্বনাশী অনিশ্চয়তা ভারতবর্ষের সকল কৃষিচেষ্টায় সর্বনাশ করিতে থাকিবে। যদি না এরূপ কোন ভবিষ্যৎ শাসনকর্তার অভ্যুদয় হইতেছে, যিনি প্রজাদিগের আরও একটু নিকটভাবে বুঝিতে পারিবেন, তাহাদিগেয় জন্য আরও একটু যথার্থ সহানুভূতি দেখাইবেন, এবং অনুগ্রহ করিয়া কৃষকদের বোধগম্য ভাষায় তাহাদিগের নিকট ব্যক্ত করিবেন, যে জমি উৎপত্তির কতখানি মাত্র গভর্নমেণ্ট তাহাদের নিকট হইতে দাবি করিতে পারেন, কতটুকু নিশ্চয়ই তাহাদের নিজের থাকিবে, রাজস্ব কর্মচারী বা বন্দোবস্তী কার্যকারকেরা তাহা স্পর্শও করিতে পারিবে না,—ততদিন পর্যন্ত আমাদের মঙ্গল নাই। সেদিন ভারতবর্ষের পক্ষে একটি শুভদিন যেদিন এরূপ বাণী ভারতবর্ষের কৃষকদিগের প্রতি উচ্চারিত হইবে। ভূপৃষ্ঠে অন্য কোন প্রজার ইহার ততটা আবশ্যক নাই।'

রমেশচন্দ্রের রায়তদের সম্বন্ধে কি পরিমাণ সহানুভূতি ছিল এই উদ্ধৃতিটিই তার উজ্জ্বল নিদর্শন। শেষের কয়েকটি ছত্রে রমেশচন্দ্রের যে আবেগ স্ফূর্তি পেয়েছে, তা প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিকদের। দেশচর্চায় এই আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ আমাদের মুগ্ধ করে।

বাঙালী লেখকবৃন্দের মধ্যে সম্ভবত রমেশচন্দ্রই প্রথম ভারতবর্ষের অর্থনীতির ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনের মাধ্যমে কেবল সাহিত্যিকদেরই আহ্বান করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির ইতিহাস রচনা করেতে। রমেশচন্দ্র তাকেই আরও ব্যাপকতর ভিত্তিভূমির উপর স্থাপন করেছিলেন। ঊনবিংশ শতকে যে মানবতাবোধ জাগ্রত হয়েছিল তাকে কর্মে রূপ দিয়েছিলেন যে সকল মনীষী তাঁদের মধ্যে রমেশ চন্দ্রের স্থান কোন অংশে ন্যূন নয়। যে দুরূহ পরিশ্রম ও অক্লান্ত নিষ্ঠা নিয়ে তিনি Economy History of India গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা একালের গবেষকদেরও ঈর্ষার বস্তু। একথা মনে রাখতে হবে স্বদেশচর্চা কেবলমাত্র উত্তাপ ও উত্তেজনাতেই নিঃশেষিত হয় না। রমেশচন্দ্র গভীর নিষ্ঠা নিয়ে যে কাজ করেছিলেন তাতে বাঙালি গৌরববোধ করতে পারে। এই বইটি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদ্ ডক্টর ভবতোষ দত্ত বলেছেন,

'মোটের উপর রমেশচন্দ্রের আর্থিক ইতিহাস ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের

তীব্র এবং নির্ভীক সমালোচনা। যে মনোভাব নিয়ে কংগ্রেস বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সুরাট অধিবেশনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, যে মনোভাব নিয়ে দাদাভাই নওরোজি বা ডিগ্‌বির রচনা, রমেশচন্দ্রে তারই পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রকাশ। স্বদেশী আন্দোলনের ও কংগ্রেসের নূতন চরমপন্থী দলের যে অর্থনৈতিক ধর্মবেদের প্রয়োজন ছিল, রমেশচন্দ্র সেটা উপস্থিত করলেন তাঁর ইতিহাসের মাধ্যমে।'

ডক্টর দত্ত রমেশচন্দ্রের গ্রন্থের ত্রুটির দিকগুলি উল্লেখ করেও এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে রমেশচন্দ্রের গ্রন্থই ভবিষ্যৎ রচনার প্রেরণা স্বরূপ হবে। বস্তুত রমেশচন্দ্রের গ্রন্থে যে ইংরেজ সমালোচনা তীব্র এবং তীক্ষ্ণ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে সে যুগে তা বিরলদৃষ্টি। গ্রন্থটির বিস্তৃত পরিচয় দেবার প্রয়োজন নেই। সে কাজ যোগ্য ব্যক্তি করবেন। প্রথমখণ্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্ম থেকে ১৮৩৭ সাল পর্যন্ত অর্থনৈতিক ইতিহাস টানা হয়েছে। বাঙলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণগুলি থেকে সাম্রাজ্যের ভূমি ব্যবস্থা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনা করেছেন রমেশচন্দ্র। একথা ঠিক রমেশচন্দ্র চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রশংসা করেছেন। একালের দৃষ্টিতে তা সমর্থনযোগ্য নয়, এত সত্য কথা। কিন্তু একটি প্রসংগ সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই। রমেশচন্দ্র জমিদারী ব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন সত্যি কথা। কিন্তু তাঁর উপন্যাসগুলিতে তিনি জমিদারের যে আদর্শ কর্মপন্থা মাঝে মাঝে বিবৃত করেছেন তাতে মনে হয় তিনি জমিদারী ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতবর্ষের সনাতন রূপটি অক্ষত থাকবে এই আশা করেছিলেন। এ কথা মানি এ দৃষ্টিতে পশ্চাৎগামিতার পরিচয় আছে। সঙ্গে সঙ্গে একথাও স্বীকার করি রমেশচন্দ্র সম্ভবত এ দিকটি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রীতির সমন্বয়সাধন রমেশচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল। তিনি যে জমিদার গোষ্ঠীর প্রত্যাশা করেছিলেন তা বাস্তবে আর কোনও দিন দেখা যাবে না। রমেশচন্দ্র কিছু পরিমাণে আদর্শবাদের দ্বারাই চালিত হয়েছিলেন। এ কথা আরও সত্য মনে হয় যখন দেখি রমেশচন্দ্র "পেজান্ট্রি অফ্ বেঙ্গল" এ জমিদারী ব্যবস্থার তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। রমেশচন্দ্র বঙ্গবিজেতা উপন্যাসে লিখেছেন :

'ধনবান জমিদারপুত্র হইয়াও ধনে তাহার আদর ছিল না ; উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও তিনি কৃষকদের সহিত বাক্যালাপ করিতে ভালবাসিতেন,

কখন কখন কৃষকদের সহিত বাস করিতেন ; সদাই কৃষকদের বন্ধু ছিলেন ; কতবার তিনি ছদ্মবেশে কৃষকদিগের গ্রামে ভ্রমণ করিতেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। যখন সায়ংকালে কৃষকদিগের কুটীরে প্রদীপ জ্বলিত, যে সময় গোশালায় গাভীসকল আসিয়া প্রবেশ করিত, কতবার তিনি কুটীরাবলীর পার্শ্বে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন, প্রজাদিগের দারিদ্র্যে সন্তোষ, জ্ঞানশূন্যতার দোষশূন্যতা, দুঃখ ও ক্লেশে তপস্বীর ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা আলোচনা করিতেন : দিনে দিনে, বৎসরে বৎসরে, যুগ-যুগান্তরেও প্রজাদিগের অপরিবর্তিত অবস্থা আলোচনা করিতেন।'

যে ইন্দ্রনাথ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র এ মন্তব্য করেছেন সে ইন্দ্রনাথের যুগ শেষ হয়েছে। অর্থনীতির কাঠামোর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে আদর্শ জমিদারও আর এখন জন্মান সম্ভব নয়। সম্ভবত রমেশচন্দ্র একথা জানতেন। সেই কারণে উজ্জ্বল দিনগুলির কথা প্রসঙ্গে লেখকের খেদ বারবার ধ্বনিত হয়েছে। "দি ইকনমিক হিস্টিরি অফ ইণ্ডিয়া আণ্ডার আরলি ব্রিটিশ রুল" গ্রন্থে রমেশচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন ব্যবস্থাকে তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের সম্পদক যে প্রকাণ্ড একটা লাভজনক ব্যবসায়ে পরিণত করেছিল সে সম্বন্ধে লেখক অবহিত ছিলেন। কোম্পানীতে নিযুক্ত হত তাদেরই নির্বাচিত কর্মী। ভারতবর্ষের আয় থেকে তারা মাল কিনত এবং নিজেদের লাভের জন্য তা ইউরোপ বিক্রি করত। তাদের পণ্যদ্রব্যের জন্য ভারতবাসীদের থেকে নির্মমভাবে কর আদায় করত। তারপর রমেশচন্দ্র বলেছেন,

The East India Company's trade was abolished in 1833, and the Company was abolished in 1358 but their policy remains.

ভারতবর্ষ থেকে যুদ্ধ ঋণ, ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাবদ যে হারে অর্থ দেওয়া হয় তাও রমেশচন্দ্র দেখিয়েছেন। ব্যঙ্গ করে রমেশচন্দ্র বলেছেন :

Verily the moisture of India blesses and fertilizes other lands.

রমেশচন্দ্র গ্রন্থ রচনা করবার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা ইংরেজ সরকারের কাছে তুলে ধরবার জন্য। যে কর আদায় হচ্ছে তা

যাতে ভারতবাসীর মঙ্গলের জন্যই ব্যয় হয় সেকথা রমেশচন্দ্র স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। জাতীয় আয় যদি সম্প্রসারিত হয় জনসাধারণের মধ্যেই তবেই জাতি হিসাবে সে বে'চে থাকতে পারে।

The proceeds of taxation are spent among the people, and for the people. A nation is impoverished if the sources of its wealth are narrowed, and the proceeds of taxation are largely remitted out of the country.

লেখকের এই উক্তির মধ্যে রয়েছে যথার্থ দেশপ্রীতি। দেশ বলতে জনসাধারণ। জনসাধারণের কল্যাণবিধান দেশচর্চার মূলমন্ত্র। রমেশচন্দ্র সেই কল্যাণকামনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। একথা ঠিক, ভবতোষ বাবু তাঁর প্রবন্ধে যে কথা বলেছেন, অর্থাৎ কংগ্রেস মডারেটপন্থীদের মতই দেশের শাসনে ভারতবাসীর অধিকার তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার যুগে এই ছিল যথেষ্ট চাওয়া। ইংরেজ শাসনকে অস্বীকার করবার প্রেরণা আসে আরও অনেক পরে। ভারতবাসীর সহযোগিতায় ভারতবর্ষ শাসিত হোক। সিভিল সার্ভিসে, ইঞ্জিনিয়ারিং-এ, ডাক ও তার বিভাগে, পুলিসে, হাসপাতালে উপযুক্তভাবে ভারতবাসী চাকরী পাক। রমেশচন্দ্র তাই চেয়েছিলেন। ইংরেজের চাকরীতে রমেশচন্দ্রের আপত্তি ছিল না। কিন্তু

We do not wish them to monopolies all the higher services to the virtual exclusion of the children of the soil.

রমেশচন্দ্র ভারতের গ্রামীন সমাজকে পুনরুদ্ধার করতে চেয়েছিলেন বর্তমান অর্থনৈতিক পটভূমিকায়। যেকথা আগে বলেছি, তিনি বিশ্বাস করতেন গ্রামীণ সমাজ আদর্শরূপে গণ্য। কিন্তু তিনি এও বুঝেছিলেন যে তারও যথার্থ রূপ বর্তমান কালে স্থাপন করা যাবে না। বিদেশী সরকারের দ্বারা যে গ্রামীণ সমাজ উৎখাত হয়ে গেল তাকে বর্তমান পরিবর্তিত অবস্থার মিলিয়ে নূতন গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থা স্থাপিত হোক এই ছিল রমেশচন্দ্রের অর্থনীতির আলোচনার অন্যতম সূত্র। শাসক ও শাসিতের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে তার বিষময় ফল সম্বন্ধে তিনি বলেছেন :

Isolation does not strengthen the Empire, it leads to ill-judged, unwise, and hasty measures of legislation, and spreads dissatisfaction and discontent among the people.

It leads to sudden and bewildering changes in the policy of the Indian Government as a result of party Government in Great Britain. It impoverishes the nation and weakens the Empire.

রমেশচন্দ্রের রচনাবলীতে স্বদেশচর্চার স্থান কতখানি ছিল উপরোক্ত আলোচনা থেকে তার একটা অভাস পাওয়া যাবে। কর্মজীবনেও তিনি নানাভবে স্বদেশের সেবা করে গেছেন। রবীন্দ্রনাথ রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছেন :

'তাঁহার চরিত্রে প্রাণের বেগের সঙ্গে অপ্রমত্ততার যে সম্মিলন ছিল তাহা এখনকার কালে তাঁহার সেই প্রচুর প্রাণশক্তি তাঁহাকে দেশ-হিতকর বিচিত্র কর্মে প্রবৃত্ত করিয়াছে, অথচ সে শক্তি কোথাও আপনার মর্যাদা লঙ্ঘন করে নাই। কি সাহিত্যে, কি রাজকার্যে, কি দেশহিতে সর্বত্রই তাঁহার উদ্যম পূর্ণবেগে ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বত্রই আপনাকে সংযত রাখিয়াছে—বস্তুত ইহাই বলশালিতার লক্ষণ।'

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৪৯—১৯১১

শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

এত ভঙ্গ বঙ্গ দেশ তবু রঙ্গে ভরা, কবির এই অমর উক্তির মধ্যেই বাংলা ও বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যের মর্ম পরিচয় নিহিত। বাংলার মাটির মেজাজ স্নিগ্ধ। বাংলার নদনদী যেন বাঙালীর বাৎসল্যময়ী জননী। এই ফলে ফুলে ভরা, রূপে রঙে ঢাকা বাংলা দেশের সাহিত্যমঞ্চে হাস্যরসের ভূমিকা বরাবরই কিছুটা জমকালো। বাংলা প্রকৃতির বিশিষ্ট লালনে বাঙালী চরিত্রে রসিকতার প্রবণতা চিরন্তন। দুঃখ দারিদ্র্য বাংলার গণজীবনে নিত্য সঙ্গী বটে, কিন্তু 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' অথবা 'হাঁটু ঢাকি বস্ত্র দিও পেট ভরে ভাত', সৌভাগ্য কামনায় এই যে জাতির কামনার একশেষ, সহস্র দুঃখ দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ সে জাতির মুখের হাসি কোনদিন কেড়ে নিতে পারিনি! তাই বিচিত্র বিপদ বিপর্যয়ের মধ্যেও হাসি বাঙালীর জীবন ও সাহিত্যে নব নব অধ্যায় রচনা করে এসেছে। হাসির উৎসের বৈচিত্র্যে হাস্যরসের মন মেজাজেরও রূপান্তর ঘটেছে যুগ থেকে যুগান্তরে (হাস্যময় জীবনের রচনা করে এসেছে হাসির উৎসের বৈচিত্র্য হাস্যরসের মন মেজাজের রূপান্তর ঘটেছে যুগ থেকে যুগান্তর)। হাস্যময় জীবনের এই পরিচয় বাঙালীর জাতীয় চরিত্রের বিশেষত্ব।

বাংলার বিচিত্র হাস্যরসের জগতে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রসরাজ অথবা ব্যঙ্গ সম্রাট বলাই মনে হয় সঙ্গত। তাঁর জীবনই তাঁর সাহিত্যের নিখুঁত ভাষ্য। শুরু থেকে সারা পর্যন্ত তাঁর শিক্ষা দীক্ষা ও বিভিন্ন বৃত্তির প্রতিটি স্তর, প্রত্যেকটি পর্ব কত না কত বৈচিত্র্যে ভরা। ক্ষণে ক্ষণে বদলিয়েছে তাঁর ছাত্র ও কর্ম জীবনের রূপ ও রঙ। জন্ম তাঁর বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছাকাছি গঙ্গাটিকুরীতে। ১৮৪৯ সাল। পিতা বামাচরণ থাকতেন পূর্ণিয়ায়। নীতি ও আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণপরিবারের নিয়মানুসারে পাঁচ বছর বয়সে হাতে-খড়ি হয় তাঁর। আট বছরে হলো উপনয়ন। হাতে খড়ির পর থেকে ন' বছর পর্যন্ত পূর্ণিয়ায় সরকারী স্কুলে কাটে তাঁর জীবনের প্রথম পর্ব। শিক্ষা হলো কিন্তু প্রধানত ইংরেজী কিছুটা উর্দু। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ছেলে অবস্থার গতিকে বাংলা ভাষার

পরিবর্তে ইংরেজী উর্দু মিশিয়ে শিক্ষা জীবনের সনাতন ভিত পাল্টিয়ে অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভীত গড়তে বাধ্য হলেন। থার্ডক্লাস পর্যন্ত ছাত্র জীবনের এই ইংরেজী উর্দু ও নামমাত্র বাংলা শিক্ষার পরিচয় গিয়ে ন' বছর বয়সে পিতার মৃত্যুতে পূর্ণিয়া ছেড়ে কৃষ্ণনগর স্কুলে গিয়া ভর্তি হলেন ইন্দ্রনাথ। বছরের শেষদিক বলে থার্ডক্লাস পর্যন্ত পড়েও নতুন স্কুলে তাঁকে ভর্তি হতে হলো সেবেন্ত ক্লাসে। কিন্তু মাত্র কমাস থেকেই জ্যেষ্ঠর কঠিন পীড়ার দায়ে ছাড়তে হলো তাঁকে কৃষ্ণনগর। এলেন জ্যেষ্ঠের সঙ্গে বীরভূম। ভর্তি হলেন বীরভূম সরকারী স্কুলে। এখানেও তাঁর অবস্থান কাল পুরো দুবছর ঠিক নয়। জ্যেষ্ঠকে হারালেন ইন্দ্রনাথ। এই সময় সতেরো বছর বয়সে ইন্দ্রনাথ পুরো সংসারী হলেন। বীরভূমের কয়েক মাসের জীবন তাঁর বাংলা শিক্ষার হাতে খড়ির পর্ব। কতকটা অসহায় ইন্দ্রনাথ আবার দায়ে পড়ে বাংলাভূমি ছেড়ে পৈতৃক ব্যবসাক্ষেত্র ভাগলপুরে রওনা হলেন। নড়বড়ে বাংলার ভিত নিয়ে ১৮৬৩ সালে তিনি এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

ইন্দ্রনাথের স্কুলের জীবন এমনভাবে নিত্যচলমান চলচ্চিত্রের মত ক্ষণে ক্ষণে রূপ থেকে রূপান্তর পরিগ্রহ করে গড়ে উঠলো। একত্র ধূনো গঙ্গাজল দিয়ে সরস্বতীর আবাহন মন্ত্র উচ্চারণ করতে না করতে এসে পড়ে বিসর্জনের পালা। কারণ এই যাযাবরী জীবনে সরস্বতীর ঠিক ষোড়শোপচারে পূজোর জাঁক তাঁর হয়ে ওঠেনি কোথাও। স্বজনবর্গের বিয়োগ বিপর্যয় এবং পরিবেশের প্রতিকূলতায় এণ্ট্রান্স পরীক্ষা পর্যন্ত পড়াশুনোয় ইন্দ্রনাথ বাগ্দেবীর পূজোর অধিবাসটুকু সেরেছিলেন, কিংবা আবরণ দেবতার পূজোয় কেবল শেষ করেছিলেন মূল পূজোর সুযোগ তাঁর হয়নি।

এই তো গেল ইন্দ্রনাথের স্কুলের জীবন। এরপর এলো তাঁর কলেজ জীবনের পালা। কিন্তু এখানেও তাঁর জীবনের যাযাবরী রূপ অক্ষুণ্ণই রইলো। বৈচিত্র্যই জীবন—এ কথাটি তাঁর ছাত্রজীবনে কিছু সাধারণ ছাড়া সত্য। এ জীবনের বৈচিত্র্য বেশ কিছুটা রঙীন ও রসগাঢ়। এর পরলে পরলে রঙ বেরঙের রূপ। প্রেসিডেন্সী কলেজ, হুগলী কলেজ, ফ্রী-চার্চ কলেজ, কেথিড্রাল মিশন কলেজ. বিচিত্র বিপর্যয়সূত্রে বি. এ পাশ করতে একের পর এক এতগুলো কলেজের বিচিত্র আবহাওয়া তাঁর স্নাতক জীবনের বর্ণ-সুষমা ও ভাবৈশ্বর্য সৃষ্টিতে কিছুটা সাহায্য করেছিল বলে মনে হয়। এরপর

১৮৭১ সালে তিনি হলেন বি এল এবং তাঁর নিজেরই ভাষায় 'ঠেলাঠেলি' করেই হলেন তিনি বি এল। কি স্কুল কি কলেজ তাঁর ছাত্রজীবনের চরিত্রটি স্ট্যাটিক তো নয়ই বরং একান্ত ডাইন্যামিক। ব্যতিক্রম, বৈপরীত্য ও বৈচিত্র্যেই তাঁর এ জীবনের সাধারণ ধর্ম। ওঠা-পড়া ভাঙ্গা-গড়ার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই। 'মানুষ মাত্রই অনাগরিক, ইতর জীব পেয়েছে বাসা, মানুষ পেয়েছে পথ'—মানুষের ধর্মপরিচয় সূত্রে কবির এই তত্ত্বকথার যেন একটি জলন্ত আট-পৌরে ও ব্যবহারিক রূপ ইন্দ্রনাথের সমগ্র ছাত্র-জীবন। বাঁধা পথে, বাঁধা-ছাঁদে নিয়ম-মাফিক গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান তাঁর স্বল্প ও সীমিত। তাঁর আত্মকথাই এ সত্যের সাক্ষ্য—'আমার পড়া বিদ্যা অপেক্ষা কুড়ান বিদ্যা বেশি। আমি কুড়াইয়া বহু বিদ্যা লাভ করিয়াছি।' ইন্দ্রনাথ সুশিক্ষিত সত্য, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য, তিনি অনেকটা স্বশিক্ষিত। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত, ইন্দ্রনাথ এই সত্যবচনের প্রতিমূর্তি। চেয়ে-পাওয়া বা ধার করা বিদ্যায় অনেক ক্ষেত্রে জীবনের যে জড়ত্ব বা দৃষ্টির যে আড়ষ্টতা দেখা দেয়, নিজস্ব চেষ্টার সচেতনভাবে অর্জিত বিদ্যায় তা থাকে না। এ বিদ্যা স্বচ্ছ, সরল ও সক্রিয় এবং সৃষ্টিশীল। ইন্দ্রনাথের ছাত্রজীবনের এই ভব-ঘুরে চরিত্রের মধ্যে এই কুড়িয়ে পাওয়া বিদ্যায় ছিল সেই দৃষ্টি ও জীবন বোধের স্বচ্ছতা, সবলতা ও মৌলিকতা। বাংলা বহির্বাংলার পল্লী ও শহরের বিচিত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও তার রূপ ও ভাববৈচিত্র্য তাঁর মত কুড়ানো স্বভাবের মানুষকে স্বতঃই একটা রস-সংবেদনা যুগিয়েছিলো। সমাজ সভ্যতা ও শিক্ষাব্যবস্থার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একালের মত সেকালেও ছিল কত অনাচার, অব্যবস্থা ও ও অসৌষ্ঠব। বিচিত্র বিবর্তনময় জীবনের মধ্যে সচেতন ও জিজ্ঞাসু ইন্দ্রনাথ সে সমাজের সব কিছু ভালোমন্দ খুঁটিনাটি করেই সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর ছাত্রজীবন তাঁর ব্যঙ্গরস পরিবেষণের সহজাত শক্তির পরিপোষকতাই করেছিল—এ ধারণা আমাদের না জন্মিয়ে পারে না।

ছাত্রজীবনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্রনাথের কর্মজীবনের রূপও মোটামুটি বৈচিত্র্যময়। এক জায়গায় নিষ্ঠার সঙ্গে বেশীদিন এক কাজে লেগে থাকা এ যেন তার স্বভাববিরুদ্ধ। বি এল হওয়ার আগেই গ্রাজুয়েট ইন্দ্রনাথ হেড মাষ্টার হলেন বীরভূম জেলার হেতমপুর স্কুলে। কিন্তু মাস দুই যেতে না যেতেই চিরগতিশীল ইন্দ্রনাথ হেড মাষ্টারির নতুন আসন খুঁজে নিলেন

বর্ধমান জেলার ওকড়সার গ্রাম্য স্কুলে। এখানে তাঁর শিক্ষকতার মেয়াদ মাত্র মাস কয়েক। শিক্ষকতা যেন তাঁর উপলক্ষ, জীবনকে উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখাই তাঁর লক্ষ্য। এক আসনে এক ভাবে থেকে জগৎ ও জীবনকে দেখায় যেন তাঁর পরম অতৃপ্তি। তাই মাষ্টারির পালা শেষে এলো তাঁর জীবনের আসল বৃত্তির পালা—ওকালতি। এখানেও পালা বদল, রূপ ও রঙ বদলের পরিচয় একেবারে যে নগণ্য তা নয়। ওকালতির প্রথম পর্ব শুরু হলো তাঁর পূর্ণিয়ায়। দু মাস যেতেই তিনি হলেন পুর্ণিয়া জেলার ডগুখোবা চৌকীর মুনসেফ। অবশ্য পাঁচ ছ' মাসের মধ্যেই ইন্দ্রনাথ মুনসেফীতে ইস্তফা দিলেন। উকিল হলেন হাকিম, আবার ক'মাসের মধ্যেই হাকিমের চেয়ার ছেড়ে উকিলের গাউন পরলেন ইন্দ্রনাথ। রূপ বৈচিত্র্যের পূজারী ইন্দ্রনাথ এবার উকিলের বেশে এলেন দিনাজপুর। কাটলো একটু বেশী দিন—প্রায় বছর পাঁচ-ছয়। লোয়ার কোর্ট ছেড়ে এরপর খেয়াল তাঁর হাইকোর্টে আসার। ১৮৮১ থেকে বছর পাঁচেক দেখলেন ইন্দ্রনাথ কুলীন আদালতের কৌলীন্যময় রূপ। হাইকোর্টের নেশা ছুটলে এলেন স্বক্ষেত্রে—বর্ধমান। হাস্যরসের পরিচয়ে বর্ধমান বাংলার রসাগার। রঙ্গে ভরা বাংলাদেশের মধ্যে বর্ধমানের রঙ্গরসের মাত্রা কিছু চড়া রকমের ভাঁড়ামি থেকে শুরু করে উচ্চাঙ্গের হিউমার পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের সুরু মোটা হাস্যরসের নানা নমুনাই বর্ধমানের সাহিত্যের বাজারে বিকিয়েছে। ইন্দ্রনাথের কর্মজীবনের বাকী অংশ কেটেছে এই রসের খনি বর্ধমানে। একষট্টি বছরের মোটামুটি দীর্ঘায়ু ভোগ করে ইন্দ্রনাথ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে মার্চ, (৯ই চৈত্র, ১৩১৭) পরলোক প্রাপ্ত হন।

ছাত্র ইন্দ্রনাথ ও কর্মী ইন্দ্রনাথ আসলে একই ইন্দ্রনাথের দুটি রূপ। চরিত্রে ছিলেন তিনি খাঁটি ব্রাহ্মণ। আচার-আচরণে, চিন্তায় ও মননে ব্রাহ্মণ্য প্রতিভা, ব্রাহ্মণ্যসংস্কার ছিল তাঁর প্রকট ও প্রগাঢ়। তাঁর স্বাধীন, নীতি ও শাস্ত্রনিষ্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তিপুরুষটি প্রগতির নামে সনাতন সমাজ জীবনের দুর্গতিকে মেনে নিতে বা মানিয়ে নিতে ছিলো একান্ত নারাজ। যে স্বাধীন, স্বতন্ত্র ও খোস মেজাজী চরিত্রটি ছাত্র ও কর্মজীবনে তাঁকে ক্ষণে ক্ষণে কোঠা ও কুঠী পরিবর্তনে বাধ্য করেছে, সেই আপোস-বিমুখ, আত্মপ্রত্যয়বান্ মানুষটিই ইন্দ্রনাথ চরিত্রের ব্যঙ্গ ও রসিকতাপ্রিয় সাহিত্যিক পুরুষ। ইন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ, ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালী, ইন্দ্রনাথ শাসক, সংস্কারক ও শিক্ষক।

এবং স্যাটায়ারিস্ট বা ব্যঙ্গবিদ্রূপকারী, ইন্দ্রনাথ এই ইন্দ্রনাথেরই সাহিত্যিক প্রকাশ। হাকিম বা উকীল ইন্দ্রনাথ এই একই ইন্দ্রনাথের বৈষয়িক মূর্তি।

আগেই বলেছি, বাহ্যবৃত্তিতে তিনি ছিলেন উকিল, কিন্তু মনোবৃত্তিতে তিনি ছিলেন স্যাট্যায়রিস্ট। হিন্দুত্ব, বাঙ্গালীত্ব ও ব্রাহ্মণত্বের দর্প অভিমানই তাঁর স্যাট্যায়াররূপ বিশিষ্ট হাস্যরসের উৎস। এই হাস্যরসের পরিচয়ই তাঁর সাহিত্য-পরিচয়, এই রসই তাঁর জীবনরস। উঠতে বসতে চলতে ফিরতে, সময়ে অসময়ে এই রস উপভোগের মাধ্যমে তিনি আপনাকে খুঁজে পেতেন, আপন স্বরূপকে উপলব্ধি করতেন। ইন্দ্রনাথের এইটিই ছিল জীবনদৃষ্টির বিশেষত্ব। প্রতিভাবান্ ও দৃষ্টিবান্ চরিত্র মাত্রেরই জীবন সন্ধানের, জীবন উপভোগের এক একটি ব্যক্তিগত বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থাকে। সেই ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণের আলোকে ও নিরিখেই ব্যক্তিবিশেষের জীবনের সুন্দর অসুন্দর, সুখ-দুঃখ ও শ্রেয় প্রেমের বিচার ও বিশ্লেষণ। রসরাজ ইন্দ্রনাথের এই ব্যক্তিগত বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণটি ছিল তাঁর হাসি, ব্যঙ্গ বা বিদ্রূপ। তিনি নীতি ও আদর্শবাদী বটে, এবং জাতীয় জীবনের আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর নৈষ্ঠিকতাও ছিল প্রবল। কিন্তু এই নৈষ্ঠিকতা তাঁর চরিত্রে নীরসতার পরিবর্তে এনেছিল অফুরন্ত সরসতা। নৈষ্ঠিকের শোনদৃষ্টি নিয়ে সেই ভ্রষ্টাচার ও ভণ্ডাচার সমাজ-জীবনের যেখানেই যখন দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন রসিক চূড়ামণি ইন্দ্রনাথ, সেখানেই ধরা পড়েছে, বিচিত্র স্বৈরাচার ও ব্যভিচার, কত রকমের মুখের পরিবর্তে মুখোশ। এই মুখোশের উপর হাড়ে-চটা ইন্দ্রনাথ কিন্তু মোটের উপর বৈঠকী মানুষ ছিলেন। বৈঠকীগল্প ও রসিকতার আসরে তিনি ছিলেন চিরদিনই মধ্যমণিস্বরূপ। বর্ধমানে তাঁর বাড়ীতেই ছিল একটা সাহিত্য-সঙ্ঘ। তাঁর বিচিত্র রস পরিবেষণের সূত্রে সেটি শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছিল একটা আদর্শ রস-সঙ্ঘ। রসের জীবন্ত মূর্তিরূপে ইন্দ্রনাথের সত্তা ব্যক্তির গণ্ডি ছড়িয়ে সঙ্ঘের রূপ পরিগ্রহ করেছিলো। যেখানেই ইন্দ্রনাথ, সেখানেই সঙ্ঘ, সেখানেই আড্ডা। এইটিই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্যতম বিশেষত্ব বা বিশিষ্ট আকর্ষণ। আজকাল বাংলা ও বাঙালীর জীবন থেকে এই রস-সঙ্ঘ বা আড্ডার পরিচয় একরকম মুছেই গেছে বললে হয়। তার অন্যতম কারণ অবশ্যই এই ধরণের রসমূর্তির শোচনীয় অভাব। অথচ এই আড্ডা বাঙালীর প্রতিভা, বাঙালীর মনীষাকে কতভাবেই না ফুটিয়েছে সেদিন! বাঙালী জীবনের এই ধারার বর্তমান

দীনতা দেখে ইন্দ্রনাথের বৈঠকী মূর্তি একাধারে আমাদের কাছে হাসি ও অশ্রুর উৎস হয়ে দেখা দেয়।

তাঁর শিক্ষায় যেমন পড়া-বিদ্যার চেয়ে কুড়ানো-বিদ্যাই বেশি, তাঁর ব্যঙ্গরসও জীবনরসে পরিপুষ্ট একান্ত অকৃত্রিম ও সহজ বস্তু। স্থান কাল ও বিষয় নির্বিচারে নিশ্বাস প্রশ্বাসের মত সহজভাবেই ইন্দ্রনাথ তাঁর রসিকতা প্রয়োগ করতেন। এমনকি ওকালতির মত নীরস ও রুক্ষ ব্যাপারকেও ইন্দ্রনাথ উঠতে বসতে তাঁর এই ব্যঙ্গের যাদুপ্রয়োগে একান্তই সজীব ও সরস রূপ দিয়েছিলেন। ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে জীবনরস সম্ভোগের সহজ প্রবৃত্তি প্রবণতা তাঁর চরিত্রে এক নতুন শক্তির সঞ্চার করেছিলো। সংসারের বাইরের কঠিন মূর্তিটি, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ সম্পর্কের আইনমাফিক গণ্ডিবদ্ধতা ও আড়ষ্টতাকে এই হাস্যরসের দিব্যস্পর্শে ইন্দ্রনাথ অনেকখানি রূপান্তরিত করেছিলেন। আদালতকক্ষে উকিল ও হাকিমের মধ্যে সম্বন্ধের আইন ও প্রথাগত ব্যবধান অনেকখানি। কিন্তু রসিকচূড়ামণি ইন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ রসিকতার ঝড়ো হাওয়ায় এই ব্যবধানের বেড়া প্রায়ই খসে পড়তো। আদালতের হাকিম জাতিতে তন্তুবায়। ব্রাহ্মণ উকিল ইন্দ্রনাথ এজলাসের মধ্যে হাকিমের উপস্থিতিতে অত্যন্ত চেঁচামেচি হৈ চৈ শুনে বিরক্ত হলেন। হঠাৎ একটা প্রবল আত্মপ্রত্যয় ও ব্রাহ্মণ্য অভিমান নিয়ে তিনি হাকিমের দিকে কটাক্ষ করে বললেন—"এ যে একেবারে সূতোহাটার গোল দেখছি।" জোঁকের মুখে নূনের মত হাকিমের অবস্থা কাহিল হয়ে পড়লো। উকিল ইন্দ্রনাথের এই শ্লিষ্ট কটাক্ষে তাঁর মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হয়ে উঠলো। নিমেষের মধ্যে এত বড়ো ইলেকট্রিক শক্ বেমালুম হজম করে এজলাসের ভিতর শৃঙ্খলা রক্ষায় তৎপর হওয়া ছাড়া তাঁর গত্যন্তর রইল না। সব রকম বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্যই আদালত। সেই আদালতেই যদি হেটো ব্যাপার চলে, নীতি ও নিয়মভঙ্গের একশেষ ঘটে, তাহলে সেই অকেজো আদালতকে কাজের করে তুলতে, অক্ষম ও অপটু হাকিমকে কর্মপটু করে তুলতে, ইন্দ্রনাথের এই জাতীয় ব্যাঙ্গই ছিল একেবারে ধন্বন্তরি। নীতিমান্ ও রুচিবান্ ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিমূর্তিটি এই ব্যঙ্গাত্মক ঘটনার অন্তরে একান্ত ভাস্বর। তাঁর জীবনকথায় পাওয়া যায়, সূক্ষ্ম রসিকতা ও বুদ্ধির দীপ্তির প্রভাবে ইন্দ্রনাথ এই তন্তুবায় হাকিমের বিশেষ প্রিয়পাত্রই ছিলেন। সময়ে অসময়ে আইন সংক্রান্ত জটিলতায় ইন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাও

করতেন তিনি। এক সময়ে এই হাকিম একটি রায় তৈরি করে একান্ত গোপনে লিখিত রায়টির চরিত্র সম্পর্কে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করেন। জিজ্ঞাসা মাত্রই তিনি বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে তাঁর অননুকরণীয় ভঙ্গিতে জবাব দিলেন—"বুনা হয়েছে বেশ, কিন্তু ধোপে টিকবে না।" জীবনীতে একমাত্র প্রকাশ, সত্য সত্যই হাকিমের সেই রায় আপিলে টেঁকেনি। ব্যঙ্গসম্রাট ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গাত্মক চেহারাখানি যেন এখানে আপাদমস্তক দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্রনাথ আইনজীবী ছিলেন, একথা তাঁর ব্যক্তিপরিচয়ে, জীবন-পরিচয়ে একান্তই 'এহো বাহ্য'। তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবী, রসজীবী। সঞ্জীবচন্দ্র 'পালামৌ'তে অশ্বত্থ বৃক্ষকে 'বড় রসিক' আখ্যা দিয়েছিলেন। কারণ সে নীরস পাষাণ থেকেও রস আহরণ করে। আমাদের মনে হয়, ইন্দ্রনাথের রসিকতার বহর দেখে রসিক অশ্বত্থ বৃক্ষ তার উন্নত মস্তক পরাজয়ের লজ্জায় নুইয়ে দেবে শ্রদ্ধেয় বন্দ্যোপাধ্যায়-এর কাছে। ইন্দ্রনাথ যখন যে হাকিমের ঘরে উকিল সকলেই জানতো, সে আদালতকক্ষটি আদালতের মরুভূমির মধ্যে উপভোগ্য মরুদ্যান বিশেষ। বৈশাখের মধ্যাহ্নে রৌদ্রদগ্ধ শ্রান্ত পান্থ যেমন বটচ্ছায়ার সন্ধানে ফেরে, আদালতের জনতাও তেমনি বিব্রত ও বিড়ম্বিত বৈষয়িক জীবনের মধ্যে একটু স্বস্তির নিশ্বাসের প্রত্যাশায় অনেক সময়ই ওকালতির সূত্রে ইন্দ্রনাথের চুটকী চাটনীর জন্যে তীর্থের কাকের মত অপেক্ষা করতেন।

বর্ধমানের সব-জজের আদালতে একবার এই জাতীয় একটা কৌতুককর ঘটনা ঘটেছিলো। উপলক্ষ্য, পাওনা টাকার জন্যে পিতার নামে পুত্রের নালিশ। পুত্র আবার যে সে ব্যক্তি নন্, সাক্ষাৎ হাইকোর্টের উকিল—কৌলীন্যে একেবারে মহামহোপাধ্যায়। আসামী দেনাদার পিতার পক্ষের উকিল, ইন্দ্রনাথ। তাঁর দৃষ্টিতে পুত্রের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক—"পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব দেবতাঃ।" পূর্ণিয়ায় 'দান শৌণ্ড' পিতার পরিচয়ে "মুন্সীজীকা লেড়কা" বলে পরিচিত ছিলেন। এবং নিজেই বলেছেন—'পিতৃগৌরবে আমার বড়ই গৌরব মনে হয়।' সনাতন আদর্শে প্রবুদ্ধ ইন্দ্রনাথের কাছে অত বড় শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পুত্রের পক্ষে পার্থিব দেবতা পিতাকে আদালতে আসামী রূপে দাঁড় করান একটা অমার্জনীয় অপরাধ বলেই গণ্য হয়েছিল। তাই তিনি সেদিন তাঁর ব্যঙ্গের তূণ থেকে একটু বাছাই করেই একটি তীক্ষ্ণতম বাণ সংগ্রহ করে নিয়ে

সেদিন পিতৃভক্তিতে রামচন্দ্রের সহোদর গুণধর পুত্রকে একটু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মুহূর্ত আগে থেকেই এজলাসে এসে বসেছিলেন। আদালত কক্ষটি লোকে লোকারণ্য। ফরিয়াদী, হাইকোর্টের উকিল যেমনি গৃহাভ্যন্তরে পদার্পণ করলেন, অমনি ইন্দ্রনাথ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন—"আসুন, আসুনি আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। শাস্ত্রে বলে পিতৃঋণ কেহই শোধ করিতে পারে না, যাহা কেহই পারে না, আপনি তাহা পারিয়াছেন এমন কি, কিছু ফাজিল পাওনারও দাবী করিয়াছেন—আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ। তাই আপনাকে দেখিবার জন্য আদালতে লোকে লোকারণ্য।" ইন্দ্রনাথের সময়ে দেশাচার লোকাচার, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নীতি, নিয়ম ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে শিথিলতা ও স্বৈরাচার দেখা দিয়েছিলো নানা রকমে। গুপ্ত কবির ভাষায়,

'কালগুণে এই দেশে বিপরীত সব।
দেখে শুনে মুখে আর নাহি সরে রব॥
* * * *
পিতা দেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে॥'

জাতীয় জীবনের এই ভাঙন দশার যুগে ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের শক্ত হাল ধরে জাতীয় জীবনতরীকে নিমজ্জন দশা থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন। হিন্দুত্ব ও বাঙালীত্বের শুচিশুভ্র রূপ যেদিন বিপন্ন ও বিপর্যস্ত ঘরে বাইরে জীবনের অঙ্গে প্রত্যঙ্গে যখন শ্বেতচিহ্ন দেখা দিয়েছে এবং কালোয় ধলোয় বাঙালী জীবনের মূর্তিটি বীভৎস রূপ ধারণ করেছে, বাঙালী জীবনের অকুণ্ঠ-প্রেমিক ইন্দ্রনাথ কতকটা প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব নিয়ে জাতির আত্মরক্ষায় অনন্যোপায় হয়েই সাহিত্যে তাঁর এই মোক্ষম ব্যঙ্গাস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন। বাঙালী জাতিকে, বাংলার শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ব্যঙ্গের হাত থেকে বাঁচানোর শুভসংকল্প ও সাধনারই ইন্দ্রনাথের এই হাস্যরস, ব্যঙ্গার্থে জীবনরস। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ব্যক্তিপরিচয় বা আত্মপরিচয় নিয়ে আমরা এখন তাঁর সাহিত্য পরিচয় সন্ধানে সচেষ্ট হবো।

ইন্দ্রনাথের হাতে-খড়ির কাব্য—'উৎকৃষ্ট কাব্যম্।' তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টির মত এখানি যেন তিনি ঠিক সৃষ্টি করেন নি, তাঁর হাতে এটি সৃষ্টি হয়ে

পড়েছে অথবা তাঁর কবি কণ্ডুয়নের নিবৃত্তিসাধন মাত্র। গুপ্ত প্রেসে একখানি নাটক ছাপা হতে দেখে একটু ব্যঙ্গ করার প্রবৃত্তি জাগে তাঁর। কাব্যখানির জন্ম এই প্রবৃত্তির চরিতার্থতার সূত্রে। ১৮৭০ সাল। ইন্দ্রনাথ তখন তরুণ ছাত্র। কিন্তু সেই তরুণ বয়সেও কালের বিপরীত হওয়ায় ভেসে না গিয়ে প্রবীণের মত ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সূত্রে তিনি বাঙ্গালী চরিত্রের লজ্জাকর বিকার বিকৃতির দিকে তাঁর কটাক্ষপাৎ করলেন। চার বছর পরের রচনা, তাঁর স্মরণীয় উপন্যাস—'কল্পতরু'। এখানিও তাঁর বিশিষ্ট বন্ধু তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিশেষ অনুরোধেরই সৃষ্টি। বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যেন তাঁর এই সব সৃষ্টির সহজ কর্তা নন, অনেকটা প্রযোজ্য কর্তা। কিন্তু অনুরোধ উপরোধের সৃষ্টি হলেও এই সৃষ্টির পরিচয়ে বঙ্গদর্শনে বকিমচন্দ্র লিখেছিলেন, —'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি মাত্র গ্রন্থ প্রচার করিয়া বাংলার প্রধান লেখকদিগের মধ্যে স্থান পাইবার যোগ্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।' মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে ইন্দ্রনাথ এই বিদ্রূপাত্মক উপন্যাসে ব্রাহ্ম নরেন্দ্রনাথের চরিত্রের মাধ্যমে ধর্মাচরণে বাঙ্গালী চরিত্রের ব্যভিচার ও অনাচার স্বৈরা-চারের যে তীব্র কটাক্ষ হেনেছেন তাতে তাঁর জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় আচারময় জীবনের প্রীতি নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংশয়হীন দৃষ্টান্ত সমুজ্জ্বল। বাংলা সাহিত্যে আজ উপন্যাসের যুগান্তর ঘটেছে। উপন্যাসের বিষয়বস্তু আর্ট বা টেকনিকেরও বৈপ্লবিক প্রশংসনীয় রূপান্তর দেখা দিয়েছে। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের হাঁটি-হাঁটি পা-পা যুগে 'কল্পতরু' কল্পতরুরই মত জাতীয় জীবনে ফলপ্রদ হয়েছিল, এ কথা অনস্বীকার্য।

এর পর এলো ইন্দ্রনাথের প্রখ্যাত ব্যঙ্গ-কাব্য, 'ভারত-উদ্ধার'। এটা তাঁর 'গোটা তিন বৈকালির' সৃষ্টি। সৃষ্টির এই বৈকালির রূপেই প্রমাণ সাহিত্য সৃষ্টির কোথাও তাঁর সুবৃহৎ পরিকল্পনা, বড় রকমের উদ্যোগ আয়োজন ছিল না। সব সৃষ্টিই অল্প-বিস্তর আকস্মিক বস্তু। সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের মানস-প্রকৃতির স্বরূপ ও স্বধর্মই এই। বাংলাদেশে সেদিন রাজ-নৈতিক আন্দোলনের সূত্রে বিলেতী পেট্রিয়টিজ্‌মের আঁটির চারার আমদানি' হয়েছিল। সেই চারাকে অঙ্কুরিত ও পত্রপুষ্প পল্লবিত করে বনস্পতির রূপ দিতে সেদিনে 'ভারত-উদ্ধার' কাব্যের বিপিনের মত কত না বাঙালী বীর কোমর বেঁধে লেগেছিল। ডি এল রায়-এর নন্দলাল আর ইন্দ্রনাথের বিপিন-এর সঙ্গে পরিচয়ে মনে হয়, সম্পর্কে এরা পরস্পর শালিকাপতি।

ভারত-উদ্ধারে ব্রতী বিপিনচন্দ্র দেশোদ্ধারের সংকল্পে মনে মনে 'সাগর লঙ্ঘিতে পারে', কিন্তু কার্যক্ষেত্রে 'গোষ্পদে ডুবিল'। দেশোদ্ধারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ বিপিনের কথার মাত্রাই হলো—"বঁটাইয়া দিই যত পাষণ্ড ইংরেজ।" ইন্দ্রনাথের হাতে বিপিন যখন এমনিভাবে ইংরেজ বঁটানোর কাজে উদ্যত-বঁটি, দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে তখন পরম দেশপ্রাণ 'নন্দলাল' দেশোদ্ধারের পুণ্যব্রত উদ্‌যাপন মানসে 'চড়িত না গাড়ি, কী জানি কখন উলটায় গাড়িখানি।' 'বাঙালী ভরসা' পরম স্বাদেশিক বিপিন যখন স্ত্রীর সহস্র কাকুতিমিনতি সত্ত্বেও দেশোদ্ধারে যেতে বদ্ধপরিকর, তখন অগত্যা পতিপ্রাণা সতী 'হৃদয়বল্লভে'র উদ্দেশ্যে বললেন—

"আলু" ভাতে ভাত তবে দিই চড়াইয়া
খাইয়া যাইবে যুদ্ধে।'

ইন্দ্রনাথের সেদিনের এই ব্যঙ্গাত্মক উক্তি বাঙালীর প্রবাদ-প্রবচনের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে উঠেছে। যে দেশপ্রেম জাল ও মেকি জিনিস, অথচ যার গগনভেদী ফাঁকা আওয়াজে সকলেরই জীবন দুর্বহ ও দুঃসহ, ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের এই জাতীয় নির্মম আঘাতে সেই ভণ্ড স্বাদেশিকতার ভূতাপসারণেই ক্ষান্ত হননি, অধিকন্তু সত্যকার দেশ প্রেমিকতার মঙ্গলঘট স্থাপনও করেছিলেন। মাত্র পাঁচটি সর্গে বিরচিত তাঁর এই ব্যঙ্গকাব্য আকারে ক্ষুদ্র, কিন্তু প্রকারে বৃহৎ ও ব্যঞ্জনাময়। দেশোদ্ধারের স্বপ্নে বিভোর, রসনা-সর্বস্ব, স্বপ্নবিলাসী, ভীরু ও আয়েসী বাঙালী-চরিত্র সেদিনের কবিসাহিত্যিক মাত্রেরই মুখরোচক ও একান্ত অপরিহার্য বস্তু হয়ে উঠেছিল। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে, বঁটি হাতে, যোদ্ধা বাঙালীর সেই হাল-হেতেলশূন্য রাম সিং জমাদারের হাস্যকর মূর্তি ইন্দ্রনাথের মত সেদিনে আরও অনেক যুগসন্ধির সাহিত্যিক চিত্রিত করেছেন। কিন্তু 'ভারত-উদ্ধার' কাব্য চরিত্রে অনন্য। এর কাহিনী পরিকল্পনার মৌলিকতা এবং হাস্য ও ব্যঙ্গরস সৃষ্টির কলাকৌশল অনুপম। বাংলা তথা ভারতের জাতীয় আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বের লজ্জাকর ও উপহাস্যকর মূর্তিটির যে অক্ষম রূপ দিয়েছেন কবি এই কাব্যে, এবং এই সূত্রে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের বালির ভিত খসিয়ে যে গ্রানিট ভিত্তির সূচনা করেছেন, প্রত্যেকটি দেশপ্রেমিক বাঙালীর কাছে তা অবিস্মরণীয়। 'ভারত-উদ্ধার' কাব্য সত্যই ভারতের ভবিষ্য ইতিহাসের 'এক পৃষ্ঠা'।

ইন্দ্রনাথের চতুর্থ স্মরণীয় গ্রন্থ, 'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচুঠাকুর'। কালের অপরিহার্য তাগিদে তাঁর সম্পাদকত্বে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রমুখ জনকয়েক রসিক সাহিত্যিক একখানি ব্যঙ্গাত্মক মাসিক পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ-আয়োজন। পঞ্চানন্দ সেই উদ্যোগের সাহিত্যিক প্রকাশ। কমলাকান্ত যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনদর্শনের প্রতিভূ, পঞ্চানন্দ তেমনি ইন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্বের পূর্ণ প্রতীক। সাময়িক পত্রিকার একান্ত অসাময়িক ও অনিয়মিত প্রকাশে পঞ্চানন্দ তত্ত্বতঃ ইন্দ্রনাথের স্বভাবের মুখপাত্র হয়ে উঠেছিল। ঠিক এমনি সময়ে (ইং ১৮৮৩) বিচারক নরীশ সাহেবকে গালাগালি দেওয়ার অপরাধে বাগ্মীপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ জেলে গেলেন। জাতির মুখপাত্র সুরেন্দ্রনাথের জেল হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত বাংলাদেশে বিশেষ করে ছাত্র মহলে, একটা বিরাট হইহই রইরই কাণ্ড পড়ে গেল। 'বঙ্গবাসী'র সুযোগ্য সম্পাদক যোগেন্দ্রবাবু দেশের সেই ঝড়ের আবহাওয়াকে তাঁর পত্রিকার প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির অনুকূলে কাজে লাগাতে উঠে পড়ে লাগলেন। সুরেন্দ্রনাথের জেলে যাওয়ার একান্ত মুখরোচক ঘটনাকে সূত্র করে রসিকপ্রবর ইন্দ্রনাথ যাতে একটু পঞ্চানন্দী রসের ভিয়ানে কোমর বাঁধেন এবং তাঁর 'পঞ্চানন্দ' ও 'বঙ্গবাসী'র পরস্পরের রাখিবন্ধন হয়, তার জন্যে তিনি একান্ত তৎপর হলেন। যোগেন্দ্রবাবুর এই আহ্বান ও আমন্ত্রণের আন্তরিকতায় ইন্দ্রনাথ বিচলিত হলেন। একেই তো তিনি স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথের উপর সরকারের এই অবৈধ আচরণে তাঁর ব্যঙ্গবাণে শান দেওয়ার কথা চিন্তা করছিলেন, তার উপর বঙ্গবাসীর সম্পাদক যখন সেই শুভ মুহূর্তটিতে এমন আন্তরিক আহ্বান জানালেন, তখন ইন্দ্রনাথ সে আহ্বানকে স্বাগত জানালেন। বঙ্গবাসীর কায়ার সঙ্গে পঞ্চানন্দের ছায়ার মিলন হলো। নব পর্যায়ে পঞ্চানন্দী রসের ভিয়ানে প্রথম প্রস্তুত হলো 'সুরেন্দ্রায়ন'। জাতির নায়ক সুরেন্দ্রনাথের বন্দীদশায় সমগ্র বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান। বিচিত্র সভা-সমিতিতে ছাত্র শিক্ষক ও জনসাধারণ যে মুহূর্তে অশ্রু সংবরণে অপারগ, ঠিক সেই মুহূর্তে রসিক প্রবর ইন্দ্রনাথ শোক প্রকাশের অভিনব ভাষা, নতুন ভঙ্গিমার প্রবর্তন করলেন। এ ভাষা তীব্র ব্যঙ্গের ভাষা, এ ভঙ্গিমা বিদ্রূপ ও বক্রোক্তির ভঙ্গিমা। —"আমি বেশ ছিলাম, সুরেন্দ্র জেলে গেল, আমাকে একেবারে মাটি করিয়া গেল। সামান্য নরলোক সুরেন্দ্র; জেলে গিয়া বিশ কোটি মানুষের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া আমাকে

টিটকারি করিতেছে; আর আমি দেবতা—জেলখানার ফটকের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম। এতে কে না মাটী হয়? আমি তো একেবারে ডাহা মাটী।" এ-ইন্দ্রনাথ সেই ইন্দ্রনাথ, যিনি জাতির অবমাননায়, জাতীয় ধর্ম ও আদর্শের লাঞ্ছনা গঞ্জনায় শ্লেষ, বক্রোক্তি ও ব্যাঙ্গ-স্তুতির ভাষা ছাড়া ভাষা খুঁজে পেতেন না। সহজ, সুন্দর ও কান্তাসম্মত শিষ্ট ভাষাকে নিগৃহীত আত্মার প্রকাশে তিনি একান্ত পঙ্গু বলে মনে করতেন। ইন্দ্রনাথের শ্লেষ ও বক্রোক্তির চড়া ও কড়া রূপের অন্তরালে তাঁর আত্মমর্যাদাবোধ ও বলিষ্ঠ জাতীয়তাবোধের সুরটি ব্যঞ্জিত।

'পঞ্চানন্দ' বা 'পাঁচুঠাকুরে'র রচনা-বৈচিত্র্যের দৈন্য বিশেষ ছিল না। কাব্য, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, অনুবন্ধ প্রভৃতি রচনার বিচিত্র ছিল রূপ ও রকম। কিন্তু যাবতীয় রচনার আত্মাই ছিল ব্যঙ্গরস। একমাত্র রসের মাধ্যমে সাহিত্যের এতগুলি রচনার মন মেজাজ ঠিক ঠিকভাবে বজায় ও ব্যক্ত করা সহজসাধ্য তো নয়ই: বরং সিদ্ধদৃষ্টি ও বলিষ্ঠ লেখনীরই সাধ্যবস্তু। 'পাঁচু-ঠাকুরে'র লেখক হিসাবে ইন্দ্রনাথের সহকারী দু-চারজন ছিল বটে কিন্তু কার্যত তিনি পত্রিকার এই পাঁচমিশাল মূর্তি এক হাতেই সেদিন গড়েছিলেন। সাহিত্যের আসরে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের ভূমিকা গ্রহণ করেছে ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ। পঞ্চানন্দের মানসগঠনে কমলাকান্তের কিছু প্রভাব নেই, তাও ঠিক বলা যায় না। অবশ্য কমলাকান্ত আর পঞ্চানন্দ যে যমজ ভাই, তাও নয়। কমলাকান্ত অগ্রজ আর পঞ্চানন্দ অনুজ। শুধু যে বয়সেই পঞ্চানন্দ ছোট, তা নয়, চরিত্র-পরিচয়ে, ব্যক্তিত্বের গৌরবে ও সৌরভে, দৃষ্টি ও সৃষ্টির উৎকর্ষ ও উদারতায় পাঁচুঠাকুর কমলাকান্তের অনুজই বটে। পঞ্চানন্দ বাঙালী ও প্রাদেশিক, কমলাকান্ত সর্বভারতীয় ও সার্বভৌম চরিত্র। পঞ্চানন্দ সময়ের সৃষ্টি, কমলাকান্ত নিত্যকালের চরিত্র। পঞ্চানন্দ প্রধানত বস্তুবাদী ও বিষয়ী মানুষ, কমলাকান্ত বস্তু ও বিষয় জগৎ-সচেতন হয়েও তত্ত্ব ও দর্শনের জগতের সঙ্গে একান্ত সংশ্লিষ্ট। পঞ্চানন্দ গণচরিত্র, কমলাকান্তের রস হিউমার, আর পঞ্চানন্দের রস স্যাটায়ার ও আয়রনি। কমলাকান্ত হাসায় ও ভাবায়, কিন্তু খোঁচায় না। পঞ্চানন্দ যতটা খোঁচায় ততটা হাসায় না। কমলাকান্ত ভালবাসে, কাছে আসে, ফাঁকি ও মেকিগুলো দেখিয়ে দেখিয়ে দিয়ে, ধরিয়ে দিয়ে লজ্জা দেয়। কিন্তু পঞ্চানন্দ যতটা শাসন করে ততটা ভালোবাসে না। শুধু দূর থেকে জীবন ও চরিত্রের দুর্বলতা ও

অসঙ্গতির দিকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের খোঁচা দেয়। 'বাঙ্গালিবাবু যিনি দুই-চারিটা ইংরেজী বোল শিখিয়াছেন, তিনি অমনি উমেদওয়াররূপে পরিণত হইয়া, দরখাস্ত বা টিকিট হাতে দ্বারে দ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্—ডাঁশ মাছির মত খাবার সময়ে, বসবার সময়ে, দাঁড়াবার সময়ে—দিনে, রাত্রে, প্রাহ্ণে, অপরাহ্ণে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—ঘ্যান্ ঘ্যান্। যিনি উমেদওয়ারি ছাড়িয়া স্বাধীন হইয়া উকিল হইলেন, তিনি আবার সনদী ঘ্যান্ ঘেনে।' কমলাকান্তের এই হিউমারের মধ্যে ব্যঙ্গের ঝাঁজ ও ঝাল নেই। এ শুধু শিবেতর নিবৃত্তির জন্যে কান্তাসম্মিত বচনে কল্যাণকর ইঙ্গিতদান। রোগমুক্তির জন্যে নির্মম অস্ত্রোপচার নয়, মানসিক ও প্রাকৃতিক চিকিৎসা।

'কিন্তু এই যে জ্যৈষ্ঠ মাসের আম-কাঁঠাল-পাকানো গরমে তোমরা কাহাকেও আপাদমস্তক বস্ত্রাবৃত না দেখিলে অসভ্য বলিয়া থাকো, সে কাহার প্রসাদাৎ ? এই যে কোচ, কেদারা, কাচের বাসন, আর্শী ফেরেমের অভাব হইলে তোমার ঘরের শোভা হয় না বলিয়া দুঃখ করিয়া থাকো, এ শিক্ষা কাহার নিকট পাইয়াছ ? তথাপি দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতবাসী রাজভক্তিহীন।' পঞ্চানন্দের এই শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতিময় হাস্যরসের অন্তরে বেশ একটু হুল ফোটানোর সচেতন প্রয়াস আছে। এ যেন পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত জাতির দেহে নির্মম অস্ত্রপ্রয়োগ। রোগমুক্তি আমাদের অবশ্যই কাম্য : কিন্তু এই শাণিত ব্যঙ্গাস্ত্রের ভয় ও আতঙ্কে আমরা একটু শিউরে না উঠে পারি না। এ যেন প্রশংসার ছদ্মবেশে নিন্দার ভোঁতা ছুরিতে পুঁচিয়ে পুঁচিয়ে কাটে। তাই বঙ্কিমের কমলাকান্তকে আমরা শুধু মনে রেখেছি, তাই নয়, তার হিউমারকে বেশ ভালোবেসে উপভোগ করেছি ; কারণ সে ল্যাংও মারে নি, চাটও মারে নি। কিন্তু পঞ্চানন্দের বক্রোক্তি ও শ্লেষোক্তির চাট খেয়ে আমরা থমকে গিয়েছি, থতমত খেয়ে গিয়েছি : কেমন যেন মাঝে মাঝে বিবর্ণ হয়ে পড়েছি। তাই তাকে ভয় করেছি খুবই, কিন্তু ভালোবেসে উঠতে পারেনি। মনে হয়, এই জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র লিখে-ছিলেন—"ইন্দ্রনাথ আমাদের সাহিত্য-আকাশে Hally's comet : যখন ফুটিয়া উঠে, তখন উহার প্রভায় দশ দিক আলোকিত হইয়া উঠে। পরন্তু সবাই উহাকে দেখিলে ভয় পায়। কে জানে, কাহার কোন্ অন্ধকার কোণটি উহার পুচ্ছের আলোকে প্রোজ্জ্বল হইয়া উঠিবে আর দেশসুদ্ধ লোকে তাহা দেখিয়া হাসিবে ও হাততালি দিবে।"

যাই হোক, মোটের উপর ইন্দ্রনাথ ছিলেন জীবন্ত পঞ্চানন্দ। পঞ্চানন্দের বিচিত্র ও বিচ্ছিন্ন ব্যঙ্গ-রচনার মাধ্যমেই ইন্দ্রনাথ আপনার বক্তব্যের পরাকাষ্ঠা ঘটিয়েছেন। তাঁর ছাত্রজীবন ও কর্মজীবনের নিত্য চলমান ও পরিবর্তনশীল রূপ এই সত্য ও তথ্যের স্পষ্ট ইঙ্গিতবহ যে, চরিত্রে তিনি চিরচঞ্চল ও উদাসীন প্রকৃতির। ধারাবাহিকভাবে ধীর, স্থির ও গম্ভীরভাবে কোন বৃহদায়তন সাহিত্য-সৃষ্টি তাঁর ধাতুতে সইত না। তিনি ছিলেন অনেকটা বর্তমানেরই মানুষ এবং প্রত্যক্ষ জগৎ ও জীবনের সঙ্গেই তাঁর যা-কিছু ঘনিষ্ঠতা। তাই পঞ্চানন্দের বর্তমান-কেন্দ্রিক ও প্রত্যক্ষস্পর্শী ছোটখাট বিচিত্র বিষয়ক রচনাই তাঁর সাহিত্য-সত্তার যথার্থ পরিচয় বহন করে চলেছে।

অবশ্য পঞ্চানন্দীরস আগাগোড়াই যে নিছক ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক এবং এই রসপিপাসুরই মধুর পানীয় তা নয়। তাঁর স্বতন্ত্র শিক্ষার কল্পনা, 'বাঙ্গালা ভাষ, সূক্ষ্মবিচার', 'বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিতে আপত্তি আছে'—ইত্যাদি রচনা গভীর ও মৌলিক চিন্তা ও মননশীলতার সার্থক নিদর্শন। তাছাড়া পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ বাংলা হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের জগতে এক অবিস্মরণীয় বস্তু। সাধারণত ব্যাকরণের সংগে সাহিত্যের অহি নকুল সম্বন্ধ। ব্যাকরণের আঁচে সাহিত্যের রস শুকিয়ে যায়, কিংবা ব্যাকরণের ঝালাফোড়নে সাহিত্য-রসিকদের বিষম লাগে, এই হচ্ছে প্রচলিত দৃষ্টি। কিন্তু ইন্দ্রনাথ 'প্রকৃতি', 'প্রত্যয়', 'সমাস', 'সন্ধি' ও 'কারক' 'বিভক্তি'তে ভরা ব্যাকরণের সুকঠিন আবরণ চিরে তার মধ্যে এমনই জীবনরস ও প্রাণরস সঞ্চার করেছেন, যার ফলে পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ এক অদ্ভুত রসসাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করেছে "অষ্ট ধাতুর লোকের সঙ্গে যখন পঞ্চানন্দের চলিতে হইতেছে, তখন বিশ্বাস না করিলে উপায় নাই। এই বিশ্বাসের নাম প্রত্যয়। ধাতু বুঝিয়াই প্রত্যয় করা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, প্রত্যয়ের পর অনেক ধাতুর রূপান্তর হয়।" আবার, অব্যয়ীভাবের সংজ্ঞাপ্রকরণেও তাঁর অনন্য সাধারণ রসদৃষ্টির পরিচয়টি উপমাহীন। '—যাহারা বাপ-পিতামহের টাকা দু'হাতে অপব্যয় করিয়া শেষে নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয় কুলাইতে পারে না, অগত্যা প্রত্যয়ের ভার প্রাপ্ত হয়, তাহারা অব্যয়ীভাব। অব্যয়ীভাবের দৃষ্টান্ত শুঁড়ির খাতায় ও ইন্‌সলভেন্ট আদালতে পাওয়া যায়।' ইন্দ্রনাথের এই পঞ্চানন্দী-ব্যাকরণ, ব্যাকরণের ছদ্মবেশে অপূর্ব রসসাহিত্য

এর সামাজিক ধর্মনৈতিক ও সাংস্কৃতিক-মূল্য মর্যাদা রসিকের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেও উপেক্ষনীয় নয়। পঞ্চানন্দী ব্যাকরণ প্রকৃতপক্ষে সমসাময়িক লোক-চরিত্র ও সমাজ-জীবনের ব্যাকরণ। ভাষা ও সাহিত্যের ব্যাকরণকে এমন বৃহত্তর তাৎপর্য প্রয়োগ, ইন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি ও রসদৃষ্টির এক উজ্জ্বলতম নিদর্শন। তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের অন্তঃপুর ও অলিগলির মধ্যে প্রবেশের সূত্র এই ব্যাকরণের শিল্পরূপ আমাদের পক্ষে অমোঘ পাথেয়। রসের আলাপ-আলোচনায় ইন্দ্রনাথের যেমন ব্যক্তি, স্থান বা কাল বিচার ছিল না, রস-সৃষ্টিতে তেমনি সরস, নীরস, গুরু, লঘু—বিষয়ের কোন বাছবিচারই তাঁর ছিল না। ইন্দ্রনাথের প্রতিভার অনন্যতার এও এক প্রকৃষ্ট পরিচয়।

ইন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের রচনা 'ক্ষুদিরাম'। তাঁর নিজেরই ভাষায় এ'টি একটি গালগল্প। জেলের ছেলে, একান্ত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ক্ষুদিরাম শহরে থেকে ইংরেজী লেখাপড়ার ছোঁয়া লেগে হয়ে পড়েছে 'ক্ষুদিরামবাবু'। হোমরা-চোমরা ক্ষুদিরামবাবু বাবুয়ানির মর্যদাহানির ভয়ে গাঁয়ের বাড়িতে যেতে কুণ্ঠাবোধ করেন। আবার যদি বা কখন-সখন কৃপা করে পল্লীতে একটু পদার্পণ করেন, তাহলে আলাপ কুশল কেবল তাদেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেন, যারা অন্তত খানিকটা ইংরেজী-জানা ও ইংরেজ-ঘেঁষা। একেবারে পাড়াগেঁয়ে ভূতদের সঙ্গে আলাপ করতে তিনি যেন ঘেন্না লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যান। বিলেতি শিক্ষার ঘরছাড়ানো, আপন-ভোলানো দুরন্ত প্রভাবে পল্লীবাংলার সহজ, সুস্থ ও বলিষ্ঠ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কেমন করে যে ঘুণ ধরলো, শ্লেষ ও ব্যাজস্তুতির ভাষায় বিরচিত ইন্দ্রনাথের এই 'গাল-গল্পটি' তার একখানি অনবদ্য করুণ আলেখ্য। আপাত-দৃষ্টিতে 'ক্ষুদিরাম' গালগল্প, কিন্তু তত্ত্বতঃ এটি বাংলার সেদিনের অধোগতি-শীল সমাজ-জীবনের সরস ও জীবন্ত উপন্যাস। বাংলার সর্বাঙ্গীণ জীবনে যে সময়ে বিপর্যয়ের ঘনঘটা, অথচ নিঃসাড় বাঙালী সে বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও নির্বিকার বাঙালী জীবনের নিকটতম আত্মীয় ইন্দ্রনাথ গ্রন্থের পূর্বাভাষে তার চমৎকার ইঙ্গিত দিয়েছেন—"অমানিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। শ্মশানক্ষেত্রের উপর দিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্য সহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে। ফেরুপাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতস্তত ধাবিত হইতেছে। বীভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে। গুরুদেব! কে এমন সময়ে শবসাধনে নিযুক্ত হইবে?" জাতির ভাগ্যাকাশে যেদিন

বিজাতীয় ভাবের ধূমকেতুর আবির্ভাব ঘটেছে, সেদিন ইন্দ্রনাথ যেন শব-সাধকেরই মত সাহিত্য-সাধনার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের অনর্থ অমঙ্গলের প্রতিকারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ব্যঙ্গই করুন আর বিদ্রূপই করুন, কথায় পঞ্চই (punch) করুন, আর টণ্টই (taunt) করুন, ইন্দ্রনাথ যে জাতীয় জীবনকে তার স্বরূপেই ভালোবাসতেন এবং সেই প্রেম ও ভালোবাসার গাঢ়তা ও গভীরতাই তাঁর ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীক্ষ্ণতা তীব্রতর উৎস, তাঁর সাহিত্যের যে-কোন রসিক ও সমঝদার পাঠকেরই এ ধারণা অনিবার্য।

এগুলি ছাড়া 'হাতে হাতে ফল', 'খাজনার আইন', 'জাতিভেদ' প্রভৃতি তাঁর আরও চার-পাঁচখানি রচনা অল্প-বিস্তর উল্লেখযোগ্য। বিচিত্র প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কাব্য, উপন্যাস ছাড়া ইন্দ্রনাথের অপর অবিস্মরণীয় কীর্তি—বাংলা সাহিত্যে 'কার্টুন' বা ব্যঙ্গচিত্রের প্রবর্তনা।

বাংলা সাহিত্যে হাস্যারসাত্মক রচনার সংখ্যা বা পরিমাণ ইন্দ্রনাথেরই সর্বাধিক। তাঁর যাবতীয় সাহিত্যই হাস্যরসাত্মক। ইন্দ্রনাথের ব্যক্তিচরিত্র ও জীবনও পরম পূত ও বলিষ্ঠ। তাঁর ধর্ম ও ন্যায়নিষ্ঠা, তাঁর বাংলা ও বাঙালী প্রীতিও আদর্শস্থানীয়। তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টির মৌলিকতাও নগণ্য নয়। তাঁর নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের সহজ আলাপ আলোচনাই সরস কাব্য সাহিত্যের অনবদ্য উপাদান। তাঁর মত মজলিসী ও গল্পে মানুষ যে কোন সভ্য, শিক্ষিত ও সংস্কৃত সমাজেরই পরম সম্পদ; এক কথায় ইন্দ্রনাথের সাহিত্য হাস্যরসের খনির কোহিনূর। কিন্তু আজ বাংলা ও বাঙালী এই কোহিনূরের পরিচয় হারিয়ে ফেলেছে। জাতির এই বিস্মৃতির প্রথম কারণ মনে হয়—অতীতচারণ বাঙালীর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। দ্বিতীয়তঃ, ইন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্যের রসের অদ্বৈতমূর্তি—স্যাটায়ার বা শ্লেষাত্মক হাস্যরস। সাহিত্যে হাস্যরস মুখরোচক বটে, কিন্তু হৃদ্য বস্তু নয়। কবি সত্যেন্দ্রনাথের লেখনীতে হাস্যরসের জাত, মান ও কুলপরিচয় অক্ষয় হয়ে আছে।—

"হাস্য তুমি উপভোগ্য,
পূজার অর্ঘ্য চেয়োনা তাই বলে······
করতালি পাবার যোগ্য
বীভৎস অদ্ভুতের জ্ঞাতি,
স্বল্প আয় ক্ষণিক খ্যাতি,
এগিয়ে কোথা আসছ গণ্ডগোলে ?"

—হসন্তিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে হাস্যরসের পরিচয়ে বলা হয়েছে—"সত্ত্বাভাবো হি হাস্যঃ"—অর্থাৎ সত্ত্বগুণের অভাব থেকেই হাস্যের জন্ম।

—'অভিনব ভারতী'।

একেই হাস্যরসের সাহিত্যের উপর মানুষের ভালোবাসা ও আকর্ষণ থাকলেও শ্রদ্ধা বা অনুরাগের শোচনীয় অভাব: তার উপর ইন্দ্রনাথের হাস্যরস শ্লেষধর্মী স্যাটায়ার বা ব্যঙ্গ হাস্য। উনিশ শতকের বাংলার 'শিক্ষা, সমাজ ও ধর্মনৈতিক জীবনের ত্রিশঙ্কু-অবস্থা হাস্যরসের এই বিশেষ মূর্তির কারিগর। কেশবচন্দ্র, প্রতাপচন্দ্র প্রমুখের প্রবল ব্রাহ্মধর্মান্দোলন, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহ আন্দোলন, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ভাবরূপের পরিবর্তে নিত্য নতুন বিজাতীয় ভাবের সঞ্চার—এ সবই জাতীয় ভাবাপন্ন সাহিত্যিকদের মধ্যে এই স্যাটায়ার রূপ হাস্যরস সৃষ্টির এক দুর্বার প্রবণতা জাগিয়েছিল। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে শুরু করে টেকচাঁদ, কালীপ্রসন্ন, দ্বিজেন্দ্রলাল, বঙ্কিম ও ইন্দ্রনাথ সকলেই বিভিন্ন আকারে প্রকারে সেদিনের জীবনের নতুন পুরাতনের সংঘর্ষ সঞ্জাত অসংগতি, অসামঞ্জস্য ও অনৌচিত্যকে কেন্দ্র করে উইট (Wit), হিউমার (humour), স্যাটায়ার (Satire) ইত্যাদি হাস্যরসের বিচিত্র ফোয়ারা ছুটিয়েছিলেন। উচ্চ হাসি, চাপা হাসি, ব্যঙ্গের হাসি, কৌতুক ও করুণ হাসি—দৃষ্টি, রুচি ও শক্তির তারতম্য অনুসারে হাসির একেবারে শোভাবাজার বসে গিয়েছিলো সেদিন। একই স্যাটায়ার-এর আবার কত না রঙ ও ঢঙ।—

হল কর্ম কাণ্ড, লণ্ড ভণ্ড,
হিঁদুয়ানী কিসে রবে।
যত দুধে শিশু ভজে ঈশ
ডুবে মলো ডবের টবে।
আগে মেয়েগুলো ছিল ভালো
ব্রত-ধর্ম কোর্তো সবে।
একা "বেথুন" এসে শেষ করেছে
আর কি তোদের তেমন পাবে!

ঈশ্বর গুপ্তের এই পরিচ্ছন্ন স্যাটায়ার, অথবা—

আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি
আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,

আমরা চাকরকে ডাকি "বেয়ারা"—আর
মুটেদের ডাকি "কুলি"।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই নিরাবরণ স্যাটায়ার জনসাধারণের উপভোগ্য বস্তু। এখানকার ব্যঙ্গ ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের মত চাপা, কুটিল অথবা বক্র চরিত্রের নয়। এ ব্যঙ্গ ঘোমটাখোলা—সহজ পাচ্য ও সুখপাঠ্য। কিন্তু ইন্দ্রনাথের শ্লিষ্ট ব্যঙ্গ, ছদ্ম ও প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ সাধারণের পক্ষে এমন সুখপাঠ্য বা মুখরোচক নয়। আবার বঙ্কিমের শুভ্র, সংযত, নির্মল হিউমারের কৌলীন্য-মর্যাদাও তাঁর হাস্যরসে অনুপস্থিত। তাই মনে হয়, সাধারণ বাঙালীর কাছে, বৃহত্তর সমাজের কাছে ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গসাহিত্য কতকটা দুর্বোধ্য ও দুষ্পাচ্য, আবার এ যুগের সূক্ষ্ম ও সংস্কৃতরুচির পাঠক সমাজে ইন্দ্রনাথ কিছুটা গ্রাম্য ও সেকেলে হয়ে পড়েছেন।

ইন্দ্রনাথের হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের যুগোত্তীর্ণতার অভাবের অন্যতম কারণ মনে হয়, তাঁর সৃষ্টির সাময়িকতা ও গণ্ডিবদ্ধতা। নিত্যকালের সাহিত্য, সর্বদেশীয় বা সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টির দৃষ্টি তাঁর ঠিক ছিল না। দৃষ্টিতে ও সৃষ্টিতে তিনি ছিলেন কতকটা প্রগতির পরিপন্থী। প্রগতিশীল ও নিত্যবর্ধমান বাংলা দেশের সাহিত্যরুচি, মনে হয়, এ কারণেও ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিকে মনে মনে শ্রদ্ধা করলেও যেন লোকভয়ে মুখ ফুটে তাঁর স্মৃতিপূজায় শঙ্খধ্বনি করতে একটু দ্বিধাগ্রস্ত।

কিন্তু ইন্দ্রনাথের সাহিত্যিক সত্তার অথবা তাঁর শিল্পদৃষ্টির অনিত্যতা ও বিশিষ্ট ভৌগোলিক পরিচয় সত্ত্বেও তাঁর সাহিত্যমালা আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ, মনন ও অনুধ্যানের বস্তু। প্রথমতঃ সর্বজনীনতা ও সর্বকালীনতাই যে সংসাহিত্যের একমাত্র মাপকাঠি তা রসিকজনের সিদ্ধান্ত নয়। যে সাহিত্যের ভৌগোলিক মানচিত্র অপেক্ষাকৃত সীমিত, সাহিত্যের আনন্দ-বাজারে তা যে অপাংক্তেয়, এ কথা বলা চলে না। নিত্য ও বিশ্বজনীন ধর্মের সঙ্গে ধর্মের যেমন একটা পারিবারিক, সাম্প্রদায়িক অথবা প্রাদেশিক মূর্তি আছে, এবং সে ধর্মও ধর্ম; সাহিত্যের তেমনি একটা দেশীয় ও জাতীয় মূর্তি আছে, এবং সে মূর্তিও জাতির সাধ্যবস্তু।

বঙ্কিমের সাহিত্যের ভাব ও রসের বিভূতি ও বৈভব ইন্দ্রনাথের সাহিত্য দাবি করতে পারে না সত্য, কিন্তু তাঁর সাহিত্যেও সেদিনের জাতীয়ভাবাপন্ন বাঙালী আত্মরক্ষার মন্ত্র খুঁজে পেয়েছে, সন্দেহ নেই। এবং সে মন্ত্র যে

আজকের দিনের মন্ত্র আর নয়, অথবা সে দৃষ্টি ও সে প্রাণ আজ সর্বথা উপেক্ষার বস্তু, এ কথা অপ্রকৃতিস্থ বা অসুস্থমস্তিষ্কের কথা। ইন্দ্রনাথের পঞ্চানন্দ ব্রহ্মানন্দের সহোদর নয়, সত্য। কিন্তু বাঙ্গালী জাতির মুখের হাসি যেদিন ম্লান হয়ে এসেছিল, আপনাকে নিঃশেষে বিলিয়ে ও বিকিয়ে দিয়ে যেদিন সে সুখ ঐশ্বর্যের মরীচিকার পিছনে অন্ধবেগে ছুটে চলেছিলো, সেদিন পঞ্চানন্দের যে রচনা বাঙ্গালী জীবনের সেই সর্বনাশা মরীচিকার ঘোর কাটিয়েছে, তা যে জাতির কাছে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবননিষ্ঠ সাহিত্য, এ কথা শিশু ও অর্বাচীনেরও সুবোধ্য। ইন্দ্রনাথের সেই বিশিষ্ট ব্যঙ্গরস সেদিনের বাঙ্গালীর জাতীয় মৌলিকতা ও শুচিতা রক্ষায় নূন-ভাতের মতই অপরিহার্য হয়ে উঠেছিলো। দেশকে ভালোবাসার আদর্শে ঘরকে ভালোবাসা যদি অপরাধ না হয়, তাহলে সেদিনের সাহিত্যে ইন্দ্রনাথকে বাংলা ও বাঙালী প্রীতির অপরাধে অপরাধী করা নিরপরাধের শাস্তিবিধান ছাড়া আর কিছু নয়। জাতীয় জীবনের লজ্জাকর ও শোচনীয় ভাঙনের যুগে ক্ষুদিরাম, নরেন্দ্রনাথ চরিত্রের উপর ব্যঙ্গের টিয়ারগ্যাস ছড়িয়ে সংস্কৃতি-সচেতন বাঙালী সেদিন ইন্দ্রনাথের মাধ্যমে কিম্ভূতকিমাকার বাঙালী জীবনের বাঁক ফেরাতে চেয়েছিলো। ঢাল-তলোয়ার-শূন্য রাম সিং জমাদারের ভুয়ো-স্বাদেশিকতার প্রহসনকে ইন্দ্রনাথের বিপিন চরিত্রের ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে সে যুগের দৃষ্টিবান্ বাঙালী অঙ্কুরে বিনষ্ট করতে চেয়েছিল। ভণ্ডামি, প্রবঞ্চনা, ফাঁকি ও মেকি যেখানে স্পর্ধাভরে বুক ফুলিয়ে দিগ্বিজয়ের নিশান উড়োয় সেখানে সেই ভণ্ড ও পাষণ্ডের দর্পশাসনে কবি ও সাহিত্যিকের একটু দৃষ্টি পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কারণ কবি সামাজিক জীবও বটে। অলংকার শাস্ত্রেরও ভাষায়—"কবি হি সামাজিক তুল্য এব"। বিশেষ করে হাস্য বা ব্যঙ্গরসের কবি একটু বেশি করেই সমাজ-সচেতন। তাঁর পক্ষে চোখ বুঁজিয়ে আপনাতে আপনি বিভোর হয়ে কাব্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। সমাজ জীবনেরই কল্যাণে তাঁর দৃষ্টিকে একটু তির্যকভাবেই নিক্ষেপ করতে হয়। দেহের অঙ্গবিশেষে দুষ্ট ক্ষত বা ক্যানসার হলে সুচিকিৎসক জীবনের খাতিরে অঙ্গচ্ছেদেরই ব্যবস্থা করেন। জাতীয় জীবনের মায়ায় ইন্দ্রনাথ সেদিন ব্যঙ্গাস্ত্র প্রয়োগে সমাজ দেহকে বিকৃত বিজাতীয় ভাবের ক্যানসারমুক্ত করতে চেয়েছিলেন—একথা রসিক বাঙালী পাঠক মাত্রেরই স্বীকার্য।

করুণ, বীর অথবা শান্তাদি রসের সাত্ত্বিক সাহিত্য উদভ্রান্ত জীবনের

সংগতি স্থাপনে যখন পঙ্গু হয়ে পড়ে, তখন সত্ত্বগুণ বিবর্জিত এই হাস্যরসের সাহিত্যই জীবনের আধিব্যাধির একমাত্র ধন্বন্তরি। সহস্র সংস্কারক সহস্র আদর্শবাদী উদাত্তকণ্ঠে তাদের নীতি আদর্শের প্রচার ঘোষণায় সমাজচিত্তে যে সাড়া জাগাতে অপটু ব্যঙ্গের দু'চারটির ঝাঁঝালো ফোড়নে অনায়াসেই জড়ের মধ্যে সেই সাড়া ও চেতনা জাগে। জীবনধর্মের এই সত্যের দৃষ্টিতেই সমাজ-সচেতন ও আত্মপ্রত্যয়বান ইন্দ্রনাথ হাস্যরসের এই প্রখর মূর্তিকেই যুগসুলভ সার্থক সাহিত্যের ধ্যেয় মূর্তিরূপে বরণ করে নিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গের এই শাণিত মূর্তি কালোচিত সাহিত্য প্রকৃতিকে যে ক্ষুণ্ণ করেনি, প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক অতুলচন্দ্র গুপ্তের অভিমত তার সাক্ষ্য—"যেমন সভ্য সমাজের মঙ্গলের জন্য মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে সেই মঙ্গলের জন্যই এই আত্মতুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার নিয়োগ হওয়া উচিত।" ইন্দ্রনাথ সত্য-সত্যই প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গালীর এবং পরোক্ষভাবে ভারতবাসীর হিতেই সাহিত্যে প্রচলিত হাস্যরসের মুখ ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন।

হাস্যরসের কটু ও কষায় রূপের অন্তরালে ইন্দ্রনাথের যে নিটোল ও বলিষ্ঠ মানব মূর্তিটি ভাস্বর, দুর্ভাগ্যবশতঃ এবং রুচিবিকারের ফলে আমরা বাঙ্গালী হয়েও সে মূর্তির বিস্মৃতির নির্বোধ উল্লাসে আত্মহারা। বাংলা দেশে সেদিন ধর্ম, সমাজ ও জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে নিত্য নতুন আইন-কানুনের মাধ্যমে মানব কল্যাণের এক হাস্যকর অপচেষ্টা চলেছিল। যে শিক্ষা-দীক্ষায় জাগে মানুষের সত্যকার জীবনবোধ ও আত্মচেতনা, তার ব্যবস্থা নেই কোথাও। চরিত্রের যে রূপায়ণে ন্যায়-অন্যায় ও শুভাশুভবোধ মানুষ সহজ সম্পদরূপে অর্জন করতে পারে, তার ছিটেফোঁটা আয়োজনও নেই বিধিবিধানের মধ্যে! কেবল অজ্ঞ ও সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে আইনের কলে মাড়াই করে, ঝাড়াই করে বার করার নেশায় মশগুল সেদিনের মানুষের কারখানার মালিকেরা মানুষ করার নামে দেশের মানুষকে অমানুষ করার বীভৎস পরিকল্পনাকে ব্যঙ্গ ও উপহাস বিদ্রূপের আঘাতে নস্যাৎ করার সাধনাই ছিল ইন্দ্রনাথের। তাই এক সময়ে সহবাস সম্মতি-আইন নিয়ে যখন দেশের মধ্যে একটা হুলুস্থুল পড়ে গেল, তখন মধ্যস্থরূপে ব্যঙ্গরসিক ইন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন—"নিদেন এক ছেলের মা না হলে কোনমতেই

নির্ভয়ে সম্মতি দেওয়া চলে না।" সহসা ইন্দ্রনাথের এই ব্যঙ্গে আমরা চমকে উঠতে পারি তাঁর রুচির গ্রাম্যতায় আমরা জুগুপ্সা বোধ করতে পারি। ইন্দ্রনাথের এ রসিকতা কতকটা ধাঁধারই মত—হঠাৎ তাঁর নিন্দায় আমাদের পঞ্চমুখ করে তোলে। কিন্তু বাচ্যার্থে বা নিন্দার ব্যঙ্গার্থে তা উচ্ছ্বসিত প্রশংসার বস্তু; আপাতঃ যা ঘৃণ্য তত্ত্বতঃ তা পরম হৃদ্য ও উপাদেয়। ইন্দ্রনাথ চরিত্রের জটিলতাই এইখানে। তাঁর মতে মানুষ মনোজীবী দেহজীবী নয়। উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষাই মনোজীবী মানুষকে দেয় মনের স্বাস্থ্য ও মানবতার অধিকার। আইনকানুন দিয়ে মানুষের এই অধিকার অর্জন হয় না। সেদিনের সমাজে এই আদর্শের লজ্জাকর অবমাননা দেখেই ইন্দ্রনাথ একান্ত ঘৃণ্যভরেই অনুরূপ রূঢ় ও তিক্ত মন্তব্য করেছিলেন।

কালান্তরে দাঁড়িয়ে সাহিত্য ও শিল্পাদর্শের বিবর্তিত আবহাওয়ার মধ্যে থেকে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনবোধ ও সাহিত্যরুচি কিংবা শিল্পাদর্শ আমাদের কাছে অনেক সময় উপাস্যের পরিবর্তে উপহাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু কালের ক্ষুধা বা যুগ প্রয়োজনের কথা মনে রেখে ইন্দ্রনাথের সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলে তাঁর ব্যক্তিমূর্তি ও সাহিত্যিক মূর্তির দ্যুতি ও দীপ্তি আমাদের বিমোহিত করে। জাতীয় ও বিজাতীয় শিল্প, সভ্যতা ও সংস্কৃতির টানাটানির মধ্যে পড়ে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন যেদিন হাঁপিয়ে উঠেছিলো বাঙ্গালী জীবনের অকুণ্ঠ প্রেমিক ইন্দ্রনাথ দেশের মানুষের সেই হাঁপিয়ে-ওঠা জীবনের পরিত্রাতারূপে সাহিত্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ব্রাহ্মধর্মের নামে ঘোর অধর্ম, দেশপ্রেমের নামে ভণ্ডামি, ত্যাগের বেনামীতে অসংযত, উচ্ছৃঙ্খল ভোগ যেদিন জাতীয় জীবনে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছিলো, সাহিত্যে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের তীব্র ও তীক্ষ্ণ কশাঘাতে ইন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন সেই প্রলয়ঙ্কর নৃত্যের অবসান।

বাংলার বাইরে পূর্ণিয়াতে ইন্দ্রনাথের শিক্ষার ভিত পত্তন হয়েছিল বাংলার পরিবর্তে ইংরেজীতে। স্কুল ও কলেজীয় শিক্ষাই কোন পর্বেই অনুকূল পরিবেশে আপসোস মিটিয়ে শিখবার জানবার সুযোগ তাঁর হয়নি। বরং সে যুগের দৃষ্টিতে ইংরেজী শিক্ষার বহর তাঁর ভালোই ছিলো কিন্তু তাঁর কথায় ও লেখায় স্বচ্ছ ঝরঝরে বাংলারই পরিচয় আগাগোড়া।

সেই ইংরেজীয়ানার দুরন্ত আবহাওয়ায় ইন্দ্রনাথের এই বলিষ্ঠ জাতীয় সত্তার পরিচয় আজ আমাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে বিদগ্ধ ব্যুৎপন্ন হয়েও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অকুণ্ঠ সেবার মাধ্যমে জাতীয় জীবনের স্থায়ী ও সর্বাঙ্গীণ কল্যাণের অক্ষয় ভিত গড়ে গিয়েছেন ইন্দ্রনাথের প্রতিভা সে পর্যায়ের না হলেও জাতীয় কল্যাণসাধনে তাঁর দৃষ্টি বঙ্কিমেরই অনুগামী। সৃষ্টির গৌরবচ্ছটায় তাঁর তেমন উজ্জ্বল নয় বটে, কিন্তু দৃষ্টির কৃপণতা বা হীনতা তাঁর ছিল না আদৌ, এ সত্য অবিসংবাদিত।

সাহিত্যে, সমাজে, ধর্মে, কর্মে, শিক্ষায়, দীক্ষায়, ছলনা, শঠতা, নষ্টামি, ভণ্ডামির হোলিখেলার যুগে উদ্‌ভ্রান্ত ও বিভ্রান্ত বাঙ্গালীর জীবনে ইন্দ্রনাথের আয়রনি ও স্যাটায়ার মহামন্ত্র বলে নম্রশির ফণীর মতই যাদু বিস্তার করেছিলো। সাহিত্যে তাঁর এই ব্যঙ্গ মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম সুরুচির মনোজ্ঞ ঠাট হারিয়েছিলো সন্দেহ নেই। তাঁর চাপা হাসি ও প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ঘোলা ও ওলা রস মাঝেসাজে আমাদের অম্ল-উদ্গার যে সৃষ্টি করেনি, তা নয়; কিন্তু পেট্রিয়ট স্যাটায়ারিস্ট ইন্দ্রনাথ জাতীয় চরিত্রের রোগের জটিলতা ও দুরারোগ্যতা বুঝেই ব্যঙ্গের এই ঝাঁঝালো দাওয়াই প্রয়োগ করেছিলেন।

'বিষস্য বিষমৌষধম্'। বাংলার জাতীয় জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বিকৃত ও বিজাতীয় ভাব শিকড় গেড়েছিলো তার জীবন সংশয়কর পরিণতির কথা ইন্দ্রনাথ নিঃশেষেই অনুভব করেছিলেন। তাঁর ব্যঙ্গ রসের বিশিষ্ট চরিত্র তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মূল সুর, তাঁর এই অনুভূতির ঐকান্তিকতা ও উদ্দেশ্যের মহৎ তাৎপর্যই সূচনা করে। তাঁর সাহিত্যে ব্যঙ্গের এই ব্যঞ্জনা সেদিনের মত আজকের দিনেও জাতির পক্ষে মৃত সঞ্জীবনীস্বরূপ। বাংলার সামগ্রিক জীবনে—শিক্ষা, সমাজ, রাজনীতি ও ধর্মনীতিতে—যে অনাচার, দুর্নীতির নব অধ্যায় আজ রচিত হয়েছে, তার দৃষ্টিতে ইন্দ্রনাথের নিরঙ্কুশ মনুষ্যত্ব, দৃপ্ত পৌরুষ ও আদর্শ বাঙ্গালী-প্রেম আজ আমাদের জাগরণে ধ্যান ও নিদ্রায় স্বপ্ন হওয়া উচিত। তাঁর বুদ্ধি-প্রদীপ্ত ও রসসমুজ্জ্বল মূর্তি আমাদের মধ্যে জাগায় এই সহজ আকূতি—

ইন্দ্রনাথ! 'দাউ সুড্‌ ট্‌স্ট বি লিভিং এ্যাট দিস আওয়ার!'

ইন্দ্রনাথের গ্রন্থমালা :

১। উৎকৃষ্ট কাব্যম্—(১২৭৭)

২। কল্পতরু (উপন্যাস)—(১২৮১)

৩। ভারত উদ্ধার (খণ্ডকাব্য)—(১২৮৪)

৪। হাতে হাতে ফল (প্রহসন)—(১২৮৯)

৫। পাঁচুঠাকুর (১ম খণ্ড)—(১২৯১) (২য় খণ্ড) (১২৯১) (৩য় খণ্ড) (১২৯২)

৬। খাজনার আইন—(১২৯২)

৭। ক্ষুদিরাম (গালগল্প)—(১২৯৪)

৮। জাতিভেদ (সন্দর্ভ)—(১৩১৭)

৯। ইন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী—(১৩৩২)

উল্লিখিত গ্রন্থাবলী ব্যতীত অন্যান্য রচনাও গ্রন্থাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৮৬১—১৯৩০

ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ

যোগেশচন্দ্র বাগল

বর্তমান বৎসরে বাংলার কয়েকজন প্রতিভাধর মনীষীর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, ডক্টর নীলরতন সরকার, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ইঁহাদের প্রত্যেকরই কথা জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আমরা কম-বেশি জানিতে পারিয়াছি পত্রপত্রিকা এবং সভাসমিতির মাধ্যমে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহোদয়ের জন্মের শতবর্ষও পূর্ণ হইল। তাঁহার কথাও আমাদের স্মরণ-মনন করা কর্তব্য। অক্ষয়কুমারের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা পুস্তকে ও প্রবন্ধে ইতিপূর্বে কিছু কিছু সংকলিত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এ-সকলের মধ্যে তাঁহার জীবনের ঘটনাপরম্পরা জানিতে পারিবেন। এখানে আমি অক্ষয়কুমারের ঐতিহাসিক কীর্তি সম্বন্ধ যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

অক্ষয়কুমার জন্মগ্রহণ করেন ১লা মার্চ ১৮৬১; তাঁহার মৃত্যুদিবস ১০ই ফেব্রুয়ারি ১৯৩০। এই দীর্ঘ সত্তর বৎসরব্যাপী তাঁহার জীবনকালকে আমরা দুইভাগে ভাগ করিতে পারি। প্রথম পঁয়ত্রিশ বৎসর তাঁহার প্রস্তুতিকাল, দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে এই প্রস্তুতির ফল তিনি গৌড়জনকে পরিবেশনে নিয়োজিত হন। অক্ষয়কুমারের শৈশব ও কৈশোর কাটে নদীয়া জেলার কুমারখালিতে। পল্লীর সুষমা-মণ্ডিত হইয়াও এটি শহরের মর্যাদা পাইবার যোগ্য। গত শতাব্দীর সপ্তম অষ্টম দশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট পল্লী-অঞ্চলে যখন মিউনিসিপ্যালিটি প্রবর্তিত হয় তখন এখানেও মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছিল। কুমারখালি সুবিখ্যাত কাঙ্গাল হরিনাথের লীলাক্ষেত্র। তাঁহার পুরা নাম হরিনাথ মজুমদার। অক্ষয়কুমারের পিতা মথুরনাথ এবং হরিনাথ সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কুমারখালির বঙ্গবিদ্যালয় এবং অন্যান্য জনহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূলে ছিলেন প্রধানত এই দুইজন।

এই সময়কার মধ্য ও উত্তর বঙ্গে নীলকরদের অত্যাচার সুবিদিত। যশোহর এবং নদীয়া জেলায় তাহাদের অত্যাচার-নিপীড়ন চরমে উঠে। কলিকাতার হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নীল চাষীদের সপক্ষ ছিলেন এবং নীলকরদের অত্যাচার-নিপীড়নের কাহিনী সপ্তাহের পর সপ্তাহ ‘পেট্রিয়টে’ প্রকাশিত করিতেন। অক্ষয়কুমার বলেন, স্থানীয়

নীলকরদের অত্যাচার-কাহিনী মথুরনাথ এবং হরিনাথ হরিশচন্দ্রের 'হিন্দু পেট্রিয়টে' এবং ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকরে' পত্রাকারে লিখিয়া পাঠাইতেন। তাঁহাদের এই যুগ্ম প্রচেষ্টায় স্থানীয় জনসাধারণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। অক্ষয়কুমারও তাঁহাদের এই প্রচেষ্টা স্মরণ করিয়া পরে জনসেবায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বাংলাদেশে অভিনব স্বাজাত্যবোধের উন্মেষ লক্ষ করি। বাংলা ভাষাসাহিত্যকে বাহন করিয়াই ইহার সূচনা হয়। নিজ সন্তানগণকে দক্ষ করিয়া তোলার প্রযত্ন নানাভাবে চলিতে থাকে। বন্ধুপুত্র অক্ষয়কুমারের বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের ভার লন হরিনাথ স্বয়ং। অক্ষয়কুমার হরিনাথকে তাঁহার সাহিত্যগুরু বলিয়া পরবর্তীকালে উল্লেখ করিয়াছেন। সুদূর পল্লীঅঞ্চলেও সাহিত্যিকপ্রবর অক্ষয়কুমার দত্তের বাংলা পুস্তকাদি প্রচারিত হয় এবং ইহার দ্বারা ঐ ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা বিশেষ অনুপ্রাণিত হন। অক্ষয়কুমারও শৈশবে এবং কৈশোরে অক্ষয়-সাহিত্য পাঠে মনঃসংযোগ করেন। হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় অক্ষয়কুমার প্রথমে বাংলা লেখা প্রকাশিত করিতে শুরু করেন। বড়লাট লর্ড লিটন ১৮৭৮ সনে দেশীয় মুদ্রাযন্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করিলে হরিনাথ কাগজখানি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়েন। ক্রমে নানা দুশ্চিন্তায় তিনি ব্যাধিগ্রস্থ হন। এই সময়, ১৮৮২ সনে, অক্ষয়কুমার অন্য দুই বন্ধুর সহযোগে কাগজখানি সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য-গুরু হরিনাথকে কাগজ সম্পাদনার দায় ও ঝুঁকি হইতে মুক্তি দেওয়া।

পিতা মথুরনাথ কর্ম উপলক্ষে রামপুর বোয়ালিয়ায় (বর্তমান নাম রাজশাহী) গমন করেন এবং সেখানেই তিনি বসবাস করিতে থাকেন। পুত্র অক্ষয়কুমারকেও তিনি বোয়ালিয়ায় লইয়া যান। অক্ষয়কুমায় স্থানীয় স্কুল হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এই বৎসরে তাঁহার বাল্যবন্ধু জলধর সেন এবং কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এই পরীক্ষায় পাস করেন। এই সনটি আর-একটি কারণেও বিশেষ স্মরণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত প্রবেশিকা পরীক্ষায় সর্বপ্রথম একজন বাঙালী মহিলা উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। তাঁহার নাম কাদম্বিনী বসু (গঙ্গোপাধ্যায়)। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যে তিনিই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবার গৌরব লাভ করেন।

এই সময় কি কলিকাতায় কি মফস্বলে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক আলোড়ন উপস্থিত হয়। মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, তাঁহারা তখন বিপ্লবের কথা ভাবেন নাই বটে, তবে রাষ্ট্রীয় অধীনতা-বোধ তাঁহাদিগের মনে কাঁটার মত বিঁধিতে থাকে। রাজশাহীতেও শিক্ষিত সমাজে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছায়। প্রাণ-চঞ্চল ছাত্রবৃন্দও নব ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়। ছাত্র অক্ষয়কুমার রাজশাহী কলেজে অধ্যয়নকালে মেকলের রচনা-চাতুর্যের মধ্যে বাঙালীর অবমাননা বুঝিতে পারিয়া ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হইতেন। ১৮৮০ সনে রাজশাহী কলেজ হইতে এফ. এ. এবং কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৮৩ সনে বি. এ. পরীক্ষায় অক্ষয়কুমার উত্তীর্ণ হন। শেষোক্ত বৎসরে তাঁহার 'সমরসিংহ' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। অক্ষয়কুমার বলেন, তিনি ইহার লভ্য 'জাতীয় ভাণ্ডারে' দান করেন। তাঁহার হৃদয় যে ঐ সময় হইতেই স্বদেশপ্রীতিতে উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল, ইহা তাহার একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ঐ সনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কারাবরণের পর সঙ্ঘবদ্ধভাবে দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনার নিমিত্ত একটি ধনভাণ্ডার খোলা হয়। ইহার নাম দেওয়া হয় 'ন্যাশনাল ফাণ্ড' বা জাতীয় ভাণ্ডার। দেখা যাইতেছে, ছাত্রাবস্থা অতিক্রান্ত হইতে না হইতেই অক্ষয়কুমার রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছেন। তিনি ১৮৮৫ সনে ওকালতি পরীক্ষা পাস করেন। তিনি অতঃপর আইন-ব্যবসায়ে রত হন। এই বৃত্তি অবলম্বন করায় রাজনৈতিক ও অন্যবিধ লোকহিতকর কার্যে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর হইল।

অক্ষয়কুমার বলেন, তিনি সাত বৎসর যাবৎ রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বা সম্পাদক ছিলেন। কলিকাতাস্থ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন বা ভারতসভার আনুকূল্যে মফস্বলের বহু শহরে ও গঞ্জে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন সুপরিচালনার জন্য শাখা-সভা স্থাপিত হয়। রাজশাহী অ্যাসোসিয়েশন ইহার পূর্ববর্তী হইলেও সভার কার্যক্রম অনুসরণ করিতে থাকে। ভারত-সভার নেতৃবৃন্দের আহ্বানে যথাক্রমে ১৮৮৩ ও ১৮৮৫ সনে কলিকাতায় ন্যাশনাল কনফারেন্স বা জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমি দ্বিতীয়বারের সম্মেলনের কার্যবিবরণী পাইয়াছি। রাষ্ট্রীয় উন্নতিমূলক বিবিধ প্রস্তাব এই সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী অধিবেশনে উত্থাপিত আলোচিত ও গৃহীত হয়।

শুধু বাংলার বিভিন্ন জেলা হইতে নহে, বাংলার বাহিরের কোনো কোনো অঞ্চল হইতেও প্রতিনিধি আসিয়া এখানে সমবেত হন। রাজশাহী হইতে 'জনৈক প্রতিনিধি' এই সম্মলনে যোগ দেন এবং অস্ত্র-আইন প্রত্যাহার, শাসন ও বিচার বিভাগে পৃথকীকরণ, পুলিশ বিভাগের সংস্কার এই তিনটি প্রস্তাবের উপর বক্তৃতা করেন। রাজশাহীর প্রগতিশীল আন্দোহনসমূহের সঙ্গে অল্প বয়সেই অক্ষয়কুমারের যেরূপ সংযোগ সাধিত হইয়াছিল তাহাতে অক্ষয়কুমারকেই রাজশাহীর 'জনৈক প্রতিনিধি' বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

এবম্বিধ আন্দোলন এবং নিজ ব্যবসায়ের অন্তরালে অক্ষয়কুমারের সাহিত্যিক মানস বরাবর ক্রিয়াশীল ছিল। তিনি সাহিত্যগুরু হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় আকৈশোর লিখিতেন। অন্যান্যদের সহযোগে তৎকর্তৃক ইহার সম্পাদনাভার গ্রহণের কথাও একটু আগে বলিয়াছি। রাজশাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকায়'ও তাঁহার লেখা নিয়মিতভাবে বাহির হইত। তাঁহার স্বদেশপ্রেম এতই প্রবল ছিল যে বিদেশী কর্তৃক আরোপিত মিথ্যা কলঙ্ককাহিনী তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বক্তিয়ার খিলজির বঙ্গবিজয়-কাহিনীর অলীকত্ব প্রতিপাদন করিয়া তিনি একখানি কাব্যগ্রন্থও রচনা করেন, কিন্তু তাহা প্রকাশিত হইবার পূর্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়।

অক্ষয়কুমারের সাহিত্যসাধনা পুষ্টিলাভ করে আর-একটি কার্যের ফলে। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্য অনুশীলন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তির পরিচয় মিলে তদীয় বিবিধ বাংলা রচনার মধ্যে। ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ আবিষ্কারে ও বিচার-বিশ্লেষণে এই সংস্কৃত জ্ঞান তাঁহার সবিশেষ সহায় হয়। ইহা কিঞ্চিৎ পরের কথা। সমসাময়িক রাষ্ট্রীয় আন্দোলন-অনুষ্ঠান দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত অক্ষয়কুমারকে স্বদেশের কাল্পনিক কলঙ্কমোচন পূর্বক তথ্যভিত্তিক সত্যিকার ইতিহাস রচনায় প্রবুদ্ধ করে। ব্যবহারশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা এবং দেশীবিদেশী বিবিধ সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি হেতু তথ্যপ্রমাণ-বিশ্লেষণে ও স্বদেশীয় ভাষায় পরিবেশনে তিনি যেরূপ সাফল্য লাভ করেন, অন্যান্যের পক্ষে তেমনটি হওয়া খুবই দুর্ঘট ছিল। দীর্ঘকালের প্রস্তুতির পর রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা'র মাধ্যমে ১৮৯৫ সনে তিনি শিক্ষিত সাধারণের নিকট তাঁহার ঐতিহাসিক মননশীলতার পরিচয় দিতে আরম্ভ করেন। এই কথাই এখন বলি।

অক্ষয়কুমারের সুবিখ্যাত 'সিরাজদ্দৌলা' গ্রন্থখানির প্রথম অংশ কয়েকটি অধ্যায়ে প্রথমে 'সাধনা'য় এবং 'সাধনা' উঠিয়া গেলে পরবর্তী অংশ 'ভারতী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিনি এ সমুদয় উক্ত পুস্তকাকারে গ্রথিত ও প্রকাশিত করেন ১৮৯৮ সনের জানুয়ারি মাসে। ইতিহাসগ্রন্থ হইলেও 'সিরাজদ্দৌলা' বাংলা সাহিত্যে ক্লাসিক্স্‌এর মর্যাদা লাভ করিয়াছে। বিদেশী লেখকবর্গ নবাব সিরাজদ্দৌলার চরিত্রকে নানাভাবে কালিমাময় করিয়া তোলেন। যে-সব অপরাধে তিনি অপরাধী নন তাহাও তাঁহাতে আরোপিত হয়। অক্ষয়কুমার উক্ত পুস্তকে প্রাঞ্জল ভাষায় যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া তৎসমুদয় খণ্ডন করিতে প্রয়াস পান। ঠিক অ্যাডভোকেটের মত নবাবের সপক্ষে তিনি নথিপত্রের নিরিখে যুক্তিজাল বিস্তার করেন। একারণ তাঁহাকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারেন বটে কিন্তু বিদেশী ইতিহাস-লেখকদের উগ্র মতবাদের ভ্রান্ততা প্রতিপাদন-কল্পে তখন ইহা আবশ্যক হইয়াছিল নিঃসন্দেহ। তাঁহারই লেখনীমুখে একটি ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের সুযোগ ঘটে। তিনিই সর্বপ্রথম এই মর্মে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেন যে তথাকথিত অন্ধকূপহত্যা একটি অলীক কাহিনী মাত্র। অক্ষয়কুমারের এই অভিমত প্রকাশের পর দেশীবিদেশী ঐতিহাসিক মহলে বেশ একটা আলোড়ন উপস্থিত হয়। কলিকাতা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির আনুকূল্যে ১৯১৬ সনের ২৪শে মার্চ এই বিষয়টি সম্পর্কে পণ্ডিতমণ্ডলীর যে আলোচনা-বৈঠক বসে তাহাতেও অক্ষয়কুমার পূর্বপ্রকাশিত নিজ মত দৃঢ়তার সহিত সমর্থন করেন। অন্ধকূপহত্যার স্মৃতিস্তম্ভটিও পরে কলিকাতার প্রকাশ্য রাজবর্ত্ম হইতে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারতবর্ষ তথা বাংলার ইতিহাস বৃটিশ ও ভারতবাসীর সংঘাতের ইতিহাস। অক্ষয়কুমার এ সময়কার ইতিহাস রচনার পক্ষে বহু উপকরণের সন্ধান পান। তাহার ভিত্তিতে তিনি 'মীরকাসিম', 'ফিরিঙ্গি বণিক' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'রাণীভবানী' শীর্ষক তাঁহার এক প্রস্থ প্রবন্ধ ১৩০৪ সালের (১৮৯৭-৯৮) 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। কি তথ্য-বিশ্লেষণে কি ভাষা-পরিপাট্যে প্রবন্ধগুলি বাস্তবিকই অপূর্ব। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশ লইয়া যাঁহারা গবেষণা করেন, এ-সকলের মধ্যে তাঁহারা বিস্তর নূতন বিষয়ের নির্দেশ পাইবেন। স্বদেশপ্রাণ অক্ষয়কুমারের ইতিহাসচর্চা ইঙ্গ-বঙ্গ সংঘাত লইয়া সুরু হইলেও

তাঁহার গবেষণা ক্রমশ ব্যাপকতর হইয়া পড়ে। আধুনিক যুগ হইতে ক্রমান্বয়ে মধ্যযুগ প্রাচীন যুগ প্রভৃতি লইয়াও তাঁহার গবেষণা আরব্ধ হয়। তৎকর্তৃক সম্পাদিত 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামীয় ত্রৈমাসিক পত্রিকার প্রকাশারম্ভ (জানুয়ারি ১৮৯৯) হইতে ইহার সূচনা—আমরা এইরূপ ধরিয়া লইতে পারি।

এই পত্রিকাখানি প্রকাশের কিছুকাল পূর্বে অক্ষয়কুমার ইহার একটি প্রস্তাবনা প্রচার করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবনাটিকে আন্তরিক সমর্থন জানাইয়া ভাদ্র ১৩০৫ ভারতীতে একটি সারগর্ভ প্রসঙ্গ লেখেন। ইহাতে তিনি এইরূপ বলেন যে জাতীয় কংগ্রেসের রাজনৈতিক কার্য্যে অনেকে অসন্তুষ্ট হইতে পারেন কিন্তু ইহার দ্বারা আমাদের মহদুপকারও সাধিত হইতেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে যেমন ঐক্যবোধ বাড়িতেছে তেমনই আমাদের অতীত ইতিহাস উদ্ধারের আকাঙ্ক্ষাও ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতেছে। আমাদের দৃষ্টি এখন শুধু বর্তমান কালের মধ্যেই নিবদ্ধ নয়, আমাদের মধ্যযুগ, পৌরাণিক যুগ এমন কি বৈদিকযুগেরও ইতিহাস উদ্ধারে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি দৃঢ়-সঙ্কল্প। আমাদের জাতীয় দোষ-ক্রটি, কলঙ্ক-অপযশ যাহাই থাকুক-না কেন, অপরের মুখে আমরা তাহা না শুনিয়া নিজেরাই তাহার সত্যাসত্য যাচাই করিয়া লইব এবং অতীত গৌরবকাহিনী উদ্ধার পূর্বক আমাদের জাতীয় ইতিহাস রচনার দ্বারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হইব। জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারে আমাদের অহংকার বাড়িবে বটে কিন্তু তাহা হইবে আত্মপ্রত্যয়েরই নামান্তর। অতীতের সত্যিকার ইতিহাস বর্তমানকে সংযত অথচ শক্তিশালী করিবে আর ইহা হইবে ভবিষ্যৎ উন্নতিরও দ্যোতক। তখন বহুজনে বিবিধ পত্রিকায় ঐতিহাসিক সন্দর্ভ পরিবেশন করিতেছিলেন। 'ঐতিহাসিক চিত্রে' ঐতিহাসিক সন্দর্ভগুলি একত্র সন্নিবেশ করার সম্পাদকীয় প্রস্তাবকেও তিনি অভিনন্দিত করেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম সংখ্যায় 'সূচনা' শীর্ষক একটি নিবন্ধে ইহার প্রশস্তি করিয়াছেন।

অক্ষয়কুমার প্রথমাবধি দেশাত্মবোধে উদ্‌বুদ্ধ রহিয়া রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিবিধ কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যরূপে তাঁহার সক্রিয় যোগদানের কথা আজ সুবিদিত। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সাহিত্যের মাধ্যমে স্থায়ী ও সার্থকরূপে দেশ ও সমাজ-সেবা সম্ভব বলিয়া ইহাকেই তিনি বিশেষভাবে আশ্রয় করেন।

সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ ইতিহাস। দেশাত্মবোধকে জীবনে ও কর্মে বস্তুগত করিতে হইলে জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচিত হওয়া একান্ত দরকার। কিন্তু ইহার পক্ষে প্রথম প্রয়োজন উপকরণসংগ্রহ। স্বদেশীয় কাব্য পুরাণাদিতে বিদেশীদের লিখিত সমসাময়িক বিবরণ ও ভ্রমণবৃত্তান্তে দেশের অভ্যন্তর ও বাহিরের পুঁথিপত্র শিল্পকলা শিলালেখ তাম্রশাসন ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের মধ্যে স্বদেশের ইতিহাসের উপকরণ ছড়াইয়া আছে। অক্ষয়কুমার এই-সকল উপকরণ নিজে এবং বিভিন্ন লেখক দ্বারা সংকলন করাইতে প্রয়াসী হন, 'ঐতিহাসিক চিত্রে'র মাধ্যমে। এই পত্রিকাখানি প্রকাশ সম্পর্কে তিনি রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "তাঁহার সহায়তায় এবং তাঁহার প্রস্তাবে 'ঐতিহাসিক চিত্র' নামক ত্রৈমাসিক পত্রের সম্পাদন ভার গ্রহণ করি।" এখানি একবৎসর মাত্র চলিলেও ইহার যাহা মূল উদ্দেশ্য—অর্থাৎ "সাধারণতঃ ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাতত্ত্বের উপকরণ সংকলনে"র যে সূচনা হইল তাহার আর বিরাম ঘটে নাই। আমরা দেখিতে পাই, অক্ষয়কুমার বাংলাদেশের এবং বাঙালী জাতির ইতিহাস-রচনার বিবিধ উপকরণ সম্পর্কে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিতে লাগিয়া যান। 'প্রদীপ' 'প্রবাসী' 'বঙ্গদর্শন'-নবপর্যায় 'সাহিত্য' প্রভৃতি তৎকালীন বিখ্যাত পত্রিকাগুলিতে এবং কখনো কখনো অল্পজ্ঞাত পত্রাদিতে ইতিহাস-মূলক প্রবন্ধ পরিবেশন করেন। তাঁহার অনুপ্রেরণায় রামপ্রাণ গুপ্ত, নিখিলনাথ রায় প্রমুখ লেখকবর্গ কখন মূলে কখনও-বা অনুবাদে ইতিহাসের উপকরণ-সম্বলিত রচনা প্রকাশ সুরু করিয়া দেন। বর্তমান শতাব্দীর আরম্ভাবধি অধ্যাপক যদুনাথ সরকার মোগল যুগের তথ্যভিত্তিক ইতিহাস রচনায় মনঃসংযোগ করিলেন। বাংলার বৌদ্ধযুগ ও তৎপরবর্তী যুগের ইতিহাসের উপকরণ বিভিন্ন উপায়ে সংগ্রহ করিতে হইবে, কিন্তু তাহা একক প্রচেষ্টায় কদাপি সম্ভবপর নহে। এজন্য সঙ্ঘবদ্ধ প্রযত্নের বিশেষ প্রয়োজন। শতাব্দীর প্রথম দশকে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিল যাহার ফলে সুধীবর্গের দৃষ্টি এইদিকে পতিত হয়।

অক্ষয়কুমার কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেসে একটি শিল্পকমিটি গঠিত হয় লালা হরকিসন লালের সভাপতিত্বে। লুপ্তপ্রায় স্বদেশীয় শিল্পের পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা সম্পর্কে বিচার আলোচনা করা ছিল এই কমিটির উদ্দেশ্য। অক্ষয়কুমার ইহার

অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। এই কংগ্রেসের সঙ্গে যে শিল্পপ্রদর্শনী আয়োজিত হয় তাহাতে তিনি স্বদেশীয় শিল্পের বিশেষ করিয়া রেশমশিল্পের উপরে মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি ইহাতে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন। ইহার ফলে স্বদেশীয় সাহিত্য দর্শন ইতিহাস প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণার দিকেও সুধীমণ্ডলী ঝুঁকিয়া পড়েন। এই সময়, ১৯০৬ সনে, কলিকাতায় দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন হইল। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষ ইহার সঙ্গে একটি শিল্পপ্রদর্শনীরও আয়োজন করেন; এই প্রদর্শনীর একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয় বাংলাদেশের পুরাতন পুঁথিপত্র গ্রামীণ লোকশিল্প সমেত বিবিধ পুরাকীর্তির সংগ্রহ লইয়া। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নেতৃত্বে এই বিভাগটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলার বিশেষ চেষ্টা হয়। এই সংগ্রহ দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে নিছক বঙ্গদেশের পুরাকীর্তির নিদর্শন-গুলি লইয়া একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের কথা উদিত হইল। ইহা ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিপূরক হইয়াও স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল থাকিবে। বস্তুতঃ প্রদর্শনীর এই বিভাগটিতে সংগৃহীত পুরা দ্রব্যাদি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হইল। ইহাকে ভিত্তি করিয়াই পরিষদের মিউজিয়ম বা চিত্রশালা গড়িয়া উঠিয়াছে। অক্ষয়কুমার প্রমুখ উত্তরবঙ্গের জননায়কগণের মনেও অনুরূপ একটি মিউজিয়ম স্থাপনের বাসনা জন্মে। ঐতিহাসিক উপকরণ সংকলনকালে অক্ষয়কুমার উত্তরবঙ্গে গৌড় এবং অন্যান্য বহু অঞ্চলে ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পান। এই-সব অঞ্চলে প্রাপ্ত পুরাদ্রব্যাদির একটি সংগ্রহ-শালা গঠনও আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকে। কিন্তু তাঁহাদের বাসনা পূর্ণ রূপ পাইতে কয়েক বৎসর কাটিয়া যায়।

বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির নাম শিক্ষিত মহলে আর কে না জানে? এই সমিতির মধ্যেই সংগ্রহশালা গঠনের বাসনা রূপ পরিগ্রহ করিল। অক্ষয়-কুমারের কর্মস্থল রাজশাহীতে সমিতি ১৯১০ সনে স্থাপিত হয়। দিঘা-পতিয়ার কুমার শরৎকুমার রায়ের বদান্যতায় এবং ঐকান্তিক উৎসাহে সমিতি স্থাপন সম্ভব হইল। অক্ষয়কুমারকে সারথি করিয়া ইহার কার্য অবিলম্বে আরম্ভ হয়। তিনি তাঁহার সহযোগী রূপে পাইলেন রমাপ্রসাদ চন্দকে। পুরাকীর্তির সংগ্রহের দিকেও সমিতি অবিলম্বে মন দিলেন। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থলে প্রাপ্ত পুথিপত্র গ্রামীণ শিল্প মূর্তি ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের প্রাচীন

নির্শনসমূহ, শিলালেখ তাম্রশাসন মুদ্রা প্রভৃতি একে একে সংগৃহীত হইয়া ইহাকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিল। রংপুর সাহিত্য-পরিষদও এইরূপ একটি মিউজিয়ম গঠনে অগ্রণী হইলেন। ঢাকা নগরীতে সরকারী আনুকূল্যে পূর্ববঙ্গের পুরাদ্রব্যাদির সংগ্রহ লইয়া একটি মিউজিয়ম স্থাপিত হইল। নবলব্ধ বিভিন্ন উপকরণের ভিত্তিতে বাঙালী জাতির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনাব এইরূপে উপায় হইয়া উঠিল। এতদিন বঙ্গদেশ তথা বাঙালী জাতির নির্ভরযোগ্য ইতিহাস না থাকায় বহু বিষয়ে পণ্ডিতমহলে ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভব হয়। এখন তাহা নিরাকরণের পন্থাও পাওয়া গেল। অক্ষয়কুমার বিভিন্ন স্থল হইতে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত পুরাদ্রব্যাদি লইয়া অবিলম্বে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইলেন। তৎসম্পাদিত 'গৌড়লেখমালা' সমিতি বাহির করেন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে। লেখমালার লেখাগুলির ব্যাখাও তিনি ইহাতে সংযোজিত করিলেন। এই বৎসরে সমিতি রামপ্রসাদ চন্দ সম্পাদিত 'গৌড় রাজমালা'ও প্রকাশিত করেন। যে যুগ লইয়া এতদিন বিস্তর সন্দেহ ও অস্পষ্ট ধারণবশে পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী ভ্রমে পতিত হয়েছিলেন; তাহার নিরাকরণেরও সুবিধা হইল।

বলিতে কি, গুপ্তযুগের পর হইতে মুসলমান আমলের পর্ব পর্যন্ত অষ্টম-দ্বাদশ শতাব্দী—এই পাঁচশত বৎসরের বাংলা তথা বাঙালীর ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়া পণ্ডিতগণ মত প্রকাশ করিতেছিলেন। ভারত-দ্বীপপুঞ্জে শিল্পদ্রব্য ভাস্কর্য স্থাপত্যের নিদর্শন বিস্তর পাওয়া যাইতেছিল এবং পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কখনও ভারতের পশ্চিম-উপকূলের আবার কখনও মহাচীনের প্রভাব এই সমুদয় সুস্পষ্ট বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতিতে যেসব শিল্পনিদর্শন মূর্তি প্রভৃতি সংগৃহীত হইতে থাকে তাহার সঙ্গে ভারত-দ্বীপপুঞ্জের শিল্পনিদর্শনসমূহের আশ্চর্য মিল দেখিয়া ইহা যে গৌড়ীয় রীতির অনুসরণে কৃত তাহা অক্ষয়কুমার প্রকাশ করিলেন। যবদ্বীপে কোনো কোনো সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া যায় বটে কিন্তু তাহার ভাববিশ্লেষণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিষম ভ্রমে পতিত হন। অক্ষয়কুমার পুঁথির সংস্কৃত ভাষার বিচার করিয়া দেখান যে উহা গৌড়ীয় কথোপকথনের ভাষা তথা ইহার উচ্চারণের মূলের সঙ্গে যোগ হারাইয়া তথাকার অধিবাসীরা উচ্চারণ অনুসারেই শব্দাদি লিখিতে অভ্যস্ত হন। দৃষ্টান্তস্বরূপ কৃষ্ণ পুঁথিতে হইয়াছে 'কেষ্ট' হৃদয় 'রিদয়' ইত্যাদি উৎকল এবং মগধে পুরাকীর্তিগুলির শিল্পরীতিও গৌড়ীয়

শিল্প-রীতি অনুসারী। উক্ত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে গৌড়ে পালরাজগণের অভ্যুদয়। তাঁহাদের প্রথম অভ্যুদয়কালে বাংলার প্রকৃতিপুঞ্জই নৃপতি নির্বাচন করিয়াছিলেন। তৎকালীন অবস্থা বিবেচনা করিলে কি এদেশে, কি বিদেশে সর্বত্রই এই ব্যাপারটি অভিনব বলিয়া বিবেচিত হইবার যোগ্য। পালযুগে বঙ্গদেশ শৌর্য-বীর্য ও ধনসম্পদের অধিকারী হয়। শুধু ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নহে, সমুদ্রপারের দূরদূরান্ত পর্যন্ত বাংলার প্রভাববিস্তার ঘটে। ধর্ম ও লোকাচার, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ভাষা-সাহিত্য, স্থাপত্য-ভাস্কর্য কোনো কোনো অঞ্চলে, যেমন ভারত-দ্বীপপুঞ্জে বিশেষভাবে প্রবর্তিত হয়। বলীদ্বীপের অধিবাসীরা ধর্মে এখনও হিন্দু। অক্ষয়কুমার সমিতির নবলব্ধ উপকরণ এবং ঐসব অঞ্চলের শিল্প-সাহিত্যের বিবিধ নিদর্শন বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া দেখান যে, উক্ত তথাকথিত বাংলার মাৎস্যন্যায় বা অধঃপতনের যুগেই গৌড়ের এই বিজয়-অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। তিনি 'সাগরিকা' শীর্ষক প্রবন্ধাবলীতে (সাহিত্য ১৩১৯-২০) যুক্তিপ্রমাণ সহযোগে এই বিজয়-অভিযানের কথা সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিলেন। ইতিপূর্বে গৌড়ের ইতিহাস তথা পালযুগের কাহিনী কিছু কিছু রচিত হইলেও এখন হইতেই ইহার গৌরবময় ইতিহাস সম্যক বুঝা যাইতে থাকে। অক্ষয়কুমার কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক ১৯১৫-১৬ সনে অনারারি লেকচার পদে বৃত হইয়া Decline of the Pala Kingdom of Bengal শীর্ষক এক প্রস্থ বক্তৃতা দেন। অতঃপর বাংলাদেশের বৌদ্ধযুগ গুপ্তযুগ পালযুগের (মুসলমানদের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত) বাংলার তথ্যনির্ভর ইতিহাস সংকলনের পক্ষে প্রচুর উপকরণ হস্তগত হইল।

উত্তরবঙ্গে পুরাদ্রব্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে লিপ্ত থাকার দরুণ অক্ষয়কুমার প্রমুখ বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির সভ্যগণের গোচরে আসিল বহু স্তূপ ও ধ্বংসাবশেষ স্বাভাবিক ভাবেই। সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খননকার্যে তখনও হস্তক্ষেপ করেন নাই। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত পাহাড়পুর স্তূপ-খননে সরকার কিরূপে উদ্বুদ্ধ হন তাহার কথা অক্ষয়কুমার স্বয়ং এখানে খনন কার্য আরম্ভের প্রথম দিনে, ১লা মার্চ ১৯২৩ তারিখে, উদ্‌বোধন বক্তৃতায় সবিস্তারে বলিয়াছেন।[১] পাহাড়পুর স্তূপটি পাহাড়ের মত দেখিতে বলিয়া স্থানীয় লোকেরা ইহার এইরূপ নাম দেয়। পূর্বে কোনো কোনো ইংরেজ

১ বঙ্গবাণী—বৈশাখ ১৩৩০ পাহাড়পুর

কর্মচারী এ স্তূপটির ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনো কাজ হয় নাই। এই স্তূপটির গহ্বরে যে বিস্তর ঐতিহাসিক পুরা দ্রব্যাদি লুকায়িত থাকা সম্ভব সে সম্বন্ধে অক্ষয়কুমার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ সার জন মার্শালকে যুক্তিপূর্ণ মন্তব্যলিপি প্রেরণ করেন। মার্শাল সাহেব ইহার পর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি এবং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহায়তায় খননকার্য পরিচালনার ভার লন, এবং সুবিখ্যাত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে এইজন্য পাঠান। পাহাড়পুর খননের ফলে বাংলার গৌরবময় বৌদ্ধযুগ ও পালযুগ সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য বাহির হয়। যাহার ফলে অক্ষয়কুমার-বর্ণিত বহির্ভারতের সঙ্গে ভারত তথা বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বিষয়ে সন্দেহের আর অবকাশ রহিল না। রবীন্দ্রনাথ পণ্ডিত-মণ্ডলীর সঙ্গে, ভারত-দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া এইপ্রকার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের নিদর্শন সমূহ প্রত্যক্ষ করেন। তাঁহাকে পুরোধা করিয়া এ সম্বন্ধে গবেষণাকার্য পরিচালনার নিমিত্ত কলিকাতায় Greater India Society বা বৃহত্তর ভারত সভা স্থাপিত হয়। অক্ষয়কুমার ছিলেন এ ধরণের গবেষণার পথিকৃৎ।

অক্ষয়কুমার বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনে (১৯১৪) ইতিহাস শাখার সভাপতি পদ অলংকৃত করেন। অন্যান্য কথার মধ্যে তিনি এই মর্মে বলেন যে আমরা এখন শুধু বাংলার একখানি ইতিহাস লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারি না, আমরা বাংলার একখানি 'ভাল ইতিহাস' চাই। অর্থাৎ নবাবিষ্কৃত তথ্যপ্রমাণাদির ভিত্তিতে তাঁহার মতে একখানি নির্ভরযোগ্য বাংলার ইতিহাস সংকলন তখনই সম্ভবপর হইয়াছিল। তিনি তথ্যপ্রমাণাদির বিচার-বিশ্লেষণ কর্তব্য বলিয়া বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। 'বিচারণা' কথাটির উল্লেখ এখানে আমরা প্রথম পাই। অক্ষয়কুমারের এই বক্তৃতাটি এখন বাংলা তথা বাঙালীর ইতিহাস-রচয়িতাদের বিশেষভাবে অনুধাবন-যোগ্য। ইতিহাস-রচনার ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত অক্ষয়কুমারের ইতিহাস-পুস্তক এবং ঐতিহাসিক প্রবন্ধাবলী পাঠে সে সম্বন্ধে আমাদের স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে। বাস্তবিক তাঁহার রচনাশৈলী ঐতিহাসিক বর্ণনাকে সাহিত্যের মর্যাদা দান করিয়াছে। অক্ষয়কুমারের ভাষা যেমন ঐশ্বর্যময়ী তেমনি প্রসাদগুণে অভিসিঞ্চিত। কোনো বিদ্বজ্জনসভা এই সকল প্রবন্ধের কিয়দংশও যদি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন তাহা হইলে

ঐতিহাসিক উপকরণাদি যে ইতিহাস-গবেষকদের সহজলভ্য হইবে শুধু তাহাই নয়, ইহা বাংলাসাহিত্যেরও গৌরব স্থায়ীভাবে বৃদ্ধি করিবে। জনৈক-লেখক অক্ষয়কুমারকে বাংলার ইতিহাস রচনার প্রথম সৈনিক বলিয়াছেন, কিন্তু এটুকু বলিলেই তাঁহার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি সত্যসত্যই ছিলেন বাংলা তথা বাঙালী সম্পর্কীয় ঐতিহাসিক গবেষণার পথিকৃৎ।

উল্লেখপঞ্জী। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বঙ্গভাষার লেখক—১৩৩১, প্রবাসী, চৈত্র ১৩৩৬এ প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের জীবনকথা; প্রবাসী, আষাঢ় ১৩৩৭এ প্রকাশিত অক্ষয়কুমারের পত্রাবলী; Annie Besant. *How India Wrought For Freedom*, 1915; Proceedings of the National Conference (1885); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইতিহাস, ১৩৬২; শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন, বাংলার ইতিহাস-সাধনা, ১৩৬০; Presidency College Register, 1927; ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় (এই পুস্তকখানিতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অক্ষয়কুমারের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলীর একটি নির্ভরযোগ্য তালিকাও প্রদত্ত হইয়াছে); ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাময়িক-পত্র, নূতন সংস্করণ, ১৩৫৪।

অক্ষয় কুমার মৈত্রিয়—জন্ম–১৮৬১ সালে ১লা মার্চ নদীয়া জেলা সিমলা গ্রামে (থানা—নওয়াপাড়া)। পিতা—মথুরানাথ মৈত্রেয়। মাতা—সৌদামিনী দেবী। ১৮৭১ সালে বোয়ালিয়া-গবর্ণমেণ্ট-স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হয়। ১৮৭৪ সালে সংস্কৃত শিক্ষার সূত্রপাত। রাজসাহী বিভাগের মধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং গবর্ণমেণ্ট হতে পনেরো টাকা করে বৃত্তি পান। ঐ কলেজে এফ. এ পরীক্ষায় রাজসাহী বিভাগে সর্বশ্রেষ্ঠ হয়ে তিনি কুড়ি টাকা করে বৃত্তি পান। কলিকাতা প্রেসীডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৮৩ সনে বি. এ এবং ১৮৮৫ সনে রাজসাহী কলেজ হতে বি. এল পাস করেন। প্রথম কাব্য—'বঙ্গবিজয়'। রচনা—রাজসাহীর 'হিন্দুরঞ্জিকা' ও কুমারখালির 'গ্রামবার্তায়' অনেকগুলি রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থ—'সমরসিংহ' (১২৯০ সনে)। সিরাজদ্দৌলা (ঐতিহাসিক চিত্র) ১৩০৪ সাল, ২১শে জানুয়ারী ১৮৯৮। সীতারাম রায় (ঐতিহাসিক চিত্র)—বৈশাখ ১৩০৫, ১০ই মে ১৮৯৮, মীরকাসিম (ঐতিহাসিক চিত্র) ১৩১২ সাল, ২৫শে ফেব্রুয়ারী ১৯০৬। ফিরিঙ্গি বণিক্—শ্রাবণ ১৩২৯, ২০শে জুলাই ১৯২২। অজ্ঞেয়-বাদ (সমালোচনা) ইং ১৯২৮। গৌড় লেখমালা, ১ম স্তবক—১৩১৯ সাল, ১লা সেপ্টম্বর ১৯১২। ইহাতে অর্থাৎ প্রথম স্তবকে পাল—নরপালগণের তাম্রশাসন ও তাঁদের শাসন সময়ের কতকগুলি শিলালিপি প্রকাশিত হয়। এছাড়াও অক্ষয়কুমারের অধিকাংশ রচনা অপ্রকাশিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে।

প্রতিভার সম্মান—রাজসরকার অক্ষয়কুমারকে 'কৈসর-ই-হিন্দ স্বর্ণ পদক' ও 'সি. আই. ই' উপাধি দান করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ তাঁহাকে ১৩১১ সালে অন্যতম সহকারী সভাপতি ও ১৩১৮ সালে 'বিশিষ্ট-সদস্য' নির্বাচিত ক'রে গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়েছেন।

মৃত্যু—১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩০ (২৭শে মাঘ ১৩৩৬) তারিখে ৭০ বৎসর বয়সে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১-১৯৪১

রবীন্দ্রনাথ : শেষ অধ্যায়

নীহাররঞ্জন রায়

১

রবীন্দ্র-প্রতিভা যখন প্রায় মধ্যগগন স্পর্শ করেছে তখন বাঙলাদেশে নূতন স্বদেশ ও স্বাজাত্যবোধের প্রথম অরুণোদয়; আর আজ যখন সে প্রতিভাসূর্য অস্তমিত হ'লো তখন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে' ধন ও রাজ্যলোভে বিভ্রান্ত নরমাংসলু শ্মশান কুকুরদের কাড়কাড়ির উন্মত্ত নৃত্য চলেছে। কালসমুদ্রের এই দুই বিন্দুর মাঝখানে বিচিত্র ভাব ও আদর্শে বিক্ষুব্ধ, বিচিত্র চিন্তা, স্বপ্ন ও কল্পনায় লীলা চঞ্চলিত বাঙ্‌লাদেশের একটি সুদীর্ঘ ঘটনাবহুল অধ্যায় বিধৃত হ'য়ে আছে। যে মৃত্যুঞ্জয়ী প্রতিভার সৃষ্টির মধ্যে এই সুদীর্ঘ অধ্যায়টির সমগ্ররূপ এক অখণ্ডতায় ধরা পড়েছে সে-প্রতিভার অধিকারী একক রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। বস্তুতঃ বাঙ্‌লাদেশের গত পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস রবীন্দ্রকবিমানসের প্রকাশ ও পরিণতির ইতিহাস; রবীন্দ্রনাথ ত একক একজন ন'ন, একটি ঐতিহ্যময় প্রতিষ্ঠান বল্লেও তাঁকে কম করে বলা হয়, তিনি একটা যুগ, এবং এই যুগটির ধর্ম ও প্রকৃতি, রূপ ও রহস্য সমস্তই রবীন্দ্রমানস-প্রকাশের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে একটি অখণ্ড সমগ্র রূপে। এই অর্ধ শতাব্দীর একপ্রান্তে গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত. সংকীর্ণ অল্পপরিসর গ্রামীজীবনমুখর, গীত ও কল্পনাসমৃদ্ধ বাঙ্‌লার বিস্তীর্ণ সমতল ক্ষেত্র; এর অন্য প্রান্তে কোলাহলমুখর, গর্বোদ্ধত, আত্মশক্তিতে দৃঢ় ও সচেতন, সংগ্রামবিক্ষুব্ধ সুবিস্তৃত সাম্প্রতিক পৃথিবী। অগণিত ভাব ও চিন্তাবৈচিত্র্যে বিপর্যস্ত এই দুস্তর কালসমুদ্রের খণ্ড খণ্ড রূপ ও অংশকে একটি অখণ্ড সমগ্ররূপে এমন করিয়া সৃষ্টির মালায় গাঁথিয়া তোলার সৌভাগ্যের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে খুব বেশী নেই।

রবীন্দ্রনাথের বাল্য-পরিবেশ গড়ে' উঠেছিল কলকাতায়, যে-কলকাতা তখন কেবল বর্তমান রূপ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে বিদেশী ধনিক-রাষ্ট্রের প্রভুত্বের আওতায়। তাঁর প্রতিভার যৌবনোন্মেষ ঘটলো বাঙ্‌লার সমতল ক্ষেত্রে ক্ষীয়মান পল্লীসমাজের শীতল ছায়ায় এবং কতকাংশে নগর-নির্ভর, নূতন ও প্রাগ্রসর মধ্যবিত্তসমাজের উজ্জ্বল কিরণপাতে। তারপর,

পঞ্চাশোর্ধে তিনি পদক্ষেপ করলেন বৃহত্তর পৃথিবীর আঙ্গিনায় যেখানে ইতিমধ্যেই সুরু হ'য়ে গিয়েছে উনবিংশ শতকের শেষ পাদ এবং বিংশ শতকের প্রথম যুগের বিচিত্র ও গভীর সমাজ-মানসের চঞ্চল জীবন-নাট্যের অভিনয়। ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাসের মধ্যে বাঙ্‌লাদেশের সমাজ-মানসের ইতিহাসের ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন। এই সুদীর্ঘ ব্যক্তি ইতিহাসের, আর বাঙ্‌লার নগর-নির্ভর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ-জীবনের সঙ্গে বৃহত্তর পৃথিবীর প্রবহমান জীবনধারার যোগ এবং বাঙালীর সমগ্র জীবনে পরদেশী ধনিকরাষ্ট্র-বাহিত বৃহত্তর পৃথিবীর জীবনধারার অসংখ্য শাখা প্রশাখার বিস্তার—এ-দু'য়ের মর্মবাণী ও ঐতিহাসিক ইঙ্গিত একই। এই উভয়ই রবীন্দ্র-মানসপ্রকাশের ভিতর একটি অখণ্ড ঐক্য রূপায়ণ লাভ করেছে, এবং এই হিসেবে রবীন্দ্রনাথ যে-ভাবে একটি দেশ ও কালের মানস-প্রতীক, পৃথিবীর সংস্কৃতির ইতিহাসে তার তুলনা খুব বেশী নেই। গত পঞ্চাশ বৎসরে বাঙ্‌লাদেশে ছোটবড় এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি', এমন কোন ভাব, কল্পনা বা চিন্তারশ্মিপাত হয়নি যা' রবীন্দ্র-চিত্তকে কোনো ভাবে স্পর্শ করেনি'; বস্তুতঃ আমাদের মানসজীবনের সকল দিক ও সকল স্তর তাঁরই প্রতিভার মায়াস্পর্শে রূপান্বিত ও ভাবান্বিত হ'য়েছে, তিনিই আমাদের গভীরতর সমাজমানসকে প্রকাশ করেছেন। পদ্মা-ভাগীরথীর পলিমাটি থেকে তিনি গড়ে' তুলেছেন যাকে বলি আমরা বর্তমান বাঙ্‌লা-দেশ। বিগত পঞ্চাশ ষাট বৎসরের বাঙালী সজাগ চিত্তে স্বদেশ ও পৃথিবীর যত তরঙ্গাঘাত লেগেছে রবীন্দ্রনাথের সুবিস্তৃত সাহিত্যে, রবীন্দ্র মহাভারতে সে আঘাত কোনো না কোনো চিহ্ন রেখে গেছে; সুদীর্ঘ ইতিহাসের একটি স্তর কখনো পরবর্তী প্রত্যেকটি স্তরে বিবর্তিত হ'য়েছে, কখনো পরবর্তী স্তর বা স্তরগুলির ভেতর দিয়ে দূরতম স্তর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছে, কখনো অতীত ও বর্তমান একই স্তরে একীভূত হ'য়ে ভবিষ্যতের সমন্বায়িত রূপের দিকে ইঙ্গিত করেছে, এবং সকল স্তর একত্র গ্রথিত হয়ে একটি অখণ্ড চলমান রূপ রচনা করেছে। বস্তুতঃ রবীন্দ্র কবিজীবন গতির চাঞ্চল্যে প্রাণবান্, তিনি চিরপথিক, অবারণ তাঁর বিরামহীন গতি; সে-গতি মৃত্যুতে শুধু এসে থামলো। থামলোই বা বলি কেন, রবীন্দ্রনাথ তো বারবার বলেছেন, সৃষ্টির এই গতি মৃত্যুতেও এসে থামে না, মৃত্যুস্নানে শুচি হ'য়ে জীবন নূতন রূপ পরিগ্রহ করে।

আমাদের ঋষিকবি ও কবিঋষিরাও তো এই কথাই না বলেছেন। কিন্তু সে যাই হোক্, রবীন্দ্র-কবিমানসের এই সচেতন গতিধর্ম, সহজ প্রাণবান্ প্রাণপ্রবরতার ধর্ম, এ-ধর্ম সহজে রবীন্দ্র-সাহিত্যপাঠকের দৃষ্টিগোচর হয়না, বিশেষ করে তাঁর কাব্য যখন আমরা টুক্‌রো টুক্‌রো করে পাঠ করি, খণ্ডিত দৃষ্টিও অনুভূতির রূপে,ও রসে যখন ডুবে যাই তখন সেই অখণ্ড সমগ্র রূপ এবং তার সচেতন প্রাণবান্ গতিধর্ম আমাদের দৃষ্টি ও মন যেন এড়িয়ে যায়।

২

রবীন্দ্র-মানস প্রকাশের কোনো পর্বেই এই সচেতন প্রাণবান্ গতিধর্ম অনুপস্থিত নয়; তিনি ত চিরকালই কালের রথের সারথী। এই প্রাণবান্ গতিধর্ম কৈশোরের "প্রভাত-সঙ্গীতে"ও যেমন স্বপ্রকাশ, ঠিক্ তেমনই স্বপ্রকাশ পরিণত বয়সের "বলাকা" ও "পূরবী"তে, এমন কি মধুর ও কোমল "মহুয়া"তেও। এই গতিধর্মের রূপ সর্বত্র এক নয়, একথা সত্য, তবে সর্বত্রই এর রূপ প্রকাশ পেয়েছে জীবনের এমন একটা গভীর তরঙ্গাঘাত থেকে যা উপরকার লীলাচাঞ্চল্যকে অনেক সময় আবৃত করে রাখে, শিল্পের ও সৌন্দর্যেরই প্রয়োজনে। জীবনের এই প্রাণবান্ গতিধর্ম গভীরতর স্তরের লীলা-চাঞ্চল্যকে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন কখনও ভাবমুগ্ধ বিস্ময়ের স্বপ্নবিহ্বলতায়, কখনও আদর্শলোকের উর্ধমুখীন্ কল্পনায়, কিন্তু তাঁর একান্ত গীতধর্মী কবিতা কিংবা সাঙ্কেতিক নাট্যেও তাঁর বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি অথবা আদর্শবাদী কল্পনা তাঁকে কখনো মাটীর ধরণী এবং ধরণীর মাটী 'দিয়া গড়া মানুষের বস্তুমূল থেকে একেবারে একান্ত ভাবে বিচ্ছিন্ন করেনি'। 'জন্ম-রোম্যান্টিক্' রবীন্দ্রনাথের রোমান্সের প্রকৃতি সত্যই একটু ভিন্ন ধরণের। বস্তুর প্রকৃতি সম্বন্ধে এক ধরণের চেতনা তাঁর বরাবরই ছিল, সমাজ-চেতনাও ছিল, কিন্তু এই বস্তু-প্রকৃতির চেতনায় সচেতন ঐতিহাসিক বোধের স্পর্শ পেতে এবং সমাজ-চেতনাকে ঐতিহাসিক চেতনা দ্বারা সমৃদ্ধ করতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল পরিণত বয়স পর্যন্ত; বস্তুত তাঁর পরিচয় আমরা পেলাম কবিগুরুর সত্তর বৎসরের পরের দশ বৎসরের রচনায়। স্বাধীন ও অনেকাংশে সংস্কারমুক্ত অথচ বোধ ও বুদ্ধির গভীর অনুশাসন দ্বারা শাসিত মন রবীন্দ্রনাথের অনেক দিনই ছিল, কিন্তু যে জ

বিশুদ্ধ পরিস্রুত মানস স্বচ্ছ দৃষ্টিতে সৃষ্টিরহস্য, মানব প্রগতির রহস্য দেখ্‌তে পায় সে-দৃষ্টি রবীন্দ্রনাথ অর্জন করেছিলেন জীবনের শেষ দশটি বৎসরে। কবিজীবনের শেষ দশটি বৎসর একটি নূতন অধ্যায়, নূতন, কিন্তু পুরাতন প্রবাহমান জীবনধারার প্রাক্তন অধ্যায়গুলি থেকে বিচ্ছিন্ন বা বা বিযুক্ত নয়, তাদের সঙ্গে ভিতরকার ঐক্যসূত্রে গাঁথা; একটু অন্য ভাবে বল্‌তে গেলে বলা যায়, নূতন অধ্যায়টি পুরাতন অধ্যায়গুলিরই পূর্ণ প্রস্ফুটিত রূপ, কার্যকারণ সম্বন্ধে গাঁথা জীবনপ্রবাহের পূর্ণ ঐতিহাসিক রূপ।

কয়েকটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৩০'এ রবীন্দ্রনাথ সোভিয়েট্‌ রাশিয়া ঘুরে এলেন, এমন সময়ে যখন সমস্ত পৃথিবী নিদারুণ অর্থ দৈন্যে পীড়িত; ভারতবর্ষও এই পীড়া থেকে বাদ পড়েনি। ১৯৩১'এ বেরুল "রাশিয়ার চিঠি" যা'তে কবিগুরুর মনের ও মননের গতি স্বপ্রকাশ। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এই বৎসরেই আমরা দেখ্‌লাম, ভারতবর্ষে দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থ পরিণতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ জুড়ে সাম্রাজ্যবাদের নিদারুণ অত্যাচার ও অবিচারের সূত্রপাত, ব্যক্তিস্বাধীনতা বিলোপের বিচিত্র প্রচেষ্টা। সাম্প্রতিক সোভিয়েট রাশিয়ার পটভূমিতে দেশের এই নিঃস্ব ও নিঃসহায় অবস্থা যেন আরও বেশী প্রকট হ'য়ে উঠলো। তাছাড়া, এর সঙ্গে ক্রমবর্ধমান আর্থিক দুর্গতি ত ছিলই। এই দারুণ দর্গতির মধ্যেও দেশের আনাচ কানাচ থেকে এক নূতন বাণীর, নূতন যুগাদর্শের, মানবতার এক নূতন আদর্শের ক্ষীণ ও অস্পষ্ট আহ্বান মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল। এমন সময়, ১৯৩৬ও আর একবার ১৯৩৭'র লক্ষ্ণৌ ও ফয়জাবাদের সভাপতি-মঞ্চ থেকে জহরলাল নেহ্‌রু সেই ক্ষীণ অস্ফুট আহ্বানকে স্পষ্ট বাণীরূপ দান করে তার কর্মরূপের মধ্যে সমস্ত দেশকে আহ্বান করলেন। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই সরকারী ও বেসরকারী নিস্পেষণ যন্ত্র রাজপথে নেমে গেল, এবং সকল প্রকার প্রগতিবাদী দল ও আন্দোলনগুলির কণ্ঠ ও হস্তরোধ করতে প্রবৃত্ত হ'লো। অন্য দিকে, বিচ্ছিন্ন ও বিভ্রান্ত এই দল ও আন্দোলন-অযথা চীৎকার ও বাগবিস্তারে নিজেদের শক্তিও ক্রমশঃ হারিয়ে ফেলতে আরম্ভ করলো। বিদেশে, ১৯৩৬'এ ফ্যাসিষ্ট ইতালি অতর্কিতে দুর্বল হাব্‌শীদের গ্রাস করলে, এবং দর্পোদ্ধত জাপান মুক্তি[illegible]রত চীনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দেখ্‌তে দেখতে সমগ্র য়ুরোপ জুড়ে আর্থিক ও রাষ্ট্রীক মুক্তির নীতি ও আদর্শ একেবারে নিম্নত[illegible]রে ডুবে গেল, দেখ্‌তে

দেখ্‌তে শক্তির নিষ্ঠুর দন্তপংক্তি মানবতার কণ্ঠ চেপে ধরলো। কবির একতম ভালবাসার পাত্র প্রিয়তম মানুষের পায়ের শৃঙ্খল আরও কঠিন হ'য়ে বাঁধা পড়লো, যে-মানবতার বেদী ছিল কবির পূজা-নৈবেদ্যের একতম বেদী সেই বেদী হ'লো সর্বত্র ধূলিবিলুণ্ঠিত। এবং সর্বশেষে, ১৯৩৯'এ মানুষ এবং মানবতার ভবিষ্যৎ নিক্ষিপ্ত হ'লো ধ্বংস ও মৃত্যুর ঘূর্ণীচক্রে।

পৃথিবীর এই দৃশ্যপট যখন মনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল সেই সময়ই অন্যদিকে কবির মনের মধ্যে ছায়াপাত করছে মৃত্যুর অস্পষ্ট অগ্রসরমান্ মূর্তি; জীবন-মোহানার পার থেকে মৃত্যুদূতের ক্ষীণপদধ্বনি কানে এসে বাজ্‌ছে। ১৯৩১'এ তিনি সত্তর পেরিয়ে গেছেন, দেশ জুড়ে রাজকীয় সমারোহে তাঁর জয়ন্তী-উৎসব সদ্য অনুষ্ঠিত হ'য়ে গেছে। ১৯৩৭'এ কবি হঠাৎ নিদারুণ রোগে আক্রান্ত হ'লেন, কিন্তু কঠিন সংগ্রামের পর বেঁচে উঠ্‌লেন এবং সুপক্ক পরিণত জীবনের শক্তি ও দীপ্ত খানিকটা ফিরে পেলেন। ১৯৪০'এ মৃত্যুর সঙ্গে নিদারুণ সংগ্রাম আবার আরম্ভ হ'লো, সুদীর্ঘ কয়েক মাস শুধু আত্মার অপরাজেয় শক্তিতে তার সঙ্গে যুঝ্‌লেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হার মেনে জয়ী হ'য়ে আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। কিন্তু, এই দশ বৎসর ক্রমশই তিনি বুঝতে পাচ্ছিলেন, মৃত্যু শুধু তাঁর জীবনেই আস্‌ছেনা, মৃত্যু তার সমস্ত মারণ-যন্ত্র ও দলবল নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে এই ধ্বংসোন্মুখ মানবধর্মবিরোধী সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার অন্তিম শয্যার দিকেও। অথচ এই সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থাকেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন একদিন, স্বীকার একদিন করেছিলেন এই ভেবে যে, এরই ভেতর থেকেই একদিন চিরন্তন মানবধর্ম হ'বে জয়ী, মানুষ তার মুক্তি অর্জ্জন করবে।

এই ছিল মানুষ ও পৃথিবীর প্রবাহ যার তরঙ্গ এসে প্রতি মুহূর্তে আঘাত করছিল কবির চিত্ততটে; এর প্রত্যাভিখ্যাত কি ভাবে কবির মন ও কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছে, কি ভাবে এদের প্রকাশকে বাণীরূপ দান করেছে তার সম্পূর্ণ পরিচয় বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে কবির গত দশ বৎসরের রচনায়। স্পর্শালু কবিচিত্তের মণিকোঠায় বিশ্বজীবনের বিচিত্র তরঙ্গাঘাত কত সূক্ষ্ম-লীলায় কত বিচিত্র রূপান্তর গ্রহণ করে তার বহুল পরিচয় এই রচনাগুলিতে পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়: এই রূপান্তরের ধর্ম ও প্রকৃতি যদিও একান্ত ভাবে অদ্বৈতাচারী, এবং প্রকাশ একান্ত ব্যক্তিগত, তা হ'লেও এর ভেতর গত দশ বৎসরের সমাজ-মানসের সমগ্রতার পরিচয়ও সমান প্রত্যক্ষ।

প্রত্যাভিঘাতের রূপগুলিও সহজ ও সুস্পষ্ট। বাঙ্‌লাদেশের ও পৃথিবীর তিনপুরুষের ইতিহাস তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, তিনি সবই দেখেছেন, সবই জেনেছেন, দেখেছেন ও জেনেছেন কবির দৃষ্টি ও মন দিয়ে যে-দৃষ্টি ও মনের কাছে কিছুই তুচ্ছ নয়, কিছুই অধরা নয়। যত কিছু মহৎ আদর্শ ছিল তাঁর প্রিয়, পরিপূর্ণ মানবতার যে-আদর্শ তিনি গড়ে তুলেছিলেন সমগ্র জীবনের সাধনা দিয়ে, পরিণত বয়সে জীবনের সায়াহ্নে তিনি দেখ্‌লেন সব ভেঙেচুরে গিয়ে মাটীর ধূলোয় লুটাতে। বিগত দিনের স্মৃতি শুধু নিদারুণ লজ্জা ও অপমানের স্মৃতি। নিজের দেশেও যে দৃশ্য চিত্তপটে ভেসে উঠ্‌লো তা'তেও গভীর দুঃখ ও নৈরাশ্য ছাড়া অন্তরে আর কোনও অনুভূতি উদ্রিক্ত হ'বার কথা নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি দুঃখে অভিভূত হ'লেন, নৈরাশ্যে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হ'লেন? মানুষের বিশ্বাস ও ভালবাসা কি তাঁর চলে গেল? মানবের অপরাজেয় বীর্যে বিশ্বাস, তাঁর ঐতিহাসিক পরিণতিতে অপরিমেয় বিশ্বাস কি তাঁকে পরিত্যাগ করলো? না, তা হ'লোনা, একেবারেই হ'লোনা। রবীন্দ্রনাথ কোনদিনই দুঃখবাদী ছিলেন না, অবিশ্বাস তাঁর কোনদিনই ছিলনা। সকল বন্ধন থেকে মুক্ত হ'য়ে পৃথিবীর সমস্ত রূপরসগন্ধ নিঃশেষে আহরণ করে নিরাসক্ত মন নিয়ে, শান্ত পরিণত মানস নিয়ে, স্বচ্ছ গভীর দৃষ্টি নিয়ে মৃত্যুর তোরণে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন; এই স্বচ্ছ পরিণত দৃষ্টি সর্বআবরণ-মুক্ত মানুষকে তাঁর চিত্তের নিকটতর করেছে, জীবনের বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতা জীবনেরই গভীরতর অর্থ ও মহিমা তাঁকে জানিয়েছে। মৃত্যু তাঁর জীবনে ঘনিয়ে আসছিল, শেষ খেয়ার জন্য তিনি বহুদিনই প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তিনি পাড়ি দেবার জন্য উন্মুখ ছিলেন না, যে-পৃথিবীকে তিনি ভালবাসতেন, যে-মানুষের মধ্যে তিনি অন্তরের শান্তির উৎসকে জেনেছিলেন তাদের ছেড়ে চলে যাবার এতটুকু ঔৎসুক্য তাঁর ছিল না। সেই জন্যেই মানুষে গভীর বিশ্বাস কখনও তাঁকে পরিত্যাগ করেনি', তাঁর দেশের ও পৃথিবীর লোকদের উপর বিশ্বাস কখনও তিনি হারাননি'। ধ্বংস ও মৃত্যু শাশ্বত মানুষের পরিণতি হ'তে পারেনা; যে-মানুষ কর্ম ও সংগ্রামে রত 'যে-মানুষ মাটির কাছাকাছি', যে-মানুষ তার পরিবেশের সঙ্গে একাত্মায় যুক্ত, সেই সাধারণ মানুষের ধ্বংস নেই। আর, যে মানবতার আদর্শ সমাজ-ইচ্ছার প্রতিরূপ, যে-মানবতা বস্তুকে অনুরূপ ইচ্ছায় রূপান্তরিত করে সেই আদর্শেরও মৃত্যু নেই। রবীন্দ্রনাথ সেই

শাশ্বত সাধারণ মানুষের সঙ্গে, সেই বৃহৎ মানবতার আদর্শের সঙ্গে চিত্তের সুগভীর আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন, এবং তাঁর কাছে বিনিময়ে মন ও হৃদয় উন্মুক্ত করেছিল যার ফলে কবিগুরুর চিত্তে মানুষ ও মানবতার ঐতিহাসিক বোধ জন্মেছিল। কবি যে তার পরিণত বয়সে বারেবারে মানুষের সাধারণ জীবনের মধ্যে, প্রাত্যহিক জীবনের সহজ সমতল ক্ষুদ্র তুচ্ছ ঘটনার আবর্তের মধ্যে ফিরে এসেছেন, যে সাধারণ মানুষ খেলা করে, ভালবাসে, খাটে ও গান গায়, প্রকৃতির বিচিত্র প্রকাশের সঙ্গে হাসে ও কাঁদে, তাদের মধ্যে ফিরে এসেছেন, এটা কিছু অকারণে নয়। ইতিহাসের বড় বড় ঘটনা, রাজ্য ভাঙাগড়া, বড় বড় বীর ও সম্রাটদের, বড় বড় নেতাদের জীবনের মধ্যে যে তাঁর কল্পনা প্রসারিত হয়নি', হ'য়েছে অত্যন্ত সাধারণ জীবনের মধ্যে, এর ইঙ্গিতও নিরর্থক নয়। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের অফুরন্ত শক্তি ও যৌবনেই তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণ মানুষই যৌবন ও প্রগতির একমাত্র উৎস বলে' তিনি জেনেছেন। পৃথিবীর শক্তি ও যৌবন ত এই সাধারণ মানুষের মধ্যেই বিধৃত হ'য়ে আছে, যে-মানুষ মাটী ভেঙ্গে চাষ করে, যে-মানুষ বার মাস খাটে, যে-মানুষ চির-পথিক, যে-মানুষ আপন শক্তি ও বীর্যে বাঁচে অথবা মরে। বায়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মন হয় অবিশ্বাসী ও রক্ষণশীল ; রবীন্দ্রনাথের বেলায় হ'য়েছে ঠিক তার উল্‌টো। গভীরতর অর্থে মানুষ ও পৃথিবীকে তিনি ভালবেসেছিলেন বলেই এই অবাঞ্ছিত পরিণতি থেকে নিজকে বাঁচাতে পেরেছিলেন। পৃথিবীর যে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির তরঙ্গ-পর্যায়ের মধ্যে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন, সে-সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধ্বংস যে এগিয়ে আস্‌ছে, তা তিনি বুঝেছিলেন এবং তার সম্পূর্ণ অর্থও ভাল করেই জানতেন। এই জ্ঞান যে-কোন মানুষের বিশ্বাসের ও ভালবাসার ভিত্তিভূমিকে টলিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু রবীন্দ্র-মানস পরিণত বয়সে এমন একটা বিশেষ ঐতিহাসিক বোধের অধিকারী হ'য়েছে যার বলে কবি জেনেছেন, সভ্যতা ও সংস্কৃতির কোন একটা বিশেষ পর্যায়ের ধ্বংস শাশ্বত মানবাত্মার যাত্রাপথে একটি ছেদ মাত্র, নূতন সভ্যতার নবজন্মের একটি বেদনাপর্ব মাত্র। ধ্বংস ও মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মেই আসে স্বাভাবিক কারণেই, মানুষ তাকে ডেকে আনে ; আবার নূতন স্বপ্নাদর্শে নূতন সভ্যতা সৃষ্টির অধিকার এবং শক্তিও শুধু মানুষেরই আছে। এই যদি হয় ধ্বংস ও সৃষ্টির, মৃত্যু ও জীবনের

মর্মবাণী, তা'হলে রবীন্দ্রনাথ মানুষে বিশ্বাস, মানবতার আদর্শে বিশ্বাস হারাবেন কেন, কেন দুঃখবাদী হ'বেন, কেন হ'বেন সংশয়বাদী? অথবা প্রগতি-বিরোধী মনই বা কেন হ'বে তার? নির্ভীক, নিরাসক্ত, ভারমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত রবীন্দ্রনাথ সর্ববন্ধমুক্ত মানবাত্মার বেদীতেই চিরকাল অর্ঘ্য বহন করে এনেছেন; মানুষকে পরিপূর্ণভাবে না জানার, না বুঝার জন্যই ত যত সংস্কার বন্ধনের সৃষ্টি। সেই মানুষকে একান্ত করে জানা ও বুঝা এই ত কবির সাধনা। এই সাধনা পূর্ণতা পেল কবির পরিণত বয়সে যখন তাঁর সত্যকার ঐতিহাসিক বোধ জন্মাল, যার বলে তিনি স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখ্‌তে পেলেন নানা চেষ্টা ও সংগ্রামের ভেতর দিয়ে, নানা বিচিত্র ভাবাদর্শের বৈপরীত্যের ভেতর দিয়ে চিরন্তন মানুষের শেষহীন সীমাহীন অগ্রযাত্রা, নিরবিচ্ছিন্ন আত্মানুসন্ধান। জীবনের শেষ দশবৎসর রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ যেন নূতন করে বিচিত্র সুখদুঃখময় মানবসংসারের সঙ্গে আপনাকে জড়াচ্ছিলেন, প্রতিদিনের মানবসংসার যেন তাঁর গভীরতর সত্ত্বার মধ্যে নূতন মোহজাল বিস্তার করছিল। একথা নিঃসন্দেহ যে বিশ্ববিধাতার নিগূঢ় অস্তিত্ব তিনি গভীরতর ভাবে ও রূপে উপলব্ধি করছিলেন, তার পরিচয় গত দশ বৎসরের রচনায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সমান সত্য যে মানুষের নিগূঢ় অস্তিত্ব এবং তার ঐতিহাসিক অর্থও গভীরতর ভাবে তাঁর মনকে অধিকার করছিল এবং বিশ্ববিধাতার সিংহাসনের পাশেই চিরন্তন মানুষের আসনও প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। যতই তিনি মৃত্যুর নিকটতর হ'চ্ছিলেন, জীবনরসের পিপাসা যেন তাঁর ততই বাড়ছিল, মানুষকে যেন তিনি আরও বেশী ভালবাস্‌তে আরম্ভ করছিলেন, জীবনের সুধাভাণ্ড থেকে ততই আরও বেশী রস আহরণ করছিলেন। তিনি যে তাঁর দেবতাকে প্রশ্ন করেছিলেন, যারা এই পৃথিবীর বায়ুকে বিষাক্ত করেছে, যারা দেবতার আলো বারবার নিবিয়ে দিচ্ছে, যারা মানুষকে অপমানে অত্যাচারে জর্জরিত করছে, দেবতা কি তাদের ক্ষমা করেছেন, তাদের ভালবেসেছেন—এ প্রশ্ন নিরর্থক নয় কিংবা কার্যকারণ-সম্বন্ধ বিচ্যুত নয়। মনের এই যে সমগ্র ভঙ্গি, অনুভূতির এই যে সমগ্র দৃষ্টিই রবীন্দ্র মানসের শেষ অধ্যায়ের ভূমিকা।

৩.

আমি আগেই ইঙ্গিত করেছি, মনের এই দৃষ্টিভঙ্গির, এই ঐতিহাসিক বোধের প্রথম সূচনা যেন ১৯৩০ শতক থেকে, সোভিয়েট রাষ্ট্র ভ্রমণের প্রত্যাভিঘাত থেকে। "রাশিয়ার চিঠি"তেই তার প্রথম প্রমাণ, কিন্তু তখনও এই নবলব্ধ বোধ ও দৃষ্টি বুদ্ধি ও চিন্তার স্তরে, অর্থাৎ সেই স্তরে যখন প্রথম প্রত্যাভিঘাত মনকে কেবল নাড়া দিয়েছে মাত্র। ভাবানুভূতির প্রথম প্রকাশ, একটু দেখা গেল "পরিশেষে" (১৯৩২), কিন্তু "প্রান্তিকে"র (১৯৩৭) আগে এই নূতন বোধ ও দৃষ্টি ভাবসত্তার অঙ্গীভূত হ'য়ে যায়নি। যাই হোক্, এই গভীরতার ঐতিহাসিক বোধ যে-সব কবিতায় স্বপ্রকাশ তাদের সম্বন্ধে কিছু বল্‌বার আগে শেষ অধ্যায়ের রচনাগুলির বিশিষ্ট প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বল্পায়তনের মধ্যে সাধারণ ভাবে দু'একটি কথা বলে' নেয়া যেতে পারে। এই দু'একটি কথা সাধারণ ধর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে হ'লেও জীবন ও বস্তুধর্মের গভীরতর বোধ ও জ্ঞানের পরিচয়ও এদের মধ্যে সুস্পষ্ট ; এ বোধ ও জ্ঞানের অভিজ্ঞতার সুযোগ সুদীর্ঘ কবিজীবনে ইতিপূর্বে আর হয়নি', এবং এর সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট ও গভীর।

প্রথম ও প্রধান কথা হ'চ্ছে শেষ অধ্যায়ের রচনাগুলিতে মৃত্যুভাবনার, মৃত্যুকল্পনার পৌনঃপুনিক উপস্থিতি। একথা তো সর্বজনবিদিত যে মৃত্যু-ভাবনা নিয়ে কবি কিশোর বয়স থেকেই এত লীলায় মেতেছেন যে মৃত্যু-ভীতি বলে' কিছু আর তাঁর ছিল না। কিন্তু যতদিন না মৃত্যু তাঁর জীবনের নিকটতর হ'লো, যতদিন না তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন ততদিন মৃত্যু তার সকল রহস্য ও মহিমা, সকল দীপ্তি ও গরিমা কবির সম্মুখে প্রসারিত করেনি'। মৃত্যুর এই ক্রমাগ্রসরমান পদধ্বনি কবির মনন ও কল্পনার কারখানায় এমন সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটালো যার ফলে কবি শুধু যে মৃত্যুর রহস্যই আরও গভীর করে' উপলব্ধি করলেন তাই নয়, জীবনের রহস্য মহিমাও তাঁর কাছে গভীরতর রূপে উদ্‌ঘাটিত হ'লো। বারবার অসংখ্য কবিতায় নানা ছলে নানা উপলক্ষ্যে কবি এই মৃত্যুভাবনার মধ্যে ফিরে এসেছেন ; তারপর ১৯৩৭' নিদারুণ অসুস্থতা প্রথম তাঁকে শুচিস্নানের সুযোগ দিলে। ডুব দিয়ে যখন তীরে এসে উঠলেন তখন তিনি শুচিস্নিগ্ধ, স্বচ্ছ, দীপ্তিময়। বস্তুতঃ ভাবকল্পনার বলে মৃত্যুসমুদ্রে এই যে নিরন্তর অবগাহন এ যেন কবির পক্ষে হ'য়ে দাঁড়ালো নিজের আত্মাকে

শুচিস্নিগ্ধ স্বচ্ছ করে নেবার একটা উপায়। "প্রান্তিকে"র সুন্দর গভীর গম্ভীর কবিতাগুলি তার প্রমাণ। তারপর ১৯৪০'র যে মারাত্মক পীড়া, সেই পীড়াই সর্বশেষে 'দেশহীন কালহীন আদি জ্যোতির' ধ্যানে তাঁর দৃষ্টি ও মনকে তন্ময় করে দিলে। 'দেহ দুঃখ হোমানলে' পুড়ে খাঁটি সোনা হ'য়ে যখন তিনি বেরিয়ে এলেন তখন তিনি পূর্ণতর মানুষ, দৃঢ়তর, সবলতর, আরও নিরাসক্ত, আরও ভারমুক্ত, আরও স্বচ্ছ, গভীর, অথচ সহজ, মোহমুক্ত তাঁর দৃষ্টি। এর ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত কবিতাগুলি থেকে এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে; "রোগশয্যায়", "আরোগ্য" ও জন্মদিনে" গ্রন্থ তিনটিতে তা, ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে। তিনি মৃত্যুর কোমল শীতল ক্রোড়ে শেষ শয্যা বিছাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলেন, কিন্তু চলে যাবার ঔৎসুক্য যে তাঁর মোটেই ছিল না, একথা আগেই বলেছি। যতকিছু কাজ ছিল সব ত শেষ করা হ'য়েছে, ছোট বড় সব কর্তব্যই ত শেষ করা হয়েছে, মানুষ ও বিশ্বজীবন যা কিছু তাঁর সাম্নে প্রসারিত করেছে তার সমস্তই ত নিঃশেষে আহরণ করা, পরিপূর্ণভাবে ভোগ করা হ'য়ে গেছে, এবং তার প্রত্যাভিঘাতে ভাব-কল্পনায় কত অনুভূতি ধরা দিয়েছে সমস্তই রসে ও সৌন্দর্যে ব্যক্ত করাও হ'য়ে গিয়েছে,—তিনি এবার যাবার জন্য প্রস্তুত; কিন্তু জীবন যে ইতিমধ্যে নূতনতর অর্থে ও স্বপ্নে সমৃদ্ধিলাভ করেছে, নূতনতর দৃষ্টির আলোকে নূতন রূপ লাভ করেছে। এ জীবনকে যে পরিপূর্ণ ক'রে এখনও জানা হয়নি', ভোগ করা হয়নি', সীমাহীন জীবন-সমুদ্রের সকল রস ত এখনো আহরণ করা হয়নি'। সেই জন্যই এ-জীবন থেকে বিদায় নেবার ইচ্ছে তাঁর নেই, সেই জন্যই বারবার তিনি এই মানবসংসারের বহুমুখীন জীযনযাত্রার মধ্যেই ফিরে ফিরে আসেন; এই মানুষই যে জীবনের চিরন্তন উৎস! এই ভাবানুভূতির যত কবিতা আছে শেষ অধ্যায়ে, বিশেষ করে ১৯৪০'র সুদীর্ঘ রোগশয্যায় ও তারপর মৃত্যু পর্য্যন্ত রচনাগুলির প্রায় প্রত্যেকটিতেই একটি গভীর গম্ভীর সুর ধরা পড়ে অতি সহজেই; জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির নূতনতর স্বপ্ন ও অর্থঅনুভূতিশীল পাঠকের দৃষ্টি এড়াবার কথা নয়।

এই প্রকৃতির কবিতাগুলি পড়িলে বিস্ময়ে হতবাক্ হ'য়ে বল্‌তে হয়, স্বচ্ছ ঔজ্জ্বল্যে দীপ্তিময় মানবাত্মার একি অপরূপ প্রকাশ! এত সহজ স্বচ্ছ, এত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট বলেই না প্রকাশের ভঙ্গিও এত সহজ সরল, স্পষ্ট ও

বাহুল্যহীন। মানুষ যখন সত্যকে পায়, অলঙ্কার তখন বাহুল্য মাত্র হ'য়ে দাঁড়ায়। বল্‌বার ভঙ্গির চেয়ে বক্তব্য বস্তু এই সব কবিতায় প্রাধান্য লাভ করেছে, এবং এই বলার মধ্যে কোথাও অস্পষ্টতা নেই; সবল নিরাসক্ত মনের অপরাজিত বীর্যের গভীর, স্বচ্ছ দীপ্তি এই কবিতাগুলিকে একটি অপরূপ শক্তি ও দৃঢ় সংহত রূপ দান করেছে। ক্ষীয়মান আয়ুর দুর্বলতার এতটুকু চিহ্ন এই কবিতাগুলির কোথাও নেই, না বলার ভঙ্গিতে, না তাদের ছন্দে, না বক্তব্যের শিথিলতায়। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতাই যেন সুগভীর প্রেম ও বিশ্বাসের দীপ্তিতে জল্‌জল্‌ করছে।

এর স্বচ্ছ সবল গভীর ভাবানুভূতি কবিকে সুগভীর প্রজ্ঞায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে সত্য ও গভীর অন্তর্দৃষ্টি দান করেছে। এই গভীর প্রজ্ঞাদৃষ্টি একদিকে যেমন তাঁকে নিয়ে গিয়েছে বিশ্ববিধাতার কোলে, তেমনি তাঁকে বারবার টেনে এনেছে মানুষের বুকে; মানবের প্রবহমান জীবন-ধারায় যাকে আমরা বলি ইতিহাস তার মর্ম কবিচিত্তের নিকটতর করেছে। সৃষ্টির অন্তহীনতায় সবলপ্রাণের গভীর বিশ্বাস, মানুষের সেবায় ও ভাল-বাসায় তৃপ্তি ও বিশ্বাস, মানবচিত্তের সাধনায় যে-সত্য নিহিত তা'তে বিশ্বাস, জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও শান্তিতে বিশ্বাস—এই গভীর পরিব্যাপ্ত বিশ্বাসই শেষ অধ্যায়ের কবিতাগুলিকে তাদের কাব্যমূল্য দান করেছে, এবং এই স্থির অকুণ্ঠিত নিঃশঙ্ক বিশ্বাসই রোগাক্রান্ত কয়েকটি বৎসরের কবি-মানসের পরিচয়। বিশেষ করে ১৯৪০'র পরে লেখা "আরোগ্য" ও "জন্মদিন" এই দু'টি গ্রন্থে এই পরিব্যাপ্ত বিশ্বাস কী উদাসপ্রীতি ও ভালবাসায় নূতনতর মাধুর্যে রূপান্তরিত হ'য়েছে তার পরিচয় আছে। যে-কবি পরিপূর্ণ শক্তি, ধৈর্য্য, বীর্য বিশ্বাসে মৃত্যুর মুখোমুখি হ'য়ে সৃষ্টি রহস্য উদঘাটিত করেছিলেন, তাঁর পক্ষেই সম্ভব হ'লো উদাসপ্রীতি ও ভালবাসায় বলা "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।" অর্ধ-উদাসীন কল্পনায়, স্বচ্ছ সহজ হৃদয়-মুকুরে কবি যে-সব অপরূপ ছবিগুলি একটি একটি করে দেখে গেছেন, কথার মালায় টুকরো টুকরো সে-সব ছবি গেঁথে তুলেছেন। নিরালা আকাশের মধ্যে কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠেছে, অতীতের সকরুণ স্মৃতি, দীর্ঘশ্বাস হাওয়ায় ভেসে আসছে, ছোট ছোট তুচ্ছ ঘটনা স্বপ্নময় হ'য়ে দেখা দিয়েছে। জীবনের শেষপ্রান্তে বসে পশ্চাতের দিকে তাকিয়ে সেই সব ছবি দেখতে ভাল লাগছে। কত যে শান্ত, রঙীন্‌ ব্যাপ্ত মুহূর্ত এই কবিতাগুলিতে ধরা পড়েছে, কত যে গভীর

ব্যঞ্জনা ছড়িয়ে আছে, তার হিসেব নেই। কী অপরূপ ছবিই না এঁকেছেন, এবং সবগুলি ছবিই একটা শান্তসৌন্দর্যে মণ্ডিত। বিক্ষোভ নয়, আলোড়ন নয়, শান্তি, পরমাশান্তি, স্বচ্ছ সহজ শান্ত মমতাময় বিনয়নম্র দৃষ্টিভঙ্গিই শেষতম অধ্যায়ের কবিতাগুলিকে রূপে রসে ভরে দিয়েছে; পৃথিবীর রূপ ও রস কৃতজ্ঞতায় যেন মনকে বিভোর করে রেখেছে। সুগভীর ভাবানুভবতায় ছবিগুলি যেন আরও সুন্দর, আরও দীপ্ত, আরও গম্ভীর। কিন্তু সব কবিতাই শুধু শান্তছবির মালা মাত্রই নয়, সত্যের অমৃতরূপেও কবিতাগুলি উদ্ভাসিত, জীবনরহস্যের গভীর ইঙ্গিতে উদ্বুদ্ধ, গভীর ধ্যানে তন্ময়, গভীর গম্ভীর আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপ্ত এবং পৃথিবীর ও মানুষের প্রতি সুগভীর প্রীতি ও ভালবাসায় উজ্জল। নিখিল বিশ্বের মর্মস্থলে যে-গভীর রহস্য আবর্তিত হচ্ছে তার অর্থানুভূতিতে কবিতাগুলি সমৃদ্ধ। সৃষ্টিলীলা, জন্মমৃত্যুর বিচিত্র রহস্য, পুরাতন আবর্জনার ধ্বংস ও নূতন সৃষ্টির আহ্বান, মৃত্যুর অতীত আত্মার চিরন্তন মহিমা ইত্যাদি সমস্তই কখনো গভীর গম্ভীর সুরে, কখনো গল্পচ্ছলে, কখনো লঘুলাস্যে কবিতাগুতি রূপ গ্রহণ করেছে; বক্তব্য সর্বত্রই সুস্পষ্ট, আবছা অস্পষ্টতার লেশমাত্র কোথাও নেই।

আমি আগেই বলেছি, কবি শেষ-খেয়ার জন্য প্রস্তুত হ'য়েই ছিলেন কিন্তু উন্মুখ ছিলেন না; নিরাসক্ত মন নিয়ে তিনি জীবনকে যেন আরও গভীর করে' আঁকড়ে রইলেন। বারবার সেইজন্যেই নানা কবিতায়, নানা গল্পচ্ছলে তিনি জীবনের মধ্যেই ফিরে এসেছেন; জীবন যেখানে উচ্চৈঃস্বরে বৃহৎ আয়োজন ও আড়ম্বরের মধ্যে আপন অস্তিত্ব ঘোষণা করছে সেখানে নয়, বরং আপাতঃ তুচ্ছ ক্ষুদ্র অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য ভাবলীলায় জীবন যেখানে আবর্তিত সেইখানে, জীবন যেখানে ছায়ার আড়ালে গোপন সেইখানে একান্ত সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক তুচ্ছ জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অসংখ্য ছবি বারবার ফিরে ফিরে আসছে—'যারা ভিড় করে' আসছে তারা মাঠের চাষী, কলের কুলি, দরিদ্র গৃহস্থ নরনারী, সাধারণ মেয়ে, কলেজের ছেলে, আপিসের কেরাণী, রাখাল বালক, সাঁওতাল কুমারী, মংপুর পাহাড়িয়া মেয়ে, বাড়ীর পুরানো ভৃত্য, রিক্স্ওয়ালা এবং এমনি ধরণের অসংখ্য নরনারী যারা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার ফলে দৈন্যে পীড়িত, সংস্কারে সংকুচিত, মনুষ্যত্বের এবং মানবতার সুবৃহৎ অধিকারে বঞ্চিত। এদের জীবনের মধ্যে ভাবানুভূতির অভিজ্ঞতা কবি পূর্ববর্তী কবিজীবনেও ভোগ

করেছেন, যেমন, "পলাতকায়", "লেখনে", আরও পূর্ববর্তী অনেক কাব্যে। এ সমস্তই সচেতন সমাজ-মানসের পরিচয় সন্দেহ নেই, কিন্তু বিশেষভাবে "নবজাতক" গ্রন্থ থেকে এই সমাজ-মানসের সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের শুভপরিণয় লক্ষ্যনীয়। এই সব ঘটনার প্রতিচ্ছবি কখনও এসেছে অতীত স্মৃতি থেকে, কখনও এসেছে চোখের সম্মুখের চলমান্ ছায়াচ্ছবি থেকে; কিন্তু কবি যেখানে দূরস্মৃতিতে আবিষ্ট সেইখানেই কবিতাগুলি একটি স্নিগ্ধ অপরূপ মাধুর্যে সমৃদ্ধ হ'য়েছে। যাহাই হোক্, উভয় ক্ষেত্রেই কবি যে জীবনের এক নূতন আস্বাদন লাভ করেছেন, দৃঢ়তর সবলতর বিশ্বাসের অধিকারী হ'য়েছেন এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। বস্তু ও জীবনের প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতির আনন্দে জীবন যেন তাঁর ভরপুর।

এই প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতি থেকেই ঐতিহাসিক বোধের জন্ম; বস্তুত: প্রত্যক্ষবোধ ও অনুভূতিই যখন মননের সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই ঐতিহাসিক বোধের সূচনা দেখা দেয়। আমি বলেছি, এই সূচনা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় "পরিশেষে"-গ্রন্থে (১৯৩২); এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতায়, বিশেষ করে' 'আগন্তুক' জাতীয় কবিতায়, এই বোধের পরিচয় অত্যন্ত স্পষ্ট। একবার যখন এই বোধ জাগ্‌লো তখন 'প্রশ্নে'র মতন কবিতা ত অনিবার্য হ'য়ে উঠ্‌লো। বস্তুর প্রত্যক্ষবোধ যখন জন্মালো তখন বস্তু সম্বন্ধে, তার মর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগ্‌বে, এটা একান্তই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ "পরিশেষ" গ্রন্থের 'প্রশ্ন' কবিতা বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় আদর্শের একেবারে মূল ধরে টান দিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক বোধের পরিপূর্ণ বিকাশের পথ খুলে দিলে। কিন্তু এখনও এই নবলব্ধ বোধ একেবারে বুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে হৃদয়ের গভীর ভাবানুভূতির অঙ্গীভূত হ'য়ে যায়নি'। "পরিশেষে"র অল্প পরেই কবি 'পথের রশি' নাম দিয়ে ছোট একটি নাটিকা রচনা করেন, এই নাটিকাটিতে নবলব্ধ বোধ সঙ্কেতের আড়ালে একেবারে যেন ফেটে পড়লো; বস্তুতঃ এই নাটিকাটিকে বলা যায় বাঙ্‌লা দেশের সাধারণ মানুষের দায়, শক্তি ও অধিকারের প্রথম ঘোষণাপত্র। কিন্তু এখনও ঐতিহাসিক বোধ কেবল নিজকে সজোরে ব্যক্ত করছে, হৃদয়কে স্পর্শ করে গভীরতর কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেনি'। তার উপায় হ'চ্ছে জীবনকে আরো ভাল করে', গভীর করে' জানা, বস্তুর ঐতিহাসিকরূপে জীবনকে জানা। সেই জানার চেষ্টা "পুনশ্চ" গ্রন্থে স্বপ্রকাশ; তবু এই গ্রন্থে দু'টি কবিতা

আছে যা'তে এই ঐতিহাসিক বোধ তার নিপুণ অস্তিত্ব জানাচ্ছে। একটি 'মানবপুত্র' যা'তে 'প্রশ্ন' কবিতার সুরটি আবার ধ্বনিত হচ্ছে; কিন্তু খুব উচুস্তরের গম্ভীর সুন্দর কবিতা 'শিশুতীর্থ'। শেষোক্ত কবিতাটিতে মানুষের নবজন্মতীর্থে শাশ্বত যাত্রার একটি কম্পন-শিহরিত ইতিহাস সবল কল্পনায় অপরূপ মূর্তি লাভ করেছে। কবিতার ধুয়াটি গভীর অর্থব্যঞ্জক : "জয় হোক্ মানুষের, জয় হোক্ নব জাতকের, জয় হোক্ চিরজীবিতের"। "বিচিত্রিতা" (১৯৩৩) ও "শেষ সপ্তকে"র (১৯৩৫) ভেতর দিয়ে জীবনের পাঠ এগিয়ে চললো; "শেষ সপ্তকে"র ৪৩ নং কবিতাটি ঐতিহাসিক বোধের দিক্ থেকে খুব সার্থক, এই কবিতাটিতে কবি জন্মদিন উপলক্ষ করে নিজের জীবনের একটা ঐতিহাসিক পরিচয় নিজে গ্রহণ করলেন, পরকেও দিলেন। ২০, ২১ ও ৩৯ নং কবিতা তিনটিও এই দিক্ দিয়ে খুব সার্থক। "পত্রপুটে" (১৯৩৬) এই নবলব্ধ বোধ একটা সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করলো এবং কয়েকটি কবিতাতেই প্রকাশের তাড়নায় ব্যাকুল এই বোধ উদ্বেলিত তরঙ্গে ভেঙ্গে পড়লো বিশেষ করে ২০, ২১ ও ৩৯ নং কবিতা তিনটিতে। "শ্যামলী"তে এই বিবর্তনই চলেছে; 'চিরযাত্রী', 'মিলভঙ্গ', 'অমৃত', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতায় তা' সুস্পষ্ট।

কবি এখন ভাবানুভূতির এমন একটা স্তরে এসে' পৌঁছেচেন যখন একবার স্থির হ'য়ে এই ঐতিহাসিক বোধের যা' কিছু অভিজ্ঞতা এ পর্যন্ত সঞ্চিত হ'য়েছে তার সবটা জ্ঞান ও বুদ্ধির নিকটে যাচাই করে, দেখার একটা ইচ্ছে মনের মধ্যে জাগ্‌লো এবং সে-ইচ্ছা রূপান্তরিত হ'লো "কালান্তরিত হ'লো "কালান্তরে"র সমাজ ও রাষ্ট্রসম্বন্ধীয় প্রবন্ধ-গুলিতে (১৯৩৭)। এর অব্যবহিত পরেই এল ১৯৩৭'র নিদারুণ অসুস্থতা, এবং মৃত্যুর সঙ্গে মুখোমুখি দেখা ঘট্‌বার ফলেই গত কয়েক বৎসরের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা পরিশ্রুত পরিশুদ্ধ হ'য়ে একেবারে কবি-চেতনার অঙ্গীভূত হ'য়ে গেল। "প্রান্তিকে" ব্যঞ্জনাময় ক্ষুদ্র ভূমিকাটিতে তিনি বললেন :

"অস্তসিন্ধুকূলে এসে রবি
পূরবদিগন্ত পানে
পাঠাইল অন্তিম পূরবী"

এই গ্রন্থের আঠারোটি কবিতার প্রথম ষোলটিতে জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্বন্ধে গভীর গম্ভীর সুর আবেগময় ভাষায় ধ্বনিত, কিন্তু শেষের

দু'টি কবিতা পড়লেই পরিষ্কার বুঝা যায় বিশ্বজীবনের সমস্ত কিছুকে ভেদ করে', সমস্ত কিছুকে আবৃত করে' একটা গভীরতর জীবনদর্শন, জীবন ও মৃত্যুর, ধ্বংস ও সৃষ্টির ব্যাপকতর একটা রহস্য কবির অনুভূতিকে, কবির চেতনাকে ঘিরে রয়েছে, এবং সেই দর্শন ও রহস্য গভীর ঐতিহাসিক বোধ থেকে জাত। ১৭ নং কবিতায় কবি পরিষ্কার বলেছেন, যেদিন তিনি মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন থেকে চেতনার মধ্যে ফিরে এলেন সেই দিনই তাঁর মনে হ'লো পৃথিবীর বর্তমান সভ্যতার জলন্ত কটাহে প্রতিমুহূর্তে অসংখ্য অসহায় মানুষ নিক্ষিপ্ত হচ্ছে, তার উত্তপ্ত বিষনিশ্বাসে পৃথিবী জলে পুড়ে যাচ্ছে। পরবর্তী ১৮ নং কবিতাটিতে সুর একেবারে সপ্তমে চড়ানো, অথচ সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রতিক পৃথিবীর ঐতিহাসিক বোধের কি অপরূপ কাব্যময় প্রকাশ—

"নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হ'তেছে ঘরে ঘরে।"

একটু ভিন্ন ও চাপা সুরে এই ধুয়াটিই ধরা যায় "সেঁজুতি"তে (১৯৩৮); জীবনের গভীর অভিনিবিষ্ট পাঠ চলেছে "সেঁজুতি"তেও, এমন কি একটু তরল সুরে গল্পকথায় গাঁথা পরবর্তী কাব্য "আকাশ প্রদীপে"ও (১৯৩৯)। ১৯৪০'র গোড়ায় বেরুলো "নবজাতক"; নামটি গভীর অর্থের দ্যোতনায় সার্থক। একটা ঋতু পরিবর্তনের, নূতন সুরের সুস্পষ্ট পরিচয় হিসাবেই যে "নবজাতকে"র জন্ম তা' কবি নিজেই স্বীকার করলেন গ্রন্থটির ভূমিকায়, এবং এই ঋতু পরিবর্তন বা নূতন সুর আর কিছুই নয়, ঐতিহাসিক চেতনায় কবি-মানসের নবজন্ম, তারই জাতকর্মের উৎসবগীতি। কিন্তু শুধু ভূমিকাতেই নয়, এর প্রায় প্রত্যেকটি কবিতায় এমন একটা দৃষ্টি ও মননভঙ্গির পরিচয় আছে যার আভাস "পরিশেষ" থেকেই আরম্ভ হয়েছিল কিন্তু "নবজাতকে" এসে' তা পরিপূর্ণ কাব্যময় রূপ ধারণ করলো এবং এখন আর দু'চারিটি কবিতায় শুধু নয়, অসংখ্য কবিতায় তা' ফুটে উঠ্‌লো। এ-জিনিসটা যেমন লক্ষ্য না করে পারা যায় না, তেমনি লক্ষ্য করতে হয় বস্তু ও জীবনকে তার ঐতিহাসিক স্বরূপে দেখবার জন্য চিত্তের একটা সহজ প্রবণতা।

"নবজাতক"গ্রন্থের 'প্রায়শ্চিত্ত', 'হিন্দুস্থান', 'রাজপুতানা', 'ভূমিকম্প', 'পক্ষী-মানব', 'আহ্বান', 'এপারে-ওপারে', 'রোমান্টিক্', 'রাত্রি', 'রূপ-বিরূপ' প্রভৃতি কবিতা এদিক দিয়ে খুবই উল্লেখযোগ্য। "সানাই"র (১৯৪০) কবিতাগুলি একটু হাল্‌কা ধরণের; কয়েকটি রচনা সত্যিই সুন্দর কিন্তু খুব সার্থক হয়ত নয়।

যে ঐতিহাসিক বোধের কথা এতক্ষণ বল্‌ছি তা' "রোগশয্যায়" (১৯৪০), "আরোগ্য" এবং "জন্মদিনে" (১৯৪১) গ্রন্থ তিনটিতে যেন আরো গভীর আরো অন্তরতর স্তরে তার মূল প্রসারিত করেছে, কবি যেন আরো স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়েছেন, বস্তু ও জীবনের প্রত্যক্ষ বোধের যেন গভীর, আরও নিবিড় হ'য়েছে। ১৯৪০'র মারাত্মক ব্যাধি যেন কবিকে আরো দিলে শক্তি ও বীর্যের দীপ্তি, আরো গভীর প্রীতি, শান্তি ও ভালবাসা, নূতন চেতনায় আরো গভীর বিশ্বাস। যে-সব কবিতায় জীবন ও মৃত্যু রহস্যের সুর ধ্বনিত, যেখানে তিনি মধুময় দ্যুলোকে, পৃথিবীর কথা বলেছেন, শুধু যে সেই সব কবিতাতেই এই ধর্ম ও প্রকৃতি স্বপ্রকাশ তা' নয়, যেখানে তিনি চিরন্তন মানুষ, শাশ্বত জড়জগৎ এবং তাদের ঐতিহাসিক পরিণতির কথা বলেছেন সেখানেও তা' সমান দীপ্তিময়। এই দিক থেকে বিশেষ করে সার্থক ও অর্থব্যঞ্জক হ'চ্ছে "আরোগ্য" গ্রন্থের ১, ৩, ৪, ৭, ১০ এবং ১৮নং কবিতা, এবং "জন্মদিনে" গ্রন্থের ৫, ১০, ১২, ১৭, ১৮ এবং ২১নং কবিতা। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় আমি আর কবিতাগুলির সার্থক লাইন উদ্ধৃত করে দেখালুম না, কিংবা তাদের গদ্যানুবৃত্তিও করলুম না। কৌতূহলী পাঠক তা' দেখে নিতে পারবেন।

রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্য্যায়ের কাব্য রচনাগুলির, এমন কি গল্প কবিতা-গুলিরও এমন একটা দৃঢ় সংহত রূপ আছে, এমন সংযত আবেগ আছে যা' কবির অপেক্ষাকৃত পুরানো লেখাগুলিতেও দেখা যায় না। যে প্রবল বাণীস্রোত ও আবেগোচ্ছ্বাস পাঠককে স্রোতের মুখে তৃণের মত ভাসিয়ে নিয়ে যায়, সে প্রবল স্রোত ও উচ্ছ্বাস এই পর্বের কবিতাগুলিতে একেবারে অনুপস্থিত। যেটুকু বক্তব্য সেটুকুই শুধু বলা হয়েছে সকল প্রকার রূপক অলঙ্কার বর্জন করে', বাহুল্য কল্পনার মায়াজাল থেকে মুক্ত করে', প্রকাশ ভঙ্গির চেয়ে বক্তব্য বস্তুকেই যেন মুখ্যতর করে'। তার ফলে কবিতাগুলি খুব দৃঢ়, সংযত ও সংহত রূপ লাভ করেছে। অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক

রূপকে ও বর্ণনায় একটি কবিতাও আচ্ছন্ন নয়, বক্তব্যের মধ্যেও অস্পষ্ট কুয়াসা কোথাও নেই। মিলহীন ছন্দ, কিন্তু নিয়মিত তালে লয়ে বাঁধা, এবং ছন্দের গাঁথুনির মধ্যেও একটা সংযত দৃঢ়তা, ধ্বনির আবেগহীন গভীরতা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আঙ্গিকের এই সব গুণ বা ধর্মকে আমি একান্তভাবে ভাবানুভূতি ও মননপ্রকৃতির বহিপ্রকাশ বলেই মনে করি, এবং তার সঙ্গে আঙ্গিকের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিবিড়, বস্তুতঃ ভাবানুভূতি ও মননপ্রকৃতিকে বাদ দিয়ে আঙ্গিকের অস্তিত্ব হয়ত থাকতে পারে কিন্তু তাকে সার্থক অস্তিত্ব বলা যায় না বলেই আমার ধারণা। যা'হোক, একথা কিছুতেই দৃষ্টি এড়াবার কথা নয় যে "পরিশেষ" থেকে আরম্ভ করে কবি যতই অগ্রসর হ'য়েছেন, এই পর্যায়ের ভাবানুভূতি ও মননক্রিয়া যতই গভীর ও নিবিড় হ'য়েছে ততই তার ধর্ম ও প্রকৃতি অনুযায়ী আঙ্গিকের পূর্বোক্ত ধর্ম ও প্রকৃতিও ক্রমশঃ দৃঢ়, সংহত, সংযত ও গভীর হয়েছে।

সমাজচেতনা রবীন্দ্রনাথের বরাবরই ছিল, কাব্যে তা খুব সুস্পষ্ট হ'য়ে ধরা পড়বার কথা নয়, কারণ তা' পরিশ্রুত ও পরিশুদ্ধ হ'য়ে বোধ ও অনুভূতির যে-স্তরে কবিকল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করে সে-স্তর সমাজচেতনার স্তর থেকে অনেক দূরে। কিন্তু গল্পে ও উপন্যাসে এবং নাটকেও তা' অপেক্ষাকৃত অনেক স্পষ্টতর হ'য়ে ধরা ছোঁওয়া দেয়, গল্প-উপন্যাস-নাটকের সাহিত্য-প্রকৃতিই তার সহায়ক। কিন্তু "শেষের কবিতা", "যোগাযোগ" পর্যন্ত দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন দৃষ্টি ও মননভঙ্গি অবলম্বন করেছেন যা'তে সমাজমানসের অকুণ্ঠিত শিল্পময় প্রকাশ ব্যাহত হ'য়েছে। তার দৃষ্টান্ত দেওয়া কঠিন নয়। কিন্তু (জীবন যতই পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'য়েছে, যতই তিনি নিরাসক্ত, ভারমুক্ত, স্থিতপ্রজ্ঞ হ'য়েছেন ততই ক্রমশঃ তার সমাজ-চেতনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐতিহাসিক বোধ, এবং তার ফলে ক্রমশঃ তার মন থেকে সমস্ত সংস্কার খসে পড়ে গেছে—মানুষ সংস্কারে জড়িত থাকে মানুষ মানুষকে পরিপূর্ণ করে' জানে না বলে—বস্তু ও ঘটনার ঐতিহাসিক অর্থ ততই তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন, ততই তিনি নির্ভীক দৃষ্টি নিয়ে বস্তু ও ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন)। এই যে নূতন দৃষ্টি ও মননভঙ্গি, গল্পে উপন্যাসে এর প্রথম পরিচয় মেলে "দুই বোন" (১৯৩৩) এবং "মালঞ্চ" (১৯৩৪) গ্রন্থে; "চার অধ্যায়" (১৯৩৪) এইদিক থেকে একটু শিথিল, কিন্তু মন ও কল্পনার বৈপ্লবিক রূপান্তর দেখা গেল

আবার "তিন সঙ্গী" গ্রন্থে। বস্তুতঃ "তিন সঙ্গী"র আধুনিকতার ধর্মকে লজ্জা দিতে পারে বাঙ্‌লা দেশে এমন আধুনিক আজো কেহ জন্মান নি'। মোহমুক্ত মানুষের যে-দাবী, সর্ববন্ধনমুক্ত, সর্বসংস্কারমুক্ত শুদ্ধ স্বচ্ছ মানবতার যে-দাবী, পরিণত স্থিতপ্রজ্ঞ জীবনের শেষ অধ্যায়ে রবীন্দ্রনাথ একমাত্র সেই দাবী, সেই আদর্শকেই স্বীকার করেছেন, আর কোনো আদর্শকেই নয়। সেই সর্ববন্ধন সর্বসংস্কার মুক্ত মানুষ ও মানবতার বেদীমূলেই রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ দশ বৎসরের বহু অভিজ্ঞতা বহু বেদনালব্ধ অর্ঘ্য বহন করে' এনেছেন, এবং সর্বশেষে একটি গভীর গম্ভীর বজ্রমন্ত্র করে' সেই অর্ঘটি নিবেদন করে' রেখে গেছেন। 'সভ্যতার সংকটে' সেই বজ্রমন্ত্র গুরু গুরু ধ্বনি শোনা যাচ্ছে; পৃথিবীর পুঞ্জীভূত পাপের উদ্ধত মাথার উপর কবে তা অগ্নিধারায় নেমে আস্‌বে! বোধ হয় আজই, বোধ হয় কাল।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ১৮৬২-১৯৩৮

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কবি সমালোচক টি, এস, এলিয়ট বলেছেন যে, প্রতি একশ' বছর অন্তর সাহিত্যের পুনর্বিচার হওয়া প্রয়োজন। কালাতিক্রমণের সঙ্গে সাহিত্যের রসরুচির ও জনপ্রিয়তার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। একশ' বছর কেন, পঁচিশ বছর আগে এদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে লেখকের যে রকম ধারণা ছিল, আজ তার অনেকটাই আমুল বদলে গেছে। একদা যিনি জনপ্রিয়তার জ্যোতির্লোকে সমাসীন ছিলেন, আজ তিনি বিস্মৃতির তিমির-গর্ভে অবলুপ্ত হয়ে গেছেন। বোধ করি জনবল্লভতার নগদ বিদায়ের সঙ্গেই বিদায় দেবার পালাগান জড়িয়ে আছে। বাংলা সাহিত্যে এই রকম একটি নাম মনে পড়ছে—তিনি গতকালের অতি পরিচিত লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়। আধুনিক পাঠকের কাছে এ নাম পরিচিত নয়, অথচ এখন যারা প্রবীণ, একদা তাঁরা হরিসাধনের গল্প উপন্যাস নিয়ে কি রকম মেতে উঠতেন, তার কথা হয়তো কারো কারো মনে পড়বে। বিশ-ত্রিশ বছর আগে হরিসাধনের গল্প, উপন্যাস, রোমাঞ্চ আর ঐতিহাসিক রমন্যাস (অর্থাৎ কিনা রোমান্স্) পড়েনি, সে যুগে এমন পাঠক দুর্লভ ছিল। সেই সমস্ত কৈশোরের ছায়াঘেরা রমণীয় দিনগুলি কার না মনে পড়ে। বিচিত্রদর্শন গাঢ়সবুজ মলাটের ব্যাকরণ কৌমুদীর নলচে আড়াল দিয়ে রোমান্সের ধূম্রজালবিস্তারী হরিসাধনের মুঘল হারেমের রহস্য রোমাঞ্চ ঘেরা কাহিনীর কল্পলোকে বিচরণ করার কথা সহজে ভোলা যায় না। খোজা-নর্ত্তকী-বাদশা-বেগম-শাহজাদা-শাহজাদীদের সহস্র-এক-রজনীর বিচিত্র কাহিনী, বিরহমিলনের ঠাসবুনানি আর প্রত্যাশিত ও পরিতৃপ্ত আনন্দানুভূতি হঠাৎ যেন একযুগের বিখ্যাত লেখককে বিস্মৃতির গর্ভ থেকে উদ্ধার করে এ যুগের ভ্রূকুঞ্চিত পাঠকের দরবারে হাজির করে দেয়।

পল্লী-বাঙলা ও শহর-কলকাতার গার্হস্থ্যজীবনের সুখ-দুঃখের গল্পগুলির সে যুগের তরুণবয়স্ক পাঠকপাঠিকে যে কি ভাবে সম্মোহিত করেছিল, এ যুগের নবীনের দল তা বুঝতে পারবেন না। শুধু গল্প পড়ার প্রতি সরস আকর্ষণ এ যুগের পাঠক হারিয়ে ফেলেছেন। বার্নার্ড শয়ের প্রগল্ভ উক্তির অনুসরণ করে হয়তো কোনো পাঠক বলবেন যে, আমরা কি এখনও

খোকাখুকুর খেলাঘরে আছি যে, আখ্যানে আখ্যায়িকা চাইব? এখন কত জীবনযন্ত্রণা। সমাজ, ব্যক্তি রাষ্ট্র, চেতন ও অবচেতন মনের পাকানো জটিল জট খুলতেই আমাদের প্রাণান্ত; এখন কি গল্পশোনার মানবশৈশবে আছি? ঠিক কথা। কালধর্মে যুগধর্মের পরিবর্তন হয়। সে যুগে গল্প চাইতাম, এ যুগে মনোবিকলনের তত্ত্বকথা চাইছি, সে যুগে আখ্যানের নানা জটিলতা চাইতাম, এ যুগে কথাসাহিত্যে জীবনসমস্যার প্রতিফলন চাইছি। এ রূপান্তর অবশ্যম্ভাবী। তবু কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে পরম প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ মনটাও কেমন যেন শৈশব-সন্ধ্যায় ফিরে যায়, সেখানে পৌঁছে হরিসাধনের পাত্র পাত্রীদের ঘটনাজটিল আখ্যানের রোমাঞ্চকর প্রাঙ্গণে নিজেও একটি চরিত্রে পরিণত হই।

জলভরা যুঁইফুলের বোঁটায় সামান্য বাদলা হাওয়া লাগলেই যেমন টুপটাপ করে জলবিন্দু ঝরে পড়ে, তেমনি স্মৃতির বৃন্তে একটু নাড়া লাগালেই চল্লিশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে যায় সেই গোলাপী রেশমী কাপড়ের মলাট, মলাটের ভেতরে তুলতুলে প্যাড, সোনালী অক্ষরে ছাপা "নূরমহল" "রঙ্গমহল", "শীশমহল।" লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—তলায় সোনার জলের মনোগ্রামে প্রকাশকের নাম লেখা। তোরঙ্গ প্যাঁটরা গোছাতে গিয়ে, অধুনা যিনি প্রবীণা গৃহিণী হয়েছেন, বাক্সের তলা থেকে তাঁর হস্তে আসে হরিসাধনের 'সতীলক্ষ্মী' উপন্যাস। সেই ১৯১৬ সনের কোন এক ফাল্গুন মাসে শুভ পরিণয় উপলক্ষে কার যেন দেওয়া উপহার—'প্রাণাধিকা শ্রীমতী বিদ্যুৎলতা দেবীর করকমলে সাদর প্রেমোপহার!' সেদিনের সেই নবীনা সলজ্জ বধূটি আজ পঞ্চাশোর্ধ্বা প্রবীণা: সংসার, কর্তা আর ব্লাডপ্রেসারের চাপে জেরবার এবং সদাই বিরস। বাক্স গোছাতে গিয়ে ক্ষণিকের জন্য তিনি কি আত্মবিস্মৃত হয়ে ১৩১৬ সনের কোন এক বাসন্তীসন্ধ্যার জাতিস্মর মুহূর্তে ফিরে যান। কৈশোর যৌবনের কত স্মৃতি-বিস্মৃতিই না জড়িয়ে আছে হরিসাধনের এই উপন্যাসখানার সঙ্গে।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে (বাংলা ১২৬৯, ভাদ্র) হরিসাধনের জন্ম হয় বাংলাদেশের এক পুণ্য নৈয়ায়িক বংশে। তাঁর পূর্বপুরুষ রাজেন্দ্র বিদ্যাবাগীশ কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাপদ ছিলেন। এঁদের আদি নিবাস শান্তিপুর হলেও লেখকের পিতা গিরীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্মব্যপদেশে খিদিরপুরের ভূকৈলাসে ও পরে বেহালায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। এই খিদিরপুরেই

হরিসাধনের জন্ম হয়। কলেজী বিদ্যায় তুঙ্গশীর্ষ তিনি লাভ করতে পারেননি তৈল-তণ্ডুল-ইন্ধনের চিন্তায়। চাকরীর গলরজ্জু গলায় ধারণ করে তিনি পঁয়ত্রিশ বছর কাটিয়ে দেন। ১৯০৮ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয় তারপরও তিনি দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। ১৯৩৮ সালে বৈশাখ মাসে পরিণত বার্ধক্যে এক যুগের অতিশয় জনপ্রিয় লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের শ্যামবাজারের বাসভবনে দেহান্ত হয়।

দীর্ঘজীবী হরিসাধন উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রায় তিন দশক—প্রায় অর্ধশতাব্দী ধ'রে নানা ধরণের উপন্যাস ও 'রমন্যাস' লিখে সে যুগের পাঠকের চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, হরিসাধন মুখোপাধ্যায় ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ও পরবর্তী যুগের মধ্যে সংযোগ-সেতু। বঙ্কিম-রমেশ-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র—এঁরা সারস্বত তীর্থের তীর্থপতি ; কিন্তু হরিসাধনও যে একদা অনেক দিন ধরে পাঠকমনে বেঁচে ছিলেন তা স্বীকার করতে হবে, সাহিত্যে বেঁচে থাকার অর্থ পাঠকমনে বেঁচে থাকা। হোক না সাময়িক, ক্ষণস্থায়ী। পৃথিবীতে ক'জন সাহিত্যিকই-বা চির-স্থায়িত্বের দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

হরিসাধনকে আজকের পাঠক ভুলে গেছে। নবযুগের অভিনবত্বের চাবুক খেয়ে অধুনাতম পাঠক আজ আর পিছন ফিরে তাকায় না। 'শুধু ধাও, শুধু বেগে ধাও, উদ্দাম উধাও, ফিরে নাহি চাও'—এই তো তার একমাত্র জপমন্ত্র। এখন 'রঙ্গমহল', 'শীশমহল' আর 'নূরমহলের' ঐতিহাসিক রোমান্স ও ইতিহাস আশ্রিত রূপকথাগুলিকে কেই বা মনে রাখে! হরিসাধনের বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ "কলিকাতা—এ কালের ও সেকালের ইতিহাস" সত্যই বিরাট ডিমাই সাইজের হাজার হাজার পাতার ওপর। আজকের দিনের অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ রম্যরচনার যুগে এই অতিকায় টিটানের সান্নিধ্য আকাঙ্ক্ষা কারই-বা অভিপ্রেত? দুর্লভ বইয়ের শেষ আশ্রয়ে এ কালের কলকাতার বেড়ার গায়ে মলাট ছেঁড়া সে কালের কলকাতা মলিন-মুখে কোন এক অধ্যাপক বা গবেষক-ক্রেতার জন্য অপেক্ষা করে। যুগধর্মের বশে রুচির খোল নলচে পালটে গেলেও, একদা হরিসাধন যে রোমাঞ্চকর গল্প পরিবেশন করে পাঠকসমাজকে মাতিয়ে রেখেছিলেন, প্রচুর আনন্দ-

কৌতূহল সঞ্চার করেছিলেন, সে কথা ভুলে গেলে তাঁর প্রতি পাঠকসমাজের অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হবে।

তেইশ বছর বয়সে হরিসাধনের প্রথম লেখা 'প্রাচীন কলিকাতা' প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'ল 'নবজীবনে', ১২৯১ সনের ফাল্গুন সংখ্যায়। কলকাতার ইতিহাস নিয়ে লেখা তাঁর গ্রন্থের এই হল সূত্রপাত। প্রবীণ বয়সে যিনি রোমান্টিক প্রেমের গল্প উপন্যাস লিখে পাঠকের মনোরঞ্জন করেছিলেন, তরুণ বয়সে তাঁর চিত্ত আকৃষ্ট হয়েছিল ঐতিহাসিক তথ্য ও কাহিনীর দিকে। স্বর্ণকুমারী সম্পাদিত 'ভারতী'র পৃষ্ঠায় তাঁর অনেক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছড়িয়ে আছে: "ধ্বংসতরু বা নন্দকুমারের ফাঁসী ও কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট" নামক তথ্যপূর্ণ গবেষণা প্রবন্ধ 'ভারতী'তেই প্রকাশিত হয়। ঠগী দমন আর এক মূল্যবান রচনা। ইতিহাসের প্রতি তাঁর চিরকাল আকর্ষণ ছিল। তারই ফলে কলকাতার বৃহত্তম ইতিহাস রচিত হল। লেখক জীবনের প্রথম দিকে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দর্শন করেছিলেন, তাঁর উপদেশ, নির্দেশ ও স্নেহ লাভ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তখন 'প্রচার' পত্রের সম্পাদক। ইনি হরিসাধনের ঘনিষ্ঠ বান্ধব ছিলেন। বঙ্কিম-চন্দ্রকে প্রথম দেখে তাঁর কি ধারণা হয়েছিল, তা তাঁর নিজের কথাতেই শোনা যাক:

"আমি সেই সৌম্যমূর্তি, প্রতিভার জীবন্ত আদর্শ, সাহিত্যসম্রাটের চরণ বন্দনা করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বঙ্কিমবাবুর পরিধানে একখানি পট্টবস্ত্র, গায়ে একখানি গরদের নামাবলী—বোধ হইল যেন 'ভবানী পাঠক' কিংবা 'সত্যানন্দ' আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া।"

একবার হরিসাধন প্রচার পত্রে একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। বঙ্কিম তরুণ লেখকের প্রবন্ধটি পড়ে খুশি হয়ে বলেছিলেন, "আগাগোড়া পড়েছি। লেখায় বেশ research আছে। কিন্তু ফুটনোটে অত reference দিয়েছ কেন?"

লেখক একটু সাহস করে বললেন, "আমরা নূতন লেখক। যদি কেউ বিশ্বাস না করে, এই জন্যে—"

বঙ্কিমচন্দ্র এর কি জবাব দিলেন? তিনি সজোরে বললেন, "কি! নিজের personality-তে তোমার বিশ্বাস নাই? যে পারে, সে তোমার লেখা contradict করুক। তখন তুমি তোমার নজীর দেখাও।" লেখক

বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে একটি সত্য শিক্ষা করেছিলেন,—আত্মবিশ্বাস, যাকে বঙ্কিমকচন্দ্র personality বলেছেন। হরিসাধন কলকাতার সুবিস্তৃত ইতিহাস লিখেছিলেন সে ত' শুধু নীরস ইতিহাস নয়, যে কোন্ অচিনপুরীর রূপকথা। তাঁকে এর জন্য প্রচুর তথ্য সংগ্রহ করতে হয়েছিল, অনেক সময় তথ্যের স্বল্পতা কল্পনার দ্বারা পুরিয়ে নিতে হয়েছিল। কিন্তু প্রায় সর্বত্র তিনি তথ্যের উৎস অর্থাৎ reference দিয়ে গেছেন, পাঠকের contradict করবার কোন অবকাশ রাখেন নি। তাঁর লেখা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ওঁর লেখা আমি 'নবজীবন' পড়েছি, বেশ হচ্ছে।" বঙ্কিমের উৎসাহে ও নির্দেশ হরিসাধন পরবর্তী জীবনে কলকাতার বিপুলায়তন ইতিহাস লিখলেও এবং সেই গ্রন্থটি আজো আকরগ্রন্থ হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, সাধারণ পাঠকসমাজে তিনি কথাসাহিত্যিক রূপেই অধিকতর পরিচিত ছিলেন।

ভারতী, সাহিত্য, ভ্রমর, প্রচার, দাসী, প্রবাসী, মানসী প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার নিয়মিত লেখক হরিসাধন সরকারী কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর লিখতে শুরু করলেন। ঠিক যাকে জনপ্রিয় লেখক বলে, হরিসাধন সেই শ্রেণীর লেখকের অগ্রগণ্য ছিলেন। অজস্র লিখেছেন তিনি, অপরিমিত লিখেছেন। যা স্বল্পতর পরিসরে সোনা ফলাতে পারতো, তাই বিশাল ক্ষেত্রে আশু প্রয়োজনের রবিশস্যের জন্ম দিয়ে ধীরে ধীরে দিগন্তে মিলিয়ে গেল। ১৮৮৫ সালে তিনি নিতান্ত তরুণ বয়সে প্রথম লেখকরূপে আত্ম-প্রকাশ করে এবং ১৯৩০ সাল পর্যন্ত অর্ধশতাব্দী ধরে অর্ধশতেরও অধিক গ্রন্থ লেখেন।

তাঁর সমস্ত রচনাকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়,—গল্প-উপন্যাস, নাটক ইতিহাস ও কলকাতার ইতিহাস। তাঁর পুরোমাপের উপন্যাসের সংখ্যা প্রায় তিরিশ, গল্পসংগ্রহও কম নয়। সামাজিক, গার্হস্থ্য, ঐতিহাসিক, রোমান্টিক, অর্ধ-ঐতিহাসিক, রূপকথা—উপন্যাসের যত রকম বিভাগ-উপবিভাগ থাকতে পারে, তার প্রত্যেকটিতে তিনি হাত দিয়ে-ছিলেন। তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ, 'পঞ্চপুষ্প' পাঠে বেভারিজ সাহেব বলেছিলেন যে এই গল্প স্কটের সমতুল্য। তাঁর গার্হস্থ্য উপন্যাসগুলির মধ্যে 'স্বর্ণপ্রতিমা', 'অপরাধিনী', 'কমলার অদৃষ্ট', 'সতীর সিন্দুর' এক সময়ে পাঠক-পাঠিকা-মহলে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। আখ্যানগুলি প্রতি-দিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও তারই মধ্যে বিচিত্র রোমান্সের স্বাদ এবং পাঠকের

অপার কৌতূহল একই সঙ্গে তৃপ্তি লাভ করত। আখ্যানের প্রাথমিক বিবরণী এমন চমকপ্রদ হ'তো যে, কৌতূহল প্রথম পৃষ্ঠা থেকেই সচকিত হয়ে উঠত।

কলকাতার ইতিহাসের আরম্ভটি কৌতুহলের রসে ভরপুর:

'আমরা যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিনের আকাশ প্রথমটা ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়াছিল। বৃষ্টি হইয়া মেঘের বক্ষ শূন্য হওয়ায়, মেঘ সরিয়া পড়িল। আকাশ সম্পূর্ণরূপে মেঘমুক্ত পরিষ্কার, অস্তগামী রবির স্বর্ণকিরণ রঞ্জিত। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিশানওয়ালা চারপাঁচখানি বাণিজ্য জাহাজ গঙ্গার প্রচণ্ড শক্তিশালী উর্মিমালার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পাইল ভরে অতি ধীরে ধীরে সুতানুটির দিকে অগ্রসর হইতেছিল···।' এ বর্ণনা শুধু নীরস ঘটনাবিবৃতি নয়, এর প্রতিচ্ছত্রে পাঠকের জন্য অপার বিস্ময় সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। আধুনিক বিশ্বের রঙ্গনটী কলিকাতার শুরু কীভাবে হয়েছে, তারপর কত ঘটনা দুর্ঘটনার সোপান বেয়ে বেয়ে কলিতীর্থ কলকাতা রূপের পসরা সাজিয়ে পথচারিকে আহ্বান করল, তার নিলাজ নিঃস্পৃহ লীলাখেলার ছবি আঁকলেন প্রবীণ ঔপন্যাসিক। কৌতুহলকে যদি আমরা নিতান্ত শিশুসুলভ বৃত্তি বলে একে একে ত্যাগ করে প্রাণপরিপক্ক বনে না যাই, তা হলে আমাদের মনও কোম্পানীর নিশানওয়ালা মনপবনের নাও বেয়ে কোন্ পরীস্থানের দিকে যাত্রা করে। মুঘল পাঠানের পটভূমিকায় লেখা তাঁর রেমোন্টিক গল্প—উপন্যাসগুলিই তাঁর জনপ্রিয়তার প্রধান অবলম্বন। 'রঙ্গমহল,' 'শীশমহল', 'নূরমহল' সিরিজের অন্তর্ভু্ত মুঘলপাঠানের রহস্য রোমান্সপূর্ণ শিল্পকাহিনীর মাদকরস এখনও সমাজের মনে পড়ে। মনে পড়ে 'শীশমহলের' সেই দীর্ঘ গল্পটি—"তস্‌বীরের মূল্য°। আকবরের একজন তরুণ 'সেনাধ্যক্ষ—নাম তার ইস্‌কান্দার। একদিন সন্ধ্যাবেলা ইস্‌কান্দার দিল্লীর রাজপথে একজন বৃদ্ধ তস্‌বিরওয়ালীর কাছে একটি অপূর্ব রূপলাবণ্যময়ী রমণীয় ছবি দেখে মুগ্ধ হ'ল, অত্যন্ত আকর্ষণ বোধ করে তস্‌বিরওয়ালীকে ঐ ছবিটির দাম জিজ্ঞাসা করল। বৃদ্ধা বলল, "জনাব, এ তস্‌বিরের মূল্য পাঁচ জুতি।"

বিস্মিত ইস্‌কান্দার প্রশ্ন করল, "জুতি মারিবে কে?"

বুড়ীর উত্তর, "যার তসবির সে।"

বুড়ী তার নামধাম জানে না, সুতরাং ইস্‌কান্দার তার কাছ থেকে ছবির

মালেকের কোন সন্ধান বার করতে পারল না। কিন্তু সেই ভুবনমোহিনীর তসবির খানি ইস্‌কান্দারের সমস্ত আশাভরসা সুখ আনন্দ কেড়ে নিল। তার পর কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা, প্রতিহিংসা, হানাহানি—তবু ইস্‌কান্দার সে ছবিখানিকে ত্যাগ করতে পারল না, আংরাখার অন্তরালে লুকিয়ে রেখে, যার ছবি তার সন্ধান করতে লাগল। সেই মোহিনীর নাম গুল্‌সানা, বিদ্রোহী পাঠান কেল্লাপতি আবদুল, সোহানী সাধ্বী পত্নী, বীরাঙ্গনা। ইস্‌কান্দরের তীব্র বাসনার উত্তাপে সোহানী মারা গেল, গুল্‌সানা দিওয়ানা হল, ইস্‌কান্দারেরও সমস্ত আকাঙ্ক্ষার চিরসমাধি রচিত হ'ল। ভাগ্য-বিপর্যয়ে রূপের মোহে ইস্‌কান্দার কর্তব্যে বিচলিত হওয়ার অপরাধে বন্দী হল। পরে গোপনে মুক্তিলাভ করলেও গুলসানাকে সে চিরকালের মতো হারিয়ে ফেলল। দ্রুতগামী একখানি নৌকার ওপরে ব্যর্থ, হতাশ্বাস, ব্যাকুল ইস্‌কান্দার ভাসতে ভাসতে কোন্‌ দিগন্তের দিকে যাত্রা করল! উপন্যাসের সমাপ্তির শেষপঙক্তিতে সিকান্দার জানিয়ে দিল—"তারপর আমার ভাগ্যে কি ঘটিল, এই পুস্তকের দ্বিতীয় অংশে পাঠক দেখিতে পাইবেন।" কৌতূহলী পাঠক তখন এর দ্বিতীয় পর্যায় 'ঋণ পরিশোধ' পড়বার জন্য চমৎকৃত হয়ে ওঠে।

এই বিচিত্র রোমান্টিক গল্পের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকও যেন ইস্‌কান্দারের সঙ্গে গভীর রাত্রিতে পা টিপে টিপে মালবের বন্ধুর পার্বত্য পথে রাহি হয়। সোহানীর দুর্গপ্রাকার বেয়ে সকলের অলক্ষিতে রংমহালের ঝারোখার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, আধখানা চাঁদের বিবর্ণ আলোকে দুর্গপ্রাঙ্গণ রহস্যময়, চারিদিকে ইরাণী গুল আর নার্গিসের গন্ধ, সিরাজির স্বপ্নাতুর মাদকতা। সহসা ঝারোখার প্রান্তে একটি মুখ ভেসে ওঠে, মতি পান্নায় ঝকমকে একটি অপূর্ব নারীমূর্তি, বিদ্রোহী সোহানীর স্ত্রী ভুবনমোহিনী গুলসানা। ইস্‌কান্দারের বুকের রক্ত আছাড়ি-পিছাড়ি করে, শিরায় শিরায় বেহস্ত্‌ দোজখের মাতামাতি শুরু হয়ে যায়—সেই তস্‌বিরের মালেক বেগম গুলসানা! লেখক এই রহস্যঘন রোমান্টিকতার স্বপ্ন পুরীতে এনে পাঠককে ছেড়ে দিলেন। তাঁর মুঘলপাঠান যুগের মুসলমান নর-নারীর জীবনকেন্দ্রিক 'ঐতিহাসিক রমন্যাস' গুলিতে পটভূমিকা হিসেবে কোথাও স্বল্পতর, কোথাও বা গাঢ়তর ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিবেশ স্বীকৃত হয়েছে। কখনও কখনও হরিসাধন কেবল দু চারিটি ঐতিহাসিক নাম মাত্র ব্যবহার করেছেন,

প্রধান চরিত্র ও মূল ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সংস্রব নেই। অনেক ইংরেজী 'Romance of History-র মতো এই ধরনের ঐতিহাসিক উপন্যাস ইতিহাস প্রধান নয়, ইতিহাসের পটে অঙ্কিত সাধারণ নর-নারীর জীবনই অধিকতর কৌতূহলের বস্তু হয়েছে।

তাঁর পারিবারিক উপন্যাসগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাসের মতো জনপ্রিয়তা লাভ করতে না পারার কারণ—তাঁর সমকালে, তাঁরই আবিষ্কৃত লেখক, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অধিকতর সুষ্ঠুরীতিতে গার্হস্থ্য উপন্যাস রচনা এবং ঈষৎ পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ জনপ্রিয়তা। উপরন্তু ঐতিহাসিক রোমান্সে যে কল্পনার উৎসার ও কাল্পনিক সৌন্দর্যসৃষ্টি গুণ হিসেবে গণ্য হয়েছে, বাস্তব পরিবেশের গার্হস্থ্য উপন্যাসের তাই ত্রুটি বলে প্রতিভাত হয়েছে। বাস্তব জীবনের নর-নারীর মধ্যে আমরা সত্য ও স্বাভাবিক ঘটনার পরমমূর্তি পেতে চাই, তাঁর গার্হস্থ্য উপন্যাসে পারিবারিক ও সাংসারিক জীবনের চিত্র আছে বটে, কিন্তু তাও উজ্জ্বল বর্ণবিলাসের জন্য প্রতিদিনের একরঙা তুচ্ছ দিনগুলো রোমান্টিক মহিমা লাভ করলেও তার প্রতিখণ্ডন হয় বলে পরবর্তীকালের পাঠকসমাজের কাছে তার মূল্য হ্রাস হয়। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসও বিশুদ্ধ 'রিয়েল' নয়, তাও পুরোপুরি রোমান্টিক, তবে তাকে 'রিয়েলের রোমান্স' বলা যেতে পারে। আধুনিক পাঠকও রোমান্স চায়, তবে তা আইডিয়ালের রোমান্স নয় রিয়েলের রোমান্স—যে তুরূপ দিয়ে শরৎচন্দ্র জিতে গেছেন।

হরিসাধন যেমন ইতিহাসের পটভূমিকায় কাল্পনিক আখ্যান লিখেছিলেন, তেমনি কয়কখানি অর্থ ঐতিহাসিক নাটকও রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে 'ঔরংজেব' 'বঙ্গবিক্রম' ও 'আকবরের স্বপ্ন' উল্লেখযোগ্য। এই নাটকগুলি সে যুগের ন্যাশনাল থিয়েটার, কোহিনুর থিয়েটার প্রভৃতি পেশাদার নাট্যমঞ্চে বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনীতও হয়েছিল। মগধের রাণী মুরলার কঙ্কনচুরীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত "কঙ্কনচোর" উপন্যাসটি রাখালদাসের মতে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে তিনি অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসে যেমন ইতিহাসের ক্ষীণসূত্রটি বজায় রেখে অবাধ কল্পনাকে যথেচ্ছ ছেড়ে দিয়েছেন, তেমনি এই নাটকগুলি নামে ঐতিহাসিক হলেও এর প্রধান চরিত্রগুলি কাল্পনিক।

সবশেষে তাঁর 'কলিকাতা—একালের ও সেকালের ইতিহাসের কথা

উল্লেখ করা প্রয়োজন। হরিসাধনের পূর্বে অনেক বিদেশী বণিক, পর্যটক ও কর্মচারী প্রাচ্য দেশের শ্রেষ্ঠ নগরী কলকাতার ওপর বড় ছোট অনেক গ্রন্থই রচনা করেছিলেন। হরিসাধন নানা তথ্য ঘেঁটে একহাজার কুড়ি পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কলকালার ইতিহাস বিবৃত করেছেন। ইতিহাসের তথ্য আর রূপকথার রূপ, দুই-ই মিশে গেছে এই বিপুলায়তন গ্রন্থে। লেখক আরম্ভ করেছেন ১৬৯০ খ্রীঃঅব্দের ভাদ্রমাসের ঘোর বর্ষার এক রাত্রিকে কেন্দ্র ক'রে। একদল বিদেশী বণিক হুগলী নদী ধরে জাহাজ যোগে সুতানুটী গ্রামের পাড়ে এসে পড়েছে, সামনে আসন্ন রাত্রি, মাথায় উপর প্রবল বর্ষণ আর পাড়ের ঝোপঝাড়ে সাপ, বাঘ, বুনো শূয়োর—আরও কত কি ? এই দলের নেতা জোব চারণক নামে এক বণিক গঙ্গার অস্বাস্থ্যকর তটে উঠে রাত কাটাতে শঙ্কিত হলেন। তাঁর সঙ্গী-সাথীদের সম্বোধন করে বললেন, 'ভাই সব, বর্ষার রাতে এই জঙ্গলের মধ্যে তাঁবুতে বাস করা বড়ই কষ্টকর হইবে। চল—আমরা আজকে রাত্রির মত জাহাজে ফিরিয়া যাই, কাল প্রাতে আবার মালমসলা জোগাড় করিয়া নূতন আশ্রয়স্থান সন্ধান করিতে হইবে।" তার পর দিন সুতোনুটীর পূর্বপারে সূর্য উঠলো—১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৫এ আগষ্ট। ঝড়জল মাথায় করে শুধু জাহাজের পালে ভর ক'রে আর অটুট মনোবল মাত্র সঙ্গে নিয়ে যে কটি ইংরেজ বণিক সেদিন হাজির হয়েছিল, তারাই সেই দুর্যোগের মধ্যে ঠিক হাল ধরে রইল, নানা সংঘাত সংঘর্ষ, শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের পর সত্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্যদেবের অস্তগমন নিষিদ্ধ হল। এইখান থেকে কলিকাতা কাব্য শুরু হলো, অবশ্য প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান-যুগকেও আলোচনা করে নিয়ে লেখক এ গ্রন্থের প্রস্তাবনা করেছেন। অসংখ্য তালিকা, নক্‌সা, মানচিত্র আর ফটোগ্রাফে শোভিত এ গ্রন্থে কলিকাতার বিচিত্র জীবনলীলা বর্ণনার যে বিপুল পরিশ্রব লক্ষ্য করা যায়, তা ইদানীং রম্যরচনার যুগে ভীতিকর বলেই মনে হবে। এতে তিনি যে সমস্ত মানচিত্র ও নক্‌সা দিয়েছেন তার কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করা যাচ্ছে :

(১) প্রাচীন বাংলা কাব্যে বর্ণিত কলকাতার আনুমানিক মানচিত্র।
(২) ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে আঁকা কলিকাতা শহরের নক্‌সা।
(৩) জোব চারণকের হাতের লেখা।
(৪) প্রাচীনকালের কালিঘাট ও আদিগঙ্গার মানচিত্র।
(৫) ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ফোর্ট উইলিয়মের ছবি।

(৬) ভূষণার রাজা সীতারাম রায়ের হাতের লেখা।
(৭) প্রাচীন কলকাতার গোরা জমিদার হলওয়েলের ছবি।
(৮) ১৭৯২ কালের এসপ্লানেডের ছবি।
(৯) কৃষ্ণনগরাধিপ কৃষ্ণচন্দ্রের হাতের লেখা।

উল্লিখিত মানচিত্র ও নকসাগুলি তথ্য ও দলিল হিসেবে কত মূল্যবান তা ইতিহাসের অনুরাগী ছাত্র বুঝতে পারবেন। পঁচিশ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ একাল সেকালের কলকাতায় শেষ অধ্যায়টিতে লেখক রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ দিয়ে 'পুঁথিতে ডোর' দিয়েছেন! এই সেই কলকাতা—সুতানুটি গোবিন্দপুর চৌরঙ্গীর ঘন জঙ্গল আর কর্দমাক্ত আদি-গঙ্গার তীরে কলিকাতা। রাতে ঠাঙাড়ে আর দিন হুগলীর ফৌজদারের পাইক বরকন্দাজের হাঁকডাক, এ সেই কলকাতা, দিনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রেশম পশমের সরগরম কুঠি-কুঠিয়াল বিকেলে চারঘোড়ার গাড়ী টানা ল্যাণ্ডোয় করে গঙ্গার ধারে ষ্ট্র্যাণ্ডে সাহেববিবিদের হাওয়া খাওয়া অথবা চৌরঙ্গীর মাঠে গাছতলায় পিস্তল হাতে সাহেবে সাহেবে ডুয়েল লড়া। এ সেই কলকাতা—সকালে ছোট হাজিরা, দুপুরে আকণ্ঠ লাঞ্চ, আর বিকেলে শবযাত্রা—যার জন্য সায়েবরা এসে বলতো 'গলগাথা'—মড়ার খুলির রাজ্য। এ সেই কলকাতা, কিপলিঙ যাকে বিদ্রূপ করেছেন। আবার সেই একই কলকাতায় ভারত জাগরণের সূচনা মহর্ষির কনিষ্ঠ পুত্রের জন্ম, পরিণত বয়সে তাঁর বিশ্ববিজয়—নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি—"রবির অর্ঘ্য পাঠিয়েছে ধ্রুবতারার অধিবাসী"। জলজঙ্গলে অস্বাস্থ্যে ভরা ক্ষুদ্র তিনখানি গ্রাম কেমন ক'রে বিশ্বাকাশে উদিত হলো, হরিসাধন তার কাহিনী রূপকথার রসে ভিজিয়ে বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি বিশুদ্ধ ইতিহাস হয়েছে কিনা তা ঐতিহাসিকেরা বিচার করবেন, কিন্তু সুদীর্ঘ গ্রন্থটি যে অতিশয় সুখপাঠ্য হয়েছে তাতে আর সন্দেহ নেই।

এই বিচিত্র প্রতিভাধর লেখককে আমরা ভুলে গেছি। আজ তাঁর গল্প কাহিনী হতগৌরব হলেও একদা তিনি বহু মনের আনন্দভাণ্ডার খুলে দিয়েছিলেন। অনেক পাঠকের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন, অনেক রসিকা গৃহিনীকে মোহময়ী দিবানিদ্রার দুর্নিবার আকর্ষণ থেকে রক্ষা করেছিলেন। এইজন্য সেই যুগের জনপ্রিয় লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায় আজও চিরস্মরণীয়।

হরিসাধন মুখোপাধ্যায়—ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক। জন্ম—১২৬৯ বঙ্গ ভাদ্র খিদিরপুর ভূকৈলাসে। মৃত্যু—১৩৪৫ বঙ্গ ৭ই বৈশাখ। পিতা—গিরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। আদি নিবাস—শান্তিপুর, তৎপরে কলিকাতা, খিদিরপুর, বেহালা (১৮৮৬)। শিক্ষা—প্রবেশিকা (হেয়ারস্কুল)। ডফ্‌টন কলেজ, সিটি কলেজ। কর্ম—গভর্ণমেন্ট টেলিগ্রাফ অফিস। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যানুরাগী এবং বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হন। ইঁহার বহু গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া উচ্চ প্রশংসা লাভ করে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ নাটক জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশিত হয়। গ্রন্থ—পঞ্চপুষ্প, মতিমহল, শীশমহল (১৩১৬), নূরমহল (১৩২০), রঙ্গমহল রহস্য (১৩২১), হাবেম কাহিনী (১৩২২), স্বর্ণপ্রতিমা (১৩২৪), শাহজাদা খসরু (১৩২৫), রূপের বালাই (১৩২৫), মরণের পরে (১৩২৬), নীলাবেগম (১৩২৬), চারুদত্ত (১৩২৬), পান্নার প্রতিশোধ (১৩২৬), অপরাধিনী (১৩২৮), সফল স্বপ্ন (১৩২৯), শয়তানের দান (১৩৩২), রূপের মূল্য, কঙ্কণ চোর, সতীলক্ষ্মী, ছায়াচিত্র, কমলার অদৃষ্ট, মৃত্যু প্রহেলিকা, লাল চিঠি, লাল পল্টন, কলিকাতা সেকালের ও একালের (১৯১৫), দেওয়ানা (১৩২৭), রূপের মোহ (১৩২৯), রঙ্গমালা (১৩০৫), সতীর সিন্দুর (১৩২৭)। নাটক—আকবরেব স্বপ্ন, বঙ্গে বিক্রম, মায়া, ঔরঙ্গজেব।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৮৬৩—১৯১৩

জীবনভাষ্য

রথীন্দ্রনাথ রায়

রবীন্দ্রজীবনের প্রথমার্ধে রবীন্দ্রসমকালীন কবিদের মধ্যে যিনি কাব্য-প্রত্যয়ে ও কাব্যরীতির অভিনব কর্ষণায় বিশিষ্ট মনন ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখেছেন তিনি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল। রবীন্দ্র-প্রভাবিত কাব্য-ভূমিতে সেদিন আপন কবিব্যক্তিত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সহজসাধ্য ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে দ্বিজেন্দ্রলালের অভিনব কবিশক্তিকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছিলেন। উত্তরকালে তিনি যখন প্রধানত নাট্যরচনায় আত্মনিয়োগ করেন, তখনও তাঁর মানসবৈশিষ্ট্য ও শিল্পস্বাতন্ত্র্য নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে। মাত্র পঞ্চাশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে তাঁর রচনার বিস্ময়কর বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রেম ও সৌন্দর্যস্বপ্নের রোমান্টিক গীতিকাব্য, হাস্যরসের স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যসংগীত, অভিনব ছন্দ ও কাব্যরীতি, বিচিত্রধর্মী নাটক ও প্রহসন, দেশাত্মবোধক সংগীত প্রভৃতি বিচিত্রকীর্তি তাঁর শিল্প-জীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। দ্বিজেন্দ্রলালের শিল্পজীবন আলোচনা করতে হলে তাঁর দেশ-কাল ও ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করা যায় না। বরং এই পটভূমিকায় তাঁর সাহিত্যসাধনাকে আরও নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করা যায়। বিশেষত, দ্বিজেন্দ্রলালের ক্ষেত্রে এর স্বতন্ত্র তাৎপর্য আছে। তাঁর কাব্যজীবন ও ব্যক্তিজীবন একই বিধাতার রচনা, একটিকে বাদ দিয়ে আর-একটির পূর্ণ স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। দান্তের কাব্যপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন: "কোনো ক্ষণজন্মা ব্যক্তি কাব্যে ও জীবনের কর্মে, উভয়তই নিজের প্রতিভা বিকাশ করিতে পারেন—কাব্য ও কর্ম উভয়ই তাঁহার এক প্রতিভার ফল। কাব্যকে তাঁহাদের জীবনের সহিত একত্র করিয়া দেখিলে, তাহার অর্থ বিস্তৃততর, ভাব নিবিড়তর হইয়া উঠে।"[১]

২.

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ জুলাই (১২৭০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা শ্রাবণ) কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় ছিলেন কৃষ্ণনগরের

---

১. কবিজীবনী: সাহিত্য

মহারাজার দেওয়ান। কার্তিকেয়চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রলাল। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও কবিজীবনের উপর তাঁর পিতার প্রভাব কম নয়। সুকণ্ঠ গায়ক, সুরসিক তেজস্বী ও উন্নতচরিত্র কার্তিকেয়চন্দ্র তৎকালের কৃষ্ণনাগরিক সমাজে নিজেই একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন। কার্তিকেয় চন্দ্র সংস্কৃত 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত'-এর আদর্শে 'ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিত' নাম দিয়ে কৃষ্ণনগর-রাজবংশের একটি প্রামাণিক ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'আত্মজীবনচরিত' বাংলা সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তিনি 'গীতমঞ্জরী' নামে একখানি স্বরচিত গীতিসংগ্রহও প্রকাশ করেন। শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় কার্তিকেয়চন্দ্র সম্পর্কে লিখেছেন, "আত্মীয়স্বজন পোষণ, গুণিজনের উৎসাহদান, সাধুতার সমাদর, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, এসকল যেন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল। এইসকল গুণেই তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি দেশহিতৈষী, স্বজাতিপ্রেমিক মহাজনগণের বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন।"[২] চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্বিতা, সংগীতানুরাগ প্রভৃতি গুণ দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকারসূত্রেই পেয়েছিলেন। এই চরিত্রের আদর্শেই তিনি দুর্গাদাস চরিত্রটি এঁকেছিলেন। দুর্গাদাস নাটকের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছেন, "যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, সেই চিরআরাধ্য পিতৃদেব ৺কার্তিকেয়চন্দ্র রায় দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।"

সেকালের কৃষ্ণনগরে একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল। কার্তিকেয়চন্দ্রের বাসভবনটি ছিল কৃষ্ণনাগরিক সংস্কৃতির ও সংগীতচর্চার প্রধান কেন্দ্র। বিদ্যসাগর অক্ষয়কুমার সঞ্জীবচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধু মধুসূদন প্রমুখ সাহিত্য ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রের কীর্তিমানদের সঙ্গে কার্তিকেয়চন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল। এঁদের অনেককেই বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মধুসূদন হেমচন্দ্র প্রমুখ কবির কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন।[৩] অল্পবয়সে তিনি সংগীতচর্চাও শুরু করেন। সেকালের কৃষ্ণনগরের সাংগীতিক পরিবেশের বর্ণনা করতে গিয়ে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "...দ্বিজেন্দ্রলালের পিতা কার্তিক দেওয়ানের অনেক

---

২. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (ভাদ্র ১৩৬২), পৃ ৩০।

৩. "মহারাজ সতীশচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্র, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁহার পিতার বন্ধুগণ কৌতূহলী হইয়া দ্বিজেন্দ্রের কবিতা আবৃত্তি শুনিয়া তাঁহাকে কবিতা পাঠে উৎসাহিত করিতেন।"—দ্বিজেন্দ্রলাল : নবকৃষ্ণ ঘোষ, পৃ ১০।

গান শুনেছি। তিনি ছিলেন সুকণ্ঠ ও সংগীতবিদ্যায় সুশিক্ষিত। তিনি বোধ হয় বাঙ্গলা হিন্দী দু-ভাষায়ই গান গাইতেন, কিন্তু কি যে গাইতেন আমার মনে নেই। দ্বিজেন্দ্রলালও গাইয়ে বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি সভাসমিতিতে গান গাইতেন ছোকরা বয়সেই। বোধহয় কণ্ঠসংগীত তাঁর পিতার কাছ থেকেই শিক্ষা করেছিলেন।"[৪]

দ্বিজেন্দ্রলালের ভ্রাতারাও সকলে কৃতবিদ্য ছিলেন। 'সেজদা' জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়, 'রাঙাদা' হরেন্দ্রলাল রায় ও 'রাঙাবৌদি' মোহিনীদেবীর উৎসাহবাক্য দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভা বিকাশের সহায়ক হয়েছিল। বড়দা রাজেন্দ্রলাল রায় ও সেজদা জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় তাঁকে ইংরেজি সাহিত্যে দীক্ষা দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছেন, "বড়দাদা এবং সেজদাদা আমাকে ইংরাজী সাহিত্যের অভিজ্ঞতা-অর্জনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন।"[৫] জ্ঞানেন্দ্রলাল সুলেখক ছিলেন। তিনি তৎকাল-প্রচলিত সুরভি, পতাকা, Telegraph. Bengalee প্রভৃতি পত্রিকায় লিখতেন। হরেন্দ্রলাল রায় 'নবপ্রভা' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী মোহিনীদেবী সুলেখিকা ও প্রতিভাশালিনী গায়িকা ছিলেন। তিনি ছিলেন বিখ্যাত গায়ক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভগ্নী। পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন বিলিতি গানের ভক্ত হয়ে ওঠেন, তখন সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারই নাকি তাঁকে ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। মাত্র বারো বছর বয়সেই তিনি কবিতা ও গান রচনা শুরু করেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেছেন, "১২ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে আমি কবিতা ও গান রচনা করিতাম। ১২ হইতে ১৭ বৎসর পর্যন্ত রচিত আমার গীতগুলি ক্রমে 'আর্যগাথা' নামক গ্রন্থের আকারে প্রকাশিত হয়। তখন কবিতাও লিখিতাম। কিন্তু তখন কোনো কবিতা প্রকাশিত হয় নাই। কেবল দেওঘরে সন্ধ্যা নামক মৎপ্রণীত একটি কবিতা নব্যভারতে প্রকাশিত হয়।"[৬]

এম্. এ. পাস করার পরে কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট্ স্কলারশিপ নিয়ে তিনি বিলাত যাত্রা করেন (এপ্রিল ১৮৮৪)। তিনি তাঁর প্রবাসজীবনের

৪. আত্মকথা, পৃ ৩০।

৫. দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায় চৌধুরী, পৃ ৭১।

৬. আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ: নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭।

অভিজ্ঞতাকে 'বিলাতপ্রবাসী' নাম দিয়ে পতাকা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।[৭] নিপুন পর্যবেক্ষণশক্তি, হাস্যপরিহাস-প্রবণতা, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি, চারিত্রিক তেজস্বিতা প্রভৃতি ব্যক্তি ও সাহিত্যিক দ্বিজেন্দ্রলালের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এই পত্রগুচ্ছের মধ্যে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। বিলাতপ্রবাসকালে দ্বিজেন্দ্রলাল 'দি লিরিক্‌স অব্‌ ইণ্ড' নামে একখানি ইংরেজি কাব্য প্রকাশ করেন। এই কাব্যেও তাঁর প্রতিভার গীতিধর্মিতা ও সুগভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় আছে।

বিলাতপ্রবাসকালে বিলিতি গান শিক্ষা এ ইংরেজি কাব্য রচনা করা দ্বিজেন্দ্রজীবনের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। নাট্যরচনার আকাঙ্ক্ষাও সেই সময়েই অঙ্কুরিত হয়েছিল। তিনি লিখেছেন, "বিলাত যাইবার পূর্বে আমি 'হেমলতা' নাটক ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক শৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক 'সধবার একাদশী' ও 'গ্রন্থকার' নামক একটি প্রহসনের অভিনয় দেখি, আর Addison-এর Cato এবং Shakespeare-এর Julius Caesar-এর আংশিক অভিনয় দেখি! সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চেও বহু অভিনয় দেখি। এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয় হইয়া উঠে।"[৮]

তিন বছর পরে তিনি বিলাত থেকে ফিরে এসে সরকারী কার্যভার গ্রহণ করেন। বিলাত যাওয়া তখনকার রক্ষণশীল সমাজে ঘোরতর অশাস্ত্রীয় ও অসামাজিক ব্যাপারের মধ্যে গণ্য ছিল। কেউ কেউ তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত করার পরামর্শও দিয়েছিলেন। সামাজিক উৎপীড়ন দ্বিজেন্দ্রলালের তরুণ মনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এই প্রতিক্রিয়ার বহ্নিজ্বালাময়রূপ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'একঘরে' নক্‌শায়। নক্‌শাটির সাহিত্যিক মূল্য কিছু নেই—লেখক নিজেই সংযমের শাসন হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু একদিক থেকে এর তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। নক্‌শাটিতে দ্বিজেন্দ্র-মানসের সুপ্ত স্যাটায়ারিস্টকেই যেন আকস্মিক আঘাতে জাগিয়ে তুলেছে। সামাজিক অসংগতি ও ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে তিনি পরবর্তীকালে বহু

৭. জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় ও হরেন্দ্রলাল রায় সাপ্তাহিক পতাকা পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় ১২৯১ ও ১২৯২ সালে দ্বিজেন্দ্রলালের 'বিলাতপ্রবাসী' প্রকাশিত হয়।

৮. আমার নাট্য জীবনের আরম্ভ : নাট্যমন্দির, শ্রাবণ ১৩১৭।

হাসির গান ও প্রহসন রচনা করেন। 'একঘরে' নকৃশায় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর মানসপ্রকৃতির একটি অনাবিষ্কৃত ভূখণ্ডকে প্রথম আবিষ্কার করেছেন।

৩

১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে (১৮৮৭) দ্বিজন্দ্রলালের সঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ হোমিয়োপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরবালা দেবীর বিবাহ হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের উপর সুরবালা দেবীর প্রভাব অসামান্য। সুরবালা দেবী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। বিলাত-প্রত্যাগত হওয়ার পর দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে যে সামাজিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, বিবাহ-ব্যাপারে তাই চূড়ান্ত শীর্ষে আরোহণ করল। জ্ঞানেন্দ্রলাল লিখেছেন, "কৃষ্ণনগরের কয়েকটি সম্ভ্রান্ত হিন্দু দ্বিজেন্দ্রের বিবাহে আমাদের সহিত বরযাত্রী গিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের পূর্বে কোনো প্রবল পক্ষ, যাঁহারা এই বিবাহে যোগ দিবেন তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার চেষ্টা করিবেন, এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা চলিয়া গেলেন।...দ্বিজেন্দ্রের এই বিবাহে আমরা যোগ দেওয়া সত্ত্বেও কেহ আমাদিগের বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না। কিন্তু প্রকাশ্যভাবে দ্বিজেন্দ্রের সহিত তখন কেহ চলিতে স্বীকৃত হইলেন না।"[১]

পরস্পরবিরোধী দুটি ভাববৃত্তি দ্বিজেন্দ্রমানসলোকে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছিল, এইখানেই তার প্রারম্ভ লগ্ন। 'একঘরে' নকৃশা ও পরবর্তীকালের বিদ্রূপাত্মক কবিতায় যেমন তাঁর বহির্মুখী সামাজিক মন হাস্যে-পরিহাসে-স্যাটায়ারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তেমনি অন্যদিকে নবপরিণীতা পত্নীকে ঘিরে তাঁর হৃদয়োচ্ছ্বাস 'গীতিকবিতার স্ফটিক পাত্রে স্বর্ণমদিরার মতো বিহ্বল ও উজ্জল হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে'। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের মনোলোকে দুটি ধারা প্রবহমান: আত্মমুগ্ধ প্রেম-বিহ্বল স্বপ্নাতুর কবি ও অসংগতিক্ষুব্ধ সামাজিক মানুষ। এই দুটি ধারা কখনো স্বতন্ত্র ধারায় সমাজরেখায় প্রবাহিত হয়েছে, আবার কখনো বা এই দুই বিরুদ্ধ ধারা এক হয়ে ভাব ও রূপের ক্ষেত্রে বিচিত্রমুখী জটিলতার সৃষ্টি করেছে। প্রেম ও সামাজিক নির্যাতন—দুয়েরই কেন্দ্রে পত্নী সুরবালা দেবী।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ আর্যগাথা (দ্বিতীয় ভাগ) ১৮৯৩

১. নব্যভারত, শ্রাবণ ১৩২০।

খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কাব্যখানির উৎসর্গ পত্রেই কবির প্রিয়াবন্দনার সুর নিঃসংশয়িত হয়ে উঠেছে—

নয় কল্পিত সৌন্দর্যে ; — নয়
কবির নয়নে দেখা— পরিস্বপ্ন সম ;—
এসেছ প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

'আর্যগাথা'র (দ্বিতীয় ভাগ) প্রথমাংশের কবিতাগুলি প্রেম ও যৌবনস্বপ্নের, কবিজায়াই তার অবলম্বন। দ্বিতীয়াংশে পাশ্চাত্য কবিদের গানের অনুবাদগুলি সংকলিত হয়েছে। ষোলো বছরের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় দাম্পত্য-জীবন দ্বিজেন্দ্রলালের মনোজীবনকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। প্রহসন, ব্যঙ্গ কবিতা, হাসির গান, নাট্যকাব্য, রোমান্টিক গীতিকবিতা প্রভৃতি বিচিত্র সৃষ্টির প্রাচুর্যে কবিজীবন তখন পূর্ণোচ্ছ্বসিত। সৃষ্টি-সাফল্যের এই চরম মুহূর্তেই এল নিদারুণ আঘাত—সুরবালা দেবীর মৃত্যু হল (২৯ নভেম্বর ১৯০৩)।

স্ত্রীবিয়োগ-বেদনা তাঁর শিল্পজীবনের পক্ষেও একটি তাৎপর্যময় ঘটনা। স্ত্রীবিয়োগের পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানত কবি ও প্রহসন রচয়িতা। একদিকে ভাবোচ্ছ্বাসপূর্ণ গীতিকবিতা, অন্যদিকে বিদ্রূপাত্মক কবিতা ও প্রহসন—এই দুয়ের টানাপোড়েনে তাঁর সাহিত্যিক জীবন সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। 'আর্যগাথা' (১ম, ২য়) ও 'মন্দ্র' কাব্য ; হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে ব্যঙ্গ কাব্য ; 'কল্কি অবতার' 'বিরহ' 'ত্র্যহস্পর্শ' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' প্রহসন চতুষ্টয় এই কালের মধ্যেই রচিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকগুলি স্ত্রীবিয়োগের পরবর্তীকালেই রচিত হয়। বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশভক্তির উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলি তাকেই বাণীরূপ দিয়েছিল। স্ত্রীবিয়োগ-বেদনাবিধুর দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর শূন্য হৃদয়ের হাহাকারকে যেন এই বহিরাশ্রয়ী উন্মাদনা ও উত্তেজনা দিয়ে অনেকটা পূরণ করার চেষ্টা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মানস-পরিবর্তনের উপরে চমৎকার আলোকপাত করেছেন সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী—

"তারাবাই ব্যতীত তাঁহার যাবতীয় জনপ্রিয় ঐতিহাসিক নাটকের সৃষ্টি স্ত্রীবিয়োগের পরে। নাটক পাঠে, নাটকের অভিনয় দেখায়, নাটক-রচনায় তাঁহার ঝোঁক গোড়া হইতেই ছিল। কিন্তু এই সময়কার নাটকগুলির

বৈশিষ্ট্য এই যে, এগুলি রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুসারে লিখিত। এমন হইবার অনেক কারণ থাকা সম্ভব। প্রথম, অভিনয়যোগ্য নাটকের চাহিদা। দ্বিতীয়, বঙ্গ-ভঙ্গ-জনিত জাতীয়তাবোধের প্রসার। আরও একটি কারণ থাকাও অসম্ভব নয়। স্ত্রীবিয়োগের পরে সংসারের ও মনের হঠাৎ-শূন্যতা পূরণ করিবার জন্য বাহিরের উত্তেজনার কিছু প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল তাঁহার পক্ষে। রঙ্গালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা সেই শূন্যতা পূরণ করিতে পারে আশায় তিনি মঞ্চোপযোগী নাটক রচনায় উদ্যোগী হইয়া উঠিয়াছিলেন এমনই খুবই সম্ভব।”[১০]

দ্বিজেন্দ্রলালের চাকুরী-জীবন সুখের হয় নি। চাকুরী-জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাও তাঁর কোনো কোনো রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি ছিলেন সদালাপী ও মজলিশী প্রকৃতির মানুষ। অনেক গুণমুগ্ধ জ্ঞানী গুণী, সংগীত ও সাহিত্য-রসিক তাঁর বাড়িতে যাতায়াত করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে বন্ধুবান্ধবদের সাহচর্যে ও নানা আলোচনায় দুঃসহ ব্যথা ভুলে থাকতে চাইতেন। ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'পূর্ণিমা-মিলন' নামে এক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্পর্কে তিনি একখানি চিঠিতে জানিয়েছেন—

“এক নূতন খেয়াল মাথায় আসিয়াছে।...আমি (অর্থাৎ আমরা) ইচ্ছা করিয়াছি, প্রতি পূর্ণিমায় দেশসুদ্ধ সাহিত্যসেবী সাহিত্যানুরাগীদের একত্র করিয়া এক-একবার প্রতি পূর্ণিমা উপলক্ষে 'মিলন' করা যাইবে। নাম হইবে 'পূর্ণিমা-মিলন'। ইহাতে কলিকাতাস্থ সমুদয় সাহিত্যিকদের মধ্যে অবারিতভাবে মেলামেশা ভাববিনিময় প্রীতিবর্ধন ও পরিচয়াদি হইবে ; আর তাহার সঙ্গে সেখানে (যেখানে যখন হইবে) গৃহস্বামীর প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যানুসারে, অল্প কিছু জলযোগ—এই ধর যেমন চা, সরবত প্রভৃতি ও চুরুট তামাকের (সিগারেটেরও !!) ব্যবস্থা থাকিবে।”[১১]

'পূর্ণিমা-মিলন' প্রায় দুবছর ধরে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল খুলনায় বদলি হওয়ার পর ক্রমশ অনিয়মিত হয়ে পড়ল, শেষে একেবারে বন্ধই হয়ে গেল। 'পূর্ণিমা-মিলন' স্বল্পায়ু হলেও তৎকালীন

১০. বাংলার ছবি

১১. দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত পত্র ; দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী পৃঃ ৪১০-১১

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান বাঙালীর একটি তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। পূর্ণিমা-মিলনকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে। প্রথম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গান গেয়ে সকলকে মুগ্ধ করেন। ললিতচন্দ্র মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশনে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রবীন্দ্রনাথের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি আবৃত্তি করেন। ডাক্তার কৈলাস বসুর বাড়িতে অনুষ্ঠিত তৃতীয় অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল ঐ মিলনোৎসবের জন্যই 'এটা নয় ফলার ভোজের নিমন্ত্রণ' গানটি রচনা করেন। উক্ত অধিবেশনে নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে সীতা ও সরমার কথোপকথন অংশটি আবৃত্তি করে শোনান। জাস্টিস সারদাচরণ মিত্রের বাড়িতে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ অধিবেশনে কান্ত কবি রজনীকান্ত স্বরচিত গান গেয়ে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। ঐ অধিবেশনেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল 'সাধে কি বাবা বলি' গানখানি গেয়েছিলেন। পূর্ণিমা-মিলনের দোললীলা উপলক্ষে একবার আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের "শুভ্রকেশ লালে লাল" হয়ে উঠেছিল।

৪

স্ত্রীবিয়োগের পর যে দশ বছর দ্বিজেন্দ্রলাল জীবিত ছিলেন (১৯০৩-১৯১৩) তাকে প্রধানত নাটক-রচনার যুগ বলা যায়। 'আলেখ্য' (১৯০৭) ও 'ত্রিবেণী' (১৯১২) ছাড়া এ যুগের অধিকাংশ রচনাই নাটক ও প্রহসন। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলিই মঞ্চসাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্বদেশী আন্দোলনের আবেগ-দীপ্ত মুহূর্ত তাঁর ঐতিহাসিক নাটকে বর্ণোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে জাতীয় ভাব বিকাশের অনুকূল উপাদান ছিল। তা ছাড়া, অতীতাশ্রয়ী ঐতিহাসিক রোমান্সকে চিত্রময় ভাষায় ও আবেগদীপ্ত ভঙ্গিতে রূপায়িত করা হয়েছে।

স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটে। এই সময় বিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও প্রমথনাথ ভট্টাচার্য 'কলিকাতা ইভনিং ক্লাব' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। এই ক্লাব কালক্রমে 'সুরধামে' স্থাপিত হল, দ্বিজেন্দ্রলাল হলেন এর সভাপতি। তাঁর মৃত্যুর পর

'ইভনিং ক্লাব' উঠে যায়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হন। ব্যধির জন্য এক বছর ছুটি নিলেন। কিন্তু দেহও ক্রমশ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১৩র ২২শে মার্চ তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণ করার পর তিনি একখানি মাসিক-পত্রিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যাণ্ড সন্স পত্রিকাটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। প্রথম সংখ্যার (আষাঢ় ১৩২০) জন্য তিনি 'সূচনা' অংশ লিখেছিলেন, ঐ সংখ্যায় প্রকাশযোগ্য রচনাগুলিও নির্বাচন করেছিলেন। বিখ্যাত 'ভারতবর্ষ' সংগীতটিও এই পত্রিকার জন্যই রচিত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় পত্রিকা প্রকাশের পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয় (১৭ মে ১৯১৩)।

দ্বিজেন্দ্র-জীবনের শেষ অধ্যায়ে সবচেয়ে তাৎপর্যমূলক ঘটনা হল রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ। এই দীর্ঘ বিস্তৃত সাহিত্যিক বিরোধের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধির প্রয়োজন আছে। সেদিনের উত্তাপ উত্তেজনা ও ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। সুতরাং এ কালের সমালোচক ও সাহিত্যের ইতিহাস-লেখকের কাছে এ ঘটনা সাহিত্যেরই অঙ্গীভূত হয়েছে। এই ঘটনা থেকে দুটি সত্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের ইতিহাস; দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যাদর্শ।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের চেয়ে মাত্র দু বছরের ছোট হলেও সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন অনেক পরে। দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা ও বিস্ময়কর স্বকীয়তা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আলোচনা করেন। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ); 'আষাঢ়ে' ও 'মন্দ্র' সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা দ্বিজেন্দ্রসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ দিগ্‌দর্শন।[১২] রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের 'অবলীলাকৃত ক্ষমতা' 'প্রবল আত্মবিশ্বাস' ও 'অবাধ সাহস'-এর কথা সশ্রদ্ধ ভাবে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালও তাঁর 'বিরহ' প্রহসনটি রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন। প্রহসনটি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতেও অভিনীত হয়েছিল।[১৩] কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জনপ্রিয় নাটকগুলির

১২। 'আর্যগাথা' (দ্বিতীয় ভাগ): সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩০১। 'আষাঢ়ে': ভারতী, অগ্রহায়ণ ১৩০৫। 'মন্দ্র': বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১৩০৯। প্রবন্ধ তিনটি কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয়ে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।

সপক্ষে বা বিপক্ষে রবীন্দ্রনাথ কোনো মন্তব্য করেন নি। সম্ভবত, রবীন্দ্রনাথের এই নীরবতা দ্বিজেন্দ্রলালের মনঃপূত হয় নি। বরিশালের প্রাদেশিক সম্মিলনীতে (১৯০৬) যে সাহিত্য-সম্মেলন আহ্বান করা হয়, তার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'বঙ্গবাসী' পত্রিকা রবীন্দ্রনাথকে এই উপলক্ষে নির্মমভাবে আক্রমণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কাঁদি থেকে এই সম্মিলনের অন্যতম ব্যবস্থাপক দেবকুমার রায়চৌধুরীকে চিঠি লেখেন, "রবিবাবুকে সাহিত্যিক সম্মিলনের সভাপতি করায় 'বঙ্গবাসী' তোমার উপরে নারাজ হইয়া এত চটিলেন কেন জানি না। আমি যদিও রবিবাবুর ঐ সব লালসামূলক রচনাবলীর নিতান্ত বিরোধী তবু এ কথা আমি মুক্ত কণ্ঠেই মানি যে, বর্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি সর্বাপেক্ষা যোগ্য ব্যক্তি এবং তাঁর সাহিত্য-প্রতিভার সঙ্গে এখন আর কাহারও তুলনাই হইতে পারে না।"[১৪]

বঙ্গবাসী কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০৪) গ্রন্থটির অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের আত্মজীবনী নিয়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রকাশ্য বিরোধের সূত্রপাত ঘটে। রবীন্দ্রনাথের আত্মপরিচয়টি দ্বিজেন্দ্রলালকে উত্তেজিত করেছিল। ১৩১১ সালে এই দুই কবির সাহিত্যিক বিরোধ যে কতদূর গড়াইয়াছিল তা রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়।[১৫] দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গয়ায় বদলি হন, তখন তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিলেন জেলা জজ লোকেন্দ্রনাথ পালিত। রবীন্দ্রসাহিত্য নিয়ে দুই বন্ধুর তুমুল তর্ক হত। দ্বিজেন্দ্রলাল পালিত সাহেবকে স্বমতে দীক্ষিত করতে অসমর্থ হয়ে প্রকাশ্যভাবে রবীন্দ্রনাথের 'অস্পষ্ট রীতি'র বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। এই মনোভাবটি দেবকুমার রায়চৌধুরীর কাছে লিখিত একখানি চিঠিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।[১৬] এর পরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'

১৩, "বিরহ প্রহসনটি থিয়েটারে অভিনীত হইয়াছিল, এমন কি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও উহার অভিনয় হয়।"—রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫): প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ ২৮০।

১৪, ১৩ই মে, ১৯০৬ কাঁদি থেকে লিখিত চিঠি: দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৪৯।

১৫, দ্বিজেন্দ্রলালকে লিখিত একখানি চিঠি (২৩ বৈশাখ, ১৩২২), রবীন্দ্রজীবনী (২য় খণ্ড, ১৩৫৫), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়; পৃ ২৮৩-৫।

১৬, দ্বিজেন্দ্রলাল: দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ ৪৯৮-৪৯৯।

কবিতার কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা জুড়ে দিয়ে কবিতাটিকে হাস্যাস্পদ করে তোলেন।[১৭]

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'কাব্যের প্রকাশ'[১৮] প্রবন্ধটিকে উপলক্ষ করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর ধূমায়িত বিক্ষোভকে রূপ দেন। 'কাব্যের অভিব্যক্তি'[১৯] প্রবন্ধে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। এর প্রায় এক বছর পরে 'কাব্যের উপভোগ'[২০] নামক একটি প্রবন্ধেও তিনি তীব্রভাবে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেন। রবীন্দ্রনাথের জবাবটিও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার ঐ সংখ্যাতেই ছাপা হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দ্বিজেনবাবু কেন অযথা কল্পনা করিতেছেন যে, আমি এক দল চেলা আমার চারপাশে তৈরী করিয়া তুলিয়াছি। আমার যে কবিতা দ্বিজেন্দ্রবাবুর কোনো মতেও ভাল লাগে নাই তাহা যে আর কাহারও ভাল লাগিতে পারে, আমার এ অপরাধ তিনি কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেছেন না।"

কাব্যে অস্পষ্টতা অভিযোগের প্রায় বৎসরাধিক কাল পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনেন।[২১] প্রবন্ধটির মূল আক্রমণস্থল ছিল রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা'। প্রিয়নাথ সেন এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করেছিলেন।[২২] কাব্যে নীতির প্রসঙ্গ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তুমুল বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। 'আনন্দবিদায়' প্যারডি রচনা করে দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে সর্বসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন। স্টার রঙ্গমঞ্চে 'আনন্দবিদায়'-এর দক্ষযজ্ঞ পরিণতি নিয়ে প্রমথ চৌধুরী 'সাহিত্য চাবুক' (সাহিত্য, মাঘ ১৩১৯) প্রবন্ধ লেখেন। মৃত্যুর পূর্বে দ্বিজেন্দ্রলাল 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার জন্য যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি বলেছেন, "আমাদের শাসনকর্তারা যদি বঙ্গসাহিত্যের আদর জানিতেন, তাহা হইলে বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেল peerage পাইতেন ও রবীন্দ্রনাথ Knight উপাধিতে ভূষিত হইতেন।"

১৭, একটি পুরাতন মাঝির গান (আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা), সাহিত্য, আশ্বিন ১৩১৩।

১৮, বঙ্গদর্শন, শ্রাবণ ১৩১৩।

১৯, প্রবাসী, কার্তিক ১৩১৩।

২০, বঙ্গদর্শন, মাঘ ১৩১৪।

২১, কাব্যে নীতি : সাহিত্য, জ্যৈষ্ঠ ১৩১৬।

২২, চিত্রাঙ্গদা : সাহিত্য, কার্তিক ১৩১৬।

দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দুটি অভিযোগ এনেছিলেন: কাব্যে অস্পষ্টতা ও দুর্নীতি। দ্বিতীয় অভিযোগটির মূলে কোনো যুক্তিই ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বহু রচনায় সংস্কারমুক্ত বুদ্ধিদীপ্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। 'পাষাণী' রচয়িতার পক্ষে 'চিত্রাঙ্গদা'র দুর্নীতি আলোচনা নিতান্ত অসংগত বলেই মনে হয়। তবে প্রথম অভিযোগটির মধ্যে তৎকালীন রবীন্দ্রবিরোধী মতবাদের একটি পরিচয় পাওয়া যায়। সে যুগের অনেকেই রবীন্দ্রকাব্যের সূক্ষ্মতর ভাব-লাবণ্য গ্রহণ করতে পারেন নি। তার কারণ তখনো রবীন্দ্রকাব্যকে আস্বাদন করার মতে কাব্যসংস্কার ও রসরুচি তৈরি হয় নি। হেম-নবীনের কাব্যসংস্কারই তখন রসাস্বাদনের মাপকাঠি। দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন স্পষ্ট ও জোরালো কাব্যের পক্ষপাতী। প্রত্যক্ষের বাইরে যে অস্পষ্ট অদেখা আর-একটি সূক্ষ্মতর ছায়াশরীরী জগৎ আছে, তাকে কাব্যে স্থান দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধ তাই অনেকখানি কাব্যপ্রত্যয়গত বিরোধ। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলাল সম্পর্কে লিখেছিলেন, "বিহারীলাল তখনকার ইংরাজি ভাষায় নব্যশিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধবর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না, এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।"[২৩] হেম-নবীনের যুগে যে কারণে বিহারীলালের আদর হয় নি, রবীন্দ্রনাথেরও কতকটা সেই কারণেই বাংলাদেশে যথার্থ স্বীকৃতি পেতে বিলম্ব ঘটেছিল।

৫

দ্বিজেন্দ্রমানস যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি বলিষ্ঠ। তবু তাঁর সাহিত্যের যথাযোগ্য সমাদর ঘটে নি। সমসাময়িক কালে, বিশেষত তাঁর জীবনের শেষ দশ বছরে, নাট্যকার হিসাবেই তিনি খ্যাতিলাভ করেছিলেন। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানও সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। তাঁর নাট্যকার খ্যাতিই কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছিল। নাটকগুলির জনপ্রিয়তা ও মঞ্চসাফল্যও হয়তো তাঁকে তাঁর স্বক্ষেত্র থেকে অনেকখানি সরিয়ে এনেছিল। শেষকাব্য 'ত্রিবেণী'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন: "সম্ভবতঃ

২৩, বিহারীলাল: আধুনিক সাহিত্য।

আমার খণ্ডকবিতার এই খানেই সমাপ্তি!"—এই উক্তিটি যেন তাঁর কাব্যনিয়তিরই নির্মম পরিহাস! স্বক্ষেত্র থেকে সরে এসে তিনি লাভবান হতে পারেন নি। সম্ভাবনা-দীপ্ত কাব্যজীবনকে অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে নাট্যসরস্বতীর আহ্বানে সাড়া দিতে হয়েছে।

তাঁর নাট্যকার খ্যাতি যেমন কবিখ্যাতির অন্তরায় হয়েছে, তেমনি আর একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখযোগ্য। দ্বিজেন্দ্রলালের কাল একই সঙ্গে রবীন্দ্রবরণ ও রবীন্দ্রবিরোধের কাল। কেউ কেউ আবার এই দুই ভাবধারার বিপরীত আকর্ষণে আন্দোলিত হয়েছিলেন। তৎকালে দ্বিজেন্দ্রলালের নেতৃত্বে একটি রবীন্দ্রবিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ আরও আটাশ বছর জীবিত ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অংশ এই অসাধারণ রূপস্রষ্টার দক্ষিণপাণির আশীর্বাদে ধন্য হয়েছে। রবীন্দ্রকাব্যের রূপ ও রীতিই বাংলা কাব্যের পথ নির্দেশ করেছে। যা রবীন্দ্রকাব্যের অনুকূল নয়, তা সহজেই পরিত্যক্ত হল। দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রবর্তিত কাব্যরীতি ও কলাবিধির সম্যক্ অনুশীলনের অভাবে বাংলা সাহিত্যের এই প্রতিভাবান কবির কবিকীর্তি আজ এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায়ে পরিণত হয়েছে। বাংলা কাব্যের ইতিহাসে একটি শক্তির উৎস দীর্ঘকাল অনাবিষ্কৃতই পড়ে রইল।

দ্বিজেন্দ্রলালের মনে লিরিসিজম্ ও স্যাটায়ার একটি যুগ্মবেণী রচনা করেছিল। লিরিক ও স্যাটায়ারের বিপরীত আকর্ষণে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্য-পরিণামকে কোন্ পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে, দ্বিজেন্দ্রকাব্য-জিজ্ঞাসার এইটিই সবচেয়ে বড় কথা। মনোধর্মের দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল 'বিশুদ্ধ রোমান্টিক কবি' নন। 'আষাঢ়ে' কাব্যের সমালোচনা-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে এই সত্যটিকে বহু পূর্বেই নির্দেশ করেছিলেন। তাঁর বায়রনের কথা মনে হয়েছিল। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা শেলীর মত বায়রনের কবিতার কোনো সুগভীর আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা ছিল না। আবেগতপ্ত অবলীলাকৃত প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে এক বিদ্রূপাত্মক মনোভাব তাঁর কাব্যে প্রাধান্যলাভ করেছিল। 'মহত্তের সঙ্গে তুচ্ছ, গভীরের সঙ্গে অগভীর, করুণের সঙ্গে হাস্য—প্রভৃতি আপাতবিরোধী ভাববৃত্তিগুলি তাঁর কাব্যে ওঠা-নামা করেছে।' বায়রনের মত দ্বিজেন্দ্রলালেরও অন্তর্মুখী গতিপ্রবণতার সঙ্গে বহির্মুখী সামাজিক মনের একটি মিলন ঘটেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল কাব্যরীতি ও ছন্দের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব এনেছিলেন। বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, গদ্যাত্মকভঙ্গি দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যরীতিকে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। প্রচলিত অক্ষরবৃত্ত ছন্দকেই তিনি syllabic রূপ দিতে চেয়েছিলেন। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন, "তাঁর এই অভিনব ছন্দে স্বরবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ধ্বনি সমাবেশ ঘটেছে।"[২৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল মূলত কবি হলেও নাটকের ক্ষেত্রেও তাঁর দান কম নয়। তখন বাংলা নাটকের একচ্ছত্র সম্রাট গিরিশচন্দ্র। গিরিশচন্দ্রের সেই প্রবল প্রভাবের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল সেই জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেন নি। তাঁর স্বাতন্ত্র্য-সমুজ্জ্বল প্রতিভা রূপ-রীতি আঙ্গিক-প্রকরণ চরিত্রসৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে নূতনত্ব এনেছিল। কিন্তু নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল অপূর্ণতা ও আতিশয্য-দোষ থেকে মুক্ত নন। আধুনিক নাটকের সূক্ষ্মতর শিল্পরীতি, স্বল্পায়ত রূপবিন্যাস, আধুনিক মঞ্চানুগ কলাবিধি দ্বিজেন্দ্র-নাটকে অনুসন্ধান করা সঙ্গত নয়। ব্যয়সাধ্য দীর্ঘ ঐতিহাসিক নাটকের প্রবণতাও আজ অনুপস্থিত। যে নাট্যকার খ্যাতি তাঁকে সে যুগে জনপ্রিয় করেছিল, তার ভিত্তি আজ দুর্বল। কবিতা গান ও কাব্যরীতি মধ্যেই তাঁর স্বক্ষেত্র নির্ণয় করতে হবে। দ্বিজেন্দ্রলালের জন্মশতবার্ষিক উপলক্ষে এই প্রতিভাবান কবি সুরকার ও নাট্যকারকে যোগ্য সমাদর দেওয়ার সুযোগ এসেছে।

২৪, দ্বিজেন্দ্রলালের স্বরবৃত্ত ছন্দ : উদয়ন, আশ্বিন ১৩৪০।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৮৬৩—১৯১৫

কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

শিশু ও কিশোরের উপযোগী সাহিত্য-সৃষ্টির জন্য বিশেষ ভাবের নৈপুণ্য ও রসজ্ঞান প্রয়োজন এবং সেই নৈপুণ্য ও রসজ্ঞান অর্জন করিতে হইলে শিশু ও কিশোরের মন বুঝিতে পারিবার উপযুক্ত আগ্রহ ও উৎসাহ সাহিত্যিকের নিজের মনে-প্রাণে নিহিত থাকা প্রয়োজন। তাহা না থাকিলে শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অন্য শাখাপ্রশাখারই মত নূতন ধারার সৃষ্টি সম্ভব নয়। এবং তাহারই অভাব শিশু ও কিশোর সাহিত্যে দীর্ঘদিন ছিল, পুস্তকের পর্যায়ে এবং পত্রিকার পর্যায়েও।

সেই অভাবের পূরণ হয় শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রতিষ্ঠিত মাসিক পত্রিকা 'সখা' প্রকাশিত হইবার পর হইতেই। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারি 'সখা'র আবির্ভাব হয়। ইহার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রমদাচরণ সেন। প্রমদাচরণ ছিলেন দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার মনে অপরিসীম উৎসাহ ও প্রেরণা ছিল বাংলার শিশু কিশোরদিগের মনে আনন্দ ও উদ্দীপনা আনয়নের জন্য। সেইজন্য পত্রিকাখানিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে তিনি অশেষ ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেন, যাহার ফলে অল্প দিনের মধ্যেই 'সখা' সেই কালের বালকবালিকাগণের নিকট প্রিয়বন্ধুরূপে গৃহীত হইয়াছিল। প্রমদাচরণের সৌভাগ্য ছিল যে তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া কয়েক জন লেখক তাঁহার এই উদ্যমে আন্তরিকভাবে যোগদান করেন। ইহাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী নামে একজন তরুণ লেখক। যে সুন্দর রচনাসম্ভারে 'সখা' প্রথম হইতেই সুসজ্জিত হইয়া শিশু ও কিশোরদিগের মনোলোভা রূপ গ্রহণ করে তাহার অধিকাংশই ছিল সম্পাদক প্রমদাচরণ এবং মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও উপেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী এই লেখকত্রয়ের রচিত। সেই যুগের শিশু ও কিশোরদিগের মন 'সখা' কিভাবে নন্দিত ও উৎসাহিত করিয়াছিল তাহার সাক্ষ্য আমরা, যাহারা তাহার অব্যবহিত পরের যুগের কিশোর ছিলাম, আমাদের পূর্ব্ববর্তী যুগের কিশোরদের যাঁহারা আমাদের অপেক্ষা দশ-বারো বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাঁহাদের—কথাবর্তায় প্রভূত পরিমাণে পাইয়াছিলাম।

এবং আমরা তখনকার দিনে ঘরে ঘরে বাঁধানো 'সখা'র বহু খণ্ড দেখিয়াছি।

'সখা'-সম্পাদক প্রমদাচরণ কঠোর পরিশ্রমে ও দারিদ্র্যভারে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া অকালে ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। তাঁহার পর পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এবং তাঁহার পরে প্রথমে অন্নদাচরণ সেন ও পরে নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য আরও কয় বৎসর ইহার পরিচালনা করার পর 'সখা' বন্ধ হয়। তাহার পর ১৮৯৩ সালে প্রকাশিত হয় 'সাথী' ভুবনমোহন রায়ের সম্পাদনায়। ইহার নাম প্রথমে ছিল 'সাথী'। এই নামের সহিত 'সখা' যুক্ত হয় এবং ১৮৯৪ হইতে ইহা 'সখা ও সাথী' নামে পরিচিত ও সমাদৃত হয়। তাহার পরের বৎসর প্রকাশিত হয় তৎকালে প্রসিদ্ধ শিশু ও কিশোরদিগের মাসিক 'মুকুল' পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সম্পাদনায়। এইগুলি প্রকাশনের পূর্বে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী জ্ঞানদানন্দিনী দেবী 'বালক' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে, এক বৎসর পৃথকভাবে চলিবার পর উহা 'ভারতী'র সহিত যুক্ত হয়।

এই কয়খানি শিশু ও কিশোরদিগের মাসিক পত্র বাংলা ভাষায় শিশু ও কিশোর সাহিত্যে নূতন যুগের সূচনা করে এবং এই যুগে শিশু কিশোর সাহিত্যের, প্রবাহে কয়েকটি নূতন ধারা যুক্ত হইবার পর ঐ সাহিত্য সতেজ ও গতিশীল প্রবাহে পরিণত হয়। ইহা সম্ভব হয় কয়েকজন আশ্চর্য প্রতিভাশালী লেখকের উৎসাহে ও পরিশ্রমে, যাঁহাদের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অক্ষয় ও অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথও অল্পদিনের জন্য 'বালক'-পত্রিকাটি নিজের লেখায় ভূষিত করেন। আরও পরে শিশুর কল্পনা দিয়া রচিত তাঁহার 'শিশু'র কবিতাগুলি বাংলার শিশু সাহিত্যে অমূল্য সম্পদরূপে গণ্য হয়। বাংলার শিশু ও কিশোর সাহিত্যের আর একজন প্রতিভাশালী লেখক আসেন বিংশ শতাব্দীর মুখে, তিনি দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এই যুগ-প্রবর্তকদিগের মধ্যে অন্যতম ছিলেন, শুধু এ কথা বলিলেই তাঁহার কৃতিত্ব ও কীর্তির সকল কথা বলা হয় না। যে সকল কথা বলিতে হইলে তাঁহার কর্মজীবনের প্রায় সমস্ত পরিসর এই আলোচনার মধ্যে টানিতে হয়। তিনি শিশু ও কিশোরদের জন্য প্রথম লেখনী ধারণ যখন করেন তখন তাঁহার বয়স মাত্র উনিশ বৎসর

অতিক্রম করিয়াছে, এবং জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত সেই বিষয়ে তাঁহার প্রয়াস চলিয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে তাঁহার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় 'সখা' পত্রিকায় ১৮৮৩ সালে এবং মৃত্যুর অল্প পূর্বেও তিনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত 'সন্দেশ পত্রিকাটি যাহাতে সর্বাঙ্গসুন্দর হইয়া উঠে তাহার জন্য বিশেষ ভাবে চিন্তা করিয়াছেন, নির্দেশ দিয়াছেন এবং যতদিন কলম ধরিবার শক্তি ছিল, লিখিয়াছেন ও ছবি আঁকিয়াছেন।

তিনি বাংলার শিশু ও কিশোদের মন বুঝিতেন। তাঁহার মৃত্যুর (৪ঠা পৌষ ১৩২২) পর মাঘ ১৩২২ সংখ্যার 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁহার যে জীবন আলেখ্য প্রকাশিত হয় তাহাতে সন্দেশের পাঠক-পাঠিকাদের উদ্দেশে বলা হইয়াছিল—"তোমরা তাঁহাকে না চিনিলেও, তিনি তোমাদিগকে, বাঙলার সকল বালক-বালিকাকে, শিশুদের মনটিকে—বেশ চিনিতেন। তাই যেটি বলিলে আর যেমনভাবে বলিলে বেশ সহজে তোমরা বুঝিবে, তোমাদের মনের মত হইবে, তোমাদের প্রতি গভীর স্নেহের পরবশ হইয়া, বহু পরিশ্রম ও যত্ন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও নিপুণতা প্রয়োগে তোমাদিগকে শিক্ষা ও আমোদ দিতে, তোমাদিগকে 'স্ফূর্তি' দিয়া ভালো করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন।"

এই বিবরণের প্রত্যেকটি কথা যথার্থ। শিশুর শব্দসমষ্টি (vocabulary) অতি সংক্ষিপ্ত, সামান্য দুই-তিন শতও নয়। এবং সেই শব্দগুলি যোজনা করার ব্যাকরণও অতিমাত্রায় সংকুচিত। কিশোরের ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্য দুইয়েরই প্রসার বর্ধিত, কিন্তু তাহা হইলেও বয়স্কদিগের বিশেষত শিক্ষিতজনের তুলনায় তাহার পরিসর ও পরিমাণ অনেক কম। বিদ্যাসাগর যুগের শিশু ও কিশোরসাহিত্যের ভাষা সরল হইলেও সাধারণ কথিত ভাষার মত সহজ ও স্নিগ্ধ ছিল না। সে যুগের লেখকেরা শিশু ও কিশোরকে গল্প বলিতে এবং উপদেশ ও শিক্ষা দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নিজেদের মনোমত ভাষায়, নিজেদের দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়টিকে দেখিয়া। ফলে বিষয়বস্তু মনোগ্রাহী হইলেও বলিবার ভঙ্গিতে বড় ও ছোট, বিজ্ঞ ও অল্পজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদটা বজায় ছিল এবং অনেক কথাই পুনরাবৃত্তি করিয়া বুঝাইতে হইত।

শিশুর ও কিশোরের মন বুঝিয়া বয়স্কের উচ্চাসন হইতে নামিয়া তাহাদের সহিত মিশিয়া, তাহাদের মনোমত সহজ কথিত ভাষায়

তাহাদের জন্য লেখার রীতিপদ্ধতি সর্বপ্রথমে যে কয়জন প্রচলিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অগ্রবর্তী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর। শিশু ও কিশোর সাহিত্যে যে শৈলী এখন সাধারণ ভাবে চলিতেছে, বোধ হয় তাহার প্রবর্তন সর্বপ্রথমে করেন শিবনাথ শাস্ত্রী, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী এবং কিছু পরে যোগীন্দ্রনাথ সরকার; সে কারণেই নূতন যুগের অন্যতম স্রষ্টা রূপে উপেন্দ্রকিশোরের আসন প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনারীতি এক আদর্শের সৃষ্টি করে—যাহা সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রে আজও আদৃত ও অনুসৃত হইতেছে। ইঁহাদের পরে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা ইঁহাদের নির্দেশ ও পন্থা গ্রহণ করিয়াছেন, কোনো ভিন্ন পথ তাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, তবে পথ আরও প্রশস্ত ও সরল করা হইয়াছে এবং সেইকারণে নূতন সৃষ্টি ও সৃজনের কাজও সহজসাধ্য হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোরের লিখিবার বিষয়বস্তুর কথা এইবার বলিতে হয়। এক প্রশস্ত প্রান্তরের উপর তাঁহার লেখনি শিশু ও কিশোরের মনকে লইয়া ফিরিয়াছে। একদিকে শিশুর মনভোলানো উপকথা ও ছড়া, কিশোরের মনো-রঞ্জনকারী গল্প ও নাটিকা ও অন্য প্রান্তে কোটি কোটি বৎসর পূর্বেকার বিরাট ও ভয়ঙ্কর জীবের কথা ও কোটি কোটি যোজন দূরের নভোমণ্ডলের কথা। বাংলা শিশু ও কিশোর সাহিত্যে অন্যকোন একজন লেখক এইরূপে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে লিখিবার সফল চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

উপেন্দ্রকিশোর 'সখা' পত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেন বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ দিয়া। তিনি শিশুর ও কিশোরের মন শুধু ভুলাইতেই চাহিতেন না, তাহাদের মনে সাধারণ জ্ঞান প্রসার ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল ও চেতনা জাগ্রত করিবার চেষ্টাও শেষদিন পর্যন্ত করিয়া গিয়াছেন এবং সেই কারণেই তাঁহার 'ছেলেদের রামায়ণ' ও 'ছোটোদের রামায়ণ' যেমন একদিকে এখনও অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া আছে, অন্যদিকে তাঁহার 'সেকালের কথা' অনন্য হইয়া আছে; ইহা একমাত্র পুস্তক যাহাতে এই পৃথিবীর অতি সুদূর অতীত প্রাক্‌মনুষ্য যুগের জীবজন্তুর কথা সরল ও সহজ ভাষায় কিশোরদের জন্য লিখিত হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোরের লিখিত প্রবন্ধ ও গল্পের ভাষা শিশু ও কিশোরের মনের মত করিয়া রচিত হইত। বৈজ্ঞানিক বিষয়েও সেই একই ধারা

চলিত। উপরন্তু তাঁহার ছিল চিত্রাঙ্কনে অসাধারণ নৈপুণ্য। ভাষা যেখানে সীমায় পৌঁছাইত সেখানে তাঁহার আঁকা ছবি শিশু ও কিশোরের মনকে লইয়া যাইত আরও আগে। কি গল্পের চরিত্র বা ঘটনা, কি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু—অল্পবয়স্ক ও সুকুমারমতি পাঠক-পাঠিকা লেখার বর্ণনায় ও ছবির আকারে-প্রকারে সে সকলের মর্মকথা অতি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিত। তিনি 'সেকালের কথা' চিত্রিত করিয়াছিলেন নিজে ছবি আঁকিয়া। সেই ছবি সম্পর্কে ভারত গভর্নমেণ্টের তৎকালীন ভূতত্ত্ব-বিভাগের ডিরেক্টর স্যার্ টমাস হল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন যে, ছবিগুলি এখানের ছোট ছেলেদের চিত্তরঞ্জক বইতে দেওয়া হইয়াছে কিন্তু উহা এত বিজ্ঞানসম্মত ভাবে অঙ্কিত যে ওগুলি বিলাতি প্রামাণিক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থে স্থান পাইবার যোগ্য। শিশু-কিশোরদের সাহিত্য-জগতে একাধারে লেখক ও চিত্রকর উপেন্দ্রকিশোরের পূর্বে আর কেহ ছিলেন বলিয়া জানা নাই এবং এইরূপ অনুপম ভাষার সহিত অপরূপ চিত্রের যোজনা তাঁহার সমসাময়িক অবনীন্দ্রনাথ এবং পরে তাঁহার পুত্র সুকুমার ও কন্যা সুখলতা করিয়াছেন, অন্য বিশেষ কেহ করিয়াছেন কিনা জানি না।

উপেন্দ্রকিশোর শুধু ছোটদের মনই বুঝিতেন এমন নহে, তিনি বুঝিতেন যে শৈশবে ও কৈশোরে যে স্পৃহা ও যে চেতনা অঙ্কুরিত হয়, পরের জীবনে তাহার বিকাশ সম্ভব। বস্তুতই বাংলা শিশুসাহিত্যের জগতে উপেন্দ্রকিশোরের আবির্ভাব এক স্মরণীয় ঘটনা। আজ আমাদের উপর ক্ষুদ্রত্বের অভিশাপ চলিতেছে, তাই সেই সৌভাগ্যের কথা আমাদের মনে স্থান পায় না।

একজনের লিখিত বিষয়কে চিত্রে রূপ ও আকৃতি দান অন্য আর কাহারও পক্ষে সহজ নয়, কেননা যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার মানসপটে যে ছবি কল্পনার বা চিন্তার সাহায্যে উদিত হইয়াছে তাহা অন্যের মানসপটে প্রতিফলিত করা দুরূহ ব্যাপার। উপেন্দ্রকিশোরের 'সেকালের কথা' যে সকল চিত্রে ভূষিত বা সুকুমার রায়ের উদ্ভট কল্পনা যেভাবে তাঁহার নিজের আঁকা ছবিতে রূপায়িত হইয়াছে তাহা কোনো ভিন্ন ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব ছিল বলিয়া মনে হয় না।

বাল্যকালে দেখা 'সেকালের কথা'র একটি ছবি এখনও আমার মনে জাগিয়া আছে। একটি বিরাটকায় জীব যেন ইডেন গার্ডেনে গাছের

সারির পিছন হইতে ক্রিকেট ম্যাচ দেখিতেছে। মাঠের সীমানার উঁচু ঝাউ গাছের উপর তাহার কাঁধ ও মাথা জাগিয়া আছে। ছবিতে অঙ্কিত জীবটির নাম ছিল বোধ হয় ব্রন্টোসরস এবং তাহার মুখাবয়ব ও বিশাল দেহের বর্ণনা ভাষায় দিয়া উপেন্দ্রকিশোর ঐভাবে চিত্রে তাহা রূপায়িত করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা ও চিত্রণ কিরূপ বিজ্ঞানসম্মত হইয়াছিল সে বিষয়ে হল্যাণ্ড সাহেবের মত পূর্বেই লিখিয়াছি। এই ছবি কি অন্য কেহ আঁকিয়া দিতে পারিত ?

কথা কাহিনী ও বিবৃতিতে একই হাতের লিখন ও আলেখ্য এবং তাহাতে ভাষার ও চিত্রের সমান সার্থকতা ও সাফল্য বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে মাত্র তিন-চার জন দেখাইয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শিশু-সাহিত্যের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ সুন্দরভাবে প্রসারিত ও চিত্রে রূপায়িত করিয়াছেন একমাত্র উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। শুধু শিশুসাহিত্যের ভাষায় নূতন ধারা আনয়নই তাঁহার স্মৃতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু সেই ভাষাকে অনুপম চিত্রসজ্জায় ভূষিত করিয়া তিনি চিরস্মরণীয় হইবার অধিকার পূর্ণরূপে অর্জন করিয়া গিয়াছেন। আমাদের ক্ষণভঙ্গুর স্মৃতি ও চরিত্র এবং কীর্তির মান নিরূপণে বিকার এখন আমাদের অধোগতির পথ প্রশস্ত করিয়া ফেলিতেছে। নইলে বাংলার শিশুসাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোরের স্থাননির্ণয় এত বিস্তারিত ভাবে করিতে হইত না।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভার স্ফুরণ কিন্তু শুধুমাত্র শিশুসাহিত্যে নূতন চেতনা আনিয়া ও নূতন রূপ প্রবর্তন করিয়াই শেষ হয় নাই। তিনি কলাবিদ্ ছিলেন এবং নানাভাবে সংগীতে ও চিত্রশিল্পে তাঁহার প্রতিভার, পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন। এবং তাহার সর্বাপেক্ষা আশ্চর্য পরিচয় তিনি দিয়া গিয়াছেন ফলিত আলোক-বিজ্ঞানের ফটো-টেক্‌নিক শাখার ব্যবহারিক প্রয়োগ বিষয়ে সমীক্ষা-পরীক্ষা গবেষণা ও যান্ত্রিক উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের দ্বারা।

সংগীত সম্বন্ধে স্পৃহা তাঁহার কৈশোরেই আরম্ভ হয়। সংগীত-বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান ও শিক্ষার নিদর্শন আমরা পাই তাঁহার কয়েকটি সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধে যাহা 'সাধনা' ও 'প্রবাসী'-তে প্রকাশিত হয়। সেই সকল প্রবন্ধে আমরা দেখিতে পাই কিভাবে সংগীতসাধনায় তাঁহার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রযুক্ত হইয়াছে। বেহালা ছিল তাঁহার প্রিয় যন্ত্র, যদিও হারমোনিয়াম

ফ্লুট ইত্যাদিতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। হারমোনিয়াম-শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি একটি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন ডোয়ার্কিন অ্যাণ্ড সন্সের দ্বারিকাবাবুর অনুরোধে। কিন্তু পরে তিনি দেখলেন যে হারমোনিয়ামে ভারতীয় সংগীতের অনিষ্ট হইতেছে এবং সেইজন্য তিনি ঐ বইয়ের আর নূতন সংস্করণ ছাপিতে দেন নাই। সংগীতের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তাঁহার আয়ত্ত ছিল এবং পাশ্চাত্য সংগীতের সহিত তাঁহার পরিচয় ঘনিষ্ঠ ছিল।

তিনি বিদেশী প্রথায়, কাঁধে রাখিয়া ও চিবুক দিয়া চাপিয়া ধরিয়া বেহালা বাজাইতেন এবং ছড় ধরিবার ও চালাইবার বিদেশী রীতিই তিনি ব্যবহার করিতেন। ফলে তাঁহার বেহালায় যে দীর্ঘ তান ও সুরের সূক্ষ্ম ধ্বনিভেদ হইত তাহা দেশীপ্রথায় বেহালাকে বাহুলগ্ন করিয়া দ্রুতচালনার উপযোগী করিয়া ছড় ধরিলে সম্ভব হইত না। গানের সহিত তাঁহার বেহালায় সংগত রবীন্দ্রনাথের বিশেষ পছন্দ ছিল। আদিব্রাহ্মসমাজের এগারোই মাঘের সমস্বর গীত-উৎসব সংগীতের সহিত তাঁহার বেহালার সংগত একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

তিনি নিজেও অনেক গান রচনা ও সুর যোজনা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে তাঁহার প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসংগীত 'জাগো পুরবাসী' এখনো মাঘোৎসবের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হইয়া আছে। অন্য আর-একটি গান 'জয় দীনদয়াময়'। এগুলি সুরতাললয়ের সহিত কথার সুন্দর যোগে অনুপম। কণ্ঠসংগীত এবং যন্ত্রসংগীত এই দুই শাখাতেই তাঁহার স্বাভাবিক অধিকার ছিল। উপরন্তু তিনি দীর্ঘদিনের শাস্ত্রসম্মত শিক্ষাদীক্ষার ফলে উহা পূর্ণরূপে আয়ত্ত করেন। তাঁহার স্বভাবগত গুণ ছিল যে কোনো বিষয়ে তাঁহার স্পৃহা বা কৌতূহল জাগ্রত হইলে তিনি তাহাতে গভীর ভাবে অনুশীলন করিতেন।

তাঁহার সংগীতচর্চার আর-একটি দিক আমার বাল্যস্মৃতির সহিত বিজড়িত: শিশু ও কিশোর বালক-বালিকারা ছিল তাঁহার স্নেহ-ভালোবাসার পাত্র। সেইজন্য তাহাদের গান শিক্ষাদানের জন্য সেই সময়ের 'রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ে'র সহিত তিনি গানের ক্লাস খুলিয়াছিলেন এবং পরম ধৈর্য ও যত্নের সহিত ছোটদের সংগীতশিক্ষার কাজ প্রায় একাকী চালাইতেন। ইহাতে তাঁহার সময় ও পরিশ্রমই শুধু ব্যয় হইত না, আর্থিক ব্যয়ও ছিল যন্ত্রপাতির মেরামতে, যাতায়াতে। তিনি ছোটদের আনন্দে এতদূর সন্তুষ্ট হইতেন যে অন্য কিছু লাভের কথা তাঁহার মনে

স্থানও পাইত না। 'রবিবাসরীয় নীতি-বিদ্যালয়ে'র ঐ গানের ক্লাস এমনি আনন্দের ব্যাপার ছিল যে, যদিও আমি তখন পিতার[১] কর্মস্থল এলাহাবাদ হইতে ছুটিছাটায় শুধু কলিকাতায় আসিতে পাইতাম, কিন্তু সেই ছুটির মধ্যে অতি আগ্রহের সহিত সেই ক্লাসে যাইতাম—সামান্য কয়দিনের আনন্দ-লাভের জন্য। বাল্যজীবনে সংগীতের কি প্রভাব, কিভাবে উহা শিশু ও কিশোরের মন-প্রাণ স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন করে, উপেন্দ্রকিশোর তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার শত কাজের মধ্যেও এই গানের ক্লাস চালনার ভার তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজের রচিত গানে নিজেই সুর যোজনা করিয়া ও নিজে গাইয়া তিনি বহু বালকবালিকাকে শিখাইয়াছেন এবং তাহারা তাঁহার বেহালা ও কণ্ঠের সহিত তাহাদের কণ্ঠ মিলাইয়া গান গাহিত। দীর্ঘ ষাট বৎসরের ব্যবধান সত্ত্বেও আজও সে কথা মনে পড়ে।

চিত্রাঙ্কনে তাঁহার স্বভাবজাত ক্ষমতা ছিল। তিনি যখন ময়মনসিংহ জেলা স্কুলের ছাত্র তখন তৎকালীন বাংলার ছোটলাট সার্ এশ্‌লি ইডেন ঐ স্কুল পরিদর্শন করিতে গিয়া বালক উপেন্দ্রকিশোরের খাতায় তাঁহার নিজের ছবি অঙ্কিত দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি উপেন্দ্র-কিশোরকে বলেন, "তুমি ইহারই চর্চায় নিজেকে নিযুক্ত রাখিয়ো"। ছোট-লাটের ক্লাস-পরিদর্শন করিবার সময়েই সেই ছবি বালক উপেন্দ্রকিশোর আঁকিয়া ফেলেন।

দীর্ঘদিনের সাধনালব্ধ কালাকৌশল ও শিল্পজ্ঞান যুক্ত হওয়ায় পরবর্তী জীবনে এই স্বাভাবিক প্রতিভার পূর্ণবিকাশ ঘটে। তিনি পাশ্চাত্ত্য প্রথায় চিত্রাঙ্কনে তৈলযুক্ত রং ও কালিকলম ব্যবহার করিতেন এবং জলের মাধ্যমে বর্ণযোজনায় তিনি কুশলী শিল্পী ছিলেন। চিত্রাঙ্কনের পদ্ধতি রীতি ও কৌশল তাহার সম্পূর্ণ আয়ত্ত হওয়ায় তিনি ইচ্ছামত বা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন মাধ্যম ও প্রথার ব্যবহার করিতেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী তিনি তৈলবর্ণে অঙ্কিত করিতেন। গিরিডির উপবন ও শৈলমালা, পুরীর সমুদ্র ও দার্জিলিং অঞ্চলের হিমালয়ের দৃশ্যের বহু চিত্রণ তিনি করিয়াছিলেন ঐভাবে। অন্যদিকে পুস্তকে বা পত্রিকায় প্রকাশের জন্য, গল্প বা সন্দর্ভের বিষয় সম্পর্কিত ছবি তিনি কালিকলমেই আঁকিতেন বেশির ভাগ। তুলি ও জলরঙ্ দিয়া নানা বর্ণে ঐরকম কিছু ছবি আঁকিয়া দিতেন। যেমন অন্যান্য বিষয়ে তেমনি

১। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রাঙ্কনেও তিনি তাঁহার কাজ পারিপাটি ও সর্বাঙ্গসুন্দর করিতে সর্বদাই চেষ্টিত ছিলেন।

লেখার বিষয়বস্তু বা প্রাকৃতিক দৃশ্যের বাইরেও তাঁহার শিল্পীমন বিচরণ করিত। অনেকগুলি পৌরাণিক ঘটনা ইত্যাদির দৃশ্য ও প্রাচীন ইতিকথার চরিত্র তিনি জলরঙের মাধ্যমে আঁকিয়াছিলেন। এইগুলি আঁকিবার কার্যরীতি (টেকনিক) বিদেশী ছিল বলা যায়, কেননা তাঁহার দৃশ্যাবলীতে পরিপ্রেক্ষিত (prespective) এবং মনুষ্য জীবজন্তুর শরীরসংস্থান ও শারীরিক অনুপাত বিদেশী চিত্রাঙ্কনের রীতি অনুযায়ী ও যথাযথ হইত। কিন্তু ঐসকল চিত্রাঙ্কনে তিনি বিদেশী প্রথামত জীবন্ত নরনারীকে সাজাইয়া ও মডেল রূপে দাঁড় করাইয়া তাহা দেখিয়া আঁকিতেন না। সেইজন্য তাঁহার এই জাতীয় চিত্রে কোনো বাস্তবের প্রতিকৃতি বা প্রতিরূপ থাকিত না, থাকিত শিল্পীমানস-কল্পিত চিত্রের দৃশ্যমান রূপায়ণ। এবং সেই রূপায়ণে শিল্পী কি ভাবের বশে চিত্রাঙ্কণ করিয়াছেন ও চিত্রে কি রসের নিবেদন করিতে চাহিয়াছেন তাহাও উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত হইত।

যে সময়ে তিনি এইসকল ছবি আঁকিতেছেন ঠিক সেই সময়েই শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ শক্তিমান কলাশিল্পীগণ প্রাচীন ভারতীয় চিত্রকলার ধারাকে পুনরুজ্জীবিত ও প্রতিষ্ঠিত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের সমর্থকবৃন্দের মধ্যে কয়েকজন অযথা ও অকারণ উপেন্দ্রকিশোরের ঐসকল চিত্রকে 'আড়ষ্ট ছবি' 'বিদেশীর অনুকরণে অঙ্কিত মেকী' ইত্যাদি বলায় তাঁহার এই জাতীয় চিত্রের প্রকাশ ও সমাদর হইতে পারে নাই। সেই সময়ে প্রাচীনপন্থী ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুত্থানের স্রোত বহিতেছে, এবং সেই প্রবাহেই উহার বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের উচ্ছ্বাস চলিতেছে। অন্যদিকে সমর্থকদিগের ছিল সুগভীর ললিতকলা বিষয়ক জ্ঞান ও পরিমার্জিত রুচি-জ্ঞাপক ভাষার উপর দখল; ফলে নিন্দুকের দল ক্রমেই হটিয়া যাইতে থাকেন।

আমার পিতৃদেব ছিলেন ভারতীয় চিত্রকলার সমর্থক। তাঁহার দুই পত্রিকার[২] শক্তিশালী সমর্থন ভারতীয় চিত্রকলার পুনরুত্থানে কিরূপ সবল ও সক্ষম সহায়তা করিয়াছে তাহা সর্বজনবিদিত। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন ভারতীয় চিত্রকলা ঐরূপে প্রবল বিতর্কের আবর্তে পড়িয়াছে। সেই

২ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ'।

কারণে তখন ঐ দুই পত্রিকার সকল শক্তি নিয়োজিত হয় তাহারই সমর্থনে। উপেন্দ্রকিশোরের বিশুদ্ধ চিত্রকলার ক্ষেত্রে প্রয়াস সেইজন্য সেখানেও সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয়। উপেন্দ্রকিশোর নিজে ছিলেন সুরুচি ও শালীনত্বের আধার এবং আত্মবিজ্ঞপ্তির বিরোধী। তিনি তাঁহার শিল্পজ্ঞান ও শিল্প-কার্যের উপর আক্রমণ যথাযথ না হওয়ায় কোনো বাদানুবাদের মধ্যে যান নাই। শুনিয়াছি, এই বিষয়ে তাঁহাকে প্রশ্ন করায় তিনি মৃদু হাস্যের সহিত বলেন যে, ললিতকলার ক্ষেত্র সুদূরপ্রসারিত এবং সীমানাবিহীন। আজ যাহাকে আমরা এই দেশী বলিতেছি অতীতের বিদেশী কলাশিল্পের নিদর্শনের সহিত তাহার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়—যদিও ইতিহাস অসম্পূর্ণ বলিয়া ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক খুঁজিয়া দেখা সম্ভব এখনও হয় নাই। সেই সঙ্গে তিনি বলেন যে, ললিতকলার ক্ষেত্রে এই দেশে বিচার ও বিতর্ক যথাযথভাবে চালিত হইতেছে না। তাহা হইলে এতটা উষ্মার, এইরূপ সাচ্চা-ঝুটা প্রকৃত-বিকৃত লইয়া তর্কের ও তীব্র বাদবিতণ্ডার সৃষ্টি হইত না।

উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা ললিতকলার ক্ষেত্রে কিরূপে স্ফুরিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য। তাঁহার শিল্পসৃষ্টি লইয়া যুক্তিতর্কের অবতারণা করা আমার অভিপ্রায় নয়। সুতরাং আমি উপেন্দ্র-কিশোরের চিত্রকলা সম্পর্কে এই কথা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব যে, যদি শিল্পীর শিল্পচেতনার প্রকাশ এবং তাঁহার শিল্পীমানসে কল্পনার প্রসারের প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁহার চিত্রে পূর্ণরূপে পাওয়া যায় তবে সেই শিল্পীর ললিতকলার ক্ষেত্রে অধিকার আছে। এই কথা আমি জানিয়াছি দীর্ঘদিনের অধ্যয়ন ও বহু বিশেষজ্ঞের মতামত শুনিবার ফলে। উপেন্দ্রকিশোরের অঙ্কিত কয়েকটি চিত্র যথা 'বলরামের দেহত্যাগ' তাঁহার ঐ অধিকারের যথার্থ পরিচয় দিয়াছে বলিয়া মনে করি।

যাঁহারা অজন্তা গুহা-চিত্রাবলীর মধ্যে ভারতীয় চিত্রকলার এক পর্যায়ের নয় শত বৎসরব্যাপী ইতিহাস যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন তাঁহারা জানেন যে চিত্রে পরিপ্রেক্ষিতের উপস্থাপন ভারতীয় চিত্রকলার ধর্ম বা রীতি-বিরোধী নহে। অজন্তার সপ্তদশ গুহায় সপ্তম শতকের ভারতীয় চিত্রশিল্পীর পরিপ্রেক্ষিত ব্যবহার সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায়। মুখাবয়ব ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপের অনুপাত এবং তাহাদের সংস্থান সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

তাহার পর আসে উপেন্দ্রকিশোরের ফলিত আলোক-বিজ্ঞানের ফোটো-টেকনিক শাখার ব্যবহার প্রয়াস বিষয়ে গবেষণা ও আবিষ্কারের কথা। এই সাধনার আরম্ভ হয় ১৮৯১ সালে এবং উহা চলিতে থাকে ১৯১২-১৩ সাল পর্যন্ত। তাহার পর রোগের প্রকোপে শরীর ক্ষীণ হওয়ায় তিনি ঐ দিকে আর মনোনিয়োগ করিতে সমর্থ ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার ঐ সাধনার ফলে বহু বাঙালির তথা ভারতীয়ের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে কর্মসংস্থান আজ হইতেছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ ইউ রায় অ্যাণ্ড সন্স সারা ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান রূপে পরিচিত হয় এবং সেখানে তাঁহার ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র সুকুমার রায়ের নিকটে যান্ত্রিক ও ব্যবহারিক শিক্ষা লাভের ফলে বহু সুনিপুণ ও দক্ষ প্রোসেস-শিল্পী পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ব্যবসায়ে নানা প্রকার বিপর্যয় ঘটার ফলে ইউ. রায়, কোম্পানী উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের প্রসাদে শিক্ষাদীক্ষা ও ব্যবহারিক প্রয়োগজ্ঞান অর্জনের ফলে যাঁহারা প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা আজও এই বিষয়ে সারা ভারতে অগ্রণী হইয়া বর্তমান আছেন।

এই বিষয়ে তাঁহার চিন্তা নিবদ্ধ হয় ছেলেদের জন্য লিখিত তাঁহার গল্পের ও প্রবন্ধের ছবি জঘন্যভাবে পুস্তকে ও পত্রিকায় মুদ্রিত হয় দেখিয়া। তিনি যে কাজে মন দিতেন তাহাতে বাধা-বিঘ্ন কি আছে তাহা ভাবিয়া নিরুৎসাহ হওয়া তাঁহার স্বভাবে ছিল না। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি অসীম ধৈর্য এবং অতি সূক্ষ্ম সমীক্ষণক্ষমতা ছিল তাঁহার চরিত্রের ভূষণ এবং উপরন্তু ছিল দীর্ঘদিনের অধ্যয়নে অর্জিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও উচ্চস্তরের গণিতে গভীর ব্যুৎপত্তি। সুতরাং ১৮৯৫ সালে হাফ্‌টোন ও লাইন ব্লক করিবার যন্ত্রপাতি আনিবার পর যখন তিনি দেখিলেন যে তাহার দ্বারা তাঁহার মনোমত উৎকৃষ্ট ছাপিবার ব্লক প্রস্তুত করা যাইতেছে না তখন তাহার উন্নয়নে তিনি লাগিয়া গেলেন অশেষ উদ্যম ও উৎসাহের সহিত।

তখনকার দিনে হাফটোন প্রথায় ব্লক প্রস্তুত করা ছিল অতি প্রারম্ভিক পর্যায়ে। অতি অল্প লোকেই উহার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন। তবে পাশ্চাত্ত্য দেশের রীতি অনুযায়ী ঐ বিষয়ে গবেষণা পরীক্ষা ও সমীক্ষা বিশেষজ্ঞরা সমানে করিতেছিলেন। এবং ঐরূপ অবস্থায় যে রূপ হয়, সেইমত যে-যাহার মতবাদ (theory) চালাইয়া মহা বিভ্রান্তির সৃষ্টিই করিতেছিলেন। হাফটোন প্রতিচ্ছবির রহস্য তাহাতে প্রায় প্রহেলিকায়

দাঁড়ায়। কর্মশালায় হাফটোন-যন্ত্রপাতির ব্যবহার ছিল স্থূল নির্দেশ অনুযায়ী এবং তাহার ফলাফলের স্থিরতাও ছিল না কিছুমাত্রও। এই দেশে সবেমাত্র ঐ পথে কাজ আরম্ভ হইয়াছে! শিক্ষক বলিতে কেহ ছিল না। কারিগর কপাল ঠুকিয়া ছাপার অক্ষরে প্রদত্ত মামুলি নির্দেশ চালাইতে চেষ্টা করিত। ভুলভ্রান্তি সংশোধনের জন্য পরীক্ষাগারই ছিল না সারা এশিয়া ভূমিখণ্ডে, গবেষণাগার তো সবে মাত্র এতদিন পরে কয়েক বৎসর পূর্বে এই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোর কিন্তু দমিবার পাত্র ছিলেন না। তাঁহার ধীশক্তি ইহাতে নিযুক্ত করিয়া, বহু অর্থব্যয়ে, অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া অসীম ধৈর্য ও অপ্রতিহত শক্তির সহিত তিনি তাঁহার গবেষণা ও সমীক্ষা চালাইতে থাকিলেন। সেই গবেষণা ও পরীক্ষা-নীরীক্ষা কি উচ্চস্তরের ছিল তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে নিম্নে উদ্ধৃত কয়েকটি মন্তব্যে, যাহা বিভিন্ন জগদ্বিখ্যাত পত্রিকায় সে সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাঁহার হাফটোন বিষয়ে গবেষণার প্রসঙ্গে ১৯০৪-৫ সালের Penrose Annual সম্পাদকীয় মন্তব্যে উপেন্দ্রকিশোরের "classical pen"—অর্থাৎ অতি উচ্চশ্রেণীর লেখা—উল্লেখ করিয়া বলেন—

"মি. রায় যে গণিতমুখী চিন্তাধারার অধিকারী তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি আশ্চর্যভাবে সাফল্যের সহিত নিজের চিন্তাশক্তির প্রয়োগে হাফটোন-প্রক্রিয়ার সমস্যাগুলির পূরণ করিয়া লইয়াছেন। যাঁহাদের কাছে Process Work পত্রিকার পূর্বেকার খণ্ডগুলি আছে তাঁহারা উহার লিখিত প্রবন্ধাবলী পুনর্বার পাঠে লাভবান হইবেন। বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কোনো প্রোসেস কাজ আরো প্রণিধান যোগ্য হইয়াছে।"

বিখ্যাত ফোটো বৈজ্ঞানিক উইলিয়ম গ্যাম্বল (William Gamble F. R. P. S.) তাঁহার Process Year Book বার্ষিকীতে মুদ্রিত 'A Wonderful Process' নামক প্রবন্ধে ঐ প্রোসেস কার্যপন্থা ও প্রক্রিয়া সংক্রান্ত গবেষণা ও অনুসন্ধানকারীদিগের মধ্যে ইউ. রায়কে উচ্চতম শ্রেণীভুক্ত করিয়া বলেন "investigators of the highest eminence, amongst whom I may mention...U. Ray of Calcutta, whose admirable articles in the Year Book have shown not only a

clear grasp of the subject but have suggested new methods of work."

Process work and Electro-typing নামক প্রসিদ্ধ পত্রিকা তাঁহার উদ্ভাবিত কার্যপন্থাগুলির অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া বলেন, "Mr. U. Roy of Calcutta is far ahead of European and American workers in originality, which is all the more surprising when we consider how far he is from the hub-centres of process work."

তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ বিলাতের ফোটোটেক্‌নিক বিষয়ক শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি সাগ্রহে ছাপিত এবং সেই প্রবন্ধগুলি তখনকার দিনে সারা জগতে তাঁহার খ্যাতি ছড়ায়। গ্যাম্‌বল লিখিয়াছেন যে. তিনি জগতের সকল দেশ হইতে ইউ রায়ের কাজ সম্বন্ধে উৎসুক লোকের প্রশ্নপূর্ণ পত্র ক্রমাগতই পাইতেছেন। বিলাতের পুস্তক ও পত্রিকা ছাড়াও ফ্রান্সের Le Procede (Paris) এবং মার্কিন দেশের The Inland Printer ইত্যাদি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁহার কাজের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। হাফ্‌টোন জাতীয় কাজে বর্তমান উন্নতি বহুলাংশে তাঁহারই নির্দেশ অনুযায়ী হইয়াছে এবং কার্যপ্রকরণে তাঁহার প্রস্তাবিত পন্থাগুলি হইতে অনেক কিছু পাওয়া হইয়াছে।

উপেন্দ্রকিশোর জন্মগ্রহণ করেন সুপণ্ডিত ও সাধকদিগের বংশে। তাঁহার পিতামহ সাধক ও সুপণ্ডিত লোকনাথ রায় অল্পবয়সেই সংসারাসক্তির বন্ধনমুক্ত হইয়াছিলেন। তন্ত্রোক্ত শক্তিসাধনায় তিনি এইরূপ নিবিষ্ট হইয়াছিলেন যে তাঁহার পিতা পুত্রের সংসারত্যাগের আশঙ্কায় নর-কঙ্কাল ডামর গ্রন্থ মহাশঙ্খমালা প্রভৃতি সাধনের উপকরণ ব্রহ্মপুত্রে বিসর্জন দেন। এই শোকে লোকনাথ তিন দিনের মধ্যে দেহত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স বত্রিশ বৎসর মাত্র। লোকনাথের পুত্র কাশীনাথ রায় সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। লোকসমাজে মুন্সী শ্যামসুন্দর নামে তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি উদার তেজস্বী ও স্বাধীনচেতা পুরুষ ছিলেন; শ্যামসুন্দরের প্রথম পুত্র সারদারঞ্জন পরে কলিকাতা মেট্রোপলিটন (অধুনা বিদ্যাসাগর) কলেজের অধ্যক্ষ এবং ক্রিকেট খেলার গুরু হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন। দ্বিতীয় পুত্র কামদারঞ্জন পাঁচ বৎসর বয়সে তাঁহার খুল্লতাত ময়মনসিংহের প্রসিদ্ধ উকিল ও জমিদার হরিকিশোর রায়চৌধুরী

কর্তৃক দত্তকপুত্ররূপে গৃহীত হন এবং তাঁহার নূতন নামকরণ হয় উপেন্দ্রকিশোর।

উপেন্দ্রকিশোর বাল্যকাল হইতেই সংগীত ও কলাশিল্পে অনুরাগী ছিলেন। নিজে নিজেই বাঁশি ও বেহালা শিখিয়াছিলেন এবং সুরস্বরের প্রভেদ সূক্ষ্মভাবে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিতেন। ময়মনসিংহ জেলা স্কুলে পড়িবার সময় তাঁহার আঁকা নিজ প্রতিকৃতি দেখিয়া সার্ এশ্লি ইডেন কি ভাবে মোহিত হইয়াছিলেন সে কথা পূর্বেই বলিয়াছি। স্কুলে পড়িবার সময় একজন বেহালাবাদকের যন্ত্রে একটি সুন্দর গৎ শুনিয়া বাড়িতে আসিয়া তাঁহাদের একজন পুরাতন ভৃত্যকে বলেন, 'গুনীদা, তুমি এখনই একটা বেহালা আমার জন্য কিনিয়া আনো। দেরী করিলে ভুলিয়া যাইব'।

পরবর্তী জীবনে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় এই বিদেশী বাদ্যযন্ত্রকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করায় প্রযুক্ত হয়। তিনি যে কাজে মনোনিবেশ করিতেন তাহার অভিনবতম দেশীবিদেশী রীতি পদ্ধতি ও তথ্যাদি গভীরভাবে অনুশীলন করাই তাঁহার স্বভাব ছিল এবং সংগীতে ও শিল্পেও সেই পথে তিনি অগ্রসর হইয়াছিলেন। ছাত্র অবস্থায় এই কারণে স্কুলপাঠ্য পুস্তকাদিতে প্রথম দিকে সেইরূপ মনোযোগ না দিয়া চিত্রাঙ্কন ও গীতবাদ্যের চর্চাই বেশী করিয়াছিলেন। কিন্তু অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ও মেধা থাকায় ক্লাসে উচ্চস্থান অধিকার করিতেন। স্কুলের একজন সহৃদয় শিক্ষক শরৎচন্দ্র রায় উপেন্দ্রকিশোরের প্রতিভা চরিত্র ও কলাবিদ্যায় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় স্নেহশীল ছিলেন। যখন উপেন্দ্রকিশোরের প্রবেশিকা পরীক্ষা আসন্ন তখনও পড়াশুনায় তাঁহার ঝোঁক নাই দেখিয়া শরৎবাবু প্রধানশিক্ষক রতনমণি গুপ্তের শরণাপন্ন হইলেন। প্রধানশিক্ষক উপেন্দ্রকিশোরকে ডাকাইয়া বলিলেন, "তোমার উপর আমরা অনেক আশা রাখিয়াছি; দেখিয়ো তুমি যেন আমাদের নিরাশ করিয়ো না।" উপেন্দ্রকিশোর সেই দিনই সাধের বেহালা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া পড়াশুনায় মন দিলেন এবং যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৫৲ টাকা বৃত্তি পাইলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে এবং পরে মেট্রোপলিটন কলেজে পড়েন। মেট্রোপলিটন কলেজ হইতেই ১৮৮৪ সালে তিনি বি. এ. পাস করেন।

তাঁহার স্কুলের শিক্ষক শরৎচন্দ্র রায় ব্রাহ্ম ছিলেন এবং তাঁহার সংস্পর্শে

আসিয়াই উপেন্দ্রকিশোর বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কলিকাতায় আসিবার কয়েক বৎসর পরে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। এ কারণে তাঁহাকে অনেক অত্যাচার ও শাসন-উৎপীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার প্রশান্তচিত্ত ও সহজ সুমিষ্ট ব্যবহারেই জয় হইল। তাঁহার সহিত আত্মীয় স্বজনদের বিচ্ছেদ হইল না। উপেন্দ্রকিশোরেরা পাঁচ ভাই। তাহার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ সারদারঞ্জন ও তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিদারঞ্জন ভিন্ন অন্য তিনজন এবং ভগ্নীপতি হেমেন্দ্রমোহন বসু (বিখ্যাত এইচ. বোস) ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করিবার কিছুদিন পরেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা ও মহিলাপ্রগতির কাজে খ্যাতনামা ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা বিধুমুখীকে বিবাহ করেন—বোধ হয় ১৮৮৫ সালে। তাঁহার তিন পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠা সুখলতা ও মধ্যমা পুণ্যলতা লেখিকারূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। সুখলতা চিত্রকলায়ও কুশলী। পুত্রদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুকুমার রায় শিশু সাহিত্যে অক্ষয়কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। দ্বিতীয় পুত্র সুবিনয়ও শিশুসাহিত্যে সুলেখক বলিয়া পরিচিত, প্রোসেস কাজেও তাঁহার অসাধারণ দখল ছিল।

উপেন্দ্রকিশোরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সারদারঞ্জন অধ্যাপক পণ্ডিত ও ক্রিকেট খেলায় উৎসাহী বলিয়া খ্যাত ছিলেন। তৃতীয় ভ্রাতা মুক্তিদারঞ্জন সুরসিক ও সুলেখক ছিলেন এবং ক্রিকেট ও ফুটবল (টাউন ক্লাব) নাম করিয়াছিলেন। চতুর্থ ভ্রাতা কুলদারঞ্জনের কৃত ইংরাজি কিশোর-সাহিত্যের ও প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক সার্ আর্থার কনান ডয়েলের পুস্তকগুলির অনুবাদ এককালে বাংলার ছেলেবুড়োদের সকলেরই প্রিয় ছিল। ক্রিকেট-খেলোয়াড় হিসাবে (নাটোর টিম) ইনিই ভাইদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। ফটোগ্রাফি ও সংগীতেও ইহার নৈপুণ্য ছিল। সর্বকনিষ্ঠ প্রমদারঞ্জন লেখক ও ক্রিকেট-খেলোয়াড় হিসাবে কিছু নাম করিয়াছিলেন, কিন্তু সার্ভেয়ার (জরীপ-পরিচালক) হিসাবে সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী উত্তর-পূর্ব অঞ্চল (বর্তমান নেফা) ও আরাকান-ব্রহ্ম সীমান্তের জরীপে কর্ম-জীবনের অধিকাংশ সময় কাটাইতে হইয়াছিল। উপেন্দ্রকিশোরও ক্রিকেট খেলায় ভক্ত ও দক্ষ ছিলেন। আমরা বাল্যে তাঁহার ক্রিকেট (ব্যাটম-বল) খেলার বিবরণ ও প্রশংসা শুনিয়াছি।

সত্যসত্যই লোকনাথ রায় ও মুন্সী শ্যামসুন্দরের বংশধরেরা পিতৃকুল আলোকিত করিয়াছিলেন।

সবশেষে উপেন্দ্রকিশোরের সেই ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়া শেষ করি—যাহা আমার বাল্য ও কৈশোরের স্মৃতির সহিত বিজড়িত। মনে পড়ে, সেই দীর্ঘকায় কবাটবক্ষ দেহের ও গুম্ফশ্মশ্রুবহুল এবং আয়তনেত্রযুক্ত সুগঠিত মুখাবয়বের কথা। মনে পড়ে, সেই চিন্তাশীল গাম্ভীর্যমণ্ডিত সুন্দর মুখের প্রশান্ত গভীর দৃষ্টি কিভাবে স্নেহালোকে উচ্ছ্বসিত হইত আমাদের মত বালকবালিকা ও কিশোরদের সহিত কথাবার্তার সময়। পরবর্তী জীবনে বুঝিয়াছি যে, আশ্চর্য প্রশান্ত ও স্থির দৃষ্টি তাঁহাদেরই ভূষণ যাঁহাদের অন্তর শুচি, চরিত্র ও হৃদয় নির্মল। উপরন্তু উপেন্দ্রকিশোরের স্বভাব ছিল ধর্মবুদ্ধি ও ধৈর্য সম্পন্ন। বড় হইবার পর তাঁহার সমসাময়িকদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পরিচয় পাইয়াছি তাঁহার প্রশস্ত চিত্ত অমায়িক ও শিষ্টাচার ভূষিত প্রকৃতির প্রশংসাবাদের মধ্যে।

তিনি সেই যুগে—যখন সভ্যজগৎ 'আমাদের অসভ্য বর্বর বলিয়া জানিত'—সারা জগতে খ্যাতি ও স্বীকৃতি পাইয়াছিলেন পাশ্চাত্য জ্ঞানী আলোকতত্ত্ববিদ্‌গণের নিকটে, অথচ তিনি তাঁহার শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন অহংকারশূন্য ও নিরভিমান। সত্যনিষ্ঠা ছিল তাঁহার চরিত্রের অলংকার, তাঁহার মন ছিল শিশুর মত সরল ও স্নিগ্ধ। জ্ঞান-অর্জনের জন্য তিনি একাগ্রচিত্তে কঠোর পরিশ্রম করিতেন, যাহার ফলে তিনি দুরারোগ্য ডায়াবিটিস রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ৪ঠা পৌষ ১৩২২ সালে গিরিডিতে ৫২ বৎসর বয়সেই সেই অমূল্য জীবনের শেষ হয়। যাত্রার আরম্ভ হইয়াছিল ময়মনসিংহের মসুয়া গ্রামে ২৮শে বৈশাখ ১২৭০ সালে।

স্বামীবিবেকানন্দ ১৮৬৩-১৯০২

স্বামীবিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তা

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তার আলোচনার অর্থ স্বামীজীর প্রায় সকল চিন্তার আলোচনা করা, কারণ ভারতবর্ষ বিবেকানন্দের ধ্যান ও ধারণা উভয়েরই বিষয়। তিনি তাঁর সমস্ত ভাবনা ও অনুভূতির মূল উৎসরূপে এই ভারতকেই ধরেছিলেন। বিবেকানন্দই ভারতবর্ষ—একথা বহুকণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। বহু মানুষই অনুভব করেছেন, ভারতবর্ষ তার অতীত ও বর্তমানের সাধনা-বেদনা নিয়ে বিবেকানন্দের মধ্যে সর্বাধিক প্রকাশিত।

তবু একটা সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে বিবেকানন্দের স্বদেশচিন্তাকে প্রকাশ করতে হবে, যে চিন্তা ও অনুভূতি সম্বন্ধে ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের দেশনায়ক অরবিন্দ ঘোষ বলেছিলেন, তা এখনো সম্পূর্ণ উপলব্ধ বা কার্যকর হয়ে ওঠেনি, এবং তারও চুয়ান্ন বছর পরে আধুনিক দেশনায়ক পণ্ডিত জহরলাল বললেন,—আশ্চর্য, সেগুলি এখনো নূতন।

স্বামীজীর স্বদেশচিন্তার আলোচনায় তাঁর মূল বাংলা রচনাগুলির উপর আমাকে নির্ভর করতে বলা হয়েছে। এই সব মূল বাংলা রচনার দ্বারাই স্বামীজী বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত। এখানে একটি কথা জানানো উচিত, স্বামীজীর ভাষণ ও রচনার যেসব অনুবাদ স্বামী শুদ্ধানন্দ করেছিলেন, সেগুলি, গত ৫০।৬০ বৎসর ধরে বহুভাবে পঠিত হয়ে এসে মূলের মর্যাদায় বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে। 'কর্মযোগ' বা 'ভারতে-বিবেকানন্দকে' অনুবাদ বলে কে ভাবে? ইতিহাসবোধসম্পন্ন কোন্ বাঙালী জাতীয় চিত্তে এই সব গ্রন্থের বিপুল প্রভাবকে অস্বীকার করবেন? বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী শুদ্ধানন্দ উল্লেখযোগ্য মর্যাদার অধিকারী।

আলোচনার জন্য পরিমাণে অল্প স্বামীজীর নিজস্ব বাংলা রচনার উপর নির্ভর করলে আমার সুবিধা হয় তাতে আলোচ্য বস্তুর পরিমাণ কমে। 'পরিব্রাজক', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য', 'ভাববার কথা', 'বর্তমান ভারত', পত্রাবলীর বাংলা চিঠি এবং বীরবাণীর কয়েকটি বাংলা কবিতা—সন্ন্যাসের পরে স্বামীজীর বাংলা রচনা। এর সঙ্গে যোগ করে দেওয়া যায় দু'খণ্ডে স্বামী-

শিষ্য-সংবাদ, যাতে স্বামীজীর বাংলায় কথোপকথন বাংলা ভাষাতে রক্ষা করবার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও সঙ্কলক স্বামীজীর বাগ্‌রীতি রক্ষণের ব্যাপারে কতখানি সাফল্যলাভ করেছেন জানি না।

স্বামীজীর বাংলা রচনার পরিমাণ তাঁর 'বাণী ও রচনার' এক অষ্টমাংশেরও কম।

তাহলেও মূল বাংলা রচনায় নিবদ্ধ তাঁর স্বদেশচিন্তার পূর্ণাঙ্গ রূপ এক প্রবন্ধে উপস্থিত করা আমার সাধ্যাতীত। স্বামীজী এমন সংক্ষেপে, সংহত আকারে বলতে বা লিখতে পারতেন, এত অল্প পরিসরে এত বেশী বক্তব্য উপস্থিত করতেন যে, সে কথা গুলিকে সামান্য ব্যাখ্যসহ উপস্থিত করলেই ব্যাপারটা বিপুল হয়ে দাঁড়ায়। আমি তাই বিশেষ আলোচনার জন্য তাঁর ক্ষুদ্রতম পুস্তক 'বর্তমান ভারতকে' নেব। তার আগে তাঁর দেশচিন্তার পরিধি সম্বন্ধে একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

স্বদেশ বলতে বিবেকানন্দের কাছে বলাই বাহুল্য মাটি বোঝাত না, বোঝাত মানুষ। কিন্তু মাটিও বোঝাত। 'ভারতের ধূলিকণা পর্যন্ত আমার কাছে পবিত্র'—একথা বলবার সময়ে তিনি নিশ্চয় আবেগ-আপ্লুত পৌত্তলিকের তুল্য ধূলিশায়ী ছিলেন, কিন্তু তথাপি কথাটা যে বলেছিলেন তার কারণ, বিবেকানন্দ জানতেন, মানুষের উপরে প্রকৃতির প্রভাব অল্প নয়। ভারতের মাটি ভারতের প্রতিভাকে উপযুক্ত উন্মোচনের পরিবেশ দিয়েছে। দেহজীবী একজন মিস্ মেয়ো যেখানে শ্বাস টেনে নর্দমার গন্ধ পেয়েছেন (কথাটা গান্ধীজী আমাদের শিখিয়েছেন), সেখানে বিবেকানন্দ পেয়েছেন নন্দনগন্ধ।

কিন্তু এক সময়ে মিস্ মেয়োর ঘৃণার দৃষ্টি ও বিবেকানন্দের প্রেমের দৃষ্টি এক হয়ে গিয়েছিল। তখন বিবেকানন্দের কাছেও ভারতভূমি থেকে মৃতদেহের শ্মশানগন্ধ ভেসে আসছিল।

বিবেকানন্দের আহত পৌরুষ গর্জন করে উঠল—ভারতবর্ষ একদা বড় ছিল—সে এখন বড় নয়—কিন্তু সে বড় হবে ভবিষ্যতে, যে কোনো সীমা ছাড়িয়ে।

কে বড় করবে?—কেন বিবেকানন্দ করবেন।—'আমি যদি না পারি', বিবেকানন্দ বললেন, 'ভবিষ্যতে আমার থেকেও বড় কেউ এসে সে ভার নেবে।' কিন্তু ভারতবর্ষ বড় হবেই।

দেহত্যাগের দিন স্বামীজী বলেছিলেন, 'যদি আর একজন বিবেকানন্দ থাকত, সে বুঝত বিবেকানন্দ কি করে গেল।' যিনি বলেছিলেন, তিনি জানতেন, আর একজন বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে নেই। এ পর্যন্ত তাঁর আত্মবোধের অহং। তারপরেই বৈদান্তিক বিবেকানন্দ বললেন, 'কিন্তু কালে কত বিবেকানন্দ হবে!' অর্থাৎ আত্মদ্রষ্টা বিবেকানন্দের কাছে 'বিবেকানন্দ' নিশ্চয় মানবাত্মার একটা বড় প্রকাশ, কিন্তু সেই মানব-প্রকাশকেই চরম বলবার মূঢ়তা কখনো তিনি দেখাতে পারেন? অতএব 'কালে কত বিবেকানন্দ হবে।' বুদ্ধকে নমস্কার জানিয়ে এই বুদ্ধশিষ্য একদা বুদ্ধের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছিলেন—'বুদ্ধত্ব একটা অবস্থামাত্র, তোমরা সকলেই বুদ্ধ হতে পার।' এবং এই বুদ্ধই বিবেকানন্দের কণ্ঠে আবির্ভূত হয়ে উচ্চারণ করেছিলেন মানবমহিমার মহত্তম বাণী—

"The Christs and Buddhas are but waves on the boundless ocean which I Am.'

বিবেকানন্দের মানবচিন্তা বা বিশ্বচিন্তার এই চরম রূপ। একই পট-ভূমিকায় দেখতে হবে তাঁর ভারতচিন্তাকে। ভারত মহান এই চিন্তার ধাত্রীভূমি বলে।

ভারতের উত্থান বলতে স্বামীজী জাগতিক থেকে পারমার্থিক পর্যন্ত সর্বাত্মক উত্থান বুঝতেন। যুগপ্রয়োজনে তাঁকে জাগতিক উত্থানের কথাই বেশী বলতে হয়েছে; নিজেকে ভাল না বাসলে নিজের ভিতরের ভগবানকে ভালবাসা কঠিন। নিজেকে ভালবাসার অর্থ ভোগ। স্বামীজী বলতেন, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না।—ভিখারীর আবার দান! ইন্দ্রিয়হীনের আবার ইন্দ্রিয়-সংযম।

ভারতের সমস্যা কোনগুলি? স্বামীজীর জিজ্ঞাসা—কোনগুলি নয়? কি আছে দেশে—অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা না চরিত্র?

বিবেকানন্দ সমস্যাগুলির মূলে নাড়া দিলেন।

(ক) অন্নবস্ত্রাদি সমস্যা। প্রশ্নটা দেশের অর্থনৈতিক মানোন্নয়নের। সে মনোন্নয়ন হতে পারে শিল্পের উন্নতিতে ও বাণিজ্যের প্রসারে। তার সঙ্গে কৃষির উন্নতি তো আছেই। স্বামীজীর চোখের সামনে যে ইতিহাস পড়েছিল, তাতে আছে, বাণিজ্যের মারফৎ এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তার করেছে।

প্রাচীন ভারতের শিল্প ছিল গৃহজাত। এখন সেই কুটীরশিল্পের দিন গত। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের ২০।৩০ বছর পরেও কুটীরশিল্পের মহিমা নিয়ে ভারতের রাজনৈতিক জগতে মারামারি হয়েছে। বিবেকানন্দও সচেতন ছিলেন যান্ত্রিকতার অভিশাপ সম্বন্ধে। কিন্তু ভারতকে বিশ্বছাড়া করবার ইচ্ছা ছিল না তাঁর। তিনি দেখলেন, যন্ত্রশিল্পের উন্নতি ভিন্ন ভারতের আর্থিক অবস্থার উন্নতি নেই। পাশ্চাত্ত্য মিশনারীদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, তাঁরা ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষগ্রস্তদের কাছে গিয়ে (যে দুর্ভিক্ষ আবার উক্ত মিশনারীদের স্বধর্মাবলম্বীদের সৃষ্টি) নগদ দেড় টাকায় একটি টাটকা ক্রীশ্চান কিনেছেন, কিন্তু ঐ হীদেনদের দেশের শিল্পসমৃদ্ধির জন্য কিছু করেননি। বিবেকানন্দের আমেরিকা যাবার প্রাথমিক উদ্দেশ্য, সে দেশে শিল্পশিক্ষা করা। আমেরিকার পথে জাহাজে জামসেদজী টাটার সঙ্গে আলোচনাকালে স্বামীজী শিল্পশিক্ষাদানে সমর্থ সন্ন্যাসী-সংঘ গঠনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, তদনুযায়ী পরবর্তীকালে জামসেদজী টাটা যখন বিজ্ঞানমন্দির প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তখন স্বামীজীর কাছে এ ব্যাপারে নেতৃত্ব নেবার আবেদন জানিয়েছিলেন। টাটার লেখা সে পত্রটি স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে মুদ্রিত আছে।

আমেরিকাতে পৌঁছেই ধর্মমহাসভায় যোগদানের পূর্বে, স্বামীজী ভারতের এই শিল্পপ্রয়োজন সম্বন্ধে কি বলেছিলেন, তার কিছু নমুনা দেওয়া যায়—

"He spoke at some length or the condition of his people and their religion····· He said, the missionaries had fine theories······but had done nothing for the industrial condition of the people."

"The speaker explained his mission in his country to organize monks for industrial purposes, that they might give the people the benefit of this industrial education and thus elevate them and improve their condition."

"He said, Americans instead of sending out missionaries to train them in religion, would better send someone out to give them industrial education.

[Aug. 1893—New Discoveries M. L. Burke]

সন্ন্যাসীদের শিল্পশিক্ষার ব্যাপারটা বিবেকানন্দের কাছে কথার কথা ছিল না। আমেরিকা থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে বলরাম বসুর বাড়ীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তদের আহ্বান করে তিনি যে রামকৃষ্ণ মিশনের সূচনা করেন, তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মুদ্রিত বিবরণীর একাংশে কার্যপ্রণালী অংশে আছে—"মানুষের সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য বিদ্যাদানের উপযুক্ত লোক শিক্ষিতকরণ, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকার উৎসাহবর্ধন এবং বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মভাব রামকৃষ্ণজীবনে যেরূপ ব্যখ্যাত হইয়াছিল, তাহা জনসমাজে প্রবর্তন।"

[স্বামী-শিষ্য-সংবাদ—পূর্বকাণ্ড]

মঠের নিয়মাবলীর মধ্যে শিল্প বিষয়ে আরও উল্লেখ পাওয়া যায়।

"এখন উদ্দেশ্য এই যে, এই মঠটিকে ধীরে ধীরে সর্বাঙ্গসুন্দর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে হইবে। তাহার মধ্যে দার্শনিক চর্চা ও ধর্মচর্চার সঙ্গে সঙ্গে একটি পূর্ণ টেকনিক্যাল ইনস্টীটিউট করিতে হইবে; এইটি প্রথম কর্তব্য, পরে অন্যান্য অবয়ব ক্রমে ক্রমে যুক্ত হইবে।"

[স্বামী বিবেকানন্দ ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংঘ—সরলাবালা সরকার]

"...মহাবলশালী সমাজভিত্তি সৃষ্টি করিতে হইলে নূতন উপনিবেশ সংস্থাপন করাই একমাত্র উপায়; যে স্থানে নরনারী প্রাক্তন সংস্কারাপেক্ষাও কঠিনতর বন্ধন সমাজশাসন হইতে দূরে থাকিয়া, নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্যম প্রয়োগ করিয়া নববলে বলীয়ান হইবে। ভারতবর্ষের বাহিরে উপনিবেশ স্থাপনের উপায় নাই।"

"মধ্যভারতে হাজারিবাগ প্রভৃতি জেলার নিকট উর্বর, স্বাস্থ্যকর অনেক ভূমি এখনও অনায়াসে পাওয়া যাইতে পারে। ঐ প্রদেশে এক বৃহৎ ভূমিখণ্ড লইয়া তাহার উপর একটি বৃহৎ শিল্প বিদ্যালয় ও ধীরে ধীরে কারখানা ইত্যাদি খুলিতে হইবে। অন্নাগমের নূতন পথ যেমনই আবিষ্কৃত হইতে থাকিবে, লোক তেমনই উক্ত উপনিবেশে আসিতে থাকিবে।"

[মঠের ২৭ ও ২৮ নং নিয়ম।—একই গ্রন্থ]

দুর্ভিক্ষে বা অভাবে অন্নদান বা সেবাকাজ প্রভৃতিকে স্বামীজী সাময়িক ব্যাপার মনে করতেন।

(খ) শিক্ষা। শিক্ষার ব্যাপারে আলোচনার বিপদ বিষয়-ব্যাপ্তিতে; স্বামীজী শেষ পর্যন্ত শিক্ষাকেই সর্বরোগহর বিবেচনা করেছেন এবং যেখানেই

সুযোগ হয়েছে শিক্ষা-পরিকল্পনা হাজির করেছেন। শিক্ষার বিষয়ে তাঁর বেদান্ত-নির্ভর সংজ্ঞাই সর্বশ্রেষ্ঠ—"মানুষের অন্তর্নিহিত পূর্ণতার বিকাশ চেষ্টার নাম শিক্ষা"—এখানে আমরা ঐ শিক্ষার প্রয়োগরূপকেই লক্ষ্য করব। ব্যক্তিত্ব বিকাশকে তিনি শিক্ষার মূল লক্ষ বলেছিলেন, সেই ব্যক্তিত্ব যাতে অন্য ব্যক্তিত্বের সঙ্গে অবিরোধে ব্যক্ত হতে পারে তার জন্য তিনি সমন্বয়ের বাণী দিয়ে গেলেন। শিক্ষার ব্যবহারিক দিকে তিনি জনশিক্ষার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। জনশিক্ষা যাদের জন্য, সেই জনগণ শিক্ষার দ্বারা প্রথমত নিজের অবস্থার সঠিক রূপ জানতে পারবে, অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন সম্বন্ধে অবহিত হবে, তারপরে তারা ঐ প্রয়োজন নিবারণের উপযুক্ত উপায় জেনে নেবে। তার মানে তাদের বৃত্তিশিক্ষা দিতে হবে, সেই সঙ্গে বহিঃপৃথিবীর কিছু জ্ঞান। আত্মচেতনার জন্য সহজ ধর্মশিক্ষা দেওয়ারও দরকার। ধর্মশিক্ষা বিশেষ দেবতার প্রতি ভক্তি বাড়াবার জন্য দেওয়া হবে না মানুষের আশু প্রয়োজনের সঙ্গে চিরপ্রয়োজনের যোগসাধনই ধর্মশিক্ষার উদ্দেশ্য।

শিল্পশিক্ষার বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কথা আগেই বলেছি! স্ত্রীশিক্ষা, কলাশিল্পশিক্ষা বা উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞান-শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনার আলোচনা স্থগিত থাক, কিন্তু ঐ পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার ব্যাপারে তাঁর নির্দেশ রীতিমত প্রগতিশীল। জনশিক্ষার পথে প্রধান বাধা দারিদ্র্য। পাঠশালা করে দিলেও চাষী এত গরীব যে, মাঠ থেকে তার ছেলেকে অব্যাহতি দিয়ে পাঠশালায় পাঠাতে পারবে না। স্বামীজী বললেন, সে ক্ষেত্রে মহম্মদই পর্বতের কাছে যাবে। ম্যাপ, গ্লোব, চার্ট নিয়ে চলে যাও গরীবের কাছে, ইত্যাদি। বৈপ্লবিক সংগঠনের অনুরূপ পরিকল্পনা এখানে স্বামীজী গ্রহণ করেছেন।

শিক্ষার ব্যাপারে আর একটি বিষয়ে তিনি জোর দিতেন, দুর্বলকর কিছু শেখাবে না। অশ্বিনীকুমার দত্তকে স্বামীজি বলেছিলেন, আপনি সবচেয়ে বড় কাজ শিক্ষাদানে নিযুক্ত। চাষী, মুচি, মেথরের কাছে আপনাকে যেতে হবে। কখনো ছেলেদের কাঁদুনি শেখাবেন না। যেখানে শুনবেন ছেলেদের রাধাকৃষ্ণ শেখানো হচ্ছে, ডাইনে বাঁয়ে চাবকাবেন।

শেষ কথা, মানুষ হতে হবে শিক্ষার দ্বারা। শ্রদ্ধা সে পথের প্রথম ও শেষ কথা। শ্রদ্ধাবান নচিকেতা হলেন পরম আদর্শ।

(গ) সাহিত্য কলাশিল্প ইত্যাদি।

বিবেকানন্দ সাহিত্যিক ছিলেন না, কিন্তু বংলা সাহিত্যে স্থানাধিকারী। বাংলা চলিত ভাষাকে জীবনের ভাষা করে তুলতে তিনি পেরেছেন। রসিকতায়, গভীরতায়, উন্মাদনা ও ওজস্বিতায় সে গদ্য হল সাহিত্যের সম্পদ।

কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভূমিকা সৃষ্টি থেকে সৃষ্টির রীতিনির্ণয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রমথ চৌধুরীর বহু আগে, চলিত ভাষার পক্ষে প্রমথ চৌধুরীর প্রায় সকল যুক্তি কোনো এক অপূর্ব প্রতিভায় 'আত্মসাৎ' করে তিনি প্রচার করে গেছেন। প্রমথ চৌধুরীর মৌলিকতাহারী সেই সব বক্তব্যে ছিল আশ্চর্য আধুনিকতা। নিতান্ত স্থানীয় বুলিতে কতকগুলো কৌতুকপূর্ণ বা ব্যঙ্গাত্মক নক্সা কাটতে, কিংবা সাধুরীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহসৃষ্টির উন্মাদনাবশেই তিনি চলিত ভাষার পক্ষে রায় দেননি, তাঁর মনে হয়েছিল, যদি মানুষের প্রাণের কাছে হাজির হতে হয় তার মুখের ভাষা নিয়ে তার কাছে যেতে হবে; সর্বোচ্চ জ্ঞানবিজ্ঞান পর্যন্ত প্রকাশ করতে হবে ঐ মুখের ভাষাতেই।

যথেষ্ট নিন্দা স্বামীজীকে সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁর সাধু গদ্যের রচনা দেখে যে সুরেশ সমাজপতি সবিস্ময়ে লিখেছিলেন—সত্যই প্রতিভা সর্বগ্রাসী! —তিনিই স্বামীজীর চলিত ভাষা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে লিখলেন—এ যে রাখালী ভাষা! স্বামীজীর চলিত ভাষার লেখা 'উদ্বোধনে' প্রকাশিত হচ্ছিল, সেটা কারো মতে—উদ্বোধনের উদ্বন্ধন, সাদা কথায়, উদ্বোধনের গলায় দড়ি।

বাংলা সাহিত্যের বিষয়বস্তু সম্বন্ধেও স্বামীজীর আক্ষেপ ছিল। এই মহাজ্ঞানী ও মহামনীষী যদি বাংলা সাহিত্যের বিষয়বৈচিত্র্যের অভাবে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, এ সাহিত্যে 'পচা নবেল নাটক' (বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির কথা ভুলে গিয়ে) বা পিরীতির হাসান-হোসেন মার্কা কবিতা ছাড়া (রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু ভালো কবিতা তখন রচিত হয়ে গেছে যদিও, এবং মধুসূদনের মহাকাব্য, স্বামীজী যার গুণ মুগ্ধ ছিলেন) কিছু নেই, তখন ঐ কথাগুলিকে জ্বালাময় আত্মদংশন বলেই ধরব—কারণ সত্যই তো বাংলায় উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের গ্রন্থ নেই। কেন নেই, স্বামীজী তাও বুঝতেন। বই লিখলে ছাপবে কে? কিনবে কে? অভাব দূর করবার জন্য নিজের বিরল অবসরের মধ্যে যতখানি সম্ভব কাজ করে গেছেন—তাঁর 'পরিব্রাজক' ও 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যে' জ্ঞানবস্তু পরিবেশনের সার্থক চেষ্টা দেখা যায়।

সাহিত্যের ব্যাপারে বিবেকানন্দের প্রগতির ভূমিকা কলাশিল্পের ক্ষেত্রে আরও অগ্রসর। সাহিত্যে বাংলা দেশের প্রধান প্রতিভাসমূহের অবতরণ ঘটে গেছে সেই সময়ের মধ্যেই, সাহিত্যের গতিপথও নির্ধারিত হয়ে গেছে কিন্তু শিল্পের ব্যাপারে সৃষ্টি তো নেই-ই, শিল্পের অবলম্বনীয় আদর্শ সম্বন্ধেও ধারণা স্পষ্ট ছিল না। এই পরিস্থিতিতে শিল্প সম্বন্ধে সবিশেষ আগ্রহ এবং মৌলিক দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া গেল স্বামীজীর মধ্যে। ভারতীয় শিল্পজাগরণে বিবেকানন্দের ও তাঁর শিষ্য নিবেদিতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা অনেকেই স্বীকার করেন। এ ব্যাপারে আচার্য নন্দলাল বসু গিরিজাশঙ্কর, রায়চৌধুরী, ডঃ কালিদাস নাগ প্রভৃতির নাম করা যায়।

এ বিষয়ে প্রথম প্রশ্ন—শিল্প আন্দোলনকে তিনি কতখানি প্রত্যক্ষে প্রভাবিত করেছেন? উত্তর দ্বিধাগ্রস্ত। তাঁর প্রভাব যে সরাসরি নয়, তা স্বীকার্য। তাঁর প্রভাব পরোক্ষ, কিন্তু পরোক্ষ হলেও গভীর! যে জাপানী শিল্পশাস্ত্রী ভারতের নিজস্ব শিল্প সম্বন্ধে ভারতীয়দের মনে ঔৎসুক্য সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেই ওকাকুরা স্বামীজীকে জাপানে নিয়ে যেতেই ভারতে এসেছিলেন, এবং বিবেকানন্দ ও তাঁর শিষ্যা নিবেদিতার (নিবেদিতার শিল্পদীক্ষাও স্বামীজী কাছেই) সাহায্য ভারতীয় শিল্পের মর্মলোকে তাঁর প্রবেশের সহায়তা করেছিল। ভারতীয় শিল্পের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা আনন্দকুমার স্বামী স্বামীজীর পরিচিত এবং শিল্পব্যাখ্যার ব্যাপারে নিবেদিতার আংশিক সহযোগী। অবনীন্দ্রনাথ যে হ্যাভেলকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর উপর নিবেদিতার প্রভাবের কথা আচার্য নন্দলাল স্বীকার করেছেন।

আবার বলি, নিবেদিতার সম্পূর্ণ শিল্পদীক্ষা স্বামীজীর কাছেই।

শিল্পসৃষ্টিতে স্বামীজীর প্রভাব নিয়ে যত আলোচনাই চলুক (এবং সে বিষয়ে নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত সম্ভবপর নয়), শিল্পধারণায় বিবেকানন্দ যে ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে পুরোগামী তাতে সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দই প্রথম (আমি যতদূর জানি, অবশ্য ভুল হতে পারে) ভারতীয় শিল্পের শ্রেয় আদর্শ নির্দেশ করে গেছেন। বিলেতী শিল্পের অন্ধ অনুকরণ থেকে দেশীয় শিল্পরীতির দিকে প্রত্যাবর্তনের জন্য তাঁর ঋষি-নির্দেশ পরবর্তীকালে গৃহীত হওয়ার ফলেই ভারতীয় শিল্পের নবযুগ সম্ভব হয়েছে। স্বামীজীর অভ্রান্ত দৃষ্টির একটি দৃষ্টান্ত দিই: যে ঠাকুরবাড়ি থেকে নব্যশিল্পের যাত্রারম্ভ সেই ঠাকুরবাড়ির

অন্যতম মনস্বী সন্তান বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩০১ সালের শেষের দিকে সাধনা পত্রিকায় রবিবর্মার ছবির উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করে লিখেছিলেন, কালীঘাটের পটদেখা অভ্যস্ত দৃষ্টি রবিবর্মার ছবির রসগ্রহণ করতে পারবে না। কয়েক বৎসর পরে স্বামীজী লিখলেন, ওসব রবি বর্মা-ফর্মার ছবি দেখলে লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তুলনায় তিনি জয়পুরের সোনালী চিত্রি বা এমনকি কালিঘাটের পটকেও ভাল বললেন।

রবি বর্মাকে পরিহার করেই ভারতীয় শিল্পের নবযুগের যাত্রারম্ভ।

আর একটি কথা, শিল্পের ব্যাপারে বিবেকানন্দ কেবল মাস্টারপিস নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন না, তাঁর বিশেষ ঝোঁক গণশিল্পের। বাংলায় ও ভারতে শিল্প একদিন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল একদিন তা সর্বাঙ্গীণ জীবনকে সুন্দর ও শালীন করে তুলত। আমাদের দেশের সেই শিল্পপ্রাণতা বিদেশী শাসনে ও প্রভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। যে ইংলণ্ডের অনুকরণ করতে চেয়েছি শিল্পের ক্ষেত্রেও, সেই ইংলণ্ডের শিল্পসৃষ্টির কথা শুনলে স্বামীজী হাসিতে ফেটে পড়তেন। শিল্পের ব্যাপারে জাপান তাঁর কাছে অনেক বড় দেশ। স্বামীজীর মতে পাশ্চাত্ত্যের চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণে আমাদের সাধারণ জীবনে আর্ট আছে, পাশ্চাত্ত্যে আর্ট ইউটিলিটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বামীজী সমন্বয় চেয়েছেন।

জাতীয় জীবনের কোনো দিকই স্বামীজীর দৃষ্টি বহির্ভূত ছিল না। দেহে মনে বলিষ্ঠ জাতি তাঁর কাম্য ছিল। ধর্মকর্ম, জাতিভেদ, আহারবিহার, জীবনচর্চা প্রভৃতি সর্ববিষয়ে তিনি যে বিপুল চিন্তার সম্ভার রেখে গেছেন, সে সকল নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে বলে আমি ঐ সকল গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে প্রবেশ করতে চাই না, এখন 'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে ভারতের অতীত ও বর্তমান ইতিহাস এবং ভাবী ইতিহাসের সম্ভাব্য রূপ সম্বন্ধে স্বামীজীর মৌলিক মনস্বিতার কিছু পরিচয় দেব।

২

'বর্তমান ভারত' গ্রন্থটি ক্ষুদ্রাকার, বিবেকানন্দের জীবনের মতই সংক্ষিপ্ত এবং তাঁর জীবনের মতই শক্তি ও সম্ভাবনায় স্পন্দিত। এই গ্রন্থে স্বামীজী ভারত ও বিশ্বের ইতিহাস মন্থন করে ইতিহাসের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে লব্ধ ধারণাকে সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন।

'বর্তমান ভারত' স্বামীজীর ঐতিহাসিক বিচার ও সিদ্ধান্তের মহামূল্য দলিল। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কে বাংলায় আর কোনও রচনায় এইভাবে উদ্ভাসিত করে তোলা হয়নি।

বাংলায় এই একমাত্র গ্রন্থ যা বিশ্ব-ইতিহাসের তথ্য নয়, বিশ্ব-ইতিহাসের ভাষ্য। এখানে আছে মৌলিক ও স্বাধীন ইতিহাসবোধ যা প্রাপ্ত তথ্যকে এবং ঐ তথ্যের উপর নির্ভরশীল রচনাদিকে কেবল বুদ্ধিতে বিচার করে না, প্রজ্ঞাদৃষ্টিতে আলোকিত করে তোলে।

বিবেকানন্দের লৌকিক মনীষা এবং অলৌকিক প্রজ্ঞার এই মহাগ্রন্থ কয়েক পৃষ্ঠায় রচিত হয়ে প্রমাণ করেছে সৃষ্টির মহিমা তার আকারের পরিমাপের উপর নির্ভর করে না।

'বর্তমান ভারতের' ষ্টাইল ধ্রুপদী। মধুসূদন তাঁর কাব্যরীতিকে সফলভাবে গদ্যে ব্যবহার করতে পারলে যে রীতি দাঁড়াত এখানে সেই রীতিকেই পাচ্ছি।

'বর্তমান ভারতের' গদ্যরীতি নিজস্বক্ষেত্রে বহুলাংশ সাফল্য লাভ করলেও তা পরীক্ষামূলক স্তরে থেকে গেছে। বাংলা ভাষায় বাগ্মিতা আনা যায় না, ক্রিয়াপদের ঘন ঘন ব্যবহারের জন্য এ ভাষার দম মরে যায়, ভাবের ক্রমোচ্চ রূপকে ফোটাবার জন্য তরঙ্গায়িত আবেগ বাংলায় সৃষ্টি করা যায় না,—এ আক্ষেপ স্বামীজীর ছিল, তাই তিনি বিশেষণবহুল অতি গম্ভীর এক গদ্য রীতি সৃষ্টি করতে চাইলেন। 'বর্তমান ভারতের' গদ্য তারই দৃষ্টান্ত, বিবেকানন্দের প্রতিভার অন্যতম দৃষ্টান্তরূপে বর্তমান ভারত' প্রশংসাযোগ্য, কিন্তু অনুকরণ-দুঃসাধ্য, স্বামীজীও এই রীতি অতঃপর পরিহার করে তা স্বীকার করেছেন।

বোধ হয় একটু দূরে সরে যাচ্ছি। কিন্তু সত্যই কি তাই? বিবেকানন্দের সাহিত্য-ভাবনা কি তাঁর দেশাত্মভাবনার অন্তর্ভুক্ত নয়?

'বর্তমান ভারতে'র আলোচনায় আমরা ভারত-ইতিহাসের ব্যাখ্যার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেব, কিন্তু বিশ্ব-ইতিহাস থাকবে পটভূমিকায়।

ভারত-ইতিহাস আলোচনা করে স্বামীজী দেখিয়েছেন, ইংরেজ-অধিকার পর্যন্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণ ভারত শাসন করেছে। বিশ্ব-ইতিহাসের পর্যালোচানও তাঁকে একই সিদ্ধান্তে নিয়ে গেছে—সেখানেও দেখেছেন ঐ তিন বর্ণের পর্যায়ক্রমিক শাসন

সাধারণভাবে পৃথিবীতে গুণগত জাতি বা বর্ণ চারটি—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। স্বামীজীর থীসিস—এই চার বর্ণ পর্যায়ক্রমে পৃথিবী শাসন করবে; প্রথম দুই বর্ণের কাল শেষ হয়ে গেছে, তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের শাসন সমাপ্তিমুখী, চতুর্থ বর্ণ শূদ্রদের শাসন পরবর্তী অবশ্যম্ভাবী ঐতিহাসিক সত্য।

শূদ্রশাসন বেশী বাধাপ্রাপ্ত হলে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে আসবে, কিন্তু বিবর্তনের মধ্য আসবে, কিন্তু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে তার আগমনকে স্বামীজী অসম্ভব মনে করতেন না। সেক্ষেত্রে শূদ্রশাসন সকল মানুষকে হয়ত শূদ্রত্ব থেকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করতে উদ্যোগী হবে। ভারতবর্ষ তা গ্রহণ করবে বলে তাঁর বিশ্বাস ছিল।

ঔপনিবেশিক শাসন থাকতে শূদ্রাশাসন সম্ভব নয়, কারণ উপনিবেশসমূহ বৈশ্যশাসনের রক্তভাণ্ডার। উপনিবেশহারা হলেই কোনো দেশের পক্ষে সমাজতান্ত্রিক হওয়া সম্ভবপর। শূদ্রশাসনকে অবশ্যম্ভাবী ঘোষণা করে স্বামীজী ঔপনিবেশিকতার মৃত্যুদিনের কথাই ঘোষণা করে গেছেন।

ভারত-ইতিহাসের আদি অধ্যায়ে পুরোহিতশাসনের রূপ উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, কিভাবে পুরোহিতের রাজা-প্রজার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। পুরোহিতরা সভ্যতার আদি মস্তিষ্কজীবী। পুরোহিতদের মস্তিষ্কজাত জ্ঞানদ্বারাই উন্নত সভ্যতার সূচনা। তারা অবসরভোগী বলে সাহসচর্চায় সমর্থ এবং তার ফলেই বিদ্যার উন্মেষ, জড়ের উপর চেতনের অধিকার বিস্তারের সূচনা। ত্যাগ, তপস্যা ও বিদ্যায় পুরোহিতরা নমস্য।

পুরোহিতরা কিভাবে রাজশক্তিকে বশীভূত করেছিল? তার উত্তর, যে নৈসর্গিক জগতের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব প্রাচীন মানবের পক্ষে ভীতি-বিস্ময়ের বস্তু, তাকে প্রথম বুদ্ধিবলে অধিগত করে পুরোহিতরা। নৈসর্গিক শক্তিসমূহের দেব-নামকরণ ক'রে পুরোহিতরা জানাল, ঐ দেবতারা পুরোহিত-সম্পাদিত যজ্ঞের 'আহুতি গ্রহণেপ্সু'। রাজারা দেবপ্রসাদের জন্য পুরোহিতদের দ্বারস্থ। তাছাড়া ইতিহাসে বাঁচতে হলে পুরোহিত-সাহায্য চাই,—নিজের নাম ও পিতৃপুরুষের নাম বজায় রাখার একমাত্র উপায় পুরোহিতের সাহিত্যপ্রতিভাকে নিজ বংশখাতে চালিত করা। এ ছাড়া বুদ্ধিমান পুরোহিতরা মন্ত্রণায় ও চক্রান্তে অপরিহার্য।

সুতরাং রাজারা 'বর্ষার বারিদের মত থেকে দেবকৃপা, প্রজাশাসনের তন্ত্র-মন্ত্র এবং অজস্র ধনবর্ষণ' করে পুরোহিতদের সূর্যবংশ চন্দ্রবংশাদি আখ্যা সংগ্রহে তৎপর।

একজন অগ্নিবর্ণের কথা লেখা হয়েছে পরবর্তীকালে, পুরোহিতদের স্নেহদৃষ্টি পূর্বকালে কত অগ্নিবর্ণের দুষ্কৃতিকে মুছে দিয়েছিল!

পুরোহিত শাসনের আরও দোষ-পুরোহিতের শক্তি মানসিক এবং সেটা আলো-আঁধারির জগৎ। সেই 'কুজ্ঝাটিকা ও প্রহেলিকাময়' জগৎ সম্বন্ধে প্রবঞ্চনার কত সুযোগ। আর পুরোহিতদের শক্তি বস্তুশক্তির উপর নির্ভর করেনি বলে তারা তাদের জ্ঞানকে কুক্ষিগত করে রাখতে সচেষ্ট। ফলে 'সঙ্কীর্ণতা', 'অসরলতা', 'ঈর্ষা' ও 'অসহিষ্ণুতা'; ফলে আধিপত্য নাশের আশঙ্কায় মারণ-উচাটন-মন্ত্র-তন্ত্রের উপর নির্ভরতা।

ভারতে পরবর্তী শাসন ক্ষত্রিয়দের। বৌদ্ধযুগ থেকে মুঘলযুগ পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি।

পুরোহিত শক্তির সঙ্গে রাজশক্তির বিবাদ চলছিল বৈদিককাল থেকে। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রতিভায় নিজ জীবদ্দশায় শক্তিসাম্য বজায় রেখেছিলেন! তাঁর পরে বৌদ্ধ ও জৈন প্লাবন যখন এল তখন ক্ষত্রশক্তি ব্রাহ্মণশক্তিকে অভিভূত করে ফেলল। 'বৌদ্ধযুগের পুরোহিত সর্বত্যাগী, মঠাশ্রয়ী ও উদাসীন।' বৌদ্ধযুগে চন্দ্রগুপ্ত, অশোক প্রভৃতি একচ্ছত্র সম্রাটগণের আবির্ভাব।

বৌদ্ধযুগের শেষে আধুনিক হিন্দুধর্মের অভ্যুদয়কালে বৌদ্ধ-বিরোধিতায় ক্ষত্রিয়দের সহায়তা করেছিল ব্রাহ্মণশক্তি, কিন্তু ক্ষত্রিয়দের উপরে উঠতে পারেনি। সুতরাং এ যুগও ক্ষত্রিয়প্রাধান্যের।

তারপর মুসলমান রাজত্ব। মুসলমান রাজত্বে পৌরহিত্য শক্তির প্রাদুর্ভাব অসম্ভব।' 'মুসলমান রাজত্বে রাজাই প্রধান পুরোহিত।' মুসলমান-দের কাছে মূর্তিপূজোকারী কাফের 'এ জীবনে বলিদান ও অন্তে অনন্ত নরকের ভাগী।' সেই কাফেরদের মধ্যে কাফেরতম পুরোহিতদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়।

ভারতের মুসলমান শাসনকে স্বামীজী ক্ষত্রিয় শাসন বলে ধরেছেন। মুসলমান রাজারা 'বহু পরিমাণে মৌর্য, গুপ্ত, অন্ধ্র, ক্ষাত্রপাদি সম্রাটবর্গের গৌরব পুনরুদ্ভাসিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল।'

ক্ষত্র-প্রাধান্যের মহিমা ঐহিক সভ্যতার বিকাশে ও পুষ্টিতে। এইকালে চারু ও কারুকলাসমন্বিত নাগরিক সভ্যতার উদয়।

আবার এই ক্ষত্রিয়াধিকারেই জ্ঞানকাণ্ডের উদয়। ভোগের পরে আগে ভোগবৈরাগ্য। বৈরাগ্যজাত আত্মতত্ত্ব ক্ষত্রিয়শাসনের দান।

সমাজের প্রাথমিক অবস্থায় যখন সমাজগঠন ও শাসনের জন্য কেন্দ্রশক্তির প্রয়োজন, তখন ক্ষত্রিয়শাসন সুফলপ্রদ। কিন্তু সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই কেন্দ্রশক্তির সঙ্গে জাগ্রত প্রজাশক্তির সংঘর্ষ বাধে। ক্ষত্রিয়শাসন প্রজার অধিকার স্বীকারে অনিচ্ছুক, স্বেচ্ছাচারী, শোষণকারী ও বিলাসী।

স্বামীজি বলেন, "চণ্ডাশোকাত্ব অনেক রাজাই আজন্ম দেখাইয়া যান, ধর্মাশোকাত্ব অতি অল্পসংখ্যক। আকবরের ন্যায় প্রজা-রক্ষকের সংখ্যা আরঙ্গজীবের ন্যায় প্রজাভক্ষকের অপেক্ষা অনেক অল্প।

ভারতের মুঘল ক্ষত্রশক্তিকে পরাভূত করে যে ইংরাজশক্তি ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করল, তার অধিকারকে স্বামীজী বলেছেন, 'অভিনব'। বলবার কারণ, এ শক্তি বাইরে ক্ষত্রশক্তি, আসলে বৈশ্যশক্তি। ইতিহাস বিশ্লেষণ করে স্বামীজী দেখিয়েছেন, পৃথিবীতে প্রথম যথার্থ বৈশ্যশাসন ইংরাজের। আমেরিকার ভূমিকা সম্বন্ধে স্বামীজী প্রথমদিকে দ্বিধান্বিত ছিলেন, জীবনের শেষদিকে আমেরিকার প্রজাতান্ত্রিক রূপ অপেক্ষা ধন-তান্ত্রিক রূপই তাঁর কাছে বড় হয়ে ধরা পড়েছিল।

কয়েকটি বাক্যে তিনি ভারতে ইংরাজ শাসনের স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেছেন—

"অতএব ইংলণ্ডের ভারতাধিকার বাল্যে শ্রুত ঈশামসি বা বাইবেল-পুস্তকের ভারতজয়ও নহে, পাঠান-মোগলাদি সম্রাটগণের ভারতবিজয়ের ন্যায়ও নহে। কিন্তু ঈশামসি, বাইবেল, রাজপ্রাসাদ, চতুরঙ্গিণীবলের ভূকম্পকারী পদক্ষেপ, তূরীভেরীর নিনাদ, রাজসিংহাসনের বহু আড়ম্বর— এ সকলের পশ্চাতে বাস্তব ইংলণ্ড বিদ্যমান। সে ইংলণ্ডের ধ্বজা কলের চিমনি, বাহিনী—পণ্যপোত, যুদ্ধক্ষেত্র—জগতের পণ্যবীথিকা এবং সম্রাজ্ঞী— স্বয়ং সুবর্ণাঙ্গী শ্রী।"

ইংরেজের এই বৈশ্যশাসন ভারত থেকে অন্তর্হিত হলেও সমগ্র জগতের এক বৃহৎ অংশে বৈশ্যশাসন এখনও বর্তমান। বৈশ্যশাসনের গুণাগুণ সম্বন্ধে স্বামীজীর অভিমত তাই বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

বৈশ্যশাসন ধনকেন্দ্রিক। সে অর্থ পাছে রাজা হরণ করে তাই বৈশ্য-শাসনে রাজবল সংকুচিত বা অপহৃত এবং শূদ্রকুলেও অর্থসঞ্চারের বাসনা বৈশ্যের নেই।

বৈশ্যশাসনের প্রধান গুণ সে পৃথিবীতে ভাবের ও বিদ্যার বিনিময়ের পথ করে দেয়। বাণিজ্য অনুরোধে বৈশ্যকে সর্বত্র যেতে হয় বলে সে 'সভ্যতা বিলাস ও বিদ্যা' সর্বস্থানে নিয়ে যায়। ঐ জিনিষগুলি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়-শাসনে 'সমাজ-হৃৎপিণ্ডে পুঞ্জীকৃত' হয়েছিল।

ভারতের ক্ষেত্রে ইংরেজ বৈশ্যশাসন ভারতবর্ষকে বহির্জগতের সম্মুখীন করেছে এবং শাসন অনুরোধে সমগ্র ভারতকে একশাসনাধীন করেছে।

বৈশ্যশাসনের মন্দ রূপ সম্বন্ধে স্বামীজী অন্যত্র বলেছেন, 'এর ভিতরে শরীর নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা অথচ বাইরে প্রশান্তভাব—বড়ই ভয়াবহ।'

ভারতে অন্যান্য শাসনের সঙ্গে ইংরেজশাসনের পার্থক্য স্বামীজী অন্য-ভাবেও উৎকৃষ্ট বিশ্লেষণে দেখিয়েছেন। যখন স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনে থাকে কোনো জাতি, তখন বিজয়ী ও বিজিতে সর্বাঙ্গীণ ব্যবধানের সৃষ্টি হয় না। রাজা শোষণ করেন কিন্তু প্রজার কল্যাণও করেন। তাছাড়া ঐ রাজাশোষণ ব্যক্তিগত বা পারিবারিক প্রয়োজনে সংঘটিত বলে সর্বাত্মক হয় না। সে শোষণ সর্বাত্মক হয় যখন বিজয়ী রাজা স্বদেশের প্রজানিয়ন্ত্রিত, কিংবা কোনো দেশের প্রজাতন্ত্রই যখন অন্য দেশকে পরাধীন করে। এইসব ক্ষেত্রে একটি জাতির স্বার্থে পরাধীন জাতিটির শোষণ। যেমন ইংরাজ জাতির স্বার্থে ভারতবাসীর শোষণ। ইংলণ্ডের সমৃদ্ধি ভারতসাম্রাজ্যের উপর নির্ভরশীল বলে 'যেন তেন প্রকারেন ভারতে ইংলণ্ডাধিকার প্রবল রাখিতে হইবে।'

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা এই পর্যন্ত তাঁর নিজকালে নিবদ্ধ, তিনি সর্বাপেক্ষা প্রগতিশীল ও প্রজ্ঞাদৃষ্টিসম্পন্ন ভবিষ্যৎ-চিন্তায়।

স্বামীজীর মতে, আগেই বলেছি, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পালা শেষ—এবার শূদ্রের শাসন। পৃথিবীতে শূদ্রশাসন প্রবর্তিত হবেই হবে। সে শূদ্রশাসনের সবটুকু স্বামীজীর মনোমত না হলেও পরম উদারতায় তাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। বলা বাহুল্য হলেও বলছি, স্বামীজীর কালে কোনো দেশে শূদ্রশাসন প্রবর্তিত হয়নি।

এই প্রসঙ্গে প্রাচীন কাল থেকে ইংরেজ শাসন পর্যন্ত ভারতে প্রজাদের অবস্থার রূপ স্বামীজী সংক্ষেপে জানিয়েছেন।

সাধারণ প্রজার অবস্থা কোনকালে আহামরি নয়—রামরাজ্যেও নয়। পুরোহিত প্রাধান্যকালে রাজা, রাজ্যরক্ষা, নিজের বিলাস, বন্ধুবর্গের পুষ্টি ও সর্বাপেক্ষা, পুরোহিতকুলের তুষ্টির নিমিত্ত প্রজাবর্গকে শোষণ করিতেন।" পরবর্তী ক্ষত্রিয় যুগেও প্রজাশোষণ অব্যাহত।

এই দুইকালে স্বামীজী সব চেয়ে ক্ষতি দেখেছেন প্রজার আত্মবোধহীনতায়। করগ্রহণে, রাজ্যরক্ষায় প্রজার মতামতের অপেক্ষা নেই। যে দু একটা বিপরীত দৃষ্টান্ত নিয়ে আমরা উচ্ছ্বসিত, সেখানেও "প্রজাশক্তি আপনার ক্ষমতা অপ্রত্যক্ষভাবে বিশৃঙ্খলরূপে প্রকাশ করিতেছে।" সমাজ চলিয়াছে ঋষিবাক্য, বা শাস্ত্র, সেখানে দেশকর্মে প্রজার "সহমতি" বা "সমবেত বুদ্ধি-যোগের" কোনো সুযোগ ছিল না। প্রাচীন ভারতে বিক্ষিপ্ত স্বায়ত্ত-শাসনের অস্তিত্বের উল্লেখ করে স্বামীজী বলেছেন, যখন পরিব্রাজকেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনতন্ত্র এদেশে দেখেছিলেন, গ্রাম পঞ্চায়েত ছিল, বৌদ্ধ মঠে বা নাগা সন্ন্যাসীদের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের নিদর্শন পাওয়া যায় কিন্তু এগুলি তুলনায় এত সামান্য ও বিক্ষিপ্ত যে, এ সবের দ্বারা শাসনকার্যে প্রজার অধিকার প্রমাণিত হয় না।

শাসনকার্যে প্রজার অধিকার না থাকার জন্য,—প্রজা সব সময় 'পালিত রক্ষিত' বা শোষিত হওয়ার কারণে,—তার আত্মরক্ষার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল এবং এই আত্মবোধহীন নির্বীর্য প্রজাশক্তি বহিরাগত সর্বনাশকে রোধ করতে সমর্থ হয়নি।

ক্ষত্রিয় যুগ পর্যন্ত ভারতে প্রজার এই অবস্থা, বৈশ্য ইংরাজ শাসনে দুর্গতি চরমে পৌঁছিল।

সাধারণ যুক্তিতে শূদ্রশাসন অপ্রতিরোধ্য, কারণ জনসমষ্টির অধিকাংশই তারা—তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বাধা দেবার শক্তি কার? শূদ্রদের আত্মনিয়ন্ত্রণের পথে বাধা, স্বামীজীর মতে এইগুলি—(১) তাদের বিদ্যা নেই, (২) স্বজাতিবিদ্বেষের জন্য তাদের মধ্যে একতা নেই, (৩) তাদের বাসনা চিরদিনই নিষ্ফল হওয়ার জন্য তাদের মধ্যে দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের অভাব, এবং (৪) পাশ্চাত্ত্য দেশে শূদ্র-উত্থানের প্রধান বাধা সেখানকার গুণগত জাতি। কোনো শূদ্র সেখানে বিশেষ গুণ বা প্রতিভা

দেখালে অন্য বর্ণগুলি ঐ শূদ্রকে নিজ বর্ণে গ্রহণ করে. ফলে তার গুণপনায় নিজ জাতি লাভবান হয় না।

তবু 'ভারতেতর দেশের শূদ্রকুল কিঞ্চিৎ বিনিদ্র', সেখানে সোস্যালিজম, এনর্কিজম্. নাইহিলিজম্' প্রভৃতি দল শূদ্রপক্ষে বিপ্লবের ধ্বজা উড়িয়েছে।

স্বামীজী ভবিষ্যৎ দেখলেন,—'শূদ্রকর্ম সহিত' শূদ্ররা পৃথিবীতে একাধিপত্য লাভ করবে। 'শূদ্রকর্মসহিত' কথাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই শূদ্রশাসনের গুণদোষ সম্বন্ধে স্বামীজী অবহিত। এই শাসনে সাধারণ মানুষের আর্থিক উন্নতি হবে, সামাজিক সাম্য আসবে, সাধারণ শিক্ষার প্রসাদ ঘটবে। দোষ—উচ্চতর সংস্কৃতির নাশ এবং বিরাট প্রতিভার অভ্যুদয় বন্ধ।

স্বয়ং বিরাট প্রতিভাবান এবং উচ্চতর সংস্কৃতির প্রধান প্রতিভূ বিবেকানন্দ তথাপি নিজেকে সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করে বলেছেন, মানুষ যেখানে তার ন্যূনতম দৈহিক প্রয়োজন মেটাতে পারছে না, সেখানে সংস্কৃতি-বিলাসে তাঁর অভিরুচি নেই।

বিবেকানন্দ সমাজতন্ত্রকে সমাজতন্ত্র বলেই ধরেছিলেন, "শূদ্রকর্মসহিত শূদ্রশাসন" কথাটির মধ্যে তার প্রমাণ আছে, এবং আর প্রমাণ পাই প্রজাতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর নিম্নের সমালোচনায়—

"সব দেশেই···গোটাকতক শক্তিমান পুরুষ যা করছে তাই হচ্ছে; বাকিগুলো খালি ভেড়িয়াধসান বই ত নয়! ও তোমার পার্লামেণ্ট দেখলুম; সেনেট দেখলুম, ভোট, ব্যালট, মেজরিটি, সব দেখলুম, রামচন্দ্র!···"

"ভোট ব্যালটের সঙ্গে প্রজাদের···একটা শিক্ষা হয়···কিন্তু রাজনীতির দামে···চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপী দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে;...সে ঘুষের ধূম সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্ত্যদেশে হয়, রামচন্দ্র!···যাদের হাতে টাকা তারা রাজ্যশাসন নিজের মুঠোর ভেতর রেখেছে, প্রজাদের লুঠছে, শুষছে, তারপর সেপাই করে দেশদেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে—জিত হলে তাদের ঘর ভরে ধনধান্য আসবে।" [প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য]

ভারতের সাধারণ মানুষের উপর বিবেকানন্দের অপার সহানুভূতি ও শ্রদ্ধা। একদিন তাদের তৈরী শিল্পদ্রব্য রপ্তানী হয়ে সারা পৃথিবীর সভ্যতার সৃষ্টি করেছে অথচ তাদের কথা কেউ ভাবেনি। সেই "ভারতের চিরপদ-

দলিত শ্রমজীবীদে"র প্রণাম জানিয়ে বিবেকানন্দ যে ভবিষ্যৎ ভারতের স্বপ্ন দেখেছেন, সে ভারত বেরুবে "চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে...মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বাজার থেকে...।" মন্ত্রের মত কথাগুলি ধর্মের মত সত্য। বিবেকানন্দ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত শক্তির অন্ধতা দেখতে চাইছিলেন না, চাইছিলেন সমগ্র সমাজদেহের শক্তি, ভারতকে যুগে যুগে পরপদদলিত দেখবার কোনো ইচ্ছা ছিল না তাঁর, অথচ সেইটেই হবে অনিবার্য সত্য যদি ভারতবর্ষ সকলের ভারতবর্ষ না হয়।

ভারতের তৎকালীন জাতীয় আন্দোলন স্বামীজীর কাছে কোনো মহৎ রূপ উপস্থিত করে নি। জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি সে যুগে উকিলদের আখড়া মনে করেছিলেন, যেখানে বাবু ইংরেজিতে দেশশাসনের পিটিশন লেখা হয়। কংগ্রেস জনসাধারণের জন্য কিছু না করলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই—তিনি জানিয়ে দিলেন। জনসাধারণ মানে এখানে শ্রমজীবী শূদ্রসাধারণ।

জাতীয় আন্দোলনের আর একটি প্রকৃতি বোধ হয় স্বামীজীর কাছে ধরা পড়েছিল। তিনি অন্যান্য দেশে প্রজাশক্তির সঙ্গে বৈশ্যশক্তির ব্যবহারের রূপ দেখাতে গিয়ে বলছেন—

"এক্ষণে বৈশ্যকুল আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিয়াছে; অতএব প্রজার সহায়তা অনাবশ্যক জ্ঞানে আপনাদিগকে প্রজপুঞ্জ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে। এই স্থানে এ শক্তিরও মৃত্যুবীজ উপ্ত হইতেছে।"

তীক্ষ্ণ মন্তব্য। পৃথিবীর ক্ষেত্রে যেটা সত্য, ভারতের ক্ষেত্রে সেটা কি মিথ্যা? ভারতের জাতীয় আন্দোলনে দেশীয় বণিকদের উৎসাহ কি তিনি দেখেন নি, বা অনুমান করেন নি? এই উৎসাহের কারণ বা ভবিষ্যৎ কি জানতেন না?

কিন্তু তথাপি বিবেকানন্দ তৎকালীন বনিকদের উৎপাদনে উৎসাহিত করে গেছেন। সাধারণ মানুষের উন্নতি যন্ত্রশিল্পের প্রসার ভিন্ন হয় না। শিল্পায়নকে শূদ্রবিপ্লবের পটভূমিকারূপে বোধ হয় তিনি ভেবেছিলেন।

এইখানে থেমে আমাদের চিন্তা করতে হবে। বিবেকানন্দ কি ভারতের ক্ষেত্রে সর্বাত্মক শূদ্রশাসন সমর্থন করেছেন, শূদ্রশাসন বলতে ঠিক যা বোঝায় তাকে? স্বামীজী বলেছেন, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল। কিন্তু

সেটা তো অভাবের আদর্শ, স্বভাবের আদর্শ কি তাই? তিনি বলেছেন, যে ধর্ম বা ভগবান আমাদের খেতে দিতে পারে না, সে ধর্মে বা ভগবানে আমি বিশ্বাস করি না;—তাই বলে কি তিনি নাস্তিক ছিলেন—চারিদিকের শূন্য উদর-সমারোহের মধ্যেও?

শূদ্রশাসন মানবতাবাদী বিবেকানন্দের কাছে অগত্যা-আদর্শ, পূর্ণাঙ্গিক আদর্শ নয়, কারণ বিবেকানন্দ মূলে অধ্যাত্মবাদী। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র ভুললে চলবে না, বেদান্তভিত্তিক। সেখানে বস্তু-সমন্বয় নয়, চেতনার সমন্বয়। সমন্বয়ও ছোট কথা, একাত্মতা। মানুষ সেখানে এক, ক্ষুধার নয় আত্মায়। বিবেকানন্দ আত্মায় মানুষকে এক দেখে ক্ষুধার ক্ষেত্রে, ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যাপারে, পৃথক দেখে বিদ্রোহ করেছেন।

অধ্যাত্মবাদী বিবেকানন্দের কাছে ধর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ এনেছিল বিজ্ঞান। তার সম্মুখীন হলেন তাঁর অদ্বৈত বেদান্তকে নিয়ে। বিবেকানন্দ মূর্তিপূজার বিরোধিতা করলেন না,—মূর্তি যতক্ষণ মানুষের ধর্ম-চেতনাকে জাগ্রত রাখে, ততক্ষণ তার বিরুদ্ধে বেদমন্ত্র বা হাতুড়ি কিছুই তুললেন না, কিন্তু মনে জানলেন, বিজ্ঞানের যুক্তিবাদ মূর্তিকে স্বীকার করবে না, তাছাড়া মূর্তিপূজাও শেষ পর্যন্ত মূর্তিকে স্বীকার করে না, সন্ধান করে অমূর্ত চেতনার: পাশ্চাত্ত্যের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তাই প্রচার করলেন অদ্বৈত সত্যকে, যে অদ্বৈত বস্তুগতভাবে বিজ্ঞানের সন্ধানের বিষয়; বিবেকানন্দ অধিকন্তু জানতেন, ভারতবর্ষেও ভবিষ্যতে বিজ্ঞান-চেতনার বিস্তারের ফলে যে অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে ধর্মকে বাঁচতে হলে এই অদ্বৈতকে নিতেই হবে। বিজ্ঞানের আক্রমণ ছাড়াও বিবেকানন্দ ধর্মের বিরুদ্ধে আর একটি সম্ভাব্য আক্রমণ অনুমান করছিলেন,—বহির্মুখী ভোগবাদের আক্রমণ। বিবেকানন্দের পরমপ্রিয় শূদ্রশাসন এই ভোগবাদ বা জড়বাদের দ্বারা অধ্যাত্মবাদকে স্থানচ্যুত করবার চেষ্টা করবে; সফল শূদ্রবিপ্লব প্রথম ক্ষুন্নিবৃত্তির আনন্দে জীবনের অন্তরতর, গভীরতর, মূল্যকে অস্বীকার করবে। সেটা হবে মানুষের স্বরূপের অবমাননা। বিবেকানন্দের কাছে মানুষের দেহের মূল্য অল্প নয়, তার সাক্ষাৎ প্রয়োজনকে তিনি প্রথমেই স্বীকার করেছেন, কিন্তু বিশ্বাস ও আশা রেখেছেন মানুষের নিত্যস্বরূপের উপর। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ এই—

"যদি এমন একটি রাষ্ট্রগঠন করতে পারা যায়। যাতে ব্রাহ্মণ যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ—

এই সবগুলি ঠিক ঠিক বজায় থাকে, অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। কিন্তু একি সম্ভব?" [পত্র]

এটি যে সহজে সম্ভব নয়, এমন কি কার্যত অসম্ভব তা স্বামীজীই স্বীকার করেন। সেই অসম্ভব আদর্শকে সফল করবার জন্য তিনি ভারতবর্ষকে আহ্বান করেছেন।

"এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ।"

বিবেকানন্দের একটি ভবিষ্যৎবাণী ইদানীং বিশেষভাবে উল্লিখিত হচ্ছে—"পরবর্তী অভ্যুত্থান আসছে রাশিয়া বা চীন থেকে, ঠিক কোথা থেকে আসবে তা আমি জানি না।" পরবর্তী অভ্যুত্থান দু জায়গা থেকেই এসেছে।

কথাটি "অভ্যুত্থান"—কিন্তু এই অভ্যুত্থানকে কি স্বামীজী সর্বাংশে শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন? তা যদি হত, তাহলে তিনি কলিযুগের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলতেন না, কলিযুগ হল সেই যুগ, যে যুগে অর্থেই ভগবান।

বৈশ্যশাসনে অর্থ ভগবান, কিন্তু শূদ্র শাসনে অর্থ যে ব্রহ্ম। তারই নাম ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা।

কতকগুলি ঐতিহাসিক লক্ষণ থেকে স্বামীজী রুশবিপ্লব অনুমান করেছিলেন। বিপ্লবাত্মক রচনাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয়, রুশ বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ (এ সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ সালে, আমার বিশ্বাস তার পূর্বেই তাঁর ধারণা পূর্ণতা লাভ করেছিল), এবং সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনা থেকে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা থাকায় তিনি পূর্বোক্ত অনুমান করতে পেরেছিলেন। রুশ সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে প্রজানির্যাতনের একটি শোচনীয় ঘটনায় স্বামীজীর মর্মপীড়নের কথা মহেন্দ্রনাথ দত্ত "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থে" জানিয়েছেন।

আর চীনের বিপ্লব?

স্বামীজী চীনকে প্রাচীন সভ্যতার আদি গুরু বলতেন। কিন্তু সে সভ্যতা ঐহিক। চীন ভোগবিলাসের গুরু। তদুপরি চীন যেখানে মহান সেখানেও সে "আধ্যাত্মিক" নয়, "নৈতিক"। চীন "কনফুছের চেলা।" নীতিবাদ অধ্যাত্মবাদে উন্নীত না হলে তা মানুষের লোকজীবনেরই আবদ্ধ থাকে। ইহ-জীবনকেন্দ্রিক এই নীতিবাদের পৃষ্ঠা পরিবর্তন করে একে বস্তুনীতিবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব। তদুপরি চীনের বিপুল জনসংখ্যা। 'বর্তমান ভারতে'ই স্বামীজী লিখেছেন, "মহাবল" চীন আমাদের সমক্ষেই

দ্রুতপদসঞ্চারে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেছে।" উল্টোপক্ষে যে জাপান ছিল শ্রমজীবী শূদ্র, সেই জাপান পাশ্চাত্ত্য বস্তুবিজ্ঞান আয়ত্ত করে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হচ্ছে, চীনের বিপুল জনসংখ্যার জন্য যা হওয়া সম্ভব নয়। এই শূদ্র-চীনের মধ্যে যদি একতা প্রবেশ করে তাহলে বিপ্লব অনিবার্য, চীন কৃষিনির্ভর হলেও। চীনের বিপুল জনসংখ্যা, অনলস কর্মক্ষমতা এবং অনাধ্যাত্মিক নীতি-নির্ভর সভ্যতার মধ্যে বিপ্লবসম্ভাবনা স্বামীজী দেখেছিলেন। অধ্যাত্মবাদী ভারতের ক্ষেত্রে সেই বিপ্লবকে দূরবর্তী মনে হয়েছিল তাঁর।

কিন্তু যদি সত্যই চীনের অভ্যুত্থান ঘটে, তাহলে সেই অভ্যুত্থান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে কিভাবে পর্যুদস্ত করবে, তার আনুমানিক রূপ স্বামীজী আমেরিকায় পদার্পণের পরেই এক বক্তৃতায় খুলে ধরেছিলেন। ভারতের রক্তশোষক ইংরেজকে সতর্ক করে বলেছিলেন, যদি তোমরা ভূমিকা পরিবর্তন না কর, তাহলে হে ইংরেজ। ঐ চীনেরা ইতিহাসের প্রতিহিংসার মত তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

Look at those Chinese, millons of them.... There will be another invasion of the Huns. They will sweep over Europe, they will not leave one stone standing upon another. Men woman, children all will go..." [New Discoveries—M.L. Burke].

চীনকে তিনি ইতিহাসের আশীর্বাদ বলেন নি, বলেছেন ইতিহাসের অভিশাপ—সে একটা মূঢ়, বিপুল, উন্মাদ শক্তি যা ইউরোপীয় বর্বরতার উপর নিক্ষিপ্ত হবে ইতিহাসের ভারসাম্য রাখবার জন্য।

ইউরোপের উপর চীনের সেই আক্রমণের ফলে "Dark ages will come again।"

স্বামীজীর যথেষ্ট পীতাতঙ্ক ছিল দেখা যাচ্ছে!

ভয়ঙ্কর বৈদান্তিক বিবেকানন্দের কাছে "Dark age" হয়ত সম্পূর্ণ ভয়াবহ নয় কারণ আলোক ও অন্ধকারকে তিনি সমান সত্য বলে মনে করতেন, কিন্তু চীনের সেই ভয়াবহ আক্রমণের বীভৎসরূপের কথা শুনে শ্রোতারা চমকে শিউরে উঠে প্রশ্ন করেছিল—সে কবে? কবে?

স্বামীজী বলেছিলেন, হাজার বছর পরে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ের কিছু আমেরিকান শ্রোতা সেই শুনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল,

১৯৬৩ সালের ভারতীয় পাঠকেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবছে হে ঈশ্বর স্বামীজীর কালের হিসেবটা যেন সত্য হয়, সত্যই যেন সেই অন্ধকার যুগ সাড়ে নশো বছর বিলম্বিত হয়!

ইংরেজ ভারত ছেড়ে গেছে, কিন্তু ইতিমধ্যেই চীনের "অভ্যুত্থান" হয়েছে; ইউরোপ আণবিক বাহুতে রক্ষিত, দানবিক বাহু সেখানে সন্ত্রস্ত সুতরাং কোটি কোটি সন্তানের অন্ধপিতার আলিঙ্গন এগিয়ে এসেছে ভারতের ধর্মক্ষেত্রের দিকে।

চীনের অভ্যুত্থান স্বামীজী দেখেছিলেন, কিছুবাদ না দিয়েই।

স্বামীজী তাই ডাক দিয়েছেন ভারতবর্ষকে—মানুষের প্রগতিকে অব্যাহত ও সমন্বিত রাখবার জন্য।

"বর্তমান ভারতের" শেষাংশে রয়েছে বিবেকানন্দের সেই অপূর্ব আহ্বান।

সে ভারতবর্ষ আজ গভীর সঙ্কটের সম্মুখীন। সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে সদ্য-স্বাধীন ভারতকে আজ যা করতে হচ্ছে, তার অনুরূপ প্রচেষ্টা স্বামীজী ইউরোপের ক্ষেত্রে দেখেছিলেন। যুদ্ধের কর আজ চেপেছে জনসাধারণের উপরে। জনসাধারণের অনুচ্চ অভিযোগ—মূল করভার আমরাই বহন করছি। স্বামীজী ইউরোপের কথা বলছেন—

"সমস্ত ইউরোপময় ঐ কনসক্রিপসন—এক ইংলণ্ড ছাড়া।...এখন এই যে সর্বিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি বেচারাম দেশ সব তুর্কিকে ভেঙে ইউরোপীয়া বানাচ্ছে, তাদের জন্ম হতে না হতেই আধুনিক সুশিক্ষিত, সুসজ্জ ফৌজ, তোপ প্রভৃতি চাই। কিন্তু আখেরে সে পয়সা যোগায় কে? চাষা কাজেই ছেঁড়া ন্যাতা গায়ে দিয়েছে,—আর শহরে দেখবে কতগুলো ঝাব্বাঝুব্বা পরে সেপাই।"

বিস্ময়কর এই, স্বামীজী আমাদের ইদানীন্তন দায়িত্বহীন সমালোচনার মুখেও ভাষা দিয়েছিলেন! কিন্তু ধীরে। স্বামীজী তারপরেই বলছেন—

"তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক।...স্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা, ছেঁড়া ন্যাকড়াপরা স্বাধীনতা লক্ষগুণে শ্রেয়। গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই।

ইয়ুরোপের লোকেরা ঐ সর্বিয়া, বুলগার প্রভৃতিদের ঠাট্টা বিদ্রূপ করে, তাদের ভুল, অপারগতা নিয়ে ঠাট্টা করে। কিন্তু এতকাল দাসত্বের পর

কি একদিনে কাজ শিখতে পারে? ভুল করবে বৈকি, দু'শবার করবে—করে শিখবে—শিখে ঠিক করবে।" [পরিব্রাজক]

বলেছি, বর্তমান ভারতের শেষে আছে তৎকালীন ভারত ও ভাবী ভারতের উদ্দেশ্যে স্বামীজীর বাণী। পাঠ্য পুস্তকে এই অংশের নাম দেওয়া হয়েছে 'স্বদেশমন্ত্র'; অতি সঙ্গত নাম—সার্থকতর হত 'ভারতমন্ত্র' বললে। একালে ভারতবর্ষকে যিনি নিজ জীবন ও বাণীতে সর্বাধিক উন্মোচন করেছেন, ভারতমন্ত্র উচ্চারণের অধিকার তাঁরই।

'হে ভারত ভুলিও না—' এ হল অধিকারের কণ্ঠ এ বাণী দেহধারী।

এমন গদ্য কোথায় আছে বাংলায়? বোধহয় একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের দপ্তরে। সেখানেও কিন্তু ব্যথিত হৃদয়ের আবেগের প্রাধান্য। বিবেকানন্দের এই রচনায় সুরের উদারতা, উদাত্ততা ও আত্মার সুমহিম ধ্বনি।

এ গদ্যের নাম মহাগদ্য—মহাকাব্যের মত—একটা মহান সৃষ্টির মত স্বতোৎসারিত। শৃন্বন্তু: বিশ্বে: অমৃতস্য পুত্রাঃ—তার সঙ্গে 'হে ভারত', এই আহ্বানের কোথায় একটা সাদৃশ্য আছে—প্রথমটি সর্বের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত, দ্বিতীয়টি ভারতের উদ্দেশ্যে—কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সে আহ্বান না শুনলে 'নান্যপন্থাঃ বিদ্যতেহ্‌য়নায়'।

ভাবগরিমা ও সুরমহিমার দিক থেকে বিবেকানন্দের এই রচনার একমাত্র তুলনা বাংলায় রবীন্দ্রনাথের ভারততীর্থ কবিতা। দুয়েরই বক্তব্য প্রায় এক প্রভেদটুকু গদ্য ও কবিতার। 'ভারততীর্থ' কবিতা বলে সেখানে একটি অখণ্ড আবেগের প্রাধান্য 'ভারতমন্ত্রে' চিন্তার রূপটি স্পষ্টতর।

তবু শেষ পর্যন্ত 'ভারতমন্ত্র' আমাদের যেভাবে প্রবুদ্ধ করে তোলে এমন আর কিছুতে নয়, এটা বোধহয় আমার ব্যক্তিগত কথা। সেই ব্যক্তিগত কথাই বলি, এ শক্তি ছিল বন্দেমাতরম গানের।

বলেছি, রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতার তুলনায় স্বামীজীর 'ভারত-মন্ত্রে' চিন্তার রূপটি স্পষ্টতর। কথাটি একটু ব্যাখ্যা করি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতার শেষে বলেছেন—'এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন ধর হাত সবাকার;' বিবেকানন্দ বলেছেন, 'বল, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।' রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি তৎকালীন পরিবেশে অধিকতর সুপ্রযুক্ত, বিবেকানন্দের উক্তি সেখানে ঈষৎ বিস্ময় সঞ্চার করবে, কারণ

ছুৎমার্গের ভারতবর্ষে সকলকে ভাই বলবার দায়িত্ব বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের, সেই ব্রাহ্মণকে ভাই বলাবার দিকে ঝোঁক কেন?

এ ঝোঁকের হেতু আছে। 'বর্তমান ভারতে' বিবেকানন্দের দৃষ্টি বর্তমানে ও ভবিষ্যতে। বর্তমানের ব্রাহ্মণ যেন চণ্ডালকে ভাই বলে, কিন্তু ভবিষ্যতে চণ্ডাল যেন ব্রাহ্মণকে ভাই বলতে পারে। এমন একদিন আসবে যখন ব্রাহ্মণকে শুদ্র ভাই বলে গ্রহণ না করলে ব্রাহ্মণের ত্রাণ নেই। বিবেকানন্দ শুদ্র-উত্থান দেখতে পাচ্ছিলেন। সে উত্থান পুরাতন প্রভু ব্রাহ্মণকে হয়ত ধ্বংস করে ফেলবে। বিবেকানন্দ শুদ্রের জাগরণ ও সামাজিক সাম্য চান কিন্তু ব্রাহ্মণের উৎসাদন চাইবেন কিরূপে—যেহেতু ব্রাহ্মণের মধ্যে অনেক কিছু মহৎ আছে। স্বামীজী সমন্বয়ী।

বিবেকানন্দের কথা ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভারতে ফলতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে 'চলমান শ্মশানদের' আক্রমণে চলমান স্বর্গখণ্ডগুলি রাজ্যহারা।

বিবেকানন্দ আর্য ও তামিলদের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির প্রতিবাদ করেছিলেন। আজ দেখা যাচ্ছে উত্তর ভারতের আর্যশাসনের বিরুদ্ধে দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় সংস্কৃতি রণমুখী!

'ভারতমন্ত্রের' একটা নিরপেক্ষ মূল্য আছে, আবার 'বর্তমান ভারতে'র শেষাংশে যুক্ত হওয়ায় তার একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে।

'বর্তমান ভারতের' শেষে ভারত ও বিশ্বের ইতিহাসধারা বিশ্লেষণ করে স্বামীজী যেখানে পৌঁছলেন সেখানে তাঁর সামনে ছিল বর্তমানের ভারত ও ভবিষ্যতের ভারত। ঐ বর্তমানের ভারতের কাছে প্রচণ্ড বাস্তব হল, ইংরাজ বৈশ্যশাসন। বৈশ্যশাসন বহিঃসভ্যতা নিয়ে আসে, এনেও ছিল। তার ফলে নব সভ্যতাক্রান্ত ভারত পরানুবাদ, পরানুকরণে ব্যস্ত, ইংরেজের সুশাসনে পরমুখাপেক্ষী। এই শিক্ষিত বাবুর দল বীরভোগ্যা স্বাধীনতা চায়! যারা ইংরেজদের কাছ থেকে শিখেছে ঐ 'কটিতটমাত্র আচ্ছাদনকারী অজ্ঞ, মূর্খ, নীচ জাতি' ওরা অনার্য, ওরা আমাদের কেউ নয়? স্বামীজী এরই বিরুদ্ধে নির্ঘোষ তুলে বললেন, ঐ সাধারণ মানুষেরাই ভারতের দেহ—সে দেহ যদি 'কটিতটমাত্র' আচ্ছাদিত থাকে তবে সেই কটিমাত্র বস্ত্রেই সদর্পে ডাক দিতে হবে ভ্রাতৃত্বের।

কাপুরুষ কখনো স্বাধীনতা পায় না, পেলেও রাখতে পারে না। কাপুরুষ কে? যে পরের মার খেয়ে ঘরে এসে নিষ্ঠুর।—অত্যাচারিগণ,

মনে রাখো, অত্যাচার ও দাসত্ব একই বস্তুর এপিঠ ওপিঠ, স্বামীজী বললেন। যে অপরকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয়, তার স্বাধীন হবার অধিকার নেই—তাঁরই কথা। তাই 'দাসসুলভ ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা' যাদের, যাদের মধ্যে 'লজ্জাকর কাপুরুষতা'—তাদের সতর্ক করে স্বামীজী বলেছেন, এর দ্বারা তোমরা স্বাধীনতা পাবে না।

শুদ্র-অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্বামীজী ভবিষ্যৎ বাণী করেছেন, তিনি আশঙ্কা করেছিলেন, যদি উচ্চবর্ণের সহানুভূতি ব্যতিরেকেই সে উত্থান ঘটে, তাহলে উত্থানের বেগে উচ্চবর্ণকে ধ্বংস তো করবেই, অধিকন্তু ধর্ম বা অধ্যাত্মবাদ উচ্চবর্ণের দ্বারা পুষ্ট এই সন্দেহে তারা ধর্মনাশা জড়বাদের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেবে। অথচ স্বামীজীর কাছে ধর্ম সর্বস্ব, ভারতের প্রাণ আছে ধর্মে, বিশ্বের কাছে ভারতের শ্রেষ্ঠ দান ধর্মদান,—সে ধর্মকে রক্ষার উপায় কি? স্বামীজী উচ্চবর্ণকে বলেছেন, যদি বাঁচতে চাও অত্যাচার থামাও, মানুষের ন্যায্য অধিকারকে স্বীকার কর, অন্যদিকে জাগরণোন্মুখ জনসাধারণকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন ভারতের নিত্য আদর্শকে—আত্মতত্ত্বকে।

এইজন্যই বলেছি 'বর্তমান ভারতের' স্বাভাবিক উপসংহার এই 'ভারত-মন্ত্র'।

আবার এই 'ভারতমন্ত্রের' মধ্যে বিবেকানন্দ ভারতীয় মহাজাতির জন্য সর্বোত্তম আদর্শ স্থাপন করেছেন।

প্রথমেই দিয়েছেন নারী জাতির আদর্শ। শাক্ত বিবেকানন্দ শক্তির আদর্শকে আগে রাখবেন, তাই স্বাভাবিক। নারী জাতির উন্নতি ভিন্ন ভারতের উন্নতি নেই—তাঁর চিরপোষিত মত। তদুপরি তিনি জানতেন, জাতির ধর্মীয় আদর্শকে যথার্থভাবে বহন করে নারী—পুরুষ সেখানে বহির্মুখ ও উৎকেন্দ্রিক। নারীদের শিক্ষা দাও তারাই তাদের পথ নির্মাণ করে নেবে, স্বামীজী বলেছেন,—তিনি না বললেও যুগধর্মে নারীরা শিক্ষিত হবেই। কিন্তু সেই নারী যদি নবশিক্ষায় আদর্শভ্রষ্ট হয়, বিবেকানন্দের আশঙ্কা, তাতে ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তি দুর্বল হয়ে যাবে।

নারীর সামনে তিনটি আদর্শ চরিত্র উপস্থিত করেছেন—সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তী। অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী প্রভৃতি পঞ্চকন্যার পঞ্চামৃতকথা নিবেদন করেননি।

সর্বাগ্রে সীতাকে এনেছেন কারণ স্বামীজীর নিঃসংশয় ধারণায়, সীতার

তুল্য চরিত্র অতীতে আঁকা হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আশ্চর্য, বিদ্যাসাগরেরও এই ধারণা, এবং মধুসূদনের।

সীতার বন্দনায় হিন্দু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, অজ্ঞেয়বাদী বিধবাবিবাহ প্রবর্তনকারী বিদ্যাসাগর এবং ধর্মান্তরিত মধুসূদন জোটবদ্ধ।

সীতার মূল মহিমা ত্যাগে ও সহনে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এই মূর্তিমতী ত্যাগকে প্রমাণ করবেন বিচিত্র নয় কিন্তু যিনি নারীর উপর চাপিয়ে-দেওয়া অসম্ভব ও অযৌক্তিক ত্যাগাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। সেই বিদ্যাসাগরও সীতা চরিত্রের এমন অনুরাগী, এবং মধুসূদন, অসামাজিক বাসনার 'বীরাঙ্গনাদের' স্রষ্টা যিনি!

সীতার মধ্যে আছে নিঃশেষ আত্মবিলয়, সাবিত্রীর মধ্যে জ্বলন্ত আত্মঘোষণা। প্রেম যে অমৃত, প্রেমের স্পর্শে যে মৃতদেহে জীবন সঞ্চারিত হয়, একথা সাবিত্রী প্রমাণ করলেন মৃত্যু-সংগ্রামে জয়ী হয়ে। সাবিত্রীর এই মৃত্যুজয়ের মহিমাকে উদ্ভাসিত করেছেন শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্যে।

নারীর মধ্যে যে বীর্য, সাবিত্রী তারই দেবী।

আর একটি মৃত্যুঞ্জয় প্রাণকে বিবেকানন্দ বারবার নমস্কার করেছেন—সেই কিশোর মহাপুরুষের নাম নচিকেতা।

বিবেকানন্দ নিজ জীবনে মৃত্যুকে জয় করেছিলেন। আর যেখানেই সেই সিদ্ধি দেখেছেন শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। 'আমি আমাকেই নমস্কার করি' —আত্মবিৎ-এর উপলব্ধি।

দময়ন্তী প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক নায়িকা। দময়ন্তীর প্রেম-রচনায় ভারতীয় কবি কল্পনার লীলা ও অনুভূতির ঐশ্বর্যকে উজাড় করে দিয়েছেন। দেবতাকে বর্জন করে যে প্রেম মানবাভিমুখী, দময়ন্তীর সেই প্রেম, সে প্রেম অরণ্যে একই বস্ত্রের সিংহাসনে দয়িতের আসন রচনা করে।

সীতা—সাবিত্রী—দময়ন্তী: নারীর তিন আদর্শ।

এবার পুরুষের আদর্শ। তাদের উপাস্য হোক উমানাথ, সর্বত্যাগী শঙ্কর।

কিন্তু উমাকে গ্রহণ করে যিনি উমানাথ, তিনি সর্বত্যাগী হলেন কি করে? স্বামীজীর উত্তর—সেই বিপরীতটা শঙ্করের জীবনে সত্য বলেই, তিনি আদর্শ। উমানাথ উমা-তপস্যায় ধরা দিয়েছিলেন, কুমারসম্ভবের

দেবতা তিনি, কিন্তু তবু তিনি সর্বত্যাগী। এমনকি তাঁর সম্বন্ধে 'ত্যাগ' বললেও যথেষ্ট বলা হয় না, বলা উচিত 'সংহার'—সংহারই সর্বোচ্চ ত্যাগ, —সংহারের শ্মশানে তিনি বসে থাকেন, অথচ সংহারের তরল বেদনাকে তুলে রাখেন কণ্ঠে, তাঁর সর্বত্যাগ একটি গ্রহণে আকারিত—তিনি গরলে নীলকণ্ঠ।

সৃষ্টির মঙ্গলের প্রয়োজনে যে প্রলয়ের দেবতা সংসারী হয়েছেন, তাঁকে উপাস্যরূপে স্বামীজী উপস্থিত করবেনই, কারণ অতঃপর তাঁর বক্তব্য—'তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে।'

'তোমর জীবন ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে'—কিন্তু কার সুখের জন্য—সমাজের? সে সমাজ তো আদর্শ সমাজ নাও হতে পারে! সে ক্ষেত্রে স্বামীজী বললেন, 'তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত', অর্থাৎ একটি উচ্চতর উদ্দেশ্যের জন্য সৃষ্ট এই জীবন; এবং সমাজ যখন মহামায়ার ছায়া-মাত্র' তখনই সেই সমাজের জন্য আত্মদান করবে মানুষ।

সমাজকে মহামায়ার ছায়া বলে স্বামীজী জানালেন, সৃষ্টি আকস্মিক কিছু নয়—অখণ্ড সত্যের ছায়ারূপ, মহামায়ার ছায়াবসানে যা স্বয়ং অখণ্ড সত্যস্বরূপ। ৮

'ভুলিও না নীচ জাতি, মূর্খ দরিদ্র, অজ্ঞ…'অংশটি আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। স্বামীজী স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, ভারতবাসী ভারতবর্ষে জন্মসূত্রে একজাতি নয়—একজাতি রক্তসূত্রে।

এর পরেই আছে বিপুল প্রাণের মহাচ্ছন্দ, এক অসাধারণ কাব্যের প্রবাহ, যা প্রতি উচ্চারণে নূতন—'বল, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী।'

কিন্তু তবু প্রশ্ন—তোমার দেবদেবী না হতে পারে! উত্তর, তোমার দেবতাও তো ভারতেরই দেবতা—তাকেই নমস্কার কর। তবু প্রশ্ন—যদি দেবতা না মানি? উত্তর—তাতেও ক্ষতি নেই, তোমার জন্য আছে ভারতের সমাজ, ভারতের মৃত্তিকা—সেখানে সবার আসন।

মোক্ষই ভারতের শেষ আদর্শ। তার ক্রমপরিণত রূপকে স্বামীজী প্রকাশ করলেন শৈশবের শিশুশয্যা থেকে বার্ধক্যের বারাণসীর কথা বলে।

তারপরে—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ। এই ভূগোল-পূজা কি বজায় থাকবে যদি ভারতবর্ষ আদর্শ ত্যাগ করে?

তার উত্তর আছে স্বামীজীর পরবর্তী প্রার্থনায়। সে প্রার্থনা তিনি করেছেন গৌরীনাথ ও জগদম্বের কাছে, অর্থাৎ শান্ত মঙ্গলের কাছে এবং ঐ শান্ত সত্যের ক্রিয়াত্মিকা রূপের কাছে।

স্বামীজীর সেই শেষ প্রার্থনা—'আমায় মনুষ্যত্ব দাও।' দুর্বল ও কাপুরুষ মনুষ্যত্বের অধিকারী হয় না, তাই—'দুর্বলতা ও কাপুরুষতা দূর কর।'

তবু যে সম্পূর্ণ বলা হল না, মনুষ্যত্ব একটা অ্যাবসট্রাক্ট ব্যাপার, মনুষ্যত্বের লক্ষণ নিয়ে তর্ক হয়, কিন্তু মানুষ হলে আর সন্দেহ থাকে না,—মানুষই প্রমাণ।

স্বামীজীর একেবারে শেষ কথা—'মা আমায় মানুষ কর।'

বিবেকানন্দের ভারতবর্ষ সমাপ্ত হয়েছে মানবধর্মে। কিন্তু সে ধর্ম ভূমিহীন নয়—তার ভিত্তি ভারতভূমিতে।

কোনো একটা ধর্মের মধ্যে জন্মান ভাল, কিন্তু তার মধ্যে মৃত্যু ভয়ঙ্কর—স্বামীজী বলেছেন। ভারতের পুণ্যভূমিতে যে জন্ম নিয়েছে সে যেন নিখিল মানবের তীর্থভূমিতে উত্তীর্ণ হয়।

বেদান্তের মহাসত্যের উপলব্ধি ক্ষেত্ররূপে এই ভারতবর্ষই আবার বিবেকানন্দের কাছে শ্রেষ্ঠতম মানবতীর্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। তাকি দেশপ্রেমবশে?

রবীন্দ্রনাথ কি দেশপ্রেমবশেই 'এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে' লিখেছিলেন? মরণের শান্তি পারাবারের সামনে দাঁড়িয়েও একই কথা বলেছিলেন ভূগোল-পূজার জন্যই?

বিবেকানন্দের স্বদেশ চিন্তার পূর্ণতা এই ভারতমন্ত্রে।

আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল ১৮৬৪-১৯৩৮

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

আকাশের এক জায়গায় নক্ষত্ররা ভীড় করে। জাতির ভাগ্যাকাশও বুঝি ঐ রকম। এক একটা বিশেষ মুহূর্তে মনীষীরা আবির্ভূত হন। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। আকাশের দলবাঁধা নক্ষত্রের মতো কয়েকজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেছিলেন তখন। উনবিংশ শত্যাব্দীর সেই জ্যোতিষ্কদের অন্যতম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। তবে সাধারণ জ্যোতিষ্কের মতো নির্দিষ্ট কোনো কক্ষপথে পরিভ্রমণ করেননি তিনি। জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাহিত্য-সংস্কৃতির কোনো একটা বিশেষ শাখায় পারদর্শিতা অর্জন করেননি। জ্ঞানজগতের নতুন নতুন নীহারিকালোক তাঁর গন্তব্যস্থল। দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতি, চিকিৎসা, গণিত সবকিছুই তাঁর নখদর্পণে। এমন মনস্বী, বহু বিচিত্র জ্ঞানলোকের এমন একনিষ্ঠ অভিযাত্রী এ যুগে বিরল। এ যুগে স্পেসালিজেশানের যুগ। এখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন একটি শাখার বিশেষ একটি প্রশাখায় পারদর্শিতা দেখালেও পণ্ডিত নামে অভিহিত হওয়া যায়। বহু শাস্ত্রের বহুবিধ শাখাপ্রশাখায় ব্যুৎপত্তি লাভ করতে হয় না। তাই এ যুগের এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। বহু বিদ্যার বহু বিচিত্র জ্ঞানালোকে তাঁর জ্ঞানের প্রদীপ দেদীপ্যমান। বহু জ্ঞানের পুণ্য-স্পর্শে তাঁর জীবনভূমি মহিমময়। জন্ম-শতবার্ষিকী উপলক্ষে সেই মহিমময় জ্ঞানতপস্বীর জীবনকথা ও কর্মসাধনার ইতিবৃত্ত অনুসরণের চেষ্টা চলছে। বিশ্বকোষের হাজার প্রবন্ধের আকর যিনি, তাঁর পরিচয়কে তুলে ধরবার প্রয়াস চলছে একটি দুটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধে। কিন্তু ক্ষুদ্র কোনো প্রবন্ধের সীমিত গণ্ডীতে তাঁর সত্যিকারের পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। আসল বিশ্বকোষকে পাওয়া যাবে না সেখানে। বিশ্বকোষ পাঠের ভূমিকাটুকুই জানা যাবে শুধু।

আজ থেকে একশত বৎসর আগেকার কথা। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহেন্দ্র শীল সে যুগের এক বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন। কলকাতা

হাইকোর্টের উকিল হিসেবে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। শোনা যায় তখনকার প্রধান বিচারপতি পিকক সাহেব তাঁকে সমীহ করে চলতেন। কিন্তু মহেন্দ্র শীলের মনওতে ভরে নি। ওকালতি ব্যবসায়ের জয়মাল্য তাঁকে খুশি করতে পারেনি। তাঁর মন পড়ে থাকত দর্শন আর গণিতের রাজ্যে। কখনও বা ভাষা-চর্চায় মেতে উঠতেন তিনি। নিবিষ্টচিত্তে বিদেশী ভাষা শিখতেন। এই ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। বহু ভাষাবিদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নিজেকে। ইংরাজি, ফরাসি, জার্মান, ইতালীয় ও স্পেনীয় ভাষায় দখল ছিল তাঁর। তিনি অগস্ত কোমতের দর্শন পড়েছিলেন মূল ফরাসি থেকে। আইনেও তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ। কিন্তু সেই পাণ্ডিত্যের তিনি অপব্যবহার করেননি। অর্থ নয়, জ্ঞানোপার্জনই তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। যখন যা কিছু পড়েছেন তন্ন তন্ন করে পড়েছেন। যখন যা কিছু জেনেছেন, পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে জেনেছেন। মহেন্দ্র শীলের এই অদম্য স্পৃহা, জ্ঞানার্জনের এই বিপুল আগ্রহ তাঁর দ্বিতীয় পুত্র ব্রজেন্দ্রনাথের মধ্যে সংক্রামিত হল। ছোটবেলা থেকেই দেখা গেল, জ্ঞানের রাজ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ অল্পে তুষ্ট নন। একসঙ্গে অনেকখানি না জানলে, একবারে অনেক কিছু না পড়লে কোনো-মতেই পরিতৃপ্ত হন না তিনি।

ব্রজেন্দ্রনাথ তখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র। স্কুলে পড়েন। হঠাৎ একদিন বীজগণিতের নেশায় ধরল তাঁকে। গ্রীষ্মের ছুটিতে সমগ্র বীজগণিত আয়ত্ত করে ফেললেন। ব্রজেন্দ্রনাথের কাণ্ড দেখে বাড়ির লোকেরা, বন্ধুরা—সকলেই অবাক। মাষ্টার-মশাইরা সবিস্ময়ে তাকালেন এই প্রতিভাবান ছাত্রটির দিকে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে স্কুলপাঠ্য বীজগণিত শেষ করে তখন সে চাইছে উচ্চতর গণিতের রাজ্যে প্রবেশ করতে। অথচ সুযোগ জুটছেনা কোনোমতেই। সংসারের চরম দারিদ্র্য কিশোর ব্রজেন্দ্রনাথকে গ্রাস করতে চাইছে। পিতা বেঁচে নেই। মাত্র ৩২ বৎসর বয়সে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। স্ত্রী-পুত্রদের ফেলে রেখে গেছেন চরম দুর্দশার মধ্যে। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন সাত বছরের বালক। অনন্যোপায় মাতুলালয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি। সঙ্গে রইলেন অগ্রজ রাজেন্দ্রনাথ। কিন্তু মাতুলালয়ের অবস্থাও ভালো ছিল না। তাই দুঃখ-দৈন্যের সঙ্গে নিয়ত সংগ্রাম করে কিশোর ব্রজেন্দ্রনাথকে এগোতে হ'ল। ছোটবেলা

থেকেই বিত্তের অভাব তিনি পূর্ণ করলেন চিত্তের খোরাক জুটিয়ে। এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষা অবধি গণিত-বিদ্যার এক আনন্দময় জগতে নিমগ্ন করে রাখলেন নিজেকে। এন্‌ট্রান্স্ পরীক্ষায় তিনি বৃত্তি পেলেন। তারপর ভর্তি হলেন জেনারেল এসেম্ব্লী ইন্‌স্টিটিউশনে।

এবার নতুন দুই জগতের সন্ধান পেলেন তিনি। সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। এতদিন যেমন ছিল গণিত, এখন তেমনি হল সাহিত্য ও দর্শন। এবার তিনি নিত্য নূতন বই-পড়ায় মেতে উঠলেন। এখন আর বইয়ের অভাব নেই। কলেজ-গ্রন্থাগার আছে, আর আছেন অধ্যক্ষ ড. হেস্টি। ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে এই অধ্যক্ষের অবদান গভীর ও ব্যাপক। তাঁকে সাহিত্য ও দর্শন-চর্চায় তিনিই প্রথম অনুপ্রাণিত করেন। নিত্য নূতন বইয়ের সন্ধান দিয়ে এই তরুণ জ্ঞানান্বেষীকে উৎসাহিত করেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ এক বিচিত্র মানুষ। জ্ঞানরাজ্যের বিশেষ কোনদিক তাঁর মনকে দীর্ঘকাল ধরে রাখতে পারে না। তাই দেখি, জেনারেল এসেম্ব্লী ইন্‌স্টিটিউশনের পাঁচ বছরের ছাত্রজীবনে তিনি সাহিত্য ও দর্শন যেমন পড়ছেন, তেমনি পড়ছেন ইতিহাস, আইনশাস্ত্র এমনকি ভাষাতত্ত্ব। ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিচিত্র সব কাহিনী প্রচলিত আছে। একটির কথা বলি এখানে। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। অধ্যক্ষ ড. হেস্টির কাছে লজিক পড়েন। একদিন দেখা গেল অধ্যক্ষের হাতে দুরূহ একটি লজিকের বই। ব্রজেন্দ্রনাথের লোভী দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বইটির উপর। অনেক চেষ্টা করেও সে লোভ কোনমতেই দমন করতে পারলেন না তিনি। ড. হেস্টির কাছে গিয়ে বললেন, তিনিও বইটি পড়তে চান। তরুণ ছাত্রের কথা শুনে হেস্টি তো অবাক। বই দিতে প্রথমটায় রাজী হলেন না তিনি। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথও ছাড়বেন না। বার বার ঐ একই অনুরোধ করতে লাগলেন তিনি।

শেষ অবধি নাছোড়বান্দা ব্রজেন্দ্রনাথেরই জয় হ'ল। ড. হেস্টির কাছ থেকে বইটি আদায় করে তিনি ছাড়লেন। বাড়ি গিয়েই সঙ্গে সঙ্গেই পড়া শুরু করলেন। তিন দিনে বই শেষ। তারপর হেস্টিকে বইটি ফেরত দিতে গিয়ে বললেন যে ও বই তার পড়া হয়ে গেছে।

কথা শুনে হেস্টি অবাক।

কিন্তু পাকা শিক্ষাবিদ্ তিনি। ছাত্রদের চটকদার কথায় ভোলেন না।

তাই ব্রজেন্দ্রনাথকে পরীক্ষা দিতে হল। মৌখিক পরীক্ষা। ড. হেস্টি প্রশ্ন করছেন একটার পর একটা। জবাব দিচ্ছেন শ্রুতিধর ব্রজেন্দ্রনাথ। অনর্গল মুখস্থ বলে যাচ্ছেন সে বইয়ের বিভিন্ন অংশ। ড. হেস্টি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। এমন ছাত্র তিনি জীবনে দেখেন নি। এই ঘটনার পর থেকেই ড. হেস্টির সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের যোগসূত্র ক্রমে নিবিড় ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠল।

শুধু ড. হেস্টির কথাই বা বলি কেন, যখন যেখানে পড়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ, সেখানেই শিক্ষকরা তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। স্কুলে মুগ্ধ হয়েছেন মাষ্টার মশাইরা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে এম্-এ পড়বার সময়েও অধ্যাপকদের অকুণ্ঠিত স্নেহ-প্রীতি লাভ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ।

এম. এ. পাশ করার পর তিনি অর্থশাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্য ও হিন্দুদর্শন পাঠ করতে লাগলেন, তারপর হঠাৎ একদিন মেতে উঠলেন ভূ-বৃত্তান্ত চর্চায়। কিন্তু যখন যা পড়েছেন তিনি, অভিনিবেশ সহকারে পড়েছেন, তন্ন তন্ন করে পড়েছেন। এক কথায় সর্ববিদ্যা-বিশারদ তিনি। একবার এক ভদ্রলোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে দেখলেন, তিনি রাশি রাশি ম্যাপ আর চার্ট ছড়িয়ে নিয়ে বসেছেন। তন্ময়চিত্তে অধ্যয়ন ক'রে চলেছেন দক্ষিণ আমেরিকার ভূ-প্রকৃতি।

অধ্যয়নের বিস্ময়কর গীভরতা ও বিশালতা ছিল তাঁর। যখন যা' পড়তেন তিনি, খুঁটিয়ে পড়তেন। যখন যা' জানতেন, তলিয়ে জানতেন। ইংরেজি সাহিত্য পড়বার সময় তিনি স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের দুর্বোধ্য পল্লীগাঁথাগুলো পর্যন্ত আয়ত্ত করেছিলেন। বিদেশীভাষার চর্চা করতে গিয়ে একসঙ্গে অনেক রকম ভাষা শিখেছিলেন তিনি। দর্শনশাস্ত্র পড়বার সময় ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের প্রায় সমস্ত গ্রন্থ পড়েছিলেন। আর অসাধারণ ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি ও কর্মনিষ্ঠা। একবার পড়েই সব কিছু মনে রাখতে পারতেন তিনি। একবার দেখেই বুঝতে পারতেন, কোন কাজটি কিভাবে করলে সুচারুরূপে সম্পন্ন হবে।

এই কর্মনিষ্ঠা ছিল বলেই ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মজীবনও গৌরবময়। তাঁর কর্মজীবন শুরু হল কলকাতার জেনারেল এসেমব্লী ইনষ্টিটিউশনে। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে ঐ কলেজের অধ্যাপক হলেন তিনি। তারপর হলেন ফেলো।

কয়েকমাস পর তিনি কলকাতার সিটিকলেজে কাজ নিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই শিক্ষাবিদ্ হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। এই তরুণ অধ্যাপকের বিদ্যাবত্তা ও সহৃদয়তায় ছাত্ররা হল মুগ্ধ। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি, যখন যে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে গিয়েছেন ব্রজেন্দ্রনাথ, সেখানেই ছাত্রদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করেছেন। পাণ্ডিত্য, গাম্ভীর্য ও অহঙ্কারের কৃত্রিম পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে ছাত্রদের সঙ্গে কোনোদিন তিনি ব্যবধান রচনা করেন নি। তাই সর্বত্রই তিনি নিরহঙ্কারী 'ছাত্র-বান্ধব হিসেবে সকলের ভালবাসা পেয়েছেন। স্বদেশে জেনারেল এসেম্ব্লী ইন্‌স্টিটিউশান ও সিটি কলেজের অধ্যাপক (১৮৮৪-৮৫) হিসেবে পেয়েছেন, বহরমপুর কলেজ (১৮৮৭-৯৬) ও কুচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজের অধ্যক্ষ (১৮৯৬-১৯১৩) হিসেবে পেয়েছেন, পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেণ্টাল ও মরাল সায়ান্সে ও দর্শনের পঞ্চম জর্জ অধ্যাপক (১৯১৩—১৭) হিসেবে। প্রবাসেও আদর্শ শিক্ষাবিদ্ হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ যে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা পেয়েছেন, খুব কম আচার্যের জীবনেই তেমন ঘটে। কি নাগপুরে মরিস কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ হিসেবে (১৮৮৫-৮৭), কি মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে (১৯২১-৩০) সর্বত্রই ছাত্রদের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা-প্রীতি লাভ করেছেন তিনি।

নাগপুরের মরিস্ কলেজে ব্রজেন্দ্রনাথ অল্প কিছুদিন কাজ করেছিলেন। কিন্তু এরই মধ্যে তিনি ছাত্রদের হৃদয় জয়ে সমর্থ হন। মরিস কলেজে ব্রজেন্দ্রনাথের সাফল্যের পরিচয় দিতে গিয়ে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস লিখেছেন,

"কিন্তু সেই অল্পকালের মধ্যে তিনি নাগপুরের ছাত্রজগতে এরূপ প্রিয় হইয়াছিলেন যে, বোধ হয় আজ পর্যন্ত কোন অধ্যাপক সেরূপ হইতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। বিদ্যাতে বল, বিনয়ে বল, কোমল স্বভাবে বল তিনি তাঁহার ছাত্রদিগকে মায়াজালে বাঁধিয়াছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।"[১]

মরিস্ কলেজে মায়াজাল; মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়েও মায়াজাল। মহীশূরের উপাচার্য হিসেবে কাজ করার সময়েও ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতা, চরিত্র-গৌরব ও স্নেহপ্রীতিতে ওখানকার ছাত্রসমাজ থেকে সুরু ক'রে জনসাধারণ এমনকি রাজ্যসরকার পর্যন্ত নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল। উপাচার্য থাকবার সময়ে তিনি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা রচনা

১। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী (৩য় ভাগ, ১৯৩১) পৃঃ ১১৭।

করেন, তাতে প্রাথমিক থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েট অবধি সকল স্তরের শিক্ষাই স্থান পেয়েছিল। প্রতিস্তরের শিক্ষার শেষে ছাত্রদের বৃত্তিমূলক ও কার্যকরী শিক্ষাদানের সুযোগ ঐ পরিকল্পনায় ছিল। এছাড়া মহীশূরে থাকবার সময় তিনি যে শাসনতান্ত্রিক কাঠামো তৈরি করেন, তাতে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নের চিত্র ছিল; ছিল সংখ্যা-লঘুদের অধিকারের কথা। মহীশূরের শিল্প-প্রতিষ্ঠান সমূহকে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ও অনুপ্রেরণা দানের পরিকল্পনাও তিনি করেছিলেন। এ থেকে অর্থনীতির ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

সুদীর্ঘ নয় বৎসরকাল ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দিক দিয়ে উন্নতি হয়েছিল। এছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ কাউন্সিলের অতিরিক্ত সদস্য (১৯২৫-২৬) হিসেবে, মহীশূর সরকারের শিক্ষাপরামর্শদাতা এবং শিক্ষা-বোর্ড ও রাজ্যের গণতান্ত্রিক সংস্কার কমিটির সভাপতি (১৯২২-২৩) হিসেবেও ঐ রাজ্যের সেবা করেছেন। মহীশূরে ব্রজেন্দ্রনাথের কর্মসাধনার ও চিন্তাক্রমের সামগ্রিক পরিচয় দিতে গিয়ে প্রবাসী-সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন।

"তিনি মহীশূর রাজ্যের কনষ্টিটিউশন বা ভিত্তিভূত ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে মন্তব্য লেখেন, তাহা রাজনীতি বিষয়ে তাঁহার বিস্তৃত ও প্রগাঢ় জ্ঞান বা চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য ও আদর্শ সম্বন্ধেও তিনি মৈসুর বিশ্ববিদ্যালয় সংগঠন উপলক্ষে যাহা লিখিয়াছেন, সমুদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদয় কর্মীর তাহাপাঠ করা উচিত।"[২] ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে মহীশূর সরকার আচার্য শীলকে "রাজতন্ত্র প্রবীন" উপাধি প্রদান করেন।[৩] ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ২৩ শে ফেব্রুয়ারী ব্রজেন্দ্রনাথ মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। তাই মহীশূরের রাজ্য-সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁর প্রভূত প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও তিনি কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। অবসর গ্রহণের পর রাজ্যের 'বহুবিধ কল্যাণ-কর্মে ব্রজেন্দ্রনাথের অবদানের কথা সবিস্তারে উল্লেখ ক'রে, এক রাজকীয় ইস্তাহারে মহীশূর সরকার লিখেছিলেন।

"তিনি আগাগোড়াই অদম্য উৎসাহ এবং অনন্যসাধারণ কর্তব্যনিষ্ঠা

২। প্রবাসী, শ্রাবণ ১৩৩৩

৩ ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৪৫, পৃঃ ১১৭

সহকারে কাজ করিয়াছেন। শুধু মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নহে, রাজ্যের সাধারণ এবং কারিগরী শিক্ষার উন্নতিসাধনে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য এবং অভিজ্ঞতা যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ৬ বৎসর পূর্বে মহারাজার ইচ্ছানুসারে মহীশূর রাজের শাসনতন্ত্রের যে সমস্ত সংস্কার প্রবর্তিত হয় তদ্বিষয়ে স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন, এই সম্পর্কে তাহার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন, তিনি রাজ্যের যে প্রভূত সেবা করিয়াছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ মহারাজা তাঁহাকে 'রাজতন্ত্র প্রবীন' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। ভারত গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে নাইট উপাধি দিয়া তাঁহাদের গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন। মহারাজা প্রার্থনা করেন, স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অবসর গ্রহণ করার পর শান্তিতে কালযাপন করিবেন।"[8]

কিন্তু মনে যেন রাখি, পূর্ণ অবসর ব্রজেন্দ্রনাথ কোনদিনই গ্রহণ করেন নি। তা'র কর্মসাধনার পরিধি ছিল বিরাট। শুধুমাত্র চাকুরীর নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি তিনি। তাই দেখি, মহীশূরের উপাচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলা-মঙ্গলের কথা চিন্তা করছেন, বাংলাদেশের শিক্ষা—ব্যবস্থা নিয়ে ভাবছেন, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়কে বিভিন্ন ব্যাপারে সাহায্য করছেন।[৫] এ সম্বন্ধে ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ সংখ্যা প্রবাসীর সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল :

> "পরলোকগত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ করিবার সময় নানা বিদ্যা-বিষয়ে যেরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিতেন, তাহার অনেকটা শীল মহাশয়ের সহিত পরামর্শের ফল।"

এছাড়া কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রেসিডেণ্ট মাইকেল স্যাড্‌লার আচার্য শীলের কাছে নানা ভাবে ঋণী। মাইকেল স্যাড্‌লার লিখেছিলেন :

> "He has indeed guide, philosopher and friend to me. More than fifteen years have passed since we last met in the flesh. But the feeling of his presence is still in my mind"[৬]

৪ বঙ্গবাণী, ফেব্রুয়ারী ১৯৩০।

৫ Modern Review : January 1939.

৬ Modern Review : January 1936

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আচার্য শীলের সুদীর্ঘকালের যোগাযোগ ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন প্রস্তুতের জন্য গঠিত 'সিমলা কমিটি'র (১৯০৫) তিনি ছিলেন অন্যতম সভ্য।

কিন্তু স্মরণে যেন রাখি, শিক্ষার ক্ষেত্রেই শুধু নয়, মানবধর্ম ও সংস্কৃতির বৃহত্তর কর্মসাধনার সঙ্গেও তিনি নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে রোমে অনুষ্ঠিত ওরিয়েণ্টালিষ্ট্ কংগ্রেসের তিনি ছিলেন অন্যতম প্রতিনিধি। এ ছাড়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম বিশ্বজাতি কংগ্রেসের[৭] উদ্বোধন করেন তিনি। নৃতত্ত্ব ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় পারদর্শিতার জন্যে তিনি ঐ কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। সেখানে অসামান্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেন তিনি। অনন্য মনস্বিতায় পাশ্চাত্ত্য জগৎকে মুগ্ধ করেন।

স্বদেশের ধর্মসাধনা ও কর্মযজ্ঞের সঙ্গেও ব্রজেন্দ্রনাথের বরাবর সংযোগ ছিল। ১৩৪৩ সালের ফাল্গুন মাসে রামকৃষ্ণদেবের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে যে সর্বধর্ম-সম্মেলন হয়, আচার্য শীল তার উদ্বোধনী ভাষণ দেন।[৮] আচার্য শীল পরমহংস দেবকে সাক্ষাৎভাবে জানতেন এবং তিনি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের সতীর্থ ও বন্ধু।

এ ছাড়া স্বদেশের ধর্মকর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহু বিচিত্র সভা-সম্মেলনের সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের যোগাযোগ স্থাপিত হয়। কখনও সংস্কৃতি-সম্মেলনে ভাষণ দিচ্ছেন তিনি,[৯] কখনও ঐতিহাসিক—সংস্থা[১০] বা অর্থনীতিবিদের সম্মেলনে[১১] জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন, কখনও বা পৌরাণিকদের সভায়[১২] সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন, কখনও আবার দূরপ্রাচ্য থেকে আগত চিকিৎসক-সভ্যদের কাছে ভারতীয় ঔষধের গুণাগুণ বর্ণনা করেছেন।

সভা-সমিতিতে প্রদত্ত এসব অভিভাষণ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে মনে

৭ First universal Races Congress

৮ আচার্য শীলের ভাষণ ১৩৪৩ সালের এপ্রিল সংখ্যা মডার্ণ রিভিয়ুতে প্রকাশিত হয়েছিল।

৯। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতা। Indian Berearch Institute (1936)

১০। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী কলেজে ঐতিহাসিকদের কাছে প্রদত্ত ভাষণ।

১১। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ৩০শে জুলাই মহীশূরে অনুষ্ঠিত অর্থনীতিবিদ্ সম্মেলনে প্রদত্ত অভিভাষণ।

১২। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ৯ই আগষ্ট তারিখের আলোচনা।

রাখা প্রয়োজন, সর্ববিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন বলেই সকল জায়গা থেকে ব্রজেন্দ্রনাথের ডাক আসত। কিন্তু যত জানতেন ব্রজেন্দ্রনাথ, তত লিখতেন না। তাঁর জ্ঞানের পরিধির তুলনায় রচনার পরিমাণ খুবই অল্প। তিনি যেন বইয়ের জগতে হারিয়ে গেছেন—"Lost in books"; কিন্তু তা সত্বেও বলব, অল্প যা কিছু লিখেছেন তিনি, তারই মধ্যে সুগভীর পাণ্ডিত্য ও অনন্য মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, আচার্য শীল নিজে যা ভালভাবে জানতেন না, যার সত্যতা সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত নন; তা কোনোদিন তিনি কোন মন্তব্য প্রকাশ করেন নি। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ "The positive Science of the Ancient Hindus"—এর[১৩] ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

"I have not written one line which is not supported by the clearest texts." এ মন্তব্য আচার্য শীলের সকল মননশীল রচনা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। তবে এ গ্রন্থে জ্ঞানের যে 'দুর্গম ঊর্ধ্বে', যে 'সমুচ্চ মহিমায়' তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, মননশীল সাহিত্য-রচনার ইতিহাসে তা এক অক্ষয় গৌরবের অধিকারী। খৃষ্টপূর্ব ৫০০ থেকে ৫০০ খৃস্টাব্দ অবধি হিন্দুদের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ। প্রকৃতি-বিজ্ঞানের এবং চর্চায় এবং বৈজ্ঞানিক সূত্র ও চিন্তাধারার গঠনে হিন্দুদের অবদান যে গ্রীকদের চেয়ে নগণ্য নয় এবং হিন্দুদের এই বিজ্ঞানচেতনার প্রভাব যে সমগ্র প্রাচ্যে এমন কি পাশ্চাত্য দেশেও ছড়িয়ে পড়েছিল, আচার্য শীল এখানে তা প্রতিপন্ন করেছেন। তবে হিন্দু-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদনের প্রয়াস অপেক্ষা তাদের মুল বিজ্ঞান-সাধনার কথাই এই গ্রন্থে প্রাধান্য পেয়েছে। এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে পদার্থ ও রসায়নবিজ্ঞানে প্রাচীন হিন্দুদের ধ্যান-ধারণা, শব্দবিজ্ঞান, উদ্ভিদ জীবন সম্বন্ধে হিন্দুদের জ্ঞান, হিন্দুমতে জীবজন্তুর শ্রেণীবিভাগ, হিন্দু শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা এবং পরিশেষে হিন্দু চিন্তার বৈজ্ঞানিক রীতি। একদিকে ভারতের প্রাচীনতম যুগে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং অপরদিকে আধুনিক যুগের নবতম বৈজ্ঞানিক চিন্তাধার সঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথের পরিচয় কত গভীর ছিল, এই গ্রন্থটি পড়লে তা জানা যায়। আধুনিক যুগের চিন্তার আলোকে প্রাচীনকালের বিজ্ঞানচর্চার এমন সুস্পষ্ট পরিচয় আচার্য

১৩। ১৯৫৮ সংস্করণ। মতিলাল বারাণসী দাস প্রকাশিত।

শীল ছাড়া আমাদের দেশে আর একজন মাত্র লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি হচ্ছেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তবে "A History of Hindu Chemistry"-র প্রথম[১৪] দ্বিতীয় খণ্ডে[১৫] আচার্য রায় প্রাচীন যুগের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস-রচনার যে রীতি অনুসরণ করেছেন, তা সাধারণ পাঠকদের কাছে কিছুটা জটিল ও দুর্বোধ্য মনে হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু আচার্য শীল তাঁর বক্তব্য বিষয়কে আরও অনেক সহজ ও সরল ক'রে পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন। আচার্য শীলের ভাষা, রচনারীতি, অধ্যায়-বিভাগ,—সব কিছুই সুন্দর ও সুপরিকল্পিত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য, আচার্য রায়ের Hindu Chemistry-র একটি বিস্তৃত অংশ[১৬] ব্রজেন্দ্রনাথের লেখা। সে অংশ অবশ্য ব্রজেন্দ্রনাথের Positive Sciences-এও স্থান পেয়েছে। কিন্তু Hindu Chemistry-র বিষয় বিভাগ ও পরিকল্পনার দিকে তাকালে মনে হয় ব্রজেন্দ্রনাথের অধ্যায়টি সংযুক্ত না হলে এ গ্রন্থ অপূর্ণ থেকে যেত।

এ ছাড়া গণিত নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রেও ব্রজেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অপরিসীম। বহরমপুর কলেজের অধ্যক্ষ থাকার সময় তিনি রচনা করেন "A Memoir on the coefficients of Numbers" (1891). 'Theory of Number' সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা আছে এতে। গণিতপ্রিয় কিশোর ব্রজেন্দ্রনাথ যৌবনে গণিত-বিজ্ঞানের তত্ত্বকে কিভাবে অধিগত করেছিলেন, এ গ্রন্থে তার পরিচয় মিলবে। আর সাহিত্য-সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁর প্রগাঢ় নিষ্ঠা ও অভিনব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় মিলবে "New Essays in Criticism" (1903) নামক গ্রন্থে। এ গ্রন্থে সংকলিত কীট্‌স্ সম্বন্ধে লেখা[১৭] প্রবন্ধটির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি। অতি অল্প কথায় কীট্‌সের কবি-ধর্মকে ব্রজেন্দ্রনাথ কিভাবে প্রকাশ করেছেন, এ থেকে তার পরিচয় মিলবে। ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"His poems, which are the outer symbols of a rich and varied mental history, have appeared as a sensuous pano-

১৪ Second edition. Revised and enlarged ; London, 1907.

১৫ Second edition- Revised and enlarged ; Calcutta, 1925.

১৬ রসবিদ্যা ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা এবং হিন্দুদের বৈজ্ঞানিক রীতি নামক দুটি অধ্যায়।

১৭। এ প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

rama, a vista—boundless it may be—of sense-born imagination and appetite-born love."

"Rammohan Roy The Universal Man" (1956) ব্রজেন্দ্রনাথের আর-এক বিস্ময়কর কীর্তি। এ গ্রন্থটি হল রামমোহন রায় সম্পর্কে প্রদত্ত তাঁর দুটি বক্তৃতার সংকলন। প্রথম বক্তৃতাটি তিনি দেন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে। বাঙ্গালোরে রামমোহন রায়ের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে এ আলোচনাটি করেন তিনি। দ্বিতীয় বক্তৃতাটি রামমোহনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর কলকাতায় প্রদত্ত হয়। রামমোহনের জীবনদর্শন নিয়ে এমন পরিপূর্ণ ও গভীর আলোচনা আর কেউ করেন নি। রামমোহনের উপর বিভিন্ন প্রকার ধর্মচিন্তার প্রভাব, নবযুগের পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারার প্রভাব, বেদান্তদর্শনের সঙ্গে রামমোহনের যোগসূত্র, রামমোহনের বিশ্বাসভিত্তি, ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিগত ধর্ম, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্যের সমন্বয়—সাধনা, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কার এবং রামমোহনের বিশ্বমানবতাবোধ এখানে আলোচিত। এ আলোচনা থেকে নূতন এক রামমোহনকে আবিষ্কার করি আমরা; আমাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির নবজাগরণে-পর্বের পথিকৃৎকে খুঁজে পাই। এ ছাড়া ব্রজেন্দ্রনাথ যে ধর্ম চিন্তার কত গভীরে অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন "Comparative Studies in Vaishnavism and Christianity" (1899) নামক গ্রন্থে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। আর সমাজবিজ্ঞানে তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর আছে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'Positive background of Hindu Sociology (1914, 1921) নামক গ্রন্থে।[১৮]

এ ছাড়া বিশ্ব[১৯] ও ভারত-সংস্কৃতি[২০] সম্বন্ধেও তাঁর বহু রচনা আছে। দর্শনশাস্ত্র ও ধর্মে তিনি যে কি বিপুল পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন, তার পরিচয় মিলবে, গীতার অনুবাদ ও ভাষ্য-রচনায় এবং রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ সম্বন্ধে লেখা তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে। রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রেও তাঁর দৃষ্টি যে কতটা সুদূরপ্রসারী ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'British India and

১৮। এ গ্রন্থটি বি. কে. সরকারের সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে লেখেন।

১৯. Race Origins, Universal Races Congressএর ভাষণ এবং ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতা 'War'.

২০. Three ideals : Modern Review, 1937.

the Indian States'[২১] নামক রচনাটিতে। রাজনীতির ক্ষেত্রে আচার্য শীলের চিন্তাধারা বিপিনচন্দ্র পালকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল।[২২]

আচার্য শীলের জীবন ও রচনা নিয়ে আলোচনা করলে দেখি, এইভাবে জ্ঞানজগতের বহু বিচিত্র দিক এবং স্বদেশ ও স্বজাতির বহু বিচিত্র সমস্যা নিয়ে তিনি ভেবেছেন, বলেছেন, লিখেছেন। কিন্তু সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-রচনায়ও আচার্য শীল যে বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচয় রেখে গেছেন, সে কথা আজ আমরা অনেকেই ভুলতে বসেছি। "The Quest Eternal" নামক গ্রন্থে সাহিত্যিক ব্রজেন্দ্রনাথকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এটি হল ইংরেজীতে লেখা একখানি দার্শনিক কবিতার বই। তিনটি স্বতন্ত্র দার্শনিক অনুসন্ধান-সূত্র কবিতার আকারে এখানে বাণীবদ্ধ। মূল দার্শনিক চিন্তাক্রমকে কবিতার মধ্য দিয়ে এখানে তুলে ধরা হয়েছে। যেমন—

Art Thou the Prima Mater,
Mother of Heaven and Earth ?
Adya-Shakti, Prakriti,[২৩]
Or timeless, spaceless Aditi,[২৪]
Witness of Time's birth ?

এ বইটি ব্রজেন্দ্রনাথের যুবক-বয়সে লেখা। রচনাকাল ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু এটি প্রকাশিত হয় রচনার প্রায় ৪৫ বৎসর পরে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে। ব্রজেন্দ্রনাথ তখন কলকাতায় থাকেন। নানা রোগ-শোকে তিনি তখন জর্জরিত। স্ত্রী ইন্দুমতী গত হয়েছেন বহুদিন আগেই। একমাত্র কন্যা সরযূবালাও অকালে বিধবা হয়েছেন। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করলে দেখি, জ্ঞান-জগতের আনন্দ-নিকেতনের অভিযাত্রী হয়ে বার বার জীবনের সকল দুঃখ-কষ্ট শোক-তাপ তিনি ভুলতে চেয়েছেন। এবং নিজে যে পথে শান্তি ও আনন্দ পেয়েছেন. আপন জনকেও পরিচালিত করেছেন সে পথে। বিধবা কন্যা সরযূবালাকে পাঠিয়েছেন বিলেতে, উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে।

২১. Modern Review : January, 1931.

২২. Modern Review : January, 1939.

২৩. সাংখ্য দর্শনের মতে এই প্রকৃতি থেকেই চেতন-অচেতন সব কিছুর সৃষ্টি।

২৪. ঋগ্বেদে অনন্তের প্রতীক।

তাই বলে ব্যক্তিগত দুঃখ-শোক কোনোদিন এই জ্ঞান-তপস্বীকে বিচলিত করতে পারে নি। সমস্ত অভাব-অভিযোগ ও বাধা-বিঘ্নের মধ্যেও তিনি আপন জীবনের জ্ঞানের প্রদীপটিকে অনির্বাণ রেখেছিলেন।

মনস্বী ব্রজেন্দ্রনাথের এই একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধনা দেশের সুধীসমাজের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বর ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজন করা হল এক মহতী সম্বর্ধনা-সভার। উপলক্ষ, আচার্য শীলের ৭২ বৎসর পূর্তি। ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডাঃ নীলরতন সরকার। রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে আচার্য শীলের উদ্দেশ্যে একটি অনুপম কবিতা[২৫] রচনা করে পাঠালেন।

এদিকে ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনপ্রদীপ ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছিল। ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর তিনি সকল প্রশস্তি ও প্রীতি-শ্রদ্ধার জগৎ থেকে চিরবিদায় নিলেন। সারা জীবনের সুকঠিন সাধনায় জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছিলেন যে মহাতপস্বী তিনি মহাপ্রস্থান করলেন আরও দুর্গমতর ও ঊর্ধ্বতর কোনো এক অদৃশ্যলোকে। এই জ্ঞানসাধকের তিরোধানে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষ সত্যিকারের একজন পণ্ডিত ও পরিপূর্ণ এক মানুষকে হারাল। আজ জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু বিচিত্র শ্রদ্ধার্ঘ্যের মধ্য দিয়ে সেই হারিয়ে যাওয়া জ্ঞান-তপস্বীকে নতুন করে খুঁজে পাবার চেষ্টা চলছে। কিন্তু আসল বিশ্বকোষ-প্রতিমকে অমন করে জানা যাবে কি? বিশ্বকোষের ভূমিকায় কি মূলের সত্যিকার পরিচয় মিলবে? জ্ঞানজগতের নব নব বিচিত্র লোকে যে জগতপথিক অভিসারে বেরিয়েছেন, তাঁর যাত্রা-পথের নিশানা মিলবে কি?

২৫. মূল কবিতাটি ১৩৪২ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। মডার্ণ রিভিয়ুতে (জানুয়ারী ১৯৩৬) কবিতাটির ইংরেজি তর্জমা প্রকাশিত হয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৬৪—১৯১৯

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

ইং ১৮৯১ সাল। আমি কটকে থাকি। জানুআরি মাসের প্রথম সপ্তাহে, বোধ হয় ৪ঠা, বুধবার কলিকাতায় প্রথেরো (Prothero) সাহেবের বাড়ীতে রামেন্দ্রসুন্দরকে প্রথম দেখি, আমি সেবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার ভূগোল-বিবরণের একজন পরীক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলাম। প্রথেরো সাহেব প্রধান পরীক্ষক। তিনি ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটে মাদ্রাসা কলেজের সম্মুখের বাড়ীতে থাকিতেন। সে বাড়ী মাদ্রাসা কলেজের প্রিন্সিপালের জন্য গবর্মেণ্ট ভাড়া করিয়া রাখিয়াছিলেন। ইহার পূর্বে আমি মাদ্রাসা কলেজে দুই বৎসর কাজ করিয়াছিলাম। সেই সূত্রে বাড়ীটি আমার জানা ছিল। গাড়ী-বারান্দার উপরের ঘরে প্রথেরো সাহেব বসিয়াছিলেন। আমি উপরে উঠিয়া দেখি, পেণ্টুল-চাপকান-পরা. কপাটবক্ষ, সংহতপেশী, সপাট-পাণ্ডুর-মুখ মণ্ডল, অপরিস্ফুট-গুম্ফ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, ২৫।২৬ বৎসর বয়স্ক এক যুবক দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি ক্ষণমাত্র আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নামিয়া গেলেন। প্রথেরো সাহেবের সহিত দুই চারিটা কথার পর আমিও চলিয়া আসিলাম। পথে নামিয়া ভাবিতে লাগিলাম, ইনি কে? ইঁহাকে ত বাঙ্গালী মনে হইতেছে না। তৎকালে প্রবেশিকা-পরীক্ষার ভূগোল-বিবরণের চারিজন মাত্র পরীক্ষক নিযুক্ত হইতেন, তাঁহাদের নাম জানিতাম। বুঝিলাম, তাঁহাদের মধ্যে ইনিই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁহার সহিত আমার চাক্ষুষ পরিচয় তিনবারের অধিক হয় নাই, কিন্তু পত্র-ব্যবহার অনেক হইয়াছিল।

১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পরিষৎ পত্রিকা প্রকাশ আরম্ভ হয়। রজনীকান্ত গুপ্ত সম্পাদক ছিলেন। ১৩০২ বঙ্গাব্দে তিনি আমার নাম সদস্য-তালিকাভুক্ত করিয়া লইলেন। পত্রিকায় দেখি, বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের যত্ন হইতেছে। রামেন্দ্রসুন্দর ১৩০১ বঙ্গাব্দের পরিষৎ পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। বিচার্য বিষয় তিনটি—(১) বিজ্ঞানে পরিভাষার প্রয়োজন, (২) বৈজ্ঞানিক পরিভাষার লক্ষণ, (৩) পরিভাষা নির্মাণ—বিধি। এই তিন বিষয়ে তাঁহার আলোচনা পড়িয়া বুঝিয়াছিলাম, তিনি মেধাবী,

কৃতবিদ্য, স্থিরবুদ্ধি, প্রাচীনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও নবীনের অনুরাগী। তাঁহার ভাষা সরস ও সুখপাঠ্য, প্রাঞ্জল; বাগ্‌রীতি প্রসন্ন। পরে তাঁহার নিকট হইতে অনেক পত্র পাইয়াছিলাম। তাহাতে তাঁহার হস্তাক্ষর দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, তাঁহার চিন্তা প্রবাহ দ্রুত প্রধাবিত হইত; তাঁহার লেখনী অনুসরণে অসমর্থ হইয়া বাংলা সকোণ অক্ষরকে তরঙ্গে পরিণত করিত। এতদ্বারা তাঁহার বুদ্ধির প্রাখর্য প্রমাণিত হয়। 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধ রচনাকালে তাঁহার বয়স ত্রিশ বৎসর, রিপন কলেজে কিমিতি ও ভূত বিদ্যার শিক্ষক। তখন আমার বয়স পঁয়ত্রিশ, আমি কটক কলেজে থাকি।

এই প্রবন্ধে তাঁহার যে বিচার-ক্রম ও ভাষা-বিন্যাস দেখিতে পাই, তাহা পরবর্তীকালে রচিত তাঁহার যাবতীয় গ্রন্থে ও প্রবন্ধেও বিদ্যমান। আমার দৃষ্টিতে তাঁহার রচনার দুইটি লক্ষণ স্পষ্ট হইয়াছিল—(১) পরিভাষা সম্বন্ধে তিনি প্রায় প্রাচীন পন্থী, কদাচিৎ নবীনের প্রতি স্নেহশীল; মনে হয়, যেন, দুইটি বিপরীত শক্তি তাঁহার মনের মধ্যে কাজ করিত। (২) তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় পাঠকের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত তিনি পুনরুক্তি করিতেন। তাঁহার 'বৈজ্ঞানিক পরিভাষা' প্রবন্ধ মুদ্রিত করিতে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৫ পৃষ্ঠা লাগিয়াছিল। একবার তাঁহার সহিত এ বিষয়ে আমার কথোপকথন হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "পুনঃপুনঃ না বলিলে, নানাভাবে না বলিলে পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য অঙ্কিত হয় না"। এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত হইতে পারি নাই। আমি মনে করি, তাঁহার অনুসৃত পন্থায় পাঠকের চিত্তে জ্ঞাতব্য তথ্য সুনির্দিষ্টভাবে অঙ্কিত হয় না। পাঠক একপ্রকার আবছায়া পান, তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলে প্রকৃত তথ্য বলিতে পারেন না।

তাঁহার "যজ্ঞকথা" পড়িলে তাঁহার পাণ্ডিত্য সহজেই পাঠককে মুগ্ধ করে। পাঠক বুঝিতে পারেন না, বৈদিক যজ্ঞকর্মের তুল্য দুরবগাহ সমুদ্রে নিমগ্ন হইতে না পারিলে সে রত্ন উদ্‌ধৃত হইত না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বঙ্গানুবাদ করিবার সময় তাঁহাকে বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান বুঝিতে হইয়াছিল। সে অল্পদিনের পরিশ্রম সাধ্য নয়। আমি এক এক সময় ভাবি, তিনি কবে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিলেন, কবে অষ্টাধ্যায়ী আয়ত্ত করিলেন? এফ্‌-এ পড়িবার সময় তাঁহাকে সংস্কৃত কাব্য পড়িতে হইয়াছিল। বোধহয়

রঘুবংশের প্রথম চারি সর্গ ও ভট্টির দুই সর্গ মাত্র পড়িয়া থাকিবেন। এতৎসত্ত্বেও আমি বলিব, তাঁহার "যজ্ঞকথা" আরও অল্প কথায় বলিতে পারা যাইত।

তাঁহার "বিচিত্রজগৎ" বাংলা সাহিত্যে অপূর্ব ও অদ্বিতীয়। কঠিন বিষয় এত সরস ভাষায় ব্যাখ্যা করা অল্প সাধানার ফল নয়। একই ভাব, পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করিতে একবার, দুইবার, তিনবার বলিলেন, তথাপি মনে হয় যেন তাঁহার তৃপ্তি হইতেছে না।

আমি তাঁহাকে ব্যাখ্যাতৃ শ্রেষ্ঠ মনে করি।

তাঁহার "জিজ্ঞাসা"র প্রবন্ধগুলি পড়িলে মনে হয়, তিনি প্রকৃতির বিজ্ঞান হইতে সার সংগ্রহে আনন্দ পাইতেন। তিনি যখন এই সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তখন এই সকল বিষয়ই বৈজ্ঞানিকদের চিত্ত অধিকার করিয়াছিল। সে সময়ে আমারও অনেক প্রবন্ধের বিষয়বস্তু এই প্রকার ছিল। কেহ কেহ মনে করিয়াছেন, বিজ্ঞান বুঝি দর্শনের বিরুদ্ধধর্মী। কিন্তু এই বিজ্ঞানই দর্শনের প্রথম সোপান এবং দর্শনই বিজ্ঞানের পরিণতি রামেন্দ্রসুন্দরে বিজ্ঞান ও দর্শনের অপূর্ব সমন্বয় হইয়াছিল।

বৈজ্ঞানিকগণকে তিনভাগ করিতে পারা যায়। প্রথম ভাগ, যাঁহারা বিজ্ঞানের একটি শাখা লইয়া থাকেন এবং অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের গুণে সেই শাখায় গবেষণা নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করেন। ইঁহারা নিম্নশ্রেণীর হইলেও, ইঁহারা না থাকিলে অন্য দুই শ্রেণীর উদ্ভব হইতে পারিত না। যাঁহারা হাইড্রোজেন বম্ নির্মাণ করিতেছেন, তাঁহারা ও এই শ্রেণীর। এইরূপ যাঁহারা প্রকৃতির এক এক দিক্ পর্যবেক্ষণ করিয়া আমাদের জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছেন, তাঁহাদের কার্য সামান্য মনে হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদের সমবেত কর্মেই বিজ্ঞানের দ্বার প্রশস্ত হইতেছে।

দ্বিতীয় ভাগ, যাঁহারা সংগৃহীত তথ্য বর্গে বর্গে সাজাইয়া বিজ্ঞানের সকল শাখার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন এবং যাঁহারা লোকরঞ্জন ভাষায় জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচার করেন। ইঁহাদের দৃষ্টি সর্বদিকে থাকে বলিয়াই বিজ্ঞান-তত্ত্ব প্রচারে যোগ্য হইয়া থাকেন। কিন্তু ভাষাজ্ঞান না থাকিলে বিজ্ঞান প্রচার অসম্ভব। মনে রাখিতে হইবে, সাধারণ পাঠককে রচনায় প্রলুব্ধ করিতে হইবে। লেখক নিজেকে প্রশ্ন করিতেন, অপরে কেহ তাঁহার রচনা পাঠ করিবে? সাধারণ পাঠক উদাসীন। ইঁহারা মধ্যম শ্রেণীর

বৈজ্ঞানিক। ইংলণ্ডে হাক্সলেকে এই শ্রেণীতে বসাইতে পারা যায়। বঙ্গদেশে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞান-প্রচারক ছিলেন।

তৃতীয় ভাগ, যাঁহারা সমগ্র বিজ্ঞান-বৃক্ষের যাবতীয় শাখা অবলোকন করিয়া এক সূত্র অন্বেষণ করেন, অসংখ্য অনৈক্যের মধ্যে ঐক্য দেখাইয়া দেন, ইঁহারাই প্রকৃত দার্শনিক। ইঁহারা সংখ্যায় অত্যল্প। ডারবিনের 'পরিণামবাদে' আমাদের চিন্তাধারায় এক শৃঙ্খলা আনিয়া দিয়াছে। আমরা সদ্‌বস্তুর পরিণামী উৎপত্তিক্রম স্বীকার করিতেছি। নিউটনের আবিষ্কৃত 'মাধ্যাকর্ষণ' এক্ষণে আর ও প্রসারিত হইতেছে বটে, কিন্তু মূল অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কারে জীব ও অ-জীবের একটা পার্থক্য লক্ষণ ক্ষীণ হইয়াছে; মনে হয় যেন অ-জীবের ও সাড়া দিবার শক্তি আছে। এ বিষয়ে তিনি আমাদের পুরাতন শাস্ত্রকারগণের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন।

আমাদের অতীত আমাদের দেশের সহিত নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট, যাহা আমাদের দেশে ছিল, যাহা এখনও আছে, তাহার প্রতি রামেন্দ্রসুন্দর অতিশয় ভক্তিমান ছিলেন। তাহাতে হস্তার্পণ করিতে তিনি সঙ্কুচিত হইতেন। ইহার দুইটি উদাহরণ দিতেছি।

(১) তিনি বৈজ্ঞানিক পরিভাষা প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন, রসায়ন শাস্ত্রের পরিভাষার গুণে যে বিদ্যার এত উন্নতি হইতে পারিয়াছে। তৎকালে জ্ঞাত ৭০টা মূল পদার্থের সংস্কৃত-মূলক দেশীয় নাম সৃষ্টি করিলে সে বিদ্যা আয়ত্ত করা সুসাধ্য হইবে না। তথাপি তিনি ১৩০২ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ৪০ পৃষ্ঠা ব্যাপী প্রবন্ধে রসায়ণ শাস্ত্রের প্রত্যেক মূল পদার্থের ইংরেজী নামের ইতিহাস সঙ্কলন ও সংস্কৃত নাম উপন্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর আমাদের কেহ কেহ অতিশয় কুতূহলী হইয়াছিলেন। তিনি ক্লোরিণের নাম 'হরিণ' রাখিয়াছিলেন; অক্সিজেনের নাম 'দহন বায়ু', অক্সাইড 'দগ্ধ'। অতএব Chlorous anhydride 'দগ্ধ হরিণ'। ডক্টর পি. সি. রায় স্বদেশী নামের পক্ষপাতী ছিলেন। আমি মেডিক্যাল ইস্কুলের ছাত্রদের জন্য "সরল রসায়ন" লিখিয়াছিলাম। তাহাতে অক্সিজেন হাইড্রোজেন ইত্যাদি ইংরেজী নাম গ্রহণ করিয়াছিলাম।

ডক্টর রায় প্রবাসী পত্রিকায় সে পুস্তকের সমালোচনা লিখিয়াছিলেন।

"নানান্ দেশের নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা?"

স্বদেশী ভাষায় এত বড় অনুরাগী হইয়াও তিনি 'দগ্ধ হরিণ' শুনিয়া উপহাস করিয়াছিলেন। পরে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই বুঝিয়াছিলেন; সে পরিভাষা অগ্রাহ্য করিতে হইবে। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত তাহার "শব্দকথা"র ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন: "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পরিভাষা সমিতিতে কয়েক বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমি বুঝিয়াছি যে, কাগজকলম হাতে লইয়া কোন একটা বিজ্ঞান-বিদ্যার পরিভাষা গড়িয়া তোলা বৃথা পরিশ্রম। সুচারু পরিভাষিক শব্দের সৃষ্টি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচনার্কতার ও অনুবাদকের হাতে।" এখানে তিনি নিজ মত প্রত্যাখ্যান করিয়া উদাসীন হইয়াছেন। কিন্তু ইহাও ঠিক নয়। পরিভাষা নির্মাণ গ্রন্থকারের হাতে ছাড়িয়া দিলে পাঁচজন গ্রন্থকার পাঁচপ্রকার পরিভাষা করিয়া বসিবেন। পরিভাষার ঐক্য হইবে না। দ্বিতীয়ত বিষয়জ্ঞান ভাষাজ্ঞান এবং কাণ্ডজ্ঞান একাধারে সকল গ্রন্থকারের কিংবা অনুবাদকের থাকে না। কয়েক বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সঙ্কলনের নিমিত্ত এক সংসদ নিযুক্ত করিয়াছেন। উচিত ব্যবস্থাই করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে ভারত পূর্বের ন্যায় প্রদেশে প্রদেশে বিভক্ত নয়। সকল রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া পরিভাষা সমিতি গঠন না করিলে সর্বভারতীয় পরিভাষা নির্মিত হইবে না।

তৎকালে স্বদেশীভাষায় বিদেশী নামের অনুবাদ করিবার প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল। ইউরেনস গ্রহকে ইন্দ্র বলা হইবে কি বরুণ বলা হইবে, এইরূপ চিন্তায় কয়েকজন বিদ্বান অধীর হইয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই ব্যবহারিক জগতের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন না। এই মনোবৃত্তির কারণ বুঝিতে পারা যায়। আমরা পরপদানত, আমাদের মানসম্ভ্রম কিছুই নাই; কিন্তু আছে আমাদের ভাষা, আমাদের সাহিত্য। আমরা যেমন তেমন জাতি নহি। ইংরাজী নামের বঙ্গানুবাদ করিয়া এই আত্মতৃপ্তি লাভ হইত। আমি স্বভাবে প্রাচীনের অনুরাগী হইয়া ও ব্যবহারে কল্যাণকর নবীনের পক্ষপাতী ছিলাম। ১৩০২ বঙ্গাব্দে সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় বৈজ্ঞানিক পরিভাষা রচনা সম্বন্ধে আমি এক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে মনস্বী রাজেন্দ্রলাল মিত্রের অনুমোদিত বিধি স্মরণ করাইয়াছিলাম। বিজ্ঞানে

দ্রব্য, গুণ, ক্রিয়া—এই তিনপ্রকার নামের প্রয়োজন হইয়া থাকে। তন্মধ্যে দ্রব্য নামে, দ্রব্যের নির্মাতা কিম্বা আবিষ্কর্তার প্রদত্ত নাম গ্রহণ করিতে হইবে। গুণ ও ক্রিয়ার বাচক শব্দ সঙ্কলন অথবা নির্মাণ করিতে হইবে। আবশ্যক হইলে ইংরেজী শব্দই রাখিতে হইবে। নূতন শব্দ রচনার সময় দেখিতে হইবে, যেন সেই শব্দের মূল ধাতু হইতে বিশেষ্য বিশেষণ পাইতে পারি। তৎকালে এবিষয়ে একা আমি একদিকে এবং অপর বিজ্ঞান-সেবিগন অন্যদিকে ছিলেন। এখন যে পুরাতন মোহ গিয়াছে। বিজ্ঞান প্রচারের সুবিধা হইয়াছে। বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ পরিভাষা সঙ্কলনে সবিশেষ যত্নবান আছেন।

(২) ১৩১২ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আমার "বাঙ্গালা ভাষা" নামক পুস্তক প্রকাশ করিতে উদ্‌যোগী হন। উক্ত পুস্তকের প্রথম ভাগের উপক্রমণিকায় বাংলা ভাষার দোষ-গুণ বিচার করিয়া লিখিয়াছি, বাংলাভাষা শিক্ষা সহজ কিন্তু বাংলা অক্ষর শিক্ষা সহজ নহে। আর, যুক্তাক্ষর লিখিতে ও শিখিতে অযথা পরিশ্রম করিতে হয়। যদি সংযুক্ত ব্যঞ্জনের অক্ষরগুলি দেখিতে পাই, তাহা হইলে সে কষ্ট থাকে না। শুধু সংযুক্ত ব্যঞ্জনাক্ষর নয়, সংযুক্ত স্বরাক্ষর সংযোগের নিমিত্তও দ্বিবিধ, ত্রিবিধ আকার শিখিতে হয়। যথা শু, রু, রূ, হৃ ইত্যাদি। আমাকে বহু সাহিত্যিক উপহাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা বানান ও অক্ষরের পার্থক্য বুঝিতে পারেন নাই। আমি বানান পরিবর্তন করিতে চাহি নাই, সংযুক্ত অক্ষর স্পষ্ট দেখাইতে চাহিয়াছিলাম। একা রামেন্দ্রসুন্দর ইহা বুঝিয়াছিলেন। এই অভিপ্রায়ে আমি সাহিত্য-পরিষৎকে গোটা দশ-বার নূতন অক্ষর করাইতে অনুরোধ করি। তৎকালে রামেন্দ্রসুন্দর পরিষদের সম্পাদক ছিলেন। তিনি আমায় অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার প্রত্যেক চিঠিতে তাঁহার অকপট শ্রদ্ধা নির্গলিত হইয়া পড়িত। তাঁহারই যত্নে ও উৎসাহে আমার "বাঙ্গালাভাষা" গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সংযুক্তাক্ষরের আকার পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার দুই যুক্তি ছিল।

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণপরিচয়ের দুইভাগ শিখিতে ছেলেদের তেমন কষ্ট হয় না। তিনি কষ্ট বোধ করেন নাই।

(২) অক্ষরের আকারের সহিত ইতিহাস জড়িত আছে। আকার পরিবর্তন করিলে ইতিহাস জীর্ণ হইয়া যাইবে, অতএব যেমন আছে, তেমনই থাক।

আমি উত্তর করিয়াছিলাম, "আপনি আপনার সহিত অন্য বালকদের তুলনা করিতেছেন? আমি দেখিয়াছি, আমার উড়িয়া বন্ধুরা স্বচ্ছন্দে বাংলা পড়িয়া যান, কিন্তু সংযুক্তাক্ষর লিখিতে পারেন না। আর, ভাষা শিখার এই কণ্টক দূরীভূত না হইলে বাংলা ভাষার প্রসার হইবেনা। আপনি যে অক্ষরের ইতিহাস লোপের আশঙ্কা করিতেছেন, তাহাও বৃথা। কারণ, অসংখ্য পুস্তক বর্তমান অক্ষরেই মুদ্রিত হইয়াছে। শতাধিক বৎসরের প্রাচীন পুঁথীর অক্ষর দেখিলেই বুঝি, স্বাভাবিক ক্রমেই কোন কোন অক্ষর পরিবর্তিত হইয়াছে।"

তিনি আর তর্ক করিলেন না। কিন্তু আমার পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদ যখন মুদ্রিত হইয়া আসিল, তখন দেখি আমার অনভিপ্রেত অক্ষর ও আসিয়াছে আমি অ লিখিয়া পৃথক মাত্রা দিই। সেটা কিছু নয়, লেখার দোষ। ছাপায় দেখি, অ-এর মাথায় একটি পৃথক মাত্রা আছে।

আমাদের প্রাচীনকালের কোন তথ্যের সন্ধান পাইলে রামেন্দ্রসুন্দরের চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিত। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। রবীন্দ্রনাথের পরামর্শে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ বর্ষে বর্ষে এক এক স্থানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করিতেন। ১৩১৫ বঙ্গাব্দে রাজসাহীতে সম্মেলন বসিবে, রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার। আমি তখন কটকে থাকি। তিনি সম্মেলনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আমায় আহ্বান করিলেন। আর, সম্মেলনে পাঠের নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ চাই, নির্বন্ধ সহকারে পত্র লিখিলেন। ডক্টর পি. সি. রায় সম্মেলনের সভাপতি। তিনি একটি প্রবন্ধের নিমিত্ত আমায় পত্র লিখলেন। কিন্তু আমার অবসর কোথায়? বিশেষতঃ, বঙ্গের সুধীগণের শ্রবণোপযোগী প্রবন্ধ রচনাও সহজ কাজ নয়। আমি রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিলাম আমি যাইতে পারিব না, উপস্থিত প্রবন্ধও পাঠাইতে পারিব না। তিনি শুনিলেন না, পুনর্বার পত্র লিখিলেন। তাহার পুনঃপুনঃ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিতেছি না, লজ্জা হইতেছিল। এদিকে সম্মেলনের নির্ধারিত দিবস নিকটবর্তী হইতেছে। আমি "আমাদের জ্যোতিষী ও জ্যোতিষ" গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগের নিমিত্ত 'স্বয়ং বহ যন্ত্র' লিখিয়া রাখিয়াছিলাম; প্রকাশ করি নাই। উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই প্রবন্ধ রাজসাহী-সম্মেলনের ঠিকানায় পাঠাইলাম। মধ্যাহ্ন কাল। সম্মেলন বসিয়াছে। রেজেষ্টারী ডাকে আমার 'স্বয়ংবহ' উপস্থিত হইল। তাহার পর

কি হইয়াছিল, রামেন্দ্রসুন্দরের পত্র উদ্ধৃত করিতেছি। কলিকাতা হইতে তিনি আমাকে ১৩১৫।১৭ মাঘ তারিখে লিখিয়াছিলেন,—

"রাজসাহী সাহিত্য সম্মেলনে ১৯।২০টি প্রবন্ধ জুটিয়াছিল। সময়াভাব হেতু অন্যান্য অনুপস্থিত লেখকগণের প্রবন্ধের সহিত আপনার প্রবন্ধটিও 'পঠিত করিয়া গৃহীত' হইবার উপক্রম হইয়াছিল। সভাপতি পি. সি. রায় হঠাৎ আপনার প্রবন্ধটি আমাকে পড়িতে দেওয়ায় আপনার প্রবন্ধটি ঐ বিপৎ হইতে রক্ষা পায়। অন্যের নিকট যাচাই হউক, প্রবন্ধ মধ্যে আমার শিক্ষার বিষয় অনেকগুলি ছিল। আমাদের প্রাচীন আচার্যেরা যে Perpetual motion ঘটাইবার এত চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার আমি বিন্দু-বিসর্গ জানিতাম না। আমি প্রবন্ধপাঠ মাত্র আনন্দের সহিত প্রবন্ধটি সভায় পড়িয়া শুনাইবার ভার গ্রহণ করি এবং সভাপতি মহাশয়ের অনুগ্রহে মূল প্রবন্ধের টীকা-টিপ্পনী ও ভাষ্য করিবার অধিকারও পাইয়াছিলাম। আপনার প্রবন্ধ সভাস্থ সকলের এমনকি রাজসাহী কলেজের অধ্যাপক বর্গের ও প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। শুনিলে আপনি প্রীত হইবেন। "স্বয়ংবহ' শব্দটি কি আপনার ? না সিদ্ধান্তকারগণের ? 'দণ্ড' ও 'ঘটিকা' শব্দের অর্থ লইয়া আপনি যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আমার অত্যন্ত মনে লাগিয়াছে।"

"সভাপতি মহাশয় আপনার প্রবন্ধ সভাস্থলে উপস্থিত করিবার সময় আপনাকে "সর্বশাস্ত্রজ্ঞ" উপাধিযুক্ত করিয়াছিলেন। বস্তুতই আপনার বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞতায় আমরা দিন দিন বিস্মিত হইতেছি।

"স্বয়ংবহযন্ত্র সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রের উল্লেখ উদ্ধার করিয়া টীকা-সমন্বিত একটি বৃহত্তর প্রবন্ধ লেখা চলে কি ? চলিলে diagram সহ পরিষৎ-পত্রিকায় বাহির করিতে পারিব। পরিষৎ-পত্রিকা এতকাল প্রাচীন সাহিত্য লইয়া মগ্ন আছে। বৈজ্ঞানিক সাহিত্যের আলোচনা আবশ্যক বলিয়া অনেকেই অনুযোগ করিতেছেন।"

'স্বয়ংবহ' নাম আমার রচিত নয়, সিদ্ধান্তের, সাধারণ স্বয়ংবহ যন্ত্রে Perpetual motion নাই। ইহাকে automatic clock বলিতে পারি, যদিও জানি ঘড়ী স্বয়ংবহ নহে। পশ্চিমদেশের বিদ্বানেরা বুঝিতে পারেন নাই ; আমাদের প্রাচীনেরা সদগতির কল্পনায় ভ্রান্ত হইয়াছিলেন—এই বলিয়া তাঁহারা উপহাস করিয়াছেন। ১৩১৫ চৈত্র মাসের 'প্রবাসীতে' আমার (স্বয়ংবহ) প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছিল।

রামেন্দ্রসুন্দরকে সাহিত্য-পরিষদের কর্ণধার বলিলে কিছুই বলা হয় না। তিনি পরিষদের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। পরিষদের উন্নতি ও উত্তরোত্তর গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত তিনি যে কত যত্ন করিতেন, তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়, পরিষদের তুল্য প্রিয় সামগ্রী তাঁহার আর কিছু ছিল না। তিনি বঙ্গদেশের প্রত্যেক ধূলিকণাকে পবিত্র মনে করিতেন।

১৩২২ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৫) বর্ধমানের মহারাজা বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হেমচন্দ্র দাশগুপ্তের নির্বন্ধে সাহিত্য-সম্মেলন চারি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল,—সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্মেলন-সভাপতি এবং সাহিত্য-শাখাপতি।

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত দর্শন-শাখাপতি, শ্রীযদুনাথ সরকার ইতিহাস-শাখাপতি এবং আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি মনোনীত হইয়াছিলাম। মহা সমারোহে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার বিস্তৃত বিবরণ এক বৃহৎ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সম্মেলনে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল এবং দুইটিই আমাকে করিতে হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাব, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার নিমিত্ত বাংলা ভাষা পঠন ও পাঠন প্রবর্তিত করিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রার্থনা করা হউক। দ্বিতীয় প্রস্তাব, পঞ্জিকা সংস্কার সুসাধ্য করিবার নিমিত্ত বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির স্থাপিত হউক। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকে সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে হইত! বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রার্থনা প্রেরণ সোজা কথা, কিন্তু জ্যোতিষ মানমন্দির প্রতিষ্ঠা সোজা কথা নয়।

সে সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর পীড়িত। বর্ধমান যাইতে পারেন নাই। তিনি কলিকাতায় থাকিয়া সম্মেলনের আয়োজন করিতেছিলেন এবং তাঁহারই পুনঃ পুনঃ অনুরোধে আমি বিজ্ঞান-শাখাপতি হইতে সম্মত হইয়াছিলাম। সম্মেলনের পর তিনি আমায় কলিকাতা হইতে পত্র লিখিয়াছিলেন (১৩২২।৪ বৈশাখ)—

"একই দিনে আপনার দুইখানি চিঠি পাইয়া বুঝিলাম, আপনি টোপ গিলিয়াছেন। এতকাল নির্জনে তপোবনে লুকাইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, হঠাৎ একদিন লোকসমাজে ধরা দিয়া ফেলিয়াছেন। আপনাকে ঠিক ঋষ্যশৃঙ্গের সহিত তুলনা করিবার দরকার নাই; তবে বুদ্ধিমান লোকে ঋষ্যশৃঙ্গের দ্বারা আপনার কাজ করাইয়া লইয়াছিল, আপনি ও যখন ধরা

দিয়াছেন, তখন আপনার দ্বারাও আমাদের কাজ করাইয়া লইব, তাহার ভরসা হইতেছে।"

"সাহিত্য সম্মেলনের বন্দোবস্ত এবং খুব ভালই হইয়াছিল, সহস্র মুখে এক বাক্যে তাহা শুনিতেছি। কাজের দিকের খবর অন্যে বড একটা দেন নাই। আপনি যে সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন, তাহাতে বুঝিলাম, আপনি উহার শাদা-কাল দুইটা দিকই দেখিয়াছেন, আপনার প্রশ্নের উত্তরে আমার অনেক কথা বলিবার আছে। বলিতে গেলে বোধহয় একদিস্তা কাগজে কুলাইবে না।"

দেশে বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠা আমার অভিভাষণের বিষয় ছিল। বিষয়টি তাঁহার প্রিয়, কিন্তু তাঁহার কল্পিত পথ হইতে আমি কিঞ্চিৎ ভিন্ন পথে গিয়াছিলাম। বোধহয়, সেই কারনেই লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মত প্রতিষ্ঠা করিতে একদিস্তা কাগজ লাগিবে।

বঙ্গে জ্যোতিষ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে রামেন্দ্রসুন্দর ১৩২২।১৬ ভাদ্র তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"মান-মন্দির সম্পর্কে আপনার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত প্রবন্ধ পূর্বেই পড়িয়াছি। বেধালয়ের আবশ্যকতা এবং পঞ্জিকা-সংস্কারের উপযোগিতা আপনি যেরূপ বুঝাইয়াছেন, তাহাতে যদি কেহ না বুঝে তাহা হইলে গত্যন্তর নাই। কলিকাতার হাওয়া বেধকর্মের উপযোগী নহে। শীতকালের আকাশে মোটা মোটা তারাগুলো দেখা যায় না। মফঃস্বলে স্থান মিলিতে পারে, কিন্তু লোক মিলিবে না। পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য, উভয় মত জ্যোতিষিক গণানার সামঞ্জস্য করিয়া দিতে পারেন এবং তদনুসারে গণকদিগকে শিক্ষা দিতে পারেন, এরূপ লোক ত দেখিতেছিনা। কলেজের অধ্যাপকদের মধ্যে এক আপনি আছেন, তদ্ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিনা। আমাদের অধ্যাপক ভ্রাতারা যে সময়টা তারকা-পর্যবেক্ষণে নিয়োগ করিবেন, সে সময় মানের বহি লিখিলে বেশী কাজে আসিবে। এ সঙ্কল্প বিষয়ে আমার অধিক ভরসা নাই। আপনি নিজে কর্মী, আপনি স্বয়ং যদি কিছু গড়িয়া তুলিতে পারেন, তবে আশা আছে।"

পুনশ্চ ১৩২২।৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—

"আপনার মান মন্দির বিষয়ক প্রবন্ধ 'প্রবাসীতে পূর্বেই পড়িয়াছিলাম। কিন্তু জিনিষটা আদৌ গড়িয়া উঠিবে কিনা, সন্দেহ। কাশিমবাজারের

মহারাজা মাসিক ব্যয় দিবেন কিন্তু মন্দির ও যন্ত্রাদির জন্য ব্যয় সম্বন্ধে আমার ঘোর সংশয় আছে। বর্ধমান বা অন্য কেহ খরচ দিলেও উহা আদায় করিয়া জিনিষটা গড়িয়া লইবার উদ্‌যোগী লোকের অভাব। আমার ক্ষমতায় কুলাইবে না। বড়লোকে টাকা দেন, কিন্তু কেহ উদ্‌যোগ করিয়া হাত পাতিয়া না লইলে টাকা আদায় হয় না।···অভাব কেবল মানুষের, কর্মী মানুষ নাই, এবং কর্মে প্রেরণের জন্য পিছনে যে বাতিক থাকা আবশ্যক, সেই বাতিক ও কাহারও নাই। ঔদাসীন্যে কত কাজ যে নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহা দেখিয়া ব্যথা পাইতেছি মাত্র।”

রামেন্দ্রসুন্দরের অনুমানই ঠিক হইল। প্রস্তাবিত মান-মন্দিরের অধ্যক্ষতা করিবার লোক পাওয়া গেল না। রাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী আমায় তিনখান পত্র লিখিয়াছিলেন। বর্ধমানের মহারাজাও লিখিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্‌যোগী পুরুষের অভাব, তদবধি ৪০ বৎসর হইয়া গেল, কিন্তু উদযোগী মানুষের অভাব রহিয়া গিয়াছে।

১৩২২ বঙ্গাব্দে রামেন্দ্রসুন্দর বর্ধমান সম্মেলনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। ইহার পূর্বেও দুই বৎসর যাইতে পারেন নাই। ১৩২০ হইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গের সূত্রপাত হয়! তিনি আর পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরিয়া পান নাই। তিনি পরে যে সকল পত্র লিখিতেন, সে সকল পত্র তাঁহার অস্বাস্থ্যের বিবরণে পূর্ণ থাকিত। কিন্তু তাঁহার সরসচিত্ত কখনও রসহীন হইত না। একবার লিখিলেন, “আমি কয়েকদিন শয্যাগত ছিলাম। আমার হিতৈষী ডাক্তার বন্ধুগণ আমাকে স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না। কিন্তু তাহাদের মুখভঙ্গী ও মাথানাড়া দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা আমার যকৃতে বিস্ফোটক আশঙ্কা করিয়া অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করিতেছেন। আমি সম্মত হইলাম না। যদি অকালে যম সদনে যাইতে হয়, অক্ষত দেহেই যাইব। গতকল্য অপরাহ্নে এক হোমিওপাথিক ডাক্তার-বন্ধু আসিলেন। তিনি একবিন্দু জলপান করাইয়া গেলেন আর আমি আজ সকালে বিছানায় বসিয়া আপনাকে পত্র লিখিতেছি।”

আর একবার লিখিলেন তাঁহার পত্নীর বস্ত্রাঞ্চলে কেরোসিন দীপের অগ্নিসংযোগ হইয়াছিল; কোন ক্রমে তিনি রক্ষা পাইয়াছিলেন।

১৯১৪।২ আগষ্ট তারিখের পত্রে তিনি লিখিয়াছিলেন (তখন তিনি ভাল ছিলেন), “...আর ও ভাল হইবার আশায় কলেজে দেড় মাসের ছুটি

লইয়া গঙ্গায় নৌকাযাত্রা করি। আশা ছিল, গ্রীষ্মের অবকাশটা জড়াইয়া চারিমাস গঙ্গাবাসে সুস্থ হইব। মারচ্ মাসটা নৌকাতেই গঙ্গাবক্ষে কাটাইয়া দিলাম। কিন্তু গঙ্গামাতা বক্ষে স্থান দিলেন না। একদিন রাত্রিকালে মাঝ-গঙ্গায় কালনার নিকটে নৌকায় আগুন লাগিল। মাঝিরা আগুন নিভাইতে পারিল না। সস্ত্রীক জলে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। জল ঘটনাক্রমে অল্প ছিল, কাজেই গঙ্গাপ্রাপ্তি হইল না। নতুবা এতদিন চতুর্ভুজ হইয়া বৈকুণ্ঠবাসী হইতাম, নৌকাখানার সমস্ত উপরের অংশ আমার জিনিস-পত্র সমেত পুড়িয়া গেল। নিকটে নির্জন চড়া, সেখানে আশ্রয় লইলাম। ঘটনাটা কালনার নিকটে। কালনার দুইটি ভদ্রলোক ডিঙ্গি করিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। গোলমাল ও অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া আসিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিলেন এবং তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া সে রাত্রি আশ্রয় দিলেন। পরদিন ট্রেন ধরিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসি।

"এই ঘটনা অবলম্বনে দিব্য একখানি নবেল হইতে পারে। তখন আমার নিকটে পণ্ডিত ঘনশ্যাম মিশ্র নামে এক নিপুন ফল-জ্যোতিষ ছিলেন। তিনি ওড়িয়া অক্ষরে লিখিত 'সিদ্ধান্ত দর্পণ' পড়িয়া আমায় শুনাইতেন। আমি নিজে ফল-জ্যোতিষ শিক্ষা করি নাই। প্রয়োজন হইলে মিশ্র-মহাশয়কে দিয়া গণাইতাম। আর সে প্রয়োজনের হেতু ও ঘটিয়াছিল, সাধারণ লোকে জ্যোতিষের গণিত-ভাগ ও ফল-ভাগ অভিন্ন মনে করে! আমি গণিত-জ্যোতিষ চর্চা করি; লোকে মনে করিত, আমি ফল জ্যোতিষ ও জানি, সেই ভ্রম এখনও চলিতেছে। বিজ্ঞলোক আমার নিকটে তাঁহাদের কোষ্ঠী পাঠাইয়া দেন।

আমি রামেন্দ্রসুন্দরকে লিখিলাম, "আপনি আমাদের ভাগ্যের সহিত গ্রহ-নক্ষত্রের কার্যকারণ সম্বন্ধ পান না, কোষ্ঠী-গণনায় বিশ্বাস করেন না। আমিও করিনা। কিন্তু দেখিয়াছি, কোন কোন ঘটনা মিলিয়া যায়; বিশেষতঃ অগ্নিদাহ, জলডুবি ইত্যাদি। তাহাতে আশ্চর্য না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। যদি আপনার আপত্তি না থাকে, আপনার ঠিকুজী পাঠাইবেন।"

দিনকয়েক পরে এক পোষ্টকার্ড ও এক পার্সেল পাইলাম, পোষ্টকার্ডে রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহ-শিক্ষক লিখিতেছেন—আপনার পত্র মা [রামেন্দ্রসুন্দরের পত্নী] দেখিয়াছেন এবং তাঁহার আদেশে আমি এই পত্র লিখিতেছি ও কোষ্ঠী

পাঠাইতেছি। আপনি কোষ্ঠীখানা উত্তমরূপে দেখিয়া জানাইবেন, উপস্থিত রোগ হইতে কোন ভয় আছে কি না।"

আমি মিশ্র মহাশয়কে কোষ্ঠী হইতে জন্মকাল ও রাশিচক্র তুলিয়া দিলাম। তিনি ফলবিচার করিয়া যাহা বলিলেন, তাহা অবিকল লিখিয়া লইয়া রামেন্দ্রসুন্দরের গৃহ-শিক্ষকের নামে পাঠাইলাম। তাহাতে ছিল, ৪৭ বয়সে তাঁহার অজীর্ণ-জনিত পীড়া হইবে এবং উপস্থিত রোগ হইতে বিপদের আশঙ্কা নাই।

দৈবক্রমে আমার পত্র রামেন্দ্রসুন্দরের হাতে পড়িয়াছিল। তিনি উত্তরে লিখিয়াছিলেন (১৩২১।৪ আশ্বিন)—

"কোষ্ঠীর ফল দিন-তারিখ ধরিয়া যতটা দিয়াছেন, তাহাতে কোষ্ঠী গণনায় প্রায় বিশ্বাস হইবার উপক্রম হইয়াছে।...অজীর্ণ-রোগে স্বাস্থ্য-ভঙ্গের তারিখটা অত্যন্ত মিলিয়াছে, এ অবস্থা কতদিন টিকিবে, তাহা বলেন নাই। সম্ভবতঃ, সেটা শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতিকর হইবে না বলিয়াই বলেন নাই। যাহা হউক, কৌতূহলটা যখন জাগাইয়া দিলেন, তখন পরিণামটা সম্বন্ধে কোষ্ঠী কি বলেন এবং কর্মভোগ কতদিন চলিবে, তাহা জানিতে পারিলে সুখী হইব।"

পুনশ্চ ১৩৩১।২৮ আশ্বিন তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন—"আমার কোষ্ঠীখানি লইয়া আপনি যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছেন দেখিতেছি, তাহাতে কোষ্ঠীর ফলাফলের সহিত কতদূর আমার অবস্থা মিলিল, তাহা জ্ঞাপন করা কর্তব্য বোধ করিতেছি। আপনার ইহা কাজে লাগিতে পারে।

"সাধারণ ফল :—

'সুন্দর, প্রিয়ংবদ, ধর্মরত, বিদ্বান, শৌর্য-বীর্যে খ্যাতিমান্'—ইত্যাদি বিষয়ের বিচার-ভার আপনাদের উপর, শৌর্য-বীর্যের বিশেষ পরীক্ষা কখনও হয় নাই। জর্মনির সহিত লড়াইয়ে যদি সরকার বাহাদুর ঠেলিয়া পাঠান, তাহা হইলে পরীক্ষা হইতে পারে।"

ইত্যাদি ক্রমে তিনি কোষ্ঠী-গণনার ফল কতদূর সত্য হইয়াছে তাহা বিবৃত করিয়াছিলেন। এখানে তাঁর জন্ম-কোষ্ঠী হইতে জন্মকাল উদ্ধৃত করিলাম এবং সিদ্ধান্ত-রহস্য মতে গনিয়া তাৎকালিক গ্রহস্থিতি দিলাম। যাঁহার কৌতূহল হইবে, তিনি মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

জন্মকাল : ১৭৮৬।৪।৪।৫৩।৩৩॥

ভাদ্রস্য পঞ্চম দিবসে শনিবারে কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং তিথৌ রাত্রৌ সপ্তত্রিংশৎ পলাধিক একবিংশতি দণ্ডাভ্যন্তরে শুভ কর্কট লগ্নে (লগ্ন স্ফুট রাশ্যাদি ৩।০।২১।১৬) ॥

তাৎকালিক স্ফুট গ্রহা :—

র ৪।৫।১৯, চ ১১।১৪।২৯, ম ১।১।১, বু ৫।৩।১৩, বৃ ৬।২৮।৫৬, শু ৪।১৬।১৭, শ ৫।৩২।৩২, রা ৬।২২।১৯, কে ০।২২।২৯।

ইহার পর তিনি কয়েক বৎসর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিলেন, ১৩২১।৫ ফাল্গুন তারিখের পত্রে তিনি আমায় লিখিয়াছিলেন—

“আপনার শব্দকোষ সম্বন্ধে ‘প্রবাসী’ পড়িলাম। শব্দকোষে আপনাকে সাহায্য করিতে পারিলাম না, ইহা আমার দুর্ভাগ্য। যাহা হউক, আপনি যাহা খাড়া করিয়া দিলেন, ইহাতে ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বাংলা কোষ রচনার পথ পরিষ্কৃত হইয়া থাকিল।…এ পর্যন্ত কোনও বাঙ্গালী বাংলা অভিধান এমন বৈজ্ঞানিক প্রণালী-ক্রমে প্রস্তুত করেন নাই। আপনার পুস্তক প্রকাশ করিয়া সাহিত্য-পরিষৎ গৌরবান্বিত হইল। আমার এই আনন্দ যে, আমি না থাকিলে হয়ত পরিষদের সহিত আপনার গ্রন্থের এই সম্পর্কটুকু ঘটিত না।”

কি উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান প্রচারিত হইতে পারিবে, বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জন্মিতে পারিবে, এই চিন্তা অনেকের মনে জাগিয়াছিল। এক্ষণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান-পরিষৎ সে চিন্তা করিতেছেন এবং ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ নামক মাসিক পত্রে যথাসাধ্য বিজ্ঞান প্রচারে যত্নবান আছেন। ৬০।৭০ বৎসর পূর্বে লোকে বিজ্ঞানের নাম শুনিত, কিন্তু কেহ তাহার প্রতি অনুরাগী হইত না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্র ব্যতীত অন্যেরা উদাসীন থাকিতেন। তৎকালে বাংলা ভাষার প্রতি অত্যল্প শিক্ষিতের শ্রদ্ধা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর ও আমি বাংলা মাসিক পত্রে বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিতাম। কেহ কেহ দয়া করিয়া পড়িতেন, কেহ বা পাতা উল্টাইয়া যাইতেন। কি উপায়ে দেশে বিজ্ঞানের স্থূল তথ্য প্রচারিত হইবে, সে বিষয়ে আমরা চিন্তা করিতাম, এ বিষয়ে আমার প্রচুর অভিজ্ঞতা হইয়াছিল; সে সব কথা এখানে উত্থাপন করিব না। মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে পদার্থ-বিদ্যা পাঠ্য ছিল। কিন্তু ছাত্রদিগকে মুখস্ত করিয়া রাখিতে

হইত, শিখাইবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। প্রবেশিকা পরীক্ষার নিমিত্ত প্রাকৃতিক ভূগোল পড়িতে হইত। Blandford's Physical Geography বইখানি ভাল, কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের মত পড়ান হইত। তাহাও বিশ্ববিদ্যালয় তুলিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা কলেজে পড়িত, তাহারা ইংরেজীতে শিখিত, বাংলায় পড়িবে কেন? অতএব যদি দেশে বিজ্ঞান প্রচার করিতে হয়, তাহা হইলে লোকরঞ্জন ভাষায় বিজ্ঞানের মূল তথ্য বুঝাইতে হইবে। পাঠ্য পুস্তক নয়, কোন একটা শাখার আদ্যন্ত নয়, তাহার সারমর্ম পারিভাষিক শব্দ যথাসম্ভব বর্জন করিয়া পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিলে ফল হইতে পারে। কিন্তু কোন উদযোগী প্রকাশক ছিলেন না।

একদিন রামেন্দ্রসুন্দর আমায় লিখিলেন "বাংলায় এক এক বিষয়ের ছোট ছোট বই লিখিতে হইবে কোন বই ১৫০ পৃষ্ঠার অধিক হইবে না, দাম আট আনা। পাইকপাড়ার রাজা মহাশয় অরুণচন্দ্র সিংহ সে সব গ্রন্থ প্রকাশের ভার লইয়াছেন। তাঁহার নিজের প্রেস আছে। এখন বই লিখিয়া যোগাইতে পারিলে হয়। এই নিমিত্ত এক সম্পাদক-সংসদ করিতে হইবে। আপনি প্রধান, আপনি, আমিও হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত (প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূ-বিদ্যার শিক্ষক), এই তিনজন মিলিয়া পাণ্ডুলিপি দেখিয়া আমাদের মনোনীত হইলে রাজা-বাহাদুরের নিকট অর্পণ করিতে হইবে।"

আমি লিখিলাম, "আমি দূরে থাকি, আপনারা দুইজনে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা করিয়া, যদি কোন বিষয়ে প্রয়োজন মনে করেন, আমার নিকটে পাঠাইবেন।" তিনি কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তাঁহারা আমার নিকট হইতে দুইখানি বই চাহিলেন। একখানি বিজ্ঞানের ভূমিকা, অপরখানি জ্যোতির্বিদ্যা। প্রথম খানি অন্য প্রয়োজনে আমি ইংরেজীতে লিখিয়াছিলাম। তাঁহারা সেইখানাই গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। হেমবাবু ভূ-বিদ্যা সম্বন্ধে এবং রামেন্দ্রসুন্দর পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে লিখিবেন। অপর কৃতবিদ্য লেখকও আহ্বান করা হইবে। তাঁহারা এই সংসদের নির্দেশ অনুসারে গ্রন্থ রচনা করিবেন। দুই-তিন পরিচ্ছেদ লিখিয়া সংসদের সম্মতি পাইলে অপর পরিচ্ছেদ লিখিবেন। তাঁহারা দুইশত টাকা পারিশ্রমিক পাইবেন।

যে সময়ে রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রস্তাব করেন, সে সময়ে তিনি অসুস্থ ছিলেন। শরীর ভগ্ন হইতেছিল, মন নানা হিতকর কর্মের প্রতি ধাবিত হইত। কিন্তু শরীরে কুলাইল না। আমার নিকটে আর পত্র আসিল

না। ভাস্করাচার্য কয়েকটি জ্যোতিষিক যন্ত্র বর্ণনা করিয়া অবশেষে লিখিয়াছেন, সকল যন্ত্র অপেক্ষা ধী-যন্ত্র শ্রেষ্ঠ। রামেন্দ্রসুন্দর ধী-যন্ত্রের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং যে-কয়েক বৎসর জীবিত ছিলেন, সে কয়েক বৎসর তাহার প্রচুর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। বঙ্গের দুর্ভাগ্য, তাঁহার তিরোধানের পর তাঁহার আসন শূন্য রহিয়া গিয়াছে।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী—জন্ম : ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দের ২০শে আগষ্ট (১২৭১, ৫ই ভাদ্র), পিতা : গোবিন্দসুন্দর ত্রিবেদী। মাতা : চন্দ্রকামিনী দেবী। শিক্ষা : ছাত্রজীবন কৃতিত্বে সমুজ্জল। ১৮৭০ খৃঃ ছাত্রবৃত্তি পাঠশালায় পড়া শুরু করেন। (১৮৭৫ খৃঃ) সেই বৎসর তিনি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জেলার মধ্যে প্রথম স্থান ও বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৭৬ খৃঃ কান্দি স্কুলে ভর্তি হন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এনট্র্যান্স্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার ক'রে ২৫৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ফার্ষ্ট আর্ট পরীক্ষায় (১৮৮৩) দ্বিতীয় হন। ২৫৲ টাকা বৃত্তি ও সুবর্ণপদক লাভ করেন। ক্রমে বিজ্ঞান গ্রন্থের অধ্যয়নে তাঁর আগ্রহ জন্মে। ১৮০৬ সালে বি. এ. পরীক্ষায় বিজ্ঞানশাস্ত্রে অনারে প্রথম স্থান ও ৪০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান, সুবর্ণপদক ও ১০০৲ টাকার পুস্তক পুরস্কার পান। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্র গ্রহণ করে প্রেমচাঁদ ছাত্রবৃত্তি লাভ করেন। ১৮৯২ সালে রিপণ কলেজে (অধুনা সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক হয়েছিলেন। পরে ঐ কলেজে অধ্যক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত হন (১৯০৩)।

সাহিত্য সেবা : শৈশবকাল থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ছিল। তিনি আট বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন পাঠ করেছিলেন তখন তিনি বুঝিতেন না কিন্তু তাঁর মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে। 'নবজীবন' পত্রিকাতে তাঁর নিজের নামে প্রকাশিত হয় 'মহাশক্তি' নামক প্রথম প্রবন্ধ।

গ্রন্থাবলী : (১) প্রকৃতি, আশ্বিন—১৩০৩ (১৮৯৬ ইং)। (২) পুণ্ডরীককুলকীর্ত্তিপঞ্জিকা (ফতে সিংহ জমিদারীর ইতিবৃত্ত) ভাদ্র ১৩০৭ (১৯০০ ইং)। (৩) জিজ্ঞাসা—ফাল্গুন ১৩১০ (১৯০৪ ইং); (৪) বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা—১৩১২ (১৯০৬ ইং); (৫) মায়াপুরী—মাঘ ১৩১৭ (১৯১১ ইং); (৬) ঐতরেয় ব্রাহ্মণ—আশ্বিন ১৩১৮ (১৯১১ ইং); (৭) কর্মকথা—বৈশাখ ১৩২০ (১৯১৩ ইং); (৮) চরিত কথা—ভাদ্র ১৩২০ (১৯১৩ ইং); (৯) বিচিত্র প্রসঙ্গ—ভাদ্র ১৩২১ (১৯১৪ ইং); (১০) শব্দকথা—বৈশাখ ১৩২৪ (১৩১৭ ইং); (১১) বিচিত্র জগৎ—? (১৯২০ ইং); (১২) যজ্ঞকথা—ভাদ্র ১৩২৭ (১৯২০ ইং); (১৩) নানা কথা; আশ্বিন (১৯২৪ ইং); (১৪) জগৎ-কথা—(১৯২৬ ইং)। এছাড়া কয়েকখানি পাঠ্যপুস্তক ও রচনা করেন। মৃত্যু : মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে ২৩শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬ সন (ইং ৬ই জুন ১৯১৯) রাত্রি ১০ টায় রামেন্দ্রসুন্দর ইহলোক ত্যাগ করেন।

রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫-১৯১০

রণজিৎকুমার সেন

রজনীকান্ত যে-কালে আবির্ভূত হন, সেই কালটি অবিভক্ত বিশাল বঙ্গের রেণেসাঁস-উৎসের ঐতিহাসিক কাল! সেই কালের আগে পরে অর্থাৎ ১৮৬১ থেকে ১৮৭১ এই দশ বছরের মধ্যে আবির্ভূত হন রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত (১৮৬৫) ও অতুলপ্রসাদ। ভাবী বাঙ্গলার রেণেসাঁসের জন্মদাতা ছিলেন এই মনীষীবৃন্দই। তাঁদের মধ্যে একমাত্র প্রফুল্লচন্দ্র ভিন্ন বাকী পঞ্চ মনীষীই ছিলেন সঙ্গীতসাধক। রবীন্দ্রনাথ যে-সঙ্গীতের সৃষ্টি করেন, বাংলার নবজাগরণকে তা নানাভাবে উদ্দীপিত করে। বিবেকানন্দের সাধনসঙ্গীতও বাংলার ভাবময় প্রাণের এক অনন্য সম্পদ হয়ে আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীতে নিজেকে নানাভাবে দান করেও পরবর্তী জীবনে অসামান্য নাট্যসাহিত্যের অবদানে বাংলার নাট্যবিভাগকে সঞ্জীবিত করে গিয়েছেন। তাঁদের তুলনায় রজনীকান্ত ও অতুলপ্রসাদের সংখ্যাগত অবদান সংক্ষিপ্ত হলেও বিষয়ের গভীরতায় ও ধ্যানের মাধুর্যে তা অনন্যকীর্তিময়, সন্দেহ নেই।

রজনীকান্ত ছিলেন ক্ষণজন্মা কবি। তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের সীমিত জীবনে ক্ষীণকায় মাত্র আটখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জীবনের শেষ আটমাস কাটে তাঁর হাসপাতালে। এখানে তিনি যে 'হাসপাতালের রোজনামচা' লেখেন, তার মধ্যে অনন্ত শক্তির প্রতি আত্মনিবেদনই মুখ্য রূপ পায়। যেমন: 'সে আমাকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়েছে, সে তো বাপ, আমি হাজার হলেও তো পুত্র। আমাকে কি ফেলতে পারে? তাই এই শাস্তি, এই বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়েছে। ময়লা মাটি আঘাতের চোটে পড়ে গিয়ে খাঁটি জিনিষটি হব; তখন আমাকে কোলে নেবে।...' এই ভগবৎবিশ্বাস ও আত্মনিবেদনের মানসিকতা যে রোগজর্জ্জরতাজনিত, এ কথা মনে করা ভুল হবে। একটি আধ্যাত্মচেতনা রজনীকান্তের মধ্যে গোড়া থেকেই ছিল। উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পেয়ে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম জীবন থেকেই তিনি ছিলেন শান্তরসের মানুষ। শান্ত পরিবেশে বন্ধু-জনসমাগমে তিনি আড্ডা জমাতে ভালোবাসতেন, বন্ধুকৃত্য ক'রে আনন্দ পেতেন, তেম্নি অভিনয় গুণেরও অভাব ছিলনা তাঁর মধ্যে।

তবু একথা সত্য যে, রজনীকান্তের জীবন ঘটনাবহুল ছিল না। যে নাটকীয় উপাদান থাকলে নানা বিচিত্র ঘটনার সৃষ্টি হয়, এমন নাটকীয়তা তাঁর পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে কখনও ঘটেনি। নিস্তরঙ্গ শান্ত জীবন কখনও আশাভঙ্গে কাতর হয়েছে, কখনও শোকে ভেঙ্গে পড়েছে, আবার কখনও বা কর্তব্যের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে। পাবনাজেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে ১৮৬৫ সালের ২৬শে জুলাই রজনীকান্তের জন্ম হয়। তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন কর্মজীবনে সাব-জজ, শিক্ষাজীবনে ফারসী ও সংস্কৃতের ছাত্র। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর মন আচ্ছন্ন ছিল। ব্রজবুলিতে তিনি 'পদচিন্তামণিমালা' ও 'অভয়াবিহার' কাব্য রচনা করেছিলেন। উভয় কাব্যেই ভক্তিবাদের প্রাধান্য ছিল। রজনীকান্তের ভক্তিবাদ জন্মসূত্রে তাঁর পিতার কাছ থেকেই পাওয়া। মাত্র পনেরো বছর বয়সে রজনীকান্ত যে কবিতা রচনা করেন, তাতেই প্রথম তাঁর ভক্তিবিনম্র চিত্তের পরিচয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, আর তার পরিণতি লাভ করে 'আনন্দময়ী' কাব্যে—যা তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১০ সালের ৫ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়।

আইন পাশ ক'রে রজনীকান্ত রাজসাহীতে যান আইনব্যবসার জন্য। কিন্তু একাজে তিনি মানসিক প্রেরণা পাননি—যেমন পাননি শিলাইদহের জমিদারী কাজে রবীন্দ্রনাথ। তাঁর যেমন অন্যতম প্রেরণাস্থল ছিল কাব্যজগৎ, রজনীকান্তেরও তাই। রামপ্রসাদও জমিদারী হিসেবের খাতা লিখতে গিয়ে কর্মোন্নতির পথে এগোতে পারেন নি, হিসেবের খাতায় লিখতেন তিনি মাতৃসঙ্গীত। সেই ধারাটি রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে রজনীকান্তে এসে পৌঁছেছিল। এ সম্পর্কে দীঘাপাতিয়ার শরৎকুমার রায়কে প্রসঙ্গত তিনি লেখেন: 'কুমার, আমি আইনব্যবসানী, কিন্তু আমি ব্যবসান করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল; কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশলাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালোবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম; আমার চিত্ত তাই লইয়াই জীবিত ছিল। সুতরাং আইনের ব্যবসায় আমাকে সাময়িক উদরান্ন দিয়াছে, কিন্তু সঞ্চয়ের অর্থ দেয় নাই।'

আইন ব্যবসার জন্য রাজসাহী গিয়ে তিনি অর্থকরী ব্যাপারে লাভবান না হইলেও প্রাণের ক্ষেত্রে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন। এখানেই তাঁর সঙ্গে

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন ও দীনেন্দ্রকুমার রায়ের সংযোগ ঘটে। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমারই উদ্যোগী হয়ে রজনীকান্তের গানগুলিকে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। তাঁর সম্পাদনাতেই ১৯০২ সালের আগষ্ট মাসে রজনীকান্তের প্রথম গ্রন্থ 'বাণী' প্রকাশিত হয়; দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কল্যাণী' প্রকাশিত হয় ১৯০৫ সালে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কান্তকবির পরিচয়ের মূলেও ছিলেন অক্ষয়কুমার। তিনিই তাঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যান। ঐতিহাসিক হলেও সঙ্গীত যে অক্ষয়কুমারকে কতদূর আকর্ষণ করতো, এ থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। অক্ষয়কুমারের গৃহেই সঙ্গীতের আসর বসতো, সেই আসরের অন্যতম গীতিকার ও গায়ক ছিলেন রজনীকান্ত। লর্ড কার্জ্জনের অবিমৃষ্যকারিতায় সারা বাংলায় তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। স্বাদেশিকতার ব্রতে দীক্ষা নিয়েছে তখন বাঙ্গালী। একদিকে সুরেন্দ্রনাথ, বিপিন পাল, দেশবন্ধু প্রভৃতির ওজস্বিনী ভাষণ, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলাল রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রভৃতির দেশাত্মবোধক সঙ্গীত জাতিকে সেদিন উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল। গানের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন পুরোধা। সেই স্বদেশী যুগে রজনীকান্তও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে গাইলেন—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের,
তার বেশী আর সাধ্য নাই।...'

গাইলেন—

'জয় জয় জনমভূমি, জননি!
যাঁর স্তন্য সুধাময় শোণিত ধমনী,
কীর্তি গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ এই সুবিপুল ধরণী!...'

ইংরেজ সেদিন এদেশের মর্মে বুলেট বিদ্ধ করে যে পৈশাচিকতার পরিচয় দিয়েছিল, তার পরিচয় গাঁথা আছে ইতিহাসের পাতায়। 'বন্দেমাতরম' শব্দটি সেদিন পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল ইংরেজসরকারে হুকুমনামায়। এ সম্পর্কে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন :

'The cry of Bande-Mataram, as I have already observed, was forbidden in the public streets, and public-meetings in public place were prohibited.'

নবগঠিত পূর্ব্ববঙ্গে তখন স্যার বামফিল্ড ফুলারের অপ্রতিহত প্রতাপ। তাঁর আদেশে মাতৃনাম পর্যন্ত উচ্চারণে বিপদ ঘটতে শুরু হলো সেখানে। চারণকবি মুকুন্দদাসকে কারারুদ্ধ করা হলো। মুকুন্দদাস গাইলেন :

'ফুলার, আর কি দেখাও ভয় ;
দেহ তোমার বন্দী বটে, মন সে স্বাধীন রয়।...'

রজনীকান্ত কবিতা রচনা করলেন :

'ফুলার কল্লে হুকুম জারি,—
মা বলে যে ডাকবে রে তার শাস্তি হবে ভারি।
মা ব'লে তাই ডাকলে মাকে ধরবে টিপে গলা ;
তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে রে মা বলা ?
যে দিয়েছে এমন হুকুম, মা কি রে নাই তারি ?
তার মাকে কি ডাকে না সে ? দোষ শুধু বাঙ্গলারি।'

তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি সম্পর্কে 'সাহিত্য'-সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মন্তব্য করেন : "কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের একপ্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্রপ্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুলবাগানে প্রাতঃসূর্যের মৃদু-কিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দেব-বাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মতো সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে, নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু পুরুষের অশ্রু—বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাংলাসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোনো গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতায় এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করি।"

সমাজপতির মন্তব্যের পর আর কোন মন্তব্যের অবকাশ থাকে না। বাংলাদেশ এইভাবেই সেদিন রজনীকান্তকে গ্রহণ করেছিল। যদিও

তিনি প্রচারবিমুখ ছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় একমাত্র অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভিন্ন তাঁকে তুলে ধরবার দ্বিতীয় লোকের অভাব ছিল, তৎসত্ত্বেও বাংলাদেশ যে কবিকে সাগ্রহে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিল, এ কথা ভাবতেও বিস্ময় ও আনন্দ বোধ হয়। দীর্ঘ জীবন লাভ না ক'রেও তিনি সঙ্গীতে যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তা সংখ্যার পরিমাপে না হ'লেও ভাবের গভীরতায় অনেককেই অতিক্রম ক'রে গিয়েছে।

তাঁর দেশাত্মবোধের এই জনপ্রিয়তা জাতির আত্মিক তাগিদ ও প্রয়োজনেই ঘটেছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু মূলতঃ তাঁর সঙ্গীত সাধনার ক্ষেত্র ছিল আধ্যাত্মবাদে। তিনি তাঁর শেষ কাব্য 'আনন্দময়ী' রচনা করেছিলেন শাক্তপদাবলীর উপাদানে। ঈশ্বরকে কন্যারূপে ভজন-পূজনের দৃষ্টান্তে এই কাব্য উজ্জ্বল। যে বাৎসল্য রসে পৃথিবী স্থিতিশীল রয়েছে, তার সার্থকতম অভিব্যক্তি ঘটেছে এই কাব্যে। যদিও গ্রন্থাকারে এ কাব্য কবির জীবদ্দশায় প্রকাশিত হয়নি। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবিমাত্রকেই দেখা যায়, তাঁর কাব্যে বিষয়-বৈচিত্র্য ঘটলেও প্রাণের মূল সুরটি একটি বীণাতন্ত্রে অনুরণিত হ'য়ে উঠে—যা তাঁর প্রাণন-অভিজ্ঞা বা ধ্যান। রজনীকান্তের ক্ষেত্রে সেটি হচ্ছে ভক্তিবাদ—যা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এখানেই তাঁর পূর্ণতা ও সিদ্ধি। এই ভক্তিবাদ তাঁর কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, জীবনে মননে ও নানা রচনায় তা পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল—যেমন গিয়েছিল রবীন্দ্র জীবনে। মূলতঃ ভক্তিবাদেরই দেশ ভারতবর্ষ। ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা একদা এই ভক্তিবাদ বা আধ্যাত্মচেতনাকে কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে ওঠে। তার উজ্জ্বল নিদর্শন রয়েছে ভারতীয় সাধক-সম্প্রদায়ের সাধনায়, বৈষ্ণবকাব্যে, শাক্তপদাবলীতে, বাউলে ও কীর্ত্তনে। গম্ভীরা ও লোক সঙ্গীতেরও বেশীর ভাগ ভক্তিবাদে আচ্ছন্ন। সেই ধারারই উত্তরাধিকারসূত্রে রজনীকান্তের আধ্যাত্মচেতনা গ'ড়ে উঠেছিল। জন্মসূত্রেও তিনি তা অর্জন করেছিলেন সন্দেহ নেই। কারণ তাঁর পিতা গুরুপ্রসাদের মধ্যে এই ভক্তিবাদের যথেষ্টই প্রাবল্য ছিল। জীবনের অক্ষমতা, অতৃপ্তি, অনুশোচনা, আকাঙ্ক্ষা—মূলতঃ এই বিষয়গুলি থেকেই ঈশ্বর বা পরম শক্তির কাছে মানুষের প্রার্থনা জাগ্রত হ'য়ে ওঠে। কবির জীবনে সেই প্রার্থনা বেদনাময় অভিব্যক্তি সুষমাসুন্দর হ'য়ে ফুটে ওঠে তাঁর কাব্যে। যখন পড়ি:

পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয় ?
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা ক'রে রয় ?

তখন স্বভাবতঃই রজনীকান্তের সেই অনুশোচনা, বেদনাবিধুরতা ও প্রার্থনাকে আমরা সহজেই উপলব্ধি করতে পারি। উপলব্ধি করতে পারি বিশ্বদেবতার অসীম অনন্ত এই সৃষ্টি কী মধুময় সুন্দর! কবি গাইলেন :

যেদিন তোমারে হৃদয় ভরিয়া ডাকি,
শাসন বাক্যমাথায় করিয়া রাখি ;
কে যেন সেদিন আঁখি-তারকায়
মোহন তুলিকা বুলাইয়া যায়,
সুন্দর, তব সুন্দর সব
যেদিকে ফিরাই আঁখি।'...

অথবা—

'তুমি সুন্দর, তাই তোমারি বিশ্ব সুন্দর শোভাময় ;
তুমি উজ্জ্বল, তাই নিখিল-দৃশ্য নন্দন-প্রভাময়।'

বিজ্ঞান বলে—প্রকৃতি বিজ্ঞানের দ্বারাই এ বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত, এর অন্তরালে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। যদিও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো কোনো কোনো বিজ্ঞানী এই চরম মতবাদ গ্রহণ করেননি, তবু সাধারণ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান-ভিত্তিক মতবাদই চূড়ান্ত। অথচ বিজ্ঞানও যাঁর আবিষ্কারে ও মহিমাপ্রকাশে অক্ষম, সেই অসীম রহস্যময় বিশ্ববিধাতাকে উদ্দেশ ক'রে রজনীকান্ত বললেন :

'অসীম রহস্যময়! হে অগম্য! হে নির্বেদ ;
শাস্ত্র যুক্তি করিবে কি তোমার রহস্যভেদ ?
শ্রুতি, স্মৃতি, বেদমন্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, ন্যায়, তন্ত্র।
বিজ্ঞান পারেনি প্রভু করিতে সংশয়োচ্ছেদ।'

ঈশ্বরের প্রতি এই অবিচল ও স্থির বিশ্বাসই রজনীকান্তকে আজীবন পরিচালনা ও পরিশুদ্ধ করেছে। মৃত্যুর মুখোমুখী দাঁড়িয়েও পরম দয়ালের কাছে তিনি খ্যাতি, অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সবই সমর্পণ করে বলেছেন :

'আমায় সকল রকমে কাঙাল ক'রেছ
গর্ব করিতে চূর,
যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছ দূর।'

আরো বলেছেন :

'আমার দয়াল ওই বসে আছে নিরজনে।
আমারে দিও না বাধা, ভেসে যাই একমনে।'

এখানে বাংলার চিরন্তন বাউলের সুরটিই স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। হাসপাতালে কবিকে দেখে আসার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে চিঠি দেন, তাতে লেখেন : 'সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি। শরীর হার মানিয়াছে, কিন্তু চিত্তকে পরাভূত করিতে পারে নাই—কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু সঙ্গীতকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই—পৃথিবীর সমস্ত আরাম ও আশা ধূলিসাৎ হইয়াছে, কিন্তু ভূমার প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাসকে ম্লান করিতে পারে নাই।'—এই কয়েকটি কথার মধ্যেই রজনীকান্ত স্পষ্ট হ'য়ে ফুটে উঠেছেন। যে জ্যোতির্ময় পুরুষের সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশা কবিকে ক্রমেই উন্মুখ ক'রে তুলেছিল। অবশেষে তা কার্যে পরিণত হলো। কবির মধ্যে মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ লক্ষ্য করে ভক্তিবাদের অগ্রজ কবি রবীন্দ্রনাথ সেদিন যে বিমোহিত হয়েছিলেন, তাতে আর বিস্ময়ের কি আছে!

এই পরিশুদ্ধ ভক্তিবাদের পাশাপাশি হাসির গানও রজনীকান্তকে জীবনে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। তাঁর হাসির কবিতা ও গানের সংখ্যা একেবারে কম নয়। তা বিশুদ্ধ হাসির হয়েও অনেক ক্ষেত্রেই সমাজের প্রতি ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ ও ধিক্কারে পূর্ণ ছিল। অনেক সময় তা সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে শাণিত কুঠারের মতই কাজ করেছে; কোথাও আবার তীব্র শ্লেষ হয়েও দেখা দিয়েছে। যেমন :

'ধার্মিক বটে সেই, যে দিনরাত ফোঁটা তিলক কাটে;
ভক্ত সেই, যে আজন্মকাল চৈতন নাহি ছাটে,
সেই মহাশয়, সংগোপনে মদটা আসূটা টানে;
নিষ্ঠাবান, যে কুক্কুট-মাংসের মধুর আস্বাদ জানে।
রসিক সেই, যার ষাট বছরে আছে পঞ্চম পক্ষ;
সেই কাজের লোক, চব্বিশ ঘণ্টা হুঁকো যার উপলক্ষ।...'

বন্ধুজন সান্নিধ্যে যে সরসতা কবিকে অভিসিঞ্চিত করতো, সেই সরসতাই অন্যত্র কবির পরিহাস-নিপুণ মনে কৌতুক রসসৃষ্টির উন্মাদনা এনে দিত। উপরের কাব্যাংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাবু' নিবন্ধটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ঈশ্বর

গুপ্ত ও বঙ্কিমচন্দ্র থেকে যে ব্যঙ্গকাব্যের সৃষ্টি হয়, বাংলা-সাহিত্যের তা একটি বিশেষতম দিক।

এই দিকটিকে রবীন্দ্রনাথও কম লালন করেননি। সঙ্গীতে তা সার্থকতা পেয়েছে দ্বিজেন্দ্রলালে এসে। রজনীকান্তের জীবনীকারের মতে দ্বিজেন্দ্রলালই এক্ষেত্রে কান্ত কবির উৎস। রাজসাহীতে থাকাকালে দ্বিজেন্দ্রলালের দেখাদেখিই রজনীকান্ত হাসির গান ও কবিতা রচনা করতে শুরু করেন। কথিত আছে যে, রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও কৌতুকের ক্ষেত্রে কান্তকবি দ্বিজেন্দ্রলালকে 'গুরুদেব' বলে গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল গুরুপদে অভিষিক্ত হবার অবশ্যই অধিকারী ছিলেন। কারণ, সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন আর যে কবির প্রভাব অনেক কবির উপরেই পড়েছিল, তার মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অন্যতম। তাঁর ঢংটি পর্যন্ত আয়ত্ত করতে কুণ্ঠিত হননি রজনীকান্ত, বরং নিজের রচনায় দ্বিকেন্দ্র-অনুসারী ইঙ্গ-বঙ্গ ঢং এনে রজনীকান্ত গৌরব-বোধই করেছেন। তবে তাঁর এই অনুকরণপ্রিয়তা একমাত্র হাসির গানের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, অন্যত্র যেখানে কান্তকবি স্বাধীন বিচরণ করেছেন, সেখানে পরোক্ষে রবীন্দ্রপ্রভাব যে একেবারেই ছিল না, একথা জোর করে বলা চলে না। রামপ্রসাদ ও বিবেকানন্দের ছায়াপাত ঘটাও সেখানে একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। তবু রজনীকান্ত তাঁর নিজস্বধারার যে অবদান রেখে গিয়েছেন, তা সোনার চেয়েও দামী, এ কথা ইতিহাস অকপটে স্বীকার করবে।

তিনি যে নীতিমূলক কাব্যসৃষ্টি ক'রে 'অমৃত' রচনা করেছিলেন, কোনো কোনো সমালোচক তাকে রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা' অনুসারী রচনা বলে রায় দিলেও 'অমৃত'র মধ্যে রজনীকান্তের নিজস্বতা খুঁজে পাওয়া দুর্লভ নয়। বাংলার বাল্য ও কিশোর-জীবন গঠনে তা যথেষ্ট সহায়ক করেছিল। গ্রন্থের নিবেদনে রজনীকান্ত লিখেছেন: যে সকল নীতিবাক্য সার্বজনীন ও সার্বকালিক, যাহা জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের নিজস্ব নহে, যাহা অমর সত্যরূপে চিরদিন মানবসমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে ও অনন্তকাল করিবে, এই নীতিবাক্যগুলিতে সেই সকল সত্যের অবতারণা করা হইয়াছে বলিয়া গ্রন্থের নাম 'অমৃত' রাখা হইল; অমৃতের ন্যায় স্বাদ হইয়াছে, এরূপ অর্থ করিলে সঙ্গত অর্থ করা হইবে না।" কিন্তু সেরূপ অর্থ করলেও যে অসঙ্গত হবে না, একথা সকল শ্রেণীর পাঠকের পূর্বে যে দু'জন মনীষী

বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন, তাঁরা হচ্ছেন দীনেশচন্দ্র সেন ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী। তাঁদের প্রতি তাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হননি কবি। মৃত্যুর পূর্বে গ্রন্থখানি হাসপাতালের রোগশয্যায় তিনি উৎসর্গ করেন কুমার শরৎচন্দ্র রায়বাহাদুরকে ; উৎসর্গ পত্রে তিনি লেখেন :

'নয়নের আগে মোর মৃত্যু-বিভীষিকা ;
রুগ্ন, ক্ষীণ, অবসন্ন ও প্রাণ-কণিকা।
ধূলি হতে উঠাইয়া বক্ষে নিলে তারে,
কে ক'রেছে তুমি ছাড়া ? আর কেবা পারে ?
কি দিব কাঙ্গাল আমি ; রোগশয্যোপরি ;
গেঁথেছি এ ক্ষুদ্র মাল্য, বহু কষ্ট করি ;
ধর দীন-উপহার ; এই মোর শেষ ;
কুমার ! করুণানিধে ! দেখো, র'ল দেশ।'

কিন্তু শেষের মধ্যেও অশেষ আছে, লীলাময় কবিকে মরণে টেনে নিয়ে জীবনে অশেষ করেছেন ! ১৩১৭ সালের ২৮শে ভাদ্র, ইংরেজি ১৯১০ সালের ১৩ই সেপ্টেম্বর কবি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। এখনও যেন আমরা কবির কণ্ঠে শুনতে পাই :

'আমার হাত ধ'রে তুমি নিয়ে চলো সখা,
আমি যে গো পথ চিনি না।'

শুনতে পাই :

'কেন বঞ্চিত হবো চরণে ?
আমি কত আশা ক'রে ব'সে আছি
পাব জীবনে না হয় মরণে।'

জীবনে না হ'লেও মরণে তিনি সেই প্রেম-অমৃত চিরতৃষাহারীর সঙ্গে যে একাত্মতা লাভ করেছেন, তাতে সন্দেহ কি !

রজনীকান্ত সেন—কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। জন্ম—১২ই শ্রাবণ ১২৭২ পাবনা জেলা ভাঙা বাড়ী গ্রামে। মৃত্যু—২৮শে ভাদ্র ১৩১৭ কলিকাতা। পিতা—গুরুপ্রসাদ সেন ; মাতা—মনোমোহিনী দেবী। শিক্ষা—জেলা স্কুল, এফ. এ. (রাজসাহী কলেজ, ১৮৮৫)। বি. এ. (সিটি কলেজ ১৮৮৯), বি. এল. (বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯১)। কর্ম—আইন ব্যবসায়, রাজসাহী, মুন্সেফ। প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'আশা' (আশালতা মাসিক ১২৯৭)। বাংলা কাব্য সাহিত্যে ইনি কান্ত কবি নামে বিখ্যাত। হাসির গান রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। গ্রন্থ—বাণী (১৯০২), কল্যাণী (১৯০৫), সদ্ভাবকুসুম, অভয়া, অমৃত (শিশুপাঠ্য), বিশ্রাম (শিশুপাঠ্য), শেষদান।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫—১৯৪৩

অসীমা মৈত্র

ভারতের সাংবাদিকতার ইতিহাস লিখতে গেলেই প্রথমেই যাঁর নাম মনে পড়ে—তিনি হ'চ্ছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। তিনি শুধু সাংবাদিক নন—একজন বিশিষ্ট সংবাদপত্রসেবী এবং কর্মনিষ্ঠ সম্পাদক ছিলেন। শিক্ষকতা দিয়ে যে জীবন সুরু হ'য়েছিল—সাহিত্য সেবার মাধ্যমে তার পূর্ণতা দেখা যায়।

মানব প্রেম ও স্বদেশচিন্তা তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। স্কুলে থাকাকালেই রামানন্দর মনে স্বদেশ প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়। ছাত্রাবস্থায় তিনি কবিতার অনুরাগী ছিলেন। সবচেয়ে তিনি বেশী ভালবাসতেন রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' কবিতাটি। কাব্য ও উপন্যাসের মাধ্যমেও তিনি স্বদেশ প্রেমের প্রেরণা লাভ করেন। দেশাত্মবোধ তাঁর শৈশব হ'তেই জন্মায়।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বাঁকুড়া শহরে বিখ্যাত পণ্ডিত বংশে ১২৭২ সালে ৭ই জ্যৈষ্ঠ (ইং ১৮৬৫, ২৮শে মে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। রামানন্দের পিতৃপুরুষদের সকলেই সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন ও তাঁদের নিজস্ব চতুষ্পাঠী ছিল। এই বংশে রামানন্দই প্রথম ইংরাজী শিক্ষালাভ করেছিলেন।

প্রথমে রামানন্দ বাংলা স্কুলে অধ্যয়ন করেন ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি পান। পরে ইংরাজী স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান অধিকার করেন ও কুড়ি টাকা বৃত্তি পান। যখন তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন তখন তাঁর বয়স ষোল বৎসর। তাঁর পিতার এমন স্বচ্ছল অবস্থা ছিল যে পুত্রের উচ্চ শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন। কিন্তু রামানন্দ তাঁর বৃত্তির টাকা দিয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করেছিলেন।

যখন রামানন্দ স্কুলে উঁচু ক্লাসের ছাত্র তখন অঙ্কের ব্রাহ্মশিক্ষক কেদারনাথ কুলভী মহাশয়ের সান্নিধ্যে আসেন। কুলভী মহাশয়ের প্রতি এবং ক্রমে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হন। ধর্ম-সংস্কার, ও সমাজসেবা তখন ব্রাহ্মসমাজের প্রধান কাজ ছিল। এই সময় রামানন্দ ব্রাহ্ম ধর্মে বিশেষ অনুরাগী হন। তিনি যখন বি. এ. পড়তেন তখন আনন্দমোহন বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রী ছাত্রদের মধ্যে ধর্ম ও নীতিবোধ জাগানোর জন্য ছাত্র সমাজ

গঠন করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর কঠোর পরিশ্রম ক্ষমতা দেখে রামানন্দ মুগ্ধ হয়ে যান এবং তাঁরই প্রভাবে তিনি ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন।

রামানন্দ যখন কলেজে পড়তেন তখন তিনি ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের সহ সম্পাদকের কাজ করতেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক হেরম্ব চন্দ্র। ইণ্ডিয়ান মিররেও রামানন্দ লিখতেন। বাংলা পত্রিকা 'সঞ্জীবনী' ও 'ধর্মবন্ধুতে'ও তিনি প্রবন্ধ, রসরচনা ইত্যাদি লিখতেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'ধর্মবন্ধু'র সম্পাদক হন এবং ঐ বৎসরেই সিটি কলেজ থেকে এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম শ্রেণীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। কলেজের কর্তৃপক্ষ রামানন্দকে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন।

রামানন্দ অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকাকালেই আরও দুইটি কাজে হাত দেন। 'দাসাশ্রম' পরিচালনা ও ইহার প্রচার পত্রিকা 'দাসী' সম্পাদনা। মানব সেবাকেই তিনি জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। দুঃস্থ নর নারীদের আশ্রয় ও রোগীদের সেবা এই 'দাসাশ্রমে'র প্রধান কাজ। দাসাশ্রমের কাজ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। প্রথম—পতিতাদের কন্যাদের উদ্ধার ও তাদের সেবাকার্যে শিক্ষা দেওয়া। দ্বিতীয়-দুঃস্থ ও অসহায় নর নারীদের আশ্রয় দেওয়া ও সেবা এবং দুরারোগ্য ব্যাধিরচিকিৎসা করা। তারপর তিনি দেওঘরে কুষ্ঠরোগীদের জন্য একটি কুষ্ঠাশ্রম খোলেন। কঠিন ব্যাধিগ্রস্থ রোগীদের সেবা করতে তিনি কোনদিন ভয় পাননি।

রামানন্দ তাঁর বেতনের বেশী অংশ দাসাশ্রমের জন্য দান করতেন। এই দাসাশ্রমে যাঁরা সেবার কাজ করতেন তাঁরা নিজেদের দাস ও দাসী বলে পরিচয় দিতেন। দাসাশ্রম থেকেই প্রচারের উদ্দেশ্যে 'দাসী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'দাসী'র প্রথম প্রকাশে রামানন্দ তাঁর মনোভাব সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছিলেন: "বঙ্গ-সাহিত্য-সংসারে মাসিক পত্রিকার অভাব নাই। এতগুলি মাসিক পত্রিকা থাকিতে আমরা কেন আর একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশিত করিতেছি, এই প্রশ্ন সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। রাজনীতি, সাহিত্য, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব বা বিজ্ঞানের অনুশীলন আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বঙ্গীয় পুরুষ এবং রমণীগনের হৃদয়ে সেবার ভাব জাগাইয়া দেওয়াই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।"

এই পত্রিকায় তিনি নিজে সম্পাদকরূপে কাজ করতেন এবং সমাজ-হিতকর, সেবাব্রতীদের জীবনী ও সেবাব্রতমূলক নানা কাহিনী প্রকাশ

করতেন। এই রচনাগুলি এমন সহজভাবে লেখা হ'তো যাতে সাধারণ পাঠকদের উপযোগী হয়। তিনি যে সমাজ সংস্কারের জন্য এবং সমাজ কল্যাণের জন্য নানা বিষয়ে চিন্তা করতেন তা তাঁর রচনার মধ্যেই প্রকাশ পায়।

পশ্চিমী ব্রেল পদ্ধতিকে ভিত্তি ক'রে অন্ধদের শিক্ষা প্রবর্তনের কথা রামানন্দ প্রথম চিন্তা করেছিলেন। এই বিষয়ে তিনি 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অধ্যায়ে বিশেষভাবে আলোচনা করতেন এবং এই 'বিবিধ প্রসঙ্গ' অধ্যায় প্রথম 'দাসী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

নারীজাতির উন্নতি আর সমাজ সংস্কার নিয়ে তিনি সব সময়ই চিন্তা করতেন এবং সে কারণে দেশভক্তির সংগে নারীর প্রতি অসীম ভক্তি ও সম্মান তিনি মনে মনে পোষণ করতেন। নারী মায়ের জাতি। সুতরাং মাতৃত্ব নারীদের প্রধান স্বরূপ। কিন্তু তাই বলে নারীরা নীরবে অত্যাচার সহ্য কববে সে অসম্ভব। তিনি বলতেন :

"নারী নারী-প্রকৃতির সমুদয় গুণে ভূষিত হউন।"

বাল্যকাল থেকেই নারীর দুঃখ তিনি সহ্য করতে পারতেন না। নারীর প্রতি অত্যাচার ও দুঃখ তাঁকে বেশী বিচলিত করতো। তাঁর ধারণা পরমুখাপেক্ষিতায় নারীজাতির স্বাধীনতা ও মনুষ্যত্ব খর্ব হয়। তিনি বলেছেন :

"স্বাবলম্বন নারীদের পক্ষেও মঙ্গলজনক। শৈশব হইতে বার্দ্ধক্যে মৃত্যু পর্যন্ত নারীর পরমুখাপেক্ষী থাকা ভাল নয়। কোন প্রকৃতিস্থ পিতা, স্বামী ভ্রাতা, বা পুত্র মনে করেন না যে, তিনি অনুগ্রহ করিয়া কন্যা, পত্নী, ভগিনী বা মাতার ভরণপোষণ করিতেছেন ; ইহা সত্য। কিন্তু সকল পিতা, স্বামী, ভ্রাতা বা অপ্রকৃতিস্থ বা আদর্শস্থানীয় নহে।...সুতরাং নারীর স্বাবলম্বিনী হইবার জন্য তাঁহার উপার্জনের ক্ষেত্র বিস্তৃততর হওয়া ভাল। পরিবারের সহিত যুক্ত থাকিয়া উপার্জন করিতে পারা নারী ও পুরুষ উভয়ের পক্ষেই মঙ্গলকর। ...যুদ্ধ করা যে নারীর কাজ নয়, সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।"

রামানন্দ স্ত্রীশিক্ষার প্রতি জোর দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে আমাদের দেশে নারীজাতির ওপর যেভাবে পাশবিক অত্যাচার হ'য়ে গেছে তা দেশের এবং জাতির পক্ষে লজ্জাকর। সুতরাং জাতির বা দেশের উন্নতি সাধন করতে গেলে প্রত্যেক মানুষের মন থেকে পৈশাচিক মনোভাব দূর করতে হবে। নারীজাতিকে দেবীরূপে সম্মান করতে শিখতে হবে।

"যত্র নার্য্যস্ত পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ (যেখানে নারীরা পূজিত হন তথায় দেবতারা বিরাজ করেন) তিনি বলতেন এই শাস্ত্রীয় বচনকে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবহারে প্রমাণিত ক'রতে হবে। শুধু মনে মনে জানলে বা উচ্চারণ করলে চলবেনা।

অত্যাচারিত নারীদের বিষয়ে তিনি 'প্রবাসী'তে (শ্রাবণ ১৩৩০) 'বিবিধ প্রসঙ্গে' বিশদভাবে আলোচনা করেছেন।

রামানন্দ ১৮৯৫ খৃঃ সপরিবারে এলাহাবাদে যান ও কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষ হন। সে সময় শিক্ষা সংস্কারে ও শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর অবদান অতুলনীয়। তিনি কায়স্থ পাঠশালাকে আদর্শ বিদ্যায়তনে পরিণত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। শিক্ষাবিষয়ক যেসব ত্রুটি ছিল অর্থাৎ যে সব ত্রুটি থাকার দরুণ শিক্ষা বিস্তারলাভ ব্যহত হয় সেগুলি দূরীকরণে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

ছেলেদের পুঁথিগত শিক্ষার দিকে তাঁর শুধু লক্ষ ছিলনা। তিনি ছাত্রদের নিয়ে ভ্রমণেও যেতেন। পুঁথিগত শিক্ষার সংগে বাস্তব জ্ঞান যে বেশী প্রয়োজন তা তিনি নিজের জীবনের শিক্ষাকালে উপলব্ধি ক'রে ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন:

"চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমরা বাংলা স্কুলে পদার্থ বিদ্যা, উদ্ভিদ, ভূবিদ্যা প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বই পড়িয়া ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা দিয়াছিলাম। কখনও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের মুখ দেখি নাই। অন্যান্য বহির মত বৈজ্ঞানিক বহিও মুখস্থ করিতাম, এবং কল্পনার সাহায্যে যথাসাধ্য বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। বৈজ্ঞানিক সাহায্য ব্যতিরেকেও শিশুদিগকে উদ্ভিদবিদ্যার প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া যায়। আমরা পল্লীগ্রামতুল্য মফঃস্বলের ছোট সহরে পড়িতাম। সেখানে অনায়াসে আমাদের পাঠ্য যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের "উদ্ভিদবিচারে" উল্লেখিত উদ্ভিদ লতাপাতা ফল ফুল মূল সংগ্রহ করা যায়। কিন্তু তথাপি আমাদের পণ্ডিত মহাশয় আমাদিগকে কোনদিন একটিও গাছগাছড়া সংগ্রহ করিতে বা দেখিয়া আসিতে বলেন নাই। নিজে ও কখন আমাদিগকে দেখাইবার জন্য সংগ্রহ করেন নাই, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমরা বরং শৈশবসুলভ কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া দু-একটা উদ্ভিদ খুঁজিয়া বাহির করিতাম। অন্যান্য বিষয় পড়াইবার সময় যেমন করিতেন, উদ্ভিদ বিচারের

ঘণ্টাতেও তেমনি পণ্ডিতমহাশয় চটিজুতা হইতে পা দু'খানি বাহির করিয়া টেবিলের উপর তুলিয়া দিতেন, এবং এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেন, 'মূল কাহাকে বলে ?' আমরা অমনি মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিতাম,……"

রামানন্দ জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা প্রকৃত শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। ব্যবহারিক জীবনের সংগে পুঁথিগত শিক্ষার সমন্বয় যদি না ঘটে তবে শিক্ষালাভ অসম্পূর্ণ থাকে। শিক্ষালাভ সেখানে ব্যর্থ হয় এবং শিক্ষাপদ্ধতি প্রকৃত শিক্ষালাভের যে অন্তরায় তা সহজেই অনুমেয়। এইসব কারণে রামানন্দ শিক্ষায় ব্যবহারিক জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তাঁর 'ঐতিহাসিক তীর্থযাত্রা' প্রবন্ধে এই বিষয়ে সুস্পষ্ট তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেন।

"ঐতিহাসিক·· তীর্থযাত্রা—ভারতবর্ষের অনেক নগর, অনেক দৃশ্য প্রাচীন কবিত্বের স্মৃতি-বিজড়িত, প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষীস্বরূপ। বহু শতাব্দী পূর্বে নানাজাতীয় পর্যটকগণ ভারতভূমি দর্শনার্থে এখানে আসিতেন। এখনও দেশ বিদেশ হইতে কত লোক ভারতের প্রসিদ্ধ স্থানসকল দেখিবার জন্য আসিয়া থাকেন। অথচ আমরা সেই দেশে, সেই সকল স্থান ও সেই সকল দৃশ্যের মধ্যে বাস করিয়া তাহার কোন সংবাদই রাখি না। ভারতের পূর্ব গৌরব ও ভারতের অতীত ইতিহাসের জীবন্ত ছবিস্বরূপ অনেক দৃশ্য এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। অথচ আমরা তৎসমুদয় দর্শন করিয়া জন্ম সার্থক মনে করি না। আমাদের দেশের সাধারণ নিরক্ষর লোকেরা ত ইতিহাস জানে না, ইতিহাস পাঠ করে না। কিন্তু যাঁহারা ভারতের ইতিহাস পাঠ করেন, তাঁহাদের নিকটও উহা কতগুলি নীরস নাম এবং তারিখের তালিকা মাত্র। অথচ আমাদের হাতের কাছে এমন সকল উপকরণ রহিয়াছে, যদ্দ্বারা ইতিহাস শিক্ষা উপন্যাস পাঠ অপেক্ষাও প্রীতিকর হইতে পারে, যদ্দ্বারা ইতিহাস শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেরই জীবনকে কবিত্বময় এবং ধর্মভাব পূর্ণ করিতে পারে।"

শুধু শিক্ষা সংস্কার নয় দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য তাঁর আন্তরিকতা ও প্রাচেষ্টার নানা দৃষ্টান্ত দেখা যায়। রামানন্দ কংগ্রেসের আদর্শে নিষ্ঠাবান ছিলেন। এলাহাবাদে এসে তিনি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সান্নিধ্যে আসেন। এই সময় তিনি কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯০৫ সালে কাশী কংগ্রেসের অধিবেশনে শিক্ষা

সংস্কার ও সরকারী শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হ'য়েছিল তাতে রামানন্দ জোরের সংগে ব'লেছিলেন : "India's political salvation depends on mass education."

তাই দেখা যায় দেশের শৃঙ্খল মুক্তির সংগে শিক্ষা প্রসারের যে অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক রয়েছে তা অনস্বীকার্য। প্রাথমিক শিক্ষা যে একান্ত প্রয়োজন তা তিনি উপলব্ধি ক'রেছিলেন ব'লেই শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। রামানন্দ ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। জাতিগঠন ও জাতির মুক্তির জন্য তাঁর অবদান মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে।

পণ্ডিত মদন মোহন মালব্যের সংস্পর্শে এসে তিনি নানা জনহিতকর ও গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। প্রায় প্রতিটি কাজেই তিনি মালব্যজীকে সহায় ও সঙ্গীরূপে পেয়ে এসেছিলেন।

১৮৯৬ সনে যখন দুর্ভিক্ষ হয় তখন রামানন্দ এলাহাবাদে স্থানীয় সহৃদয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি অনাথ আশ্রম খোলেন। এখানে শুধু অন্ন বস্ত্রের সাহায্যই করলেন না, সেইসংগে তাদের শিক্ষিত করার জন্য হাতে কলমে কাজ শেখাবার ব্যবস্থার ক'রেছিলেন। এছাড়া রামানন্দকে সেবাব্রতীরূপে আমরা দেখতে পাই। ১৮৯৭ থেকে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে যখন সারা ভারতে প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিল তখন এলাহাবাদ ও এই মহামারীর কবল থেকে রক্ষা পায়নি। রামানন্দ রোগী আতুরদের সেবাকার্যে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন।

রামানন্দ এই এলাহাবাদে প্রায় এক যুগের ওপর ছিলেন। কায়স্থ পাঠশালার অধ্যক্ষপদ ত্যাগ ক'রেও তিনি এখানে বিভিন্ন গঠনমূলক কাজে নিজেকে নিযুক্ত রেখেছিলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে থেকে তিনি রাজনৈতিক সংস্কার সাধনে সক্ষম হ'য়েছিলেন। ভাষাগত বৈষম্য দূর ক'রে জাতীয় সংহতির যে রূপটি আমরা প্রাক্ স্বাধীনতকালে দেখে এসেছি তার মূলে রামানন্দের অবদান অনস্বীকার্য। প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বাংলার শিক্ষাসংস্কৃতির বিস্তারের কাজে তিনি প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৩১২ সাল থেকে প্রয়াগে বাঙালী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের প্রধান কর্মসূচীছিল সাহিত্য, সংগীত ও শক্তিচর্চা। যা পরবর্তীকালে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে রূপান্তরিত হয়।

এই সময়ে রামানন্দ 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভ্যু' পত্রিকা প্রকাশের কথা চিন্তা ক'রেছিলেন। ১৩০৮ সালে বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' ইণ্ডিয়ান প্রেসের চিন্তামণি ঘোষের সহায়তায় প্রথম প্রকাশিত হয়। রামানন্দ বহু পত্রিকা সম্পাদনা ক'রেছিলেন। 'ধর্মবন্ধু', 'দাসী', 'কায়স্থ সমাচার'—যা পরে 'হিন্দুস্থান রিভ্যু' নামে প্রকাশিত হ'য়েছিল এবং 'প্রদীপ'। 'প্রদীপে' রামানন্দের আদর্শের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় এবং শোনা যায় 'প্রদীপে' যে সূচনা 'প্রবাসী'তে তার পূর্ণ প্রকাশ। রামানন্দ বিভিন্ন পত্র পত্রিকা সম্পাদনে যে অভিজ্ঞতা লাভ ক'রেছিলেন তা তাঁর পরবর্তীকালে বিশেষভাবে কাজে লাগে। রামানন্দ বিশ্বাস ক'রতেন যে, উচ্চ মানের পত্রিকাকে দীর্ঘায়ু ক'রতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন: সম্পাদক ও পরিচালক বা স্বত্বাধিকারী একই ব্যক্তির হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ঃ আর্থিক সঙ্গতি থাকা বাঞ্ছনীয়। তৃতীয়: পত্রিকা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ক'রতে গেলে একটি লেখক গোষ্ঠীর প্রয়োজন এবং তাদের জন্য পারিশ্রমিক দেওয়া ব্যবস্থা থাকা উচিত। রামানন্দ আরও বিশ্বাস ক'রতেন যে, শিক্ষক ও অধ্যাপকের মত সম্পাদকের কাজ ও সমান পবিত্র।

'প্রবাসী' প্রকাশের প্রায় ছ'বছর পরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'প্রবাসী'তে প্রথম প্রকাশিত হয়। এলাহাবাদে থাকাকালে রামানন্দের সংগে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠে। রামানন্দের বড় ইচ্ছা ছিল রবীন্দ্রনাথ নিয়মিত 'প্রবাসী'তে লেখেন। ১৩১৪ সালে ভাদ্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে সুরু করে। এরপর থেকে রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র নিয়মিত লেখক।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দ জানুয়ারী মাসে 'মডার্ণ রিভ্যু' পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। 'মডার্ণ রিভ্যু' প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে শিক্ষিত মহলে বিশেষভাবে আদৃত হয়। এই পত্রিকাটির নিয়মিত লেখক ছিলেন আচার্য যদুনাথ সরকার, হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, রজনীকান্ত গুহ, সিস্টার নিবেদিতা, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লাজপত রায়, আনন্দকুমার স্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, সি, ওয়াই, চিন্তামণি প্রভৃতি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ও সাহিত্যসেবী।

অনেকে রামানন্দকে জাতীয় সংস্কৃতির পতাকাবাহী ব'লে অভিহিত ক'রে থাকেন। এই প্রসংগে বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

"ভারতবর্ষের নব জগরণের ব্যাপারে একজন মহাকবির যেমন প্রয়োজন

ছিল রামানন্দ বাবুর মতো একজন চিন্তাশীল ও বিপ্লবাত্মক সাহসী সম্পাদকেরও কি প্রয়োজন ছিল না? ······ইউরোপীয় সংস্কৃতির এবং চিন্তাধারার সংগে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের ফলে একটা সুফল ফলেছিল। ঐ সংস্কৃতির সংস্রবে এসে পরিচ্ছন্ন বুদ্ধির কষ্টিপাথরে সব কিছুকে যাচাই ক'রে নেবার বৈপ্লবিক মনোবৃত্তি আমাদের মধ্যে উন্মেষিত হ'লো। 'প্রবাসী'র এবং "মডার্ণ রিভিউ"—এর সম্পাদকের লেখনী প্রসূত মন্তব্যগুলির মধ্যে ওই শানিতবুদ্ধির তরবারির ঝলকানি দেখে আমরা মুগ্ধ হ'য়েছি। কিন্তু আর এক রামানন্দও ছিলেন যিনি ধর্ম-জগতের মানুষ, আধ্যাত্মিকতায় ছিল যাঁর সুগভীর বিশ্বাস, ভারতবর্ষের অতীতের যাঁর ছিল নিবিড় শ্রদ্ধা, যিনি তাঁর অতীতের ভিত্তিতেই রচনা করতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের উজ্জ্বলতর ভারতবর্ষ।"

রামানন্দ ভারতবর্ষের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর জীবন ও সাহিত্য এই ভাবধারায় পুষ্ট।

উনবিংশ শতাব্দীর যে সকল মনীষী আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন তাঁদের মহিমান্বিত ও গৌরবময় জীবনের নানা স্বাক্ষর আজও অম্লান হ'য়ে আছে।

রামানন্দ এঁদের মধ্যে একজন বিশিষ্ট এবং উজ্জ্বল মানুষ। শুধু সাংবাদিক বা সম্পাদক হিসেবে তিনি আমাদের শ্রদ্ধাভাজন নন, তাঁর ধর্মবিশ্বাস, দেশাত্মবোধ, সাহিত্য শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ উত্তরসূরীদের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। তাঁর প্রতিভা অতুলনীয়।

জীবনে নানা সময়ে নানা কর্মের মধ্যে রামানন্দ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, নিবেদিতা, রোমা রোঁলা, শ্রীঅরবিন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতি।

রামানন্দ প্রসংগে শ্রদ্ধেয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

"নিজ নিষ্কলুষ ও সত্যনিষ্ঠ জীবনে স্ব-নির্বাচিত সাংবাদিক ও পত্রিকা পরিচালকের পথে অতন্দ্রভাবে দেশের ও সমাজের সেবাদ্বারা সমগ্র দেশের প্রায় সকল শ্রেণীর লোকের হার্দিক শ্রদ্ধা অর্জন করিয়া, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এখন তিরোধান করিয়াছেন। তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন নিজ জীবনের অবদান, নিজ আদর্শের মহত্ব, নিজ কর্মের সার্থকতা; রাখিয়া গিয়াছেন তাঁর ব্যক্তিত্বের স্মৃতি, এবং উন্নত ও কৃতকার্য সাহিত্যিকের ধর্মের দৃষ্টান্ত। বাংলা,

ইংরেজীও হিন্দীর মাধ্যমে তাঁহার বাণী তিনি দেশবাসীর নিকট এতদিন ধরিয়া শুনাইয়া আসিয়াছেন।"

নিবেদিতা পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে ব'লেছিলেন: ঐ যে ব্যক্তিটি এখন শুধু বাংলা ভাষায় বাংলার সুখ দুঃখের কথা লইয়া ব্যস্ত আছেন, এমন একদিন আসিবে যখন তিনি সারা ভারতের বেদনা প্রকাশের ভার লইবেন। বিধাতা তাঁহাকে সেই যোগ্যতা দিয়াছেন এবং বিধাতার এতখানি দান কখনও ব্যর্থ হইবে না। ইঁহার মনীষা ও ইঁহার চরিত্র একদিন আরও প্রশস্ততর সাধনক্ষেত্র খুঁজিবেই খুঁজিবেই।"

ভগ্নী নিবেদিতার এই ভবিষ্যত বাণী উত্তরকালে সার্থক প্রমাণিত হয় এবং শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে রামানন্দের চরিত্রের যে দৃঢ়তা প্রকাশ পায়—তা রামানন্দকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ দেয়। এর চেয়ে আর বড কোন কথা হয় না।

যে কর্মময় জীবনের যাত্রা সুরু হয় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৮শে মে সেই যাত্রার বিরতি হয় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—শিক্ষাব্রতী, সাংবাদিক ও রাজনীতিজ্ঞ। জন্ম—১৮৬৫ খৃঃ ৩০ মে বাঁকুড়া জেলায়। মৃত্যু—১৯৪৩ খৃঃ ৩০শে সেপ্টেম্বর কলিকাতায়। পিতা—শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষা—বি. এ. (১৮৮৭), এম. এ. (১৮৮৯)। কর্ম—অধ্যাপক, সিটি কলেজ (১৮৯৩-৯৫), কায়স্থ পাঠশালা কলেজ (১৮৯৫), পরে অধ্যক্ষ—(১৯০৫), শান্তিনিকেতনের অবৈতনিক অধ্যক্ষ। ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক (১৯১০), সভাপতি (১৯২২)। প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনেব মূল সভাপতি (এলাহাবাদ ১৯২৩, ১৯৩২), জাতিসঙ্ঘ নিমন্ত্রিত হইয়া ইউরোপে গমন (১৯২৬)। প্রবাসী ও মডার্ণ রিভিয়ু পত্রে, ইনি নিরপেক্ষ, নির্ভিক ও সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের জন্ম আন্তর্জাতিক খ্যাতিলাভ করেন। প্রতিষ্ঠাতা—বিশাল ভারত (হিন্দী)। গ্রন্থ—আরব্য উপন্যাস, রাজা রবি বর্মার জীবনী। সম্পাদিত গ্রন্থ—রামায়ণ, মহাভারত। সম্পাদক—ধর্মবন্ধু (মাসিক ১৩০৪), দাসী (মাসিক ১২৯৯), প্রদীপ (১৩০৪), প্রবাসী (১৩০৮), মডার্ণ রিভিয়ু (১৯০৭)।

যোগীন্দ্রনাথ সরকার ১৮৬৬-১৯৩৭

লীলা মজুমদার

সমরসেট ম'ম বলেছিলেন গদ্য লেখকদের পাঠকরা মনে রাখে চল্লিশ বছর, কবিকে চিরকাল। তার কারণ চিরন্তন বিষয়বস্তু নিয়েই কাব্যের সৃষ্টি; সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্ নানান ছলে কবিতার উপকরণ হয়ে ওঠে। তার পুরোনো হয়ে উঠবার উপায় থাকে না। ছোট গল্প ও উপন্যাস সাধারণতঃ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে লেখা, চল্লিশ বছরে তাই সে সব সেকেলে হয়ে যায়; জ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে বহু প্রবন্ধের প্রয়োজনীয়তা ও আদর চলে যায়। কিন্তু এমন গদ্যও আছে যে সভাবতঃ কাব্যধর্মী, তাই সে কখনো পুরোনো হয় না; রসরচনা ও ছোটদের জন্য লেখা অনেক বই-ই এই ধরণের জিনিস। তাদের আদর দেশকালোত্তর। ছোটদের জন্য রচিত কবিতার তো কথাই নেই।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'খুকুমণির ছড়া' থেকে একটি নমুনা দিই :

'ঘোড়ায় নাকি পাড়ে না ডিম?
ঐ ত্মাখ তার বাসা,
ডিমের উপর বসে ঘোড়া
তা দিচ্ছে খাসা।'

এ ছড়া আজ কেন আগামী পরশুও লেখা হতে পারত, তবু এর অপরূপত্ব ও জনপ্রিয়তা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হত না। নিতান্ত শিশু বয়সে প্রথম পড়েছিলাম : সঙ্গে একটি লাইন-ড্রইং-এর অবিস্মরণীয় ছবি ছিল। কবিতার কথায় যদি বা কারো প্রত্যয় না হয়, ছবি দেখলে মন থেকে সব অবিশ্বাস ঘুচে যেতে বাধ্য। গাছের মগ্-ডালে, কাকের বাসার মতো, কিন্তু তার চাইতে অনেক বড় বাসা বেঁধে স্বীয়—গৃহস্বামিত্ব প্রমাণ করবার জন্য বাসার দেয়ালের উপর দিয়ে সামনের দুই খুর ঝুলিয়ে দিয়ে, ঘোড়া ডিমে তা দিচ্ছে। বাসাটি যে তারই নিজস্ব তাতে কোনো সন্দেহের কারণ নেই, যেহেতু আশেপাশে নানান্ মাপের ঘোড়ার পায়ের নাল ঝোলানো আছে এবং সারা ছবিময় একটা উগ্র ঘোড়া-ঘোড়া ভাব। এ ছবি কে এঁকেছিলেন জানি না, তবে কবির সঙ্গে তিনিও স্বচ্ছন্দে অমরত্ব দাবী করতে পারেন।

'খুকুমণির ছড়া' যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত একটি সঙ্কলন; এর

মধ্যে অনেক পুরোনো প্রচলিত ছড়ার সঙ্গে, অন্যান্য লেখকদের রচনা, বিদেশী সাহিত্য থেকে অনুবাদ ও যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নিজের কবিতাও আছে। এই বিশেষ ছড়াটি কোন শ্রেণীতে পড়ে বলতে পারি না, কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্মেষের সময়ের যে সব মনোহর রচনা দেশে সাড়া জাগিয়েছিল এবং আজ পর্যন্ত যাদের পরাভব হয়নি, এই কবিতা তারি একটি উদাহরণ।

দেশে এমন বহু প্রতিভাবান লেখক আছেন, যাঁদের ললাটে সাফল্যের তিলক জ্বলজ্বল করলেও, তাঁরা না জন্মালে দেশের বিশেষ ক্ষতি হত না। কারণ, তাঁদের পাঁচ দশ কি এক কোটি উৎকৃষ্ট বই তাঁরা যদি বা না—ই লিখতেন, আরো পাঁচ দশ কি পাঁচিশজন সমান গুণী লেখক এগিয়ে এসে যেটুকু ঘাটতি হয়, নিমেষের মধ্যে পূর্ণ করে দিতেন। দেশীয় সাহিত্যের বিবর্তন অব্যাহত থাকত।

তেমনি আবার মুষ্টিমেয় কয়েকজন আছেন যাঁরা সাহিত্যসেবায় নিজেদের উৎসর্গ না করলে, কোনো না কোনো দিক্ দিয়ে সাহিত্য অভাবগ্রস্ত হয়ে থাকত। যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই মুষ্টিমেয়র অন্যতম। শোনা যায় প্রথম প্রকাশিত আধুনিক বাংলায় ছোটদের জন্য মৌলিক গ্রন্থ হল ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'হাসি ও খেলা'। এই একখানি বই দিয়ে যোগীন্দ্রনাথ বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন ; আর তাকে ফিরে দেখতে হয়নি।

এই সময়ে যদি তিনি অনুপ্রেরণার দোসর না পেতেন, তা হলে স্থায়ী প্রভাব কতখানি হত বলা যায় না, সৌভাগ্যের বিষয় ওঁদের এমন একটি গুণীর দল গড়ে উঠেছিল খাঁদের উদ্দেশ্যই ছিল খ্যাতি বা ব্যক্তিগত লাভের দিকে দৃষ্টি না রেখে, বাংলায় এক বৈশিষ্ট্যময় বাল-সাহিত্য গড়ে তোলা, যাতে বাংলার ছেলেমেয়েদের আর কখনো মানসিক দৈন্য অনুভব করতে না হয়।

সহজেই বলা চলে এঁদের আগমনের আগে বাংলা শিশু সাহিত্যের স্বকীয়তা বলে কোনো বস্তু ছিল না। তার মানে নয় যে, ছোটদের পড়বার মতো বই-ই ছিল না ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদি এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন, কিন্তু তাঁদের গ্রন্থগুলি,—যেমন আখ্যান মঞ্জরী, কিংবা চারুপাঠ—পাঠ্য তালিকায় উচ্চস্থান পাবার উপযুক্ত হলেও,

প্রকৃত শিশুসাহিত্য ছিল না। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষাদান, রস পরিবেশন নয়। এ ছাড়া খ্রীস্টান মিশনারিদের খ্রীস্টিয় নীতি শিক্ষার বই তো ছিলই। তাকেও সাহিত্য বলা চলে না।

শিশুদের জন্য পত্রিকাও প্রকাশিত হত ; ক্রমে ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের 'বালকবন্ধু', ১৮৮৩ সালে প্রমদাচরণের 'সখা', ১৮৮৪ সালে জোড়া-সাঁকো থেকে প্রকাশিত 'বালক' দেখা দিল। ১৮৯৫ সালে শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত স্বনামধন্য 'মুকুল' প্রকাশিত হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে নতুন শিশুসাহিত্যের জমি তৈরি হয়েছিল। জমি তৈরি না থাকলে এই নব সাহিত্যের চারাটি অঙ্কুরিত হত কি না কে জানে।

'মুকুল' প্রকাশিত হবার আগেই ১৮৯২ সালে যোগীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় বই 'ছবি ও গল্প' বেরিয়েছিল ; সজনীকান্ত দাসের আত্মস্মৃতিতে এই বই-খানির চমৎকারিত্বের কথা বিমুগ্ধভাবে উল্লেখ করা আছে। ১৮৯৩ সালে যখন 'রাঙা ছবি' প্রকাশিত হল, সবাই বললে ছোটদের জন্য এমন চোখ-জুড়ুনি বইয়ের কথা এর আগে কে ভাবতে পেরেছিল? মনে হয় এই ছিল যোগীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ কীর্তি ; ছবি দিয়ে, রস দিয়ে, আনন্দ দিয়ে সর্বাঙ্গসুন্দর করে ছেলেমেয়েদের জন্য বই প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা। সেইদিন থেকেই বাংলা শিশু সাহিত্যের একটা সুউচ্চ মান প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ছোটদের জন্য বই লিখলেই আর ছবি আঁকালেই কাজ শেষ হয়ে যায় না ; সামনে থাকে সব চাইতে বড় সমস্যা। কম দামে ছোটদের জন্য ছবি দিয়ে সাজানো বই কে-ই বা প্রকাশ করতে সাহস করবে? পাকা ব্যবসায়ীরা তো নয়ই। ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে সিটি স্কুলে মাস্টারি করতে করতেই যোগীন্দ্রনাথ 'সিটি বুক সোসাইটি' স্থাপন করলেন। মুনাফার আশা না রেখে, ছোটদের জন্য বই ছাপাবার ব্যবস্থা হয়ে গেল। দেশের একটা বড় অভাব কিছুটা মিটল। যোগীন্দ্রনাথের নিজের বই ছাড়াও বহু নাম করা ছোটদের বই এখান থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ; যেমন, উপেন্দ্র-কিশোর রায়চৌধুরীর 'সেকালের কথা,' 'ছোটদের রামায়ণ,' 'ছেলেদের মহাভারত,' 'মহাভারতের গল্প'; দ্বিজেন্দ্রনাথ বসুর 'জীবজন্তু,' 'চিড়িয়াখানা'; পরে, কুলদারঞ্জন রায়ের 'রবিন হুড' 'ওডিসিয়ুস,' 'ইলিয়াড' ইত্যাদি।

উপেন্দ্রকিশোরের বিখ্যাত ইউ রায় এণ্ড সন্স তখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি ; সিটি বুক সোসাইটি একাই একশো। ছোটদের জন্য ভালো বই দেখে

দেশের সকলেই আনন্দিত। সে সব বই এতই ভালো যে, আজ পর্যন্ত তাদের জুড়ি মেলা দায়। যোগীন্দ্রনাথের বইগুলি শিশুসাহিত্যের ক্ল্যাসিক্ হয়ে আছে। 'হাসিখুশি' ১ম ও ২য় ভাগ তিন পুরুষ ধরে বাঙ্গালী সন্তানদের মুগ্ধ করে রেখেছে। 'অ-য়ে অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে', মায়ের দুধের মতো বাংলার সব শিশু উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অমূল্য সম্পদ।

লোকে যখন লেখকদের নামধাম ভুলে গিয়ে তাঁর লেখাগুলিকে প্রবাদ বাক্যের মতো অসংশয়ে গ্রহণ করে, তখনি তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়। বর্তমান পর্যায়ে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের নাম তালিকাভুক্ত করা ভুল। কারণ তিনি বিস্মৃতপ্রায় বাঙ্গালী লেখক নন্। যাঁর কলম থেকে 'হারাধনের দশটি ছেলের কাহিনী,' 'এক যে আছে মজার দেশ', 'চ্যাপটা নাকে চশমা আঁটা গুরু মহাশয়' 'এখন আসে যদি বাঘ, আমার বড্ড হবে রাগ' 'দাদ্‌খানি চাল মুসুরির ডাল' ইত্যাদি অমৃত ধারার মতো নিঃসৃত হয়েছিল এবং আজো বাংলা শিশু জগতের মাটিকে সিঞ্চিত করছে, তাঁকে কি কখনো 'বিস্মৃত প্রায়' বলা উচিত? আরেকটি চিরন্তন ছড়ার কথা পাঠকদের মনে করিয়ে দিই :

'হাতি নিয়ে লোফালুফি
ছিল আমার কাজ ;
সবাই আমায় ডাকত তখন
মল্ল মহারাজ।
সেদিন আর নাইকো রে ভাই,
সেদিন আর নাই ;
তিনটি হাতির ভারেই এখন
হাঁপিয়ে মারা যাই !'

ছোটদের জন্য এমন ছড়া স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বা ক'টি লিখেছেন ?

যোগীন্দ্রনাথ ও তাঁর সতীর্থরা অন্য এক আবহাওয়াতে বাস করতেন সেখানে তোমার-আমার ভেদ ছিল না। তাঁরা শুধু নিজেদের রচনা প্রকাশেই আগ্রহী ছিলেন না ; দেশবিদেশ থেকে যেখানে যা দেখে মনে হত ছোটদের ভালো লাগবে অমনি সেটি সংগ্রহ করে আনতেন। রস-পরিবেশনই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য : সঙ্কলনগুলিতে সব সময়ে

রচয়িতাদের নাম পর্যন্ত থাকত না ; অনেক ছবি বিলিতী বই থেকে নেওয়া হত ; একই ছবি হয় তো একাধিক গ্রন্থে স্থান পেত। কত সময়ে ছবি দেখে তবে কবিতা রচনা করা হত। এমন অপূর্ব সমবায় সমিতি আর কখনো দেখা গেল না। যোগীন্দ্রনাথের 'হাসি ও খেলা' এই ধরণের বই ; এতে তাঁর নিজের লেখা ছাড়াও প্রমদাচরণ সেন, উপেন্দ্রকিশোর, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির রচনা সম্বলিত আছে।

এই সঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত বা সম্পাদিত অনেকগুলি গ্রন্থের তালিকা সংযুক্ত করা হল ; তালিকাটি সম্পূর্ণ না হলেও প্রধান বইগুলির নাম দেওয়া হয়েছে। তালিকার দৈর্ঘ দিয়ে কিন্তু বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশে যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অবদান মাপা যায় না। চোখের যে আদর্শ রেখে আধুনিক বাংলা শিশুসাহিত্য গড়ে উঠেছে, সেই আদর্শ স্থাপন করায় তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধেয়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীও সেই আদর্শ গ্রহণ করেই বাংলা শিশুসাহিত্যকে অমন অপরূপ বলিষ্ঠতা ও সম্পূর্ণতা দিতে পেরেছিলেন। বয়সে তিন বছরের বড় হলেও, উপেন্দ্রকিশোরের কর্মজীবনের প্রথম দিকটা নানান্ পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে কেটেছিল ; যোগীন্দ্রনাথ তরুণ বয়স থেকেই শিশুসাহিত্য রচনা ও প্রকশনার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন।

এঁরা ছিলেন সমগোত্র ও অভিন্ন-আদর্শ। শোনা যায় যোগীন্দ্রনাথ সরকারদের দেবসরকার বংশের ও উপেন্দ্রকিশোরের (দেব) রায় বংশের একই পূর্বপুরুষ। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও নাকি এঁদের সেই বংশ থেকেই উদ্ভূত।

যোগীন্দ্রনাথের জন্ম জয়নগরে, তাঁর মামার বাড়িতে। তাঁর পিতার নাম নন্দলাল দেব। লেখাপড়া শিখেছিলেন জয়নগর ও দেওঘর স্কুলে এবং কলকাতার সিটি কলেজে। পরে আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। এই সময় থেকেই তাঁর শিশুসাহিত্য সেবার সূচনা হয় এবং সত্তর বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সেই সাধনায় ছেদ পড়ে নি।

মানুষটি ছিলেন কোমল স্নেহশীল, পর-দুঃখকাতর, পরিহাসপ্রিয়। বাইরে থেকে তাঁর বিখ্যাত মেজদাদা, স্বনামধন্য চিকিৎসক স্যার নীলরতন সরকারের সঙ্গে বিশেষ কোনো সাদৃশ্য না থাকলেও তাঁদের ভ্রাতৃপ্রেমের

কথা সকলে জানত। লোকজন বড় ভালোবাসতেন, খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসতেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে ভারী উৎসাহী ছিলেন।

কলকাতার ভিড়ে বাস করা যখন অসহ্য মনে হত, গিরিডিতে তাঁর বাগান দিয়ে ঘেরা বাড়ি, 'গোলকুঠিতে' চলে যেতেন। ক্রমে সেই বাড়ি বন্ধুবান্ধবের মিলনস্থল হয়ে উঠেছিল। তখনকার দিনের বাঙ্গালীরা ভারি একটা মজলিশি আবহাওয়ায় বাস করতেন, পরস্পরের মধ্যে হৃদয়ের যোগ ছিল অকৃত্রিম, সরস আদান-প্রদানের কতই না গল্প শোনা যেত। উপেন্দ্রকিশোরের বড় দাদা অধ্যক্ষ সারদারঞ্জন রায় তাঁর খেলার সরঞ্জামের দোকানে খাসা এক রকম মাছ ধরার চার বিক্রী করতেন। তার নাম ছিল, 'ইধর আও!' যোগীন্দ্রনাথ তাঁর দেখাদেখি আরেকটি চার প্রস্তুত করে, তার নাম রাখলেন 'উধর মৎ যাও!'

শুধুই যে হাস্যরস পরিবেশন করে যোগীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত ছিলেন সেটা মনে করা ভুল। সৎ ও সত্যপ্রিয়, আনন্দময় ও বলিষ্ঠ ছেলেমেয়ে তৈরি করাই ছিল তাঁর আশা ও সাধনা। তাঁর লেখা একটি ছোটদের গান থেকে কয়েক লাইন উদ্ধৃত করে এই রচনা শেষ করি।

"জগতের পিতা তুমি করুণা, নিধান,
হীনমতি শিশু মোরা দুর্বল অজ্ঞান।
ছোট প্রাণে আমাদের দাও ভালোবাসা,
ছোট ছোট মুখে দাও স্বরগের ভাষা;
শিখাও এ ছোট কণ্ঠে তব নাম গান!

যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত ও সম্পাদিত গ্রন্থ তালিকা :

হাসি ও খেলা (সঙ্কলন)
ছবি ও গল্প
রাঙা ছবি
হাসিখুসি ১ম ভাগ
হাসিখুসি ২য় ভাগ
ছড়া ও ছবি
ছবির বই
আষাঢ়ে স্বপ্ন

খেলার সাথী
হিজিবিজি
ছড়া ও পড়া
মোহনলাল (ছোটদের উপন্যাস)
মজার গল্প
হাসির গল্প
হাসিরাশি
খেলার গান (action songs)
খুকুমণির ছড়া (সঙ্কলন)
ছোটদের চিড়িয়াখানা
জানোয়ারের কাণ্ড
ছোটদের মহাভারত
ছোটদের রামায়ণ
হিন্দি হাসিখুসি (বাংলা হাসিখুসির অনুবাদ)
বন্দেমাতরম (সঙ্কলন)
শিশু চয়নিকা ইত্যাদি।

নগেন্দ্রনাথ বসু ১৮৬৬—১৯৩৮

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী বলেছিলেন যে, ইনি সেই সব 'জায়েন্ট'দের একজন যাঁরা জাতি গঠন করেন। এটা অত্যুক্তি নয়। জাতীয়-জীবনের একটি ক্ষেত্রে পথিকৃতের গৌরব তাঁর প্রাপ্য। কোষগ্রন্থ পূর্বেও ছিল। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম আধুনিক পদ্ধতিতে কোষগ্রন্থ সংকলন করে জনসাধারণের নিকট জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। গান্ধীজি অবশ্য হিন্দী বিশ্বকোষ দেখে তাঁর মন্তব্য করেছিলেন। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনে অনেক বিশেষজ্ঞের সহায়তা পেয়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু বাংলা বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ মূলতঃ তাঁর একক সাধনার ফল। কিশোর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত কোষগ্রন্থ সংকলনে প্রেরণাকে অবলম্বন করে তাঁর জীবন বিকাশ লাভ করেছে। আর সেই জীবনের ইতিহাসও বিচিত্র।

বাংলা ১২৭৩ সালের (ইং ১৮৬৬) ২৩শে আষাঢ় শুক্রবার ছাতুবাবুর ভবন সংলগ্ন তারিণীদেবীর ৭৫নং বীডন ষ্ট্রীট ভবনে নগেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর কর্তা-মা তারিণীদেবী কোটিপতি রামদুলাল সরকারের তৃতীয়া কন্যা; এঁর স্বামী কালীকৃষ্ণ ঘোষ মহারাজ নবকৃষ্ণের দৌহিত্র। এঁদের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি। অনেক খুঁজে কালীকৃষ্ণ মেয়ের বিয়ে দিলেন তারিণীচরণ বসুর সঙ্গে। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন তারিণীচরণের ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

ক্ষেত্রমণির তিন কন্যা এবং নীলমাধব ও নীলরতন দুই পুত্র। নগেন্দ্রনাথের পিতা নীলরতন কৈলাসচন্দ্র ঘোষের কন্যা পবিত্রকুমারী-কে বিয়ে করেন। সিনিয়র স্কলার কৈলাসচন্দ্রের বিদ্বান হিসাবে সে যুগে বিশেষ খ্যাতি ছিল। নীলরতনের নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথ—এই দুই পুত্র এবং এক কন্যা। পবিত্রকুমারীর বয়স মাত্র এগারো বছর আট মাস তখন নগেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। যেদিন তাঁর জন্ম সেদিনই পিতামহী হাজার টাকা দান করেছিলেন এবং সবাইকে বলেছিলেন যে, এই পুত্রসন্তানই বংশের মুখোজ্জ্বল করবে। অন্নপ্রাশনের উৎসবে ব্যয় হয়েছিল ষোলো হাজার টাকা।

নগেন্দ্রনাথের জন্মের পর কয়েক বছর পর্যন্ত পরিবারে অর্থের প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু ছিল না সুখ ও শান্তি। খুব অল্প বয়সে মার মৃত্যু হয়। বাবা ও জ্যেঠামশাই মদ ধরেছিলেন প্রথমযৌবনে। স্ত্রীর শোকে পিতা উন্মাদ। পিতামহী ক্ষেত্রমণির পক্ষে বিপুল সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব ছিল না। কর্মচারীদের প্রবঞ্চনায় লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি ঋণের দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। বসতবাড়ি পর্যন্ত নিলামে উঠল। আদালতের পেয়াদা এসে তাঁদের বের করে বাড়ি দখল করবে এমন খবর যখন পাওয়া গেল তখন পিতামহী সবাইকে নিয়ে অন্যত্র গিয়ে উঠলেন। কিছুদিন বাগবাজার অঞ্চলে থাকবার পর ছাতুবাবুর বাড়ীতে আশ্রয় পাওয়া গেল।

নগেন্দ্রনাথ তাঁর প্রথম শিক্ষা আরম্ভ করেন নরম্যাল স্কুলে। সেখান থেকে এসে ভর্তি হলেন ওরিয়েন্ট্যাল সেমিনারিতে। অষ্টম থেকে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত এখানে পড়লেন। তার পর একদিন হঠাৎ কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে কাশী পালিয়ে যাবার মতলব আঁটলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে কলিকাতায় এক বন্ধুর বাড়িতে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন দুদিন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাশী যাওয়া না হওয়ায় বাড়ি ফিরে আসতে হল।

মামাবাড়ি ছিল বিদ্যাচর্চার আবহাওয়া। মামা তাঁকে নিজের বাড়ি এনে ভর্তি করিয়ে দিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটু্যশনে। এখানে তৃতীয় শ্রেণীতে (ক্লাস এইটে) পড়বার সময় পারিবারিক জীবনে দেখা দিল চরম বিপর্যয়। পিতা উন্মাদ; একমাত্র বোন স্বামী হারিয়ে শিশুকন্যা নিয়ে এসে উঠেছে পিতৃগৃহে; বৃদ্ধা পিতামহী এতদিন দাসদাসী পরিবৃত হয়ে থাকতেন, নিজের হাতে কোনো কাজ করবার দরকার হয় নি কখনো। আজ তিনি সকলকে নিজের হাতে রান্না করে খাওয়াচ্ছেন। মামাবাড়ীর অবস্থা সচ্ছল; নগেন্দ্রনাথ সেখানে সুখেই ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তাঁর একদিন মনে হল, পরিবারের সবাই এত দুঃখে আছে, হয়তো দুবেলা নিয়মিত ভাত জোটে না এমন অবস্থা, অথচ তিনি সেই দুঃখের পরিবেশ থেকে দূরে নিশ্চিন্ত মসৃণ জীবন যাপন করছেন। এই আত্মপরতার বিরুদ্ধে তাঁর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। তিনি ঠাকুমার কাছে ফিরে এলেন সকলের সঙ্গে দুঃখের ভাগ নেবেন বলে।

সকলের সঙ্গে জীবন জড়াতে গিয়ে তাঁর বিদ্যালয়ের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু তার বদলে শুরু হল ব্যক্তিগত রুচি ও অভিপ্রায় অনুসারে পড়া।

আর চলল সাহিত্যচর্চা। যখন চৌদ্দ বছরের কিশোর তখনই তিনি গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন তাঁদের ভাড়াটিয়া কবি নন্দলাল সরকারকে। নন্দলাল 'কনোজের যুদ্ধ' নামক কাব্যের লেখক। কবিতা রচনার পাঠ এঁর কাছ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন নগেন্দ্রনাথ। সাহিত্যচর্চার আর-এক জন সঙ্গী ছিলেন ব্যোমকেশ মুস্তৌফী। ব্যোমকেশের মধ্যস্থতায় এক ধনী পুত্রের আর্থিক সহায়তা পাওয়া গেল একটি মাসিক পত্রিকা বের করবার। সম্পাদক নন্দলাল সরকার, পত্রিকার নাম 'তপস্বিনী'। এ পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথ 'অক্ষিচাঁদ' নামে একটি ধারাবাহিক উপন্যাস লিখতে আরম্ভ করেন।

ছাতুবাবুর বাড়ীর সামনেই ছিল বেঙ্গল থিয়েটার। দোতলার বারান্দা থেকে অভিনয় কিছু কিছু দেখা যেতো। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ স্বাভাবিক কারণেই নাটক ও অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। 'কর্ণবীর' নামে ম্যাকবেথের অনুবাদ করলেন তিনি ; খানিকটা ছাপা হল 'তপস্বিনী' পত্রিকায়। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে 'কর্ণবীরে'র পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ হয় এবং কিছুকাল পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'তপস্বিনী' বেশি দিন চলে নি। এর পরে 'ভারত' নামে আর-একটি পত্রিকা শুরু হল। এই পত্রিকায় নগেন্দ্রনাথের হ্যামলেটের অনুবাদ ছাপা হয়েছিল। দর্জিপাড়ার থিয়েট্রিক্যাল ক্লাবের জন্য তিনি পার্শ্বনাথ, শংকরাচার্য, লাউসেন, হরিরাজ প্রভৃতি নাটক রচনা করেছিলেন। নন্দলাল সরকারের চেষ্টায় 'কর্ণবীর' (ম্যাকবেথ) নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল ন্যাশনাল থিয়েটারে। কয়েকহাজার টাকার টিকিটও বিক্রি হয়েছিল। কিন্তু পরিচালক জীবনকৃষ্ণ সেন টাকা আত্মসাৎ করবার উদ্দেশ্যে চাতুরী করে দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্তির পরই একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দেওয়ায় অভিনয় বন্ধ হয়ে যায়। দর্জিপাড়ার ক্লাব মহাসমারোহে 'পার্শ্বনাথ' নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। কিন্তু কলিকাতার জৈনসম্প্রদায় আপত্তি করায় এর অভিনয় বন্ধ করে দিতে হয়।

'হরিরাজ' হ্যামলেট ও 'রাজতরঙ্গিণী'র কাহিনীর সংমিশ্রণে রচিত। নগেন্দ্রনাথের এক মঞ্চাভিজ্ঞ বন্ধু নিজের অভিরুচি অনুযায়ী পাণ্ডুলিপির আমূল পরিবর্তন করে স্টার থিয়েটারে অভিনয় করবার জন্য অমৃতলাল বসুকে দেখতে দেন। অমৃতলালের পছন্দ হয় নি। তখন নগেন্দ্রনাথের বন্ধু নিজেই উদ্যোগী হয়ে ন্যাশনাল থিয়েটারে এই নাটকের অভিনয় করেন। অভিনয় জনপ্রিয় হওয়ায় নাটকটি ছাপানো হয়। মূল পাণ্ডুলিপির এত

বেশি অদল-বদল করা হয়েছিল যে নগেন্দ্রনাথ নামপত্রে নিজের বা অন্য কারো নাম দেন নি। প্রখ্যাত অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্ত এই নাটকে প্রধান অংশ গ্রহণ করতেন। নাটকের জনপ্রিয়তা হয়েছিল তাঁর জন্যই। 'হরিরাজে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হবার পর অমরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করলেন নামপত্রে লেখক হিসাবে নিজের নাম ছাপিয়ে। প্রকৃত লেখক নগেন্দ্রনাথ বসুর নাম একটি সংস্করণেও ছাপা হয় নি।

নাটক রচনা করে শখ মিটতে পারে, কিন্তু জীবিকার্জনের উপায় হয় না। তাঁদের পরিবারের আর্থিক অবস্থা তখন খুবই শোচনীয়। মাতামহের চেষ্টায় রেলি ব্রাদার্সের গুদামে নগেন্দ্রনাথ চাকরী পেলেন। টিঁকে থাকলে ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে। কিন্তু মাত্র ছয় দিন কাজ করবার পর তাঁর এ কাজ ভালো লাগল না। কাজ ছেড়ে দিয়ে জুটিয়ে নিলেন এক ছাত্র। বেতন বারো টাকা। সাত টাকা দিতেন ঠাকুরমাকে; আর পাঁচ টাকা মাইনে দিয়ে নিজে সংস্কৃত পড়তে আরম্ভ করলেন।

মাত্র সতের বছর বয়সে নগেন্দ্রনাথ এক বিরাট কোষগ্রন্থ সংকলনের পরিকল্পনা রূপায়িত করতে উদ্যোগী হলেন। কোষগ্রন্থের নাম 'শব্দেন্দু মহাকোষ'। এর পরিকল্পনাটি নগেন্দ্রনাথ নিজে এই ভাবে বিবৃত করেছেন: "শব্দেন্দু মহাকোষের" তিনটি স্তম্ভ। প্রথম স্তম্ভে ইংরেজি আদ্য বর্ণমালা অনুসারে ইংরেজি শব্দ, তাহার ইংরেজি ও বাংলা অর্থ, প্রধান প্রধান ইংরেজি গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ প্রয়োগ এবং যে যে ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও দার্শনিক শব্দের বিস্তৃত পরিচয় আবশ্যক তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ; দ্বিতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সকল প্রধান শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় বিবরণ; এবং তৃতীয় স্তম্ভে অকারাদি বর্ণানুক্রমে বাংলা, সংস্কৃত ও যে সকল বিভিন্ন ভাষার শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত হইয়াছে, সেই শব্দের ব্যুৎপত্তি, অর্থ, প্রমাণ, প্রয়োগ এবং পর্যায় শব্দ বিস্তৃত ভাবে সংকলিত হইয়াছে।"

এই প্রচেষ্টায় নগেন্দ্রনাথের অংশীদার ছিলেন গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের স্বত্বাধিকারী সুরেশচন্দ্র বসু। সংকলনের সকল দায়িত্ব নগেন্দ্রনাথের; ছাপা কাগজ বাঁধাই ইত্যাদির ব্যয় সুরেশচন্দ্রের। সংকলনের কাজ খুবই কঠিন। কঠোর পরিশ্রম করে প্রথম এক শত পৃষ্ঠা একা সংকলন করলেন। নানা বই দেখবার জন্য প্রায়ই তাঁকে মেটকাফ হলে কলিকাতা পাবলিক

লাইব্রেরিতে কাজ করতে হত। কিন্তু এত পরিশ্রম বেশি দিন সইল না। শিরঃপীড়ায় তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। তবু কাজ না করে উপায় নেই। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে কোষগ্রন্থের এক-একটি খণ্ড পর পর ছাপা হচ্ছে। সংকলন বন্ধ হলে প্রেস বসে থাকবে, গ্রাহকরা অধৈর্য হয়ে উঠবে। সুতরাং বেদনায় যখন অস্থির তখনও মাথায় বরফ চাপিয়ে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু এই অবস্থায় একা কাজ করা যখন একান্তই অসম্ভব হয়ে উঠল তখন দুজন সহকারী নিযুক্ত করা হল।

এমনি করে 'শব্দেন্দু মহাকোষে'র চার শো পৃষ্ঠা ছাপা হয়ে গেল। তখন গ্রাহকসংখ্যা প্রায় দু'হাজার। কোষগ্রন্থ সুসম্পন্ন হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা। কিন্তু এই সময় 'শব্দেন্দু মহাকোষে'র মালিকানা নিয়ে গণ্ডগোলের আশঙ্কায় সুরেশবাবু ছাপা বন্ধ করে দেন; নগেন্দ্রনাথের এত বড় দায়িত্ব একা বহন করবার মতো সাধ্য ছিল না। তাঁর এত আশা এত পরিশ্রম সব ব্যর্থ হয়ে গেল।

এই সময়ে রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের দৌহিত্র সুপণ্ডিত আনন্দকৃষ্ণ বসুর সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে নগেন্দ্রনাথের পরিচয় হল। আনন্দকৃষ্ণ আরবী ফারসী লাটিন গ্রীক সংস্কৃত প্রভৃতি নানা ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ইংরেজিতেও তাঁর দখল ছিল অসাধারণ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নাকি তাঁর কাছ থেকেই ইংরেজি শিখেছিলেন। ভাষা শেখার দিকে নগেন্দ্রনাথের ঝোঁক ছিল বরাবরই। জর্মন ফরাসী ও ফারসী ভাষা শিখতে শুরু করেছেন তখন। আনন্দকৃষ্ণের সান্নিধ্যে এসে তিনি বিশেষভাবে উপকৃত হলেন।

রাধাকান্ত দেব বঙ্গলিপিতে 'শব্দকল্পদ্রুম' ছাপিয়েছিলেন। দেশের সর্বত্র এই বিরাট কোষগ্রন্থের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু লিপির বাধা এর ব্যাপক প্রচলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। নাগরী লিপিতে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশের জন্য অনুরোধ আসতে লাগল বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। রাধাকান্ত তখন পরলোক গমন করেছেন। তাঁর উত্তরাধিকারীদের কেউ এইদায়িত্ব গ্রহণ করতে পারলেন না। বরদাপ্রসন্ন বসু ও হরিচরণ বসু 'শব্দকল্পদ্রুমে'র স্বত্ব ক্রয় করে নাগরীলিপিতে প্রকাশের আয়োজন করলেন।

সে সময় নগেন্দ্রনাথের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। উপার্জন অত্যাবশ্যক। আনন্দকৃষ্ণের সুপারিশে 'শব্দকল্পদ্রুমে'র নতুন প্রকাশকরা তাঁকে কাজে নিযুক্ত করলেন। বেতন পঁচিশ টাকা। পূর্ব সংস্করণে যেসব শব্দ বাদ গেছে

সেগুলি সংগ্রহ করে পরিশিষ্টে সংকলন করা হল তাঁর প্রধান দায়িত্ব। বৈদিক দার্শনিক জৈন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের অনেক সংস্কৃত শব্দ পূর্ণ সংস্করণে নেই। অপ্রকাশিত পুঁথি পড়ে সেগুলি সংকলন করতে হবে। এর জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুঁথি সংগ্রহ করা প্রয়োজন। রাধাকান্ত দেবের গ্রন্থাগারে বহু পুঁথি ছিল। সেগুলি দেখবার অবাধ অধিকার পেলেন নগেন্দ্রনাথ; সেই সঙ্গে সুযোগ পেলেন গ্রন্থাগারের মুদ্রিত বই পড়বার। প্রথম থেকে ঐ পর্যন্ত যত বাংলা বই ছাপা হয়েছিল তার একটি করে কপি গ্রন্থাগারে ছিল। সুতরাং নগেন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের পটভূমিকার সঙ্গে পরিচিত হবার এক অপূর্ব সুযোগ পেয়েছিলেন ঐ গ্রন্থাগারে।

কোষগ্রন্থ সংকলনের কাজ নগেন্দ্রনাথ আগেও করেছেন। সুতরাং চাকরি নতুন হলেও কাজটা নতুন নয়। আর এটা তাঁর মনের মতো কাজ। তা ছাড়া এ কাজে আর-একটা সুবিধা পেলেন। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র প্রকাশকদের নিজস্ব ছাপাখানা ছিল। হরিচরণ বসুর আগ্রহে এই ছাপাখানায় তাঁর নাটক 'ধর্মবিজয় বা শংকরাচার্য' ছাপা হয় ১২৯৫ সালে। নাটকটির বেশ ভালো সমালোচনা হল। একদিন দুপুরে তিনি ছাপাখানায় বেঞ্চের উপরে শুয়ে বিশ্রাম করছেন, এমন সময় নাট্যকার অমৃতলাল বসু সেখানে কোনো কাজে এসে উপস্থিত হলেন। হরিচরণবাবু নগেন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত নাটকটির এক কপি তাঁর হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি দেখেছেন?

অমৃতলাল ভূমিকাটি পড়লেন। নাটকের আখ্যানবস্তু কোন্ কোন্ হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ভূমিকায় তার বিবরণ ছিল। নাট্যকারের পাণ্ডিত্য দেখে অমৃতলাল মন্তব্য করলেন যে, লেখক নাটক লিখে শুধু সময় নষ্ট করবে; অথচ যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হয় পুরাতত্ত্বের আলোচনা করলে তার যথেষ্ট উন্নতি হবে।

অমৃতলাল জানতেন না নাট্যকার সেখানে উপস্থিত। কিন্তু তাঁর উপদেশ মন্ত্রের মতো কাজ করল। নগেন্দ্রনাথ তখনই পুরাতত্ত্বচর্চার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এর পর থেকে নিয়মিতভাবে কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরিতে ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রামাণ্য গ্রন্থ পড়েছেন দিনের পর দিন।

কিছুকাল পরে এক অলৌকিক ঘটনায় নগেন্দ্রনাথের জীবনের সাধনা এক নতুন সার্থক পথ খুঁজে পেল। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র শব্দ সংগ্রহের জন্য পুঁথির খোঁজে তিনি একবার এসেছেন বহরমপুরে। পুঁথির সন্ধান করবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'শব্দকল্পদ্রুমে'র জন্য গ্রাহকও সংগ্রহ করতেন। খ্যাতনামা পণ্ডিত রামদাস সেনের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার দেখতে গিয়ে স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষিত ও সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। 'শব্দকল্পদ্রুমে'র গ্রাহক হবার জন্য অনুরোধ করায় তাঁরা বললেন, এই গ্রন্থ খুবই মূল্যবান, সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ পাঠকের পক্ষে অধিকতর উপযোগী 'বিশ্বকোষ'। দুঃখের বিষয় একটি খণ্ড বেরিয়েই 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলার শিক্ষিত-সমাজের এতে অপূরণীয় ক্ষতি হল। আপনি 'বিশ্বকোষ' বের করবার চেষ্টা করুন না কেন ?

নগেন্দ্রনাথ হকচকিয়ে গেলেন : আমি করব ? আমার সম্বল আর যোগ্যতা কই ?

রাত্রিতে তিনবার স্বপ্ন দেখলেন। জ্যোতির্ময়ী মূর্তিতে জগজ্জননী আবির্ভূতা হয়ে আদেশ করলেন, কলকাতা যাও, বিশ্বকোষ বের করো।

—কিন্তু মা, আমি কি পারব ?

মা আবার আদেশ করলেন, পারবে, আমি তোমার সহায়।

বহরমপুরে কয়েক দিন থাকবার কথা ছিল। কিন্তু স্বপ্নাদেশ লাভ করে সবকিছু বদলে গেল। সংকল্প স্থির হয়েছে। 'বিশ্বকোষ' নতুন করে বের করবার চেষ্টা করবেন। সুতরাং আর বিলম্ব নয়। পরদিনই কলিকাতা যেতে হবে।

কবি রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর অনুজ 'কঙ্কাবতী'র লেখক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় মিলিতভাবে 'বিশ্বকোষ' সংকলনের পরিকল্পনা করেছিলেন। ত্রৈলোক্যনাথের নাম বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। ইংরেজিতেও তিনি গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিভিন্ন সরকারী দপ্তরে দক্ষ অফিসার হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল। ১২৯৩ সালে উপক্রমণিকা সহ ২২ সংখ্যায় (fascicule) 'বিশ্বকোষে'র প্রথম খণ্ড বের হয়। এই খণ্ডে শুধু 'অ' বর্ণ সম্পূর্ণ হয়েছিল। নামপত্রে রঙ্গলাল এবং ত্রৈলোক্যনাথ দুজনেরই নাম ছিল। 'বিশ্বকোষে'র ছাপার কাজ যাতে সুষ্ঠুরূপে হতে পারে সে জন্য রঙ্গলাল চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত রাহুতা গ্রামে নিজেদের বাড়িতে একটি ছাপাখানা করেছিলেন।

সংকলনের প্রধান দায়িত্ব ছিল রঙ্গলালের উপর, বৈষয়িক দিকটা পরিচালনা করতেন ত্রৈলোক্যনাথ। 'বিশ্বকোষে'র কাজ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর ত্রৈলোক্যনাথকে সরকারী কাজে ইংলণ্ড যেতে হয়। তাঁর অনুপস্থিত 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হয়ে যাবার একটি অন্যতম কারণ। যে সব গ্রাহক অগ্রিম চাঁদা দিয়েছিলেন, 'বিশ্বকোষ' বন্ধ হওয়ায় তাঁহাদের ধারণা হয়েছিল যে ত্রৈলোক্যনাথ টাকাকড়ি নিয়ে বিলেত পালিয়ে গেছেন।

রঙ্গলাল একা 'আ' বর্ণের 'আমিক্ষীয়' শব্দ পর্যন্ত সংকলন করে ছেপেছিলেন। দ্বিতীয় খণ্ডের ('আ') ১ হতে ৮০ পৃষ্ঠা পর্যন্ত গ্রাহকদের দেওয়া হয়েছে। ৮১ থেকে ১১২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ছাপা হলেও নানা কারণে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। সুতরাং 'আমিক্ষীয়' শব্দ পর্যন্ত এসে রঙ্গলাল ও ত্রৈলোক্যনাথের প্রচেষ্টা বন্ধ হয়ে গেল ১২৯৩ সালে।

এর কিছুকাল পরে ত্রৈলোক্যনাথ দেশে ফিরে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এক দিন উনিশ বছরের এক তরুণ তাঁর আফিসে এসে উপস্থিত। 'বিশ্বকোষ' নতুন করে বের করবে, অনুমতি চায়। ত্রৈলোক্যনাথ প্রথমে কান দিলেন না তার কথায়। এমন অনভিজ্ঞ তরুণের কাজ নয় বিশ্বকোষ সংকলনের দায়িত্ব গ্রহণ করা। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ নাছোড়-বান্দা। একে একে বললেন 'শব্দেন্দু মহাকোষ' সংকলনের কথা; জানালেন 'শব্দকল্পদ্রুমে'র নতুন সংকলনের দায়িত্ব অনেকটা তাঁর উপরে। ধীরে ধীরে ত্রৈলোক্যনাথ নগেন্দ্রনাথের কর্মদক্ষতায় আস্থাবান হলেন। সাফল্যের পথে যত অন্তরায় তার ব্যাখ্যা করে বললেন, বেশ, তুমি যদি সত্যি পার তবে আমার স্বত্ব তোমাকে লিখে দিচ্ছি।

রঙ্গলালও তাঁর স্বত্ব লিখে দিলেন নগেন্দ্রনাথকে।

'বিশ্বকোষে'র মালিকানা তো পেলেন, কিন্তু টাকা আসবে কোথা থেকে? স্থির হল, সংকলনের সকল দায়িত্ব নগেন্দ্রনাথের একার; ছাপার দায়িত্ব গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের উপেন্দ্রচন্দ্র বসুর। কিছুদিন 'শব্দকল্পদ্রুমে'র কাজও নগেন্দ্রনাথকে করতে হয়েছে 'বিশ্বকোষ' সংকলনের সঙ্গে। পঁচিশ টাকার চাকরিটি গেলে সংসার অচল হবে।

'বিশ্বকোষে'র দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনা আরম্ভ। ১২৯৫ সালে (১৮৮৮ খ্রীঃ) তিনি এই কাজ শুরু করেন। গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধির উপরেই 'বিশ্বকোষে'র ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। মাত্র শ-খানেক

গ্রাহক ছিল। কিন্তু নতুন গ্রাহক করতে গেলে এ পর্যন্ত যতদূর ছাপা হয়েছে তা দেওয়া চাই। পুরনো ফর্মাগুলি রাহুতা গ্রামে পড়ে আছে। দাম প্রায় তিন হাজার টাকা। নূতন করে ছাপতে গেলে অনেক বেশি টাকা লাগবে। নগেন্দ্রনাথের অনুরোধে ত্রৈলোক্যনাথ সমস্ত ফর্মা হাজার টাকায় দিতে রাজী হলেন। অনেক কষ্টে নগদ পাঁচ শ টাকা দিতে পারলেন ; এক বছরে শোধ করবার প্রতিশ্রুতিতে হ্যাণ্ডনোট দিলেন বাকি টাকাটার জন্য।

বছর পার হয়ে গেল। 'বিশ্বকোষ' থেকে পাঁচ শ টাকা পাওয়া গেল না ঋণ শোধ করবার জন্য। নিরুপায় হয়ে ঠাকুমার সর্বশেষ অলংকারখানি বন্ধক দিয়ে পাঁচ শ টাকা দিলেন ত্রৈলোক্যনাথকে। আর পাঁচ শ টাকা গ্রেট ইণ্ডিয়ান প্রেসের উপেনবাবুকে দিয়ে নগেন্দ্রনাথ 'বিশ্বকোষে'র একমাত্র স্বত্বাধিকারী হলেন।

স্বত্বাধিকারী, কিন্তু কোনো আর্থিক লাভ নেই। তবু নগেন্দ্রনাথ বিশ্বকোষকেই করলেন তাঁর জীবনের একমাত্র অবলম্বন। চব্বিশ বছরের একাগ্র সাধনায় এই বিরাট কাজ সম্পূর্ণ করতে পেরেছিলেন। একক প্রচেষ্টায় এমন ব্যাপক সংকলনের কাজ এর পূর্বে ভারতে হয় নি।

নগেন্দ্রনাথের জীবনের সকল কর্মপ্রচেষ্টাই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বিশ্বকোষের সঙ্গে যুক্ত। বিশ্বকোষের জন্য প্রবন্ধ রচনার তাগিদেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনা করেছেন। যে সব প্রসঙ্গের উপর সন্তোষজনক বইপত্র পাওয়া যায় নি তাদের সম্বন্ধে লেখার জন্য তিনি ঘুরে ঘুরে প্রাচীন পুঁথি ও অন্যান্য মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করেছেন। এইসব প্রবন্ধের জন্যই তাঁর বহুমুখী গভীর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। কঠোর জ্ঞানসাধনার প্রতিদান তিনি পেয়েছিলেন নানাভাবে। এর মধ্যে আর্থিক ও সামাজিক জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা অন্যতম।

দেশবাসী নগেন্দ্রনাথের পাণ্ডিত্যের যোগ্য মর্যাদা দিতে বিলম্ব করে নি। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চন্দ্রবর্মার বিজয়লিপির পাঠোদ্ধার সম্পর্কে এসিয়াটিক সোসাইটিতে একটি প্রবন্ধ পাঠের সুযোগ পান। তার পর থেকে সভ্য হিসাবে সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নাগরী লিপির উৎপত্তির উপর তাঁর একটি মৌলিক রচনা ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের মুখপত্রেও তিনি এ বিষয়ে

আলোচনা করেছিলেন (১৩০২)। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথকে টেক্সটবুক কমিটির সভ্য নির্বাচিত করা হয়। ঐ বছরই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটির ফিললজিক্যাল কমিটিরও সভ্য মনোনীত হন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে প্রথমাবধি নগেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। পরিষদের সেই প্রথম দিকের অনিশ্চিত জীবনের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন নগেন্দ্রনাথ। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পরিষদ পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন; বিশ্বকোষের অনেক প্রবন্ধের খসড়া এখানে প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। প্রাচীন বাংলা পুঁথি সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করে প্রকাশ করবার ব্যাপারেও তিনি ছিলেন একজন পথিকৃৎ। এইসব সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন পরিষদ, ছাপা হয়েছে তাঁরই বিশ্বকোষ প্রেসে।

পরিষদ পত্রিকা ছাড়া নগেন্দ্রনাথ কিছুদিন কায়স্থ পত্রিকাও সম্পাদনা করেছিলেন।

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে নগেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সেখানে উত্তরবঙ্গের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব' উপাধিতে ভূষিত করেন। এ ছাড়া তিনি 'সিদ্ধান্তবারিধি' 'তত্ত্বচিন্তামণি' ও 'শব্দরত্নাকর' উপাধিও লাভ করেছিলেন।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে নগেন্দ্রনাথ ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। প্রত্নতত্ত্বের প্রতি গভীর আগ্রহ ছিল বলেই কয়েক বছরের জন্য তিনি এ কাজ গ্রহণ করেছিলেন। ময়ুরভঞ্জ রাজ্যের সর্বত্র ঘুরে বহু পুরাকীর্তির সচিত্র বিবরণ তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন একটি ইংরেজি গ্রন্থে।

১২৯৪-৯৫ সাল থেকে ১৩১৮ সাল পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের অক্লান্ত সাধনার ফলে মোট ২২ খণ্ডে এবং ১৭,০০০ পৃষ্ঠায় বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণ সম্পূর্ণ হয়। সংকলনের কাজ অবশ্য ত্রৈলোক্যনাথ এবং রঙ্গলাল কিছুকাল আগে থেকেই আরম্ভ করেছিলেন। প্রথম খণ্ড রাহুতার বিশ্বকোষ যন্ত্রে মুদ্রিত হয়ে ১২৯৩ সালে প্রকাশিত হয়, সর্বশেষ খণ্ড কলিকাতার বিশ্বকোষ প্রেসে মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৮ সালে। প্রথম খণ্ডের কোন কোন কপিতে প্রকাশের তারিখ আছে ১৩০৯। এটা পুনর্মুদ্রণের তারিখ। রাহুতার ছাপা কপি শেষ হয়ে যাবার পর নগেন্দ্রনাথ ঐ বৎসর নতুন করে ছেপেছিলেন।

বিশ্বকোষে কি পাওয়া যাবে সে সম্বন্ধে প্রথম সংস্করণের নামপত্রে বলা

হয়েছে: "যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন আধুনিক ধর্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস; মনুষ্যতত্ত্ব এবং আর্য ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়, জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, অ্যালোপ্যাথী, হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হাকিমী মতের চিকিৎসা-প্রণালী ও ব্যবস্থা; শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের সারসংগ্রহ আকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।"

বাংলা ভাষায় কোষগ্রন্থ রচনার ইতিহাস শুরু হয়েছে ফেলিক্স কেরির 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯) দিয়ে। তার পর থেকে নানা ধরণের কোষগ্রন্থ সংকলনের প্রচেষ্টা হয়েছে। কিন্তু বিশ্বকোষের মতো এরূপ বিরাট নির্ভরযোগ্য এবং সফল উদ্যম এর পূর্বে হয় নি। তবে, আধুনিক কোষগ্রন্থের আদর্শের সঙ্গে পার্থক্যটাও সহজেই চোখে পড়ে। কোষগ্রন্থ ও অভিধানের মধ্যে যে পার্থক্য আছে সে সম্বন্ধে বিশ্বকোষের সংকলকরা সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন না। তাই বিশ্বকোষকে তাঁরা বলেছেন "অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান"। অভিধানে যে-সব সাধারণ শব্দের অর্থ পাওয়া যায় তাদের ব্যাখ্যাও বিশ্বকোষের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শব্দার্থের দিক থেকে বিশ্বকোষ যে সমৃদ্ধ তার উল্লেখ করে নগেন্দ্রনাথ বলেছেন: "শব্দকল্পদ্রুম অথবা বাচস্পতি অভিধানে অধিকাংশ বৈদিক শব্দই নাই; বিশ্বকোষে সেই-সকল বৈদিক শব্দই প্রমাণ প্রয়োগ, ভাষ্য টীকা সহ প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"

শব্দার্থ সংকলনকে প্রাধান্য দেবার ফলে অনাবশ্যকরূপে বিশ্বকোষের আকার বড় হয়েছে অথচ অনেক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গের উপযুক্ত আলোচনা সম্ভব হয় নি। অবশ্য এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার প্রথম দিকেও অভিধানের মতো শব্দার্থ দেওয়া হত।

যদিও নাম বিশ্বকোষ, তথাপি ভারতীয়-বিদ্যার উপরেই এই গ্রন্থে জোর দেওয়া হয়েছে। নগেন্দ্রনাথ এই সম্বন্ধে বলেছেন: "ব্রিটানিকা প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্য মহাকোষ সমূহে ভারতবাসীর অবশ্যজ্ঞাতব্য ও নিত্যপ্রয়োনীয় নানা বিষয় লিপিবদ্ধ হয় নাই, ভারতবাসীর সেইসব অভাব পূরণের দিকে লক্ষ রাখিয়াই বিশ্বকোষ সংকলিত হইয়াছে।"

আকর-গ্রন্থ হিসাবে বিশ্বকোষের মূল্য এই কারণেই। ভারতীয়-বিদ্যার বিভিন্ন শাখার বিচ্ছিন্ন ও স্বল্পপরিচিত তথ্যগুলি সংকলন করে একটি সংহত ও ধারাবাহিক রূপ দেবার কৃতিত্ব বিশ্বকোষের। শুধু সংকলন নয়; পূর্বে যেসব প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কোথাও আলোচনা হয় নি সে সব প্রসঙ্গের উপরও লেখার জন্য নগেন্দ্রনাথকে মৌলিক গবেষণা করতে হয়েছে। বিশ্বকোষের অনেক প্রবন্ধে এখন কিছু কিছু তথ্যগত ত্রুটি চোখে পড়ে। তা ছাড়া প্রথম মধ্য ও শেষ দিকের রচনাগুলির মধ্যে যে সামঞ্জস্যের অভাব আছে সে কথা নগেন্দ্রনাথই বলেছেন। কোষগ্রন্থের প্রসঙ্গ নির্বাচনে যে অব্‌জেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রয়োজন কোথাও কোথাও তারও একটু অভাব দেখা যায়। সম্পাদক যেসব বিষয় সম্পর্কে বিশেষরূপে আগ্রহশীল সেইসব বিষয়ের প্রসঙ্গগুলির বিস্তার কিছু বেশি।

বিশ্বকোষ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হবার সময় থেকেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতসমাজ অনুরোধ করেন হিন্দী সংস্করণ সংকলনের জন্য। বাংলা সংস্করণ শেষ করে হিন্দী সংস্করণের কথা ভেবেই নগেন্দ্রনাথ বলেছেন: "বিশ্বকোষ কেবল বঙ্গবাসীর নহে, সমগ্র ভারতবাসীর; যাহাতে এই বিশ্বকোষ সমগ্র ভারতবাসীর অধিগম্য হয় তজ্জন্য ভারতবর্ষের সমগ্র বিদ্বৎসমাজ আমার সহায় হইবেন, ইহাই আমার শেষ প্রার্থনা।"

হিন্দী সংস্করণের কাজ বাংলা বিশ্বকোষ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হবার কয়েক বছর পরে শুরু হয়েছিল। বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের আগ্রহে নগেন্দ্রনাথ এই দুরূহ কাজে হাত দেন।

হিন্দী বিশ্বকোষের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। পঁচিশ খণ্ডে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। হিন্দীভাষী পণ্ডিতদের কাছ থেকে নগেন্দ্রনাথ সংকলনের কাজে সহায়তা পেয়েছিলেন। মোটামুটি ৭৬৮ পৃষ্ঠার পঁচিশটি বাঁধানো খণ্ডের মূল্য ছিল ৩১৭ টাকা। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে প্রকাশক বলেছেন: "হিন্দী বিশ্বকোষ হিন্দীকা ব্রিটেনিকা হৈ, চিত্র আর মানচিত্রো সে সুশোভিত হোতা হৈ। ইসকা তুলনা করনে বালা বড়া গ্রন্থ ভারতীয় কিসী ভী ভাষা মে নহী হৈ। হিন্দী সংসার মে য়হী এক ঐসা মহাকোষ হৈ জো হিন্দী ভাষাকো সজীব আর রাষ্ট্রীয়তাকে গুণো সে পরিশোভিত কর সকতা হৈ।"

হিন্দী সংস্করণকে বাংলা বিশ্বকোষের অনুবাদ মনে করলে ভুল করা

হবে। বাংলা সংসস্করণের ভুলত্রুটি সংশোধন করা ছাড়া মৌলিক রচনাও যোগ করা হয়েছে।

হিন্দী বিশ্বকোষের কয়েক খণ্ড দেখে মহাত্মা গান্ধী সম্পাদকের পাণ্ডিত্য ও কর্মক্ষমতায় মুগ্ধ হন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের কলিকাতা কংগ্রেসে যোগ দিতে এসে গান্ধীজি নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। কোনো খবর না দিয়েই গান্ধীজি ১৮ই পৌষ (১৩৩৫) রাত্রি আটটায় বিশ্বকোষ লেনে নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে উপস্থিত হন। নগেন্দ্রনাথ তখন হাঁপানী হৃদ্‌রোগ ও নেফ্রাইটিসে ভুগছিলেন। তথাপি তাঁর মনের জোর ও সুদৃঢ় আশাবাদ গান্ধীজির হৃদয় স্পর্শ করেছিল। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনের উদ্যোগে নগেন্দ্রনাথের পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতি হবার আশঙ্কা। কিন্তু তার জন্য নগেন্দ্রনাথের ভাবনা নেই। গান্ধীজিকে তিনি বললেন, এই কাজই আমার সাধনা, এর মধ্য দিয়েই আমি ভগবানের সেবা করি। কর্মই আমার জীবন। গান্ধীজি লিখেছেন, "I was thankful for this pilgrimage, which I should never have missed. As I was talking to him I could not but recall Doctor Murray's labours on his great work···nations are made of such giants"।

গান্ধীজির বিশ্বকোষ লেনে এই 'তীর্থযাত্রা'র বিবরণ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি সংখ্যার "ইয়ং ইণ্ডিয়ায়" বেরিয়েছিল।

১৯শে পৌষ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে কাশীতে তাঁর থাকবার এবং কাজের সুবিধা করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। এই সুযোগ গ্রহণ করা নগেন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১৩৩৮ সালে আশ্বিন মাসে হিন্দী বিশ্বকোষ সম্পূর্ণ হয়। ১৩৪০ সালের বৈশাখ থেকে আরম্ভ হল বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪২ সালের শ্রাবণ মাসে। এ কাজে নগেন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন ছিলেন পুত্র বিশ্বনাথ। হিন্দী বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ থেকেই তার শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ১৩৪১ সালের চৈত্র মাসে বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। পুত্রশোকাতুর নগেন্দ্রনাথ অপটু দেহ সত্ত্বেও চার খণ্ড পর্যন্ত প্রকাশ করেছিলেন। ১৩৪৫ সালের ২৪শে আশ্বিন নগেন্দ্রনাথ পরলোকগমন করেন।

বাংলা বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ যে সম্পূর্ণ হইতে পারে নি এটা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সম্পূর্ণ হলে নগেন্দ্রনাথের আজীবন অভিজ্ঞতার ফল এর মধ্যে পাওয়া যেত। প্রথম সংস্করণের সঙ্গে দ্বিতীয় সংস্করণের কয়েক খণ্ড তুলনা করলেই পরিকল্পনার আমূল পরিবর্তন চোখে পড়ে। প্রসঙ্গ নির্বাচন, বিষয়বস্তুর উপস্থাপন ও বিন্যাস, মুদ্রণপারিপাট্য ইত্যাদি বিষয়ে নগেন্দ্রনাথ প্রভূত উন্নতি বিধান করেছিলেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথা এই যে, বাংলা দেশের প্রায় সকল পণ্ডিত ব্যক্তি বিশ্বকোষের দ্বিতীয় সংস্করণ সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম খণ্ডে সন্নিবেশিত এঁদের নামের তালিকা থেকে উপলব্ধি করা যাবে বিশ্বকোষ বাঙালী মনীষার এক মিলিত প্রচেষ্টার ফল হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারত।

নগেন্দ্রনাথের আর-একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'। বিশ্বকোষের মতো এর ব্যাপক ব্যবহার না হলেও বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অমূল্য দলিল এই গ্রন্থ। ১৩০৩ সালে নড়াইল-হাটবাড়িয়া জমিদার গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের উৎসাহে নগেন্দ্রনাথ এই কাজে ব্রতী হন। বহু কুলগ্রন্থ ইতিহাস শিলালিপি তাম্রশাসন ইত্যাদির সাহায্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্য জাতির কুলবিবরণ তেরো খণ্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন নগেন্দ্রনাথ। তিনি কায়স্থের কুলগৌরব সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ছিলেন। কায়স্থ সমাজের উন্নতি ও সংহতির জন্য তিনি অনেক কাজ করেছেন; কায়স্থদের উপবীত গ্রহণের আন্দোলনেও তিনি ছিলেন অগ্রণী।

বাংলা ভাষায় সুপ্রাচীন ও অপ্রাচীন যত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ আছে তা থেকে শব্দ সংকলন করে একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলা অভিধান রচনা করবার আশা ছিল নগেন্দ্রনাথের। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৫০০ বাংলা, ৫০০ দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পুঁথি ও বাংলায় মিশ্রিত প্রায় ৫০০ কুলগ্রন্থের পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু এ কাজ তিনি সম্পূর্ণ করে যেতে পারেন নি।

এই সঙ্গে নগেন্দ্রনাথ কর্তৃক রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হল। এর বাইরেও দু-একটি বই থাকা সম্ভব।

এই তালিকা থেকে দেখা যাবে নগেন্দ্রনাথের জ্ঞানানুসন্ধান কত বিচিত্র পথে অভিযান করেছিল। অথচ তিনি স্কুলের শেষ শ্রেণী পর্যন্তও

উঠতে পারেন নি। শুধু নিজের চেষ্টায় জ্ঞানচর্চা করেছেন এবং দেশবাসীকে তা বিতরণ করেছেন। নগেন্দ্রনাথ ইংরেজী হিন্দী ও সংস্কৃতে তো পারদর্শী ছিলেনই, তা ছাড়া কয়েকটি বিদেশী ভাষাও আয়ত্ত করেছিলেন। আত্মশিক্ষার এরূপ দৃষ্টান্ত সচরাচর মেলে না।

নগেন্দ্রনাথ বসুর রচনাপঞ্জী

বাংলা

১ ধর্মবিজয় বা শংকরাচার্য। ১২৯৫।
বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করে শংকরাচার্যের জীবনের কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক।

২ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (ইংরেজি নাম: The Castes and Sects of Bengal)। প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয় ১৩০৫ সালে। ইতিহাস, কুলগ্রন্থ, শিলালিপি ও তাম্রশাসনের সাহায্যে লিখিত বিভিন্ন সমাজের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত, পরিচয়, স্থাননির্ণয়, বংশাবলী। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈশ্য—এই কয়টি জাতির বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪ খণ্ড বা ৬ অংশে বিভক্ত। এ ছাড়া রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণসমাজের প্রামাণিক কুলগ্রন্থ মহাবংশও 'জাতীয় ইতিহাসে'র একটি খণ্ড। কায়স্থদের বিবরণ ৫ খণ্ড বা ৬ অংশে সম্পূর্ণ। বৈশ্যকাণ্ডের প্রথম খণ্ডের প্রথম অংশ মাত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

৩ কায়স্থের বর্ণ-নির্ণয়। ইং ১৯০১।
প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কায়স্থ জাতির বিবরণ। পরে 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে'র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪ যশোর ইতিহাস-শাখার সভাপতি...সম্বোধন ; ১৯১৬।

অনুবাদ

কর্ণবীর, ১২৯২। ম্যাকবেথের বঙ্গানুবাদ।

ইংরেজী

1 The Archaeological Survey of Mayurbhanja ; Vol. I. 1911

2 The Modern Buddhism and its Followers in Orissa, 1911

3 A Short History of the Indian Kayasthas, Written for the All India Kayastha Conference, Lahore ; 1915

4. The Social History of Kamrupa, 3v. 1922-33.

হিন্দী

১ ভারতীয় লিপিতত্ত্ব, ১৯১৪।

সম্পাদিত গ্রন্থ

বাংলা

১ বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ; ২ খণ্ড ; ১৮৯৯।

২ পীতাম্বর দাস—রসমঞ্জরী, ১৩০৬।

৩ নরহরি চক্রবর্তী—ব্রজপরিক্রমা, ১৩১২।

৪ কবি জয়ানন্দ—শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল, ১৩১২।

৫ রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল—কাশী-পরিক্রমা, ১৩১৩।

৬ রামাই পণ্ডিত—শূন্যপুরাণ, ১৩১৪।

৭ নরহরি চক্রবর্তী—নবদ্বীপ পরিক্রমা (প্রথমাংশ), ১৩১৬।

৮ বিজয়রাম সেন—তীর্থমঙ্গল, ১৩২২।

৯ যদুনাথ সর্বাধিকারী—তীর্থ-ভ্রমণ (ভ্রমণের রোজনামচা) ১৩২২।

১০ বর্ধমানের ইতিকথা—প্রাচীন ও আধুনিক। অন্যান্য লেখক : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ; রাখালরাজ রায় ; অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী। ১৯১৫

সংস্কৃত ও বিভিন্ন ভাষা

১ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণম্ ; মূল সংস্কৃত, টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ সম্পাদিত। ১-২৩ ভাগ, ১২৯৮-১৩০৯। অসমাপ্ত।

২ কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব—সংগীতরাগকল্পদ্রুম। হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় পারদর্শী সংগীতজ্ঞগণের সাহায্যে সম্পাদিত। ৩ খণ্ড, ১৯১৬

বিশ্বকোষ বাংলা ও হিন্দী

১ বাংলা প্রথম সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ডের ১১৩ পৃষ্ঠা থেকে বাইশ খণ্ড পর্যন্ত নগেন্দ্রনাথের সম্পাদনা ; ১২৯৮-১৩১৮।

২ বাংলা দ্বিতীয় সংস্করণ ; ১-৪ খণ্ড, ১৩৪২-১৩৪৫। অসমাপ্ত।

৩ হিন্দী বিশ্বকোষ ; ২৫ খণ্ড, ১৩২০-১৩৩৮।

'হরিরাজ' নামক একটি নাটকের কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মূল পাণ্ডুলিপি এক বন্ধু এত বদল করেছিলেন যে নগেন্দ্রনাথ প্রথম সংস্করণে নিজের নাম দেন নি। দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল যশস্বী অভিনেতা অমরেন্দ্রনাথ দত্তের নামে। 'নারীরত্ন', অভিনব সামাজিক উপন্যাস বা বঙ্গ-সমাজের আধুনিক চিত্র (১৩২৪) নগেন্দ্রনাথের রচনা বলে কেউ কেউ বলেছেন। কিন্তু প্রমাণ নেই। তাঁর সমসাময়িক আর একজন নগেন্দ্রনাথ বসুও লিখতেন, 'অদৃশ সহায়' তাঁর লেখা। 'নারীরত্ন' এই দ্বিতীয় নগেন্দ্রনাথের লেখাও হতে পারে।

সতীশচন্দ্র রায় ১৮৬৬-১৯৩১

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

বঙ্গভাষার জন্মকাল হইতেই এই ভাষা ও ইহার সাহিত্য বাঙ্গালী পণ্ডিতের কাছে একেবারে উপেক্ষিত হয় নাই, যদিও পণ্ডিত লোকেরা অর্থাৎ সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী বেশির ভাগ সংস্কৃতেই লিখিতেন. বিষয়বস্তুর অভাবের জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনা সম্বন্ধে তাঁহাদের ততটা আগ্রহ ছিল না। অবশ্য তাঁহারা সংস্কৃত হইতে অনুবাদের মাধ্যমে এবং পদ ও কাব্য রচনার দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রসার সাধনে যথাশক্তি চেষ্টিত হইতেন, এবং সংস্কৃত সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া, রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণের কথাবস্তু মৌখিক কথকতার সহায়তায় ও মঙ্গলকাব্যের মাধ্যমে জনসাধারণের আধিমানসিক ও আধ্যাত্মিক পুষ্টি সাধনে যত্নবান্ ; এতদ্ভিন্ন ভালো রচনা বাঙ্গালায় পাইলে, তাহা উপেক্ষা করিতেন না, বরং তাহার চর্চায় মনোনিবেশ করিতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধ সহজিয়া চর্যা-গানগুলির সংস্কৃত টীকা খুব সম্ভব বাঙ্গালা দেশের পণ্ডিতেরাই লিখিয়া গিয়াছেন এবং রাধামোহন ঠাকুর ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদের সংস্কৃত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, বাঙ্গালা সাহিত্যে বড়ো বই, ভালো বই, নামকরা বইয়ের অভাব নিতান্তই পীড়াদায়ক। বাঙ্গালা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ মৌলিক দার্শনিক গ্রন্থ, যাহা মধ্যযুগে লিখিত হইয়াছিল, তাহা হইতেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'। নিষ্ঠার সহিত বাঙ্গালী বৈষ্ণব পণ্ডিত ও জনসাধারণ ইহা পাঠ করিয়া আসিয়াছেন, এবং সম্প্রতি ইহার হিন্দী ইংরেজি ও সংস্কৃত অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে।

ভারতে আগত ইউরোপীয়দের হাতেই বাঙ্গালা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চর্চা রীতিমত ভাবে আরম্ভ হইয়াছিল। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান ধর্ম-প্রচারকেরা মুখ্যতঃ খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারতীয় ভাষা পঠন-পাঠন আরম্ভ করেন, এবং খ্রীষ্টান ধর্মগ্রন্থ অনুবাদের কাজে লাগিয়া যান। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে ভারতীয় ভাষার স্বকীয় সাহিত্যের সম্বন্ধে প্রথমটায় কোনও আগ্রহ ছিল না, এবং পুরাতন সাহিত্যের চর্চা তাঁহাদের গণ্ডীর এবং ক্ষমতার বাহিরেই ছিল। বাঙ্গালার প্রথম ব্যাকরণ ও প্রথম গদ্য-গ্রন্থ ('কৃপার শাস্ত্রের অর্থ ভেদ') লিস্‌বন্ হইতে ১৭৪৩ সালে রোমান হরফে

পোর্তুগীস্ ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। তখন পোর্তুগীস্ পাদ্রীদের মধ্যে বাঙ্গালার নিজস্ব সাহিত্য পড়িবার কোনও গরজ ছিল না। ইংরেজ সরকারী কর্মচারী নাথানিএল ব্রাসি হ্যালহেড ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে তাঁহার Grammar of the Bengal Language প্রকাশিত করেন—এই পুস্তকের ছাপায় সর্বপ্রথম বাঙ্গালা হরফ ব্যবহৃত হয়। পোর্তুগীস্ পাদ্রী মানুএল দা আস্‌সুম্পাসাঁও-র ব্যাকরণ অপেক্ষা ইংরেজিতে লেখা হ্যালহেডের ব্যাকরণ আরও উচ্চ পর্যায়ের বই ছিল; এবং হ্যালহেড তাঁহার বাঙ্গালা ব্যাকরণে বাঙ্গালা পাঠের নিদর্শন স্বরূপ কাশীরাম দাশের মহাভারত হইতে কিয়দংশ ছাপাইয়া দিয়াছিলেন। বিদেশীর হাতে এইরূপে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চার সূত্রপাত দেখি। ইহার পরে রুষ বাদক নাট্য-প্রযোজক এবং লেখক হেরাসিম লেবেডেফ কলিকাতায় আসিয়া বাঙ্গালা নাটক রচনায় ও প্রযোজনায় পথিকৃৎ হইলেন, কলিকাতার দেশীয় ভাষার ব্যাকরণ লিখিবার প্রয়াস করিলেন, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের উচ্চ কোটির পুস্তক অধ্যয়নেও মনোনিবেশ করিলেন—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তিনি রুষ অক্ষরে নিজের উচ্চারণের সুবিধার জন্য লিখিয়া লইলেন, এবং প্রত্যেক শব্দের আক্ষরিক অনুবাদও দিলেন। হাতে-লেখা বাঙ্গালা বইয়ের প্রত্যেকটি ছত্র ধরিয়া এইভাবে বিশেষ পরিশ্রম সহকারে বাঙ্গালা ভাষার চর্চায় তিনি অবহিত হইলেন; ইঁহার নিজের লেখা রুষ প্রতিবর্ণ-ও অনুবাদ-ময় এই বই মস্কো নগরে রক্ষিত আছে, এবং ইহার দুই-একটি পৃষ্ঠাও কলিকাতা হইতে প্রকাশিত, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মদনমোহন গোস্বামীর সম্পাদিত, লেবেডেফের কৃতি বাঙ্গালা নাটকের সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে।

ইহার পরে আমরা পাই শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট পাদ্রী উইলিয়ম কেরিকে, ইনি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অপরিসীম সেবা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙ্গালার প্রথম যুগের এক বড়ো কবি কৃত্তিবাসের রামায়ণের মুদ্রণ ও প্রকাশন, এবং ইঁহার দ্বারা প্রথম বাঙ্গালা সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা—এই সব কারণে ইনি চিরকাল ধরিয়া বাঙ্গালীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়া থাকিবেন।

প্রায় ঐ সময়েই ভারতে ও ভারতের বাহিরে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মধ্যে সংস্কৃতের চর্চা আরম্ভ হইয়া যায়। কয়েক দশক ধরিয়া ভারতের আধুনিক ভাষার সাহিত্যের প্রতি ইউরোপীয় মনীষার একটু অবহেলা দেখা যায়।

ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, কারণ তাঁহাদের নিজেদের দেশে নিজেদের মাতৃভাষার সাহিত্যের গভীর আলোচনা তখনও আরম্ভ হয় নাই। সকলেই তখনও ইউরোপের প্রাচীন ভাষা লাতীন ও গ্রীক লইয়া মশগুল হইয়া থাকিতেন। ও লাতীনের পাশে ইহাদের সহোদরা সংস্কৃত ভাষাও স্থান করিয়া লইল। ১৮৬০ সালের পর হইতে এদেশের আধুনিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ইউরোপের কোনও কোনও ব্যক্তি আকৃষ্ট হইলেন। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পোর্তুগীস পাদ্রীদের হাতে, কোঙ্কণী মারাঠী ও তমিল, এই তিনটি ভাষা বিশেষভাবে আলোচিত হইত, কিন্তু উত্তর-ভারতের আধুনিক ভাষাগুলির প্রতি কাহারও তেমন দৃষ্টি পড়ে নাই। ফরাসী পণ্ডিত গার্সাঁ দ্যু-তাসি হিন্দী ও উর্দূ ভাষার সাহিত্যের চর্চা করিতে লাগিলেন, এবং সে সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন। আধুনিক ভারতীয় আর্য-ভাষার আলোচনার আদি প্রবর্তক ইংরেজ সিবিলীয়ন জন বীম্স্ ১৮৬৫ সালের দিকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

বঙ্গভাষী জনসাধারণ পুরানো সাহিত্য বলিতে খুব বেশী করিয়া বিবিধ কবির কৃতি রামায়ণ মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ করিতেন; কবিকঙ্কণ-চণ্ডী এবং বিশেষ করিয়া ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল লোকপ্রিয় কাব্য ছিল, এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণবগণের নিকট বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্য মহাজন-পদাবলী ও জীবনী-সাহিত্য প্রভৃতি সমাদৃত ছিল। ১৮৭০ সালের পরে ক্ষীণ ধারায় মাতৃভাষার পুরানো সাহিত্য সম্বন্ধে শিক্ষিত বাঙ্গালীর কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা দেখা দিল। এই বিষয়ে অগ্রণী হইলেন রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়; তাঁহার নামের ইংরেজি বানানের তিনটি আদ্য অক্ষর R. C. D.-কে বদলাইয়া Arcy Dae, এই ছদ্ম নামে ইংরেজিতে বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে প্রথম পুস্তক প্রকাশ করিলেন ১৮৭২ সালে। তারপরে পথ যেন খুলিয়া গেল। বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য মন্থন করিয়া ১৮৮৩ সালে জগবন্ধু ভদ্র মহাশয় তাঁহার 'গৌরপদ-তরঙ্গিণী' সংকলন করিলেন, এবং প্রায় ঐ সময়েই (১৮৮৭) সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিদ্যাপতির পদাবলী, বাঙ্গালা পদসাহিত্য হইতে সংকলন করিয়া, পৃথক প্রকাশ করিলেন। সারদাচরণ মিত্র ও শোভাবাজারের বরদাকান্ত মিত্রের সহযোগিতায় সাহিত্য-সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' নাম দিয়া বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের

পদ, কবিকঙ্কণ-চণ্ডী, রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ প্রমুখ পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত করেন (১৮৭৪-৭৭)। ইতিমধ্যে কলিকাতার বটতলা ছাপাখানা হইতে ১৮৪০ সালের পূর্বেই কিছু-কিছু বৈষ্ণব পদ পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়, এবং ১৮১৭ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের গ্রন্থাবলীর বিভিন্ন কতকগুলি সংস্করণও প্রকাশিত হয়। ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলার সাধারণ পাঠাগারে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সম্বন্ধে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া বাঙ্গালী শিক্ষিত সমাজকে তাহার ভাষার প্রাচীন সাহিত্যের এই দিকটির প্রতি আকৃষ্ট করেন। রমণীমোহন মল্লিক চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতির সম্পূর্ণ পদসংগ্রহ প্রকাশিত করেন। ইতিমধ্যে ১৮৯২ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রতিষ্ঠা হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী তাহার প্রাচীন সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক রিকৃথ সম্বন্ধে সচেতনভাবে অনুসন্ধানের জন্য পথ বাহির করিল।

১৮৭২ সালে রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তখনকার কালের বিখ্যাত পুস্তক ‘বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব’ প্রকাশিত করেন। ওদিকে কুমিল্লায় ও ঢাকায় থাকিয়া দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার যুগান্তকারী গ্রন্থ ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য’ ১৮৯৭ সালে প্রকাশিত করেন। পরে ১৯১২ সালে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আহ্বানে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত বক্তৃতামালার আধারে তাঁহার বিখ্যাত পুস্তক *Hrstory of the Bengali Language and Literature* প্রকাশিত করিলেন। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চেষ্টায় প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পুঁথি সংগ্রহ এবং অপ্রকাশিত পুঁথির মুদ্রণ তখন পুরা দমে চলিয়াছে।

এইভাবে বাঙ্গালীর কাছে তাঁহার মাতৃভাষার সাহিত্যের গভীর অধ্যয়ন ও অনুসন্ধানের সূত্রপাত হইল। এবং এই পথে যাঁহারা নূতন-নূতন আবিষ্কার ও গবেষণার দ্বারা, নূতন তথ্য ও তত্ত্ব আনয়ন করিয়া বঙ্গ-সরস্বতীর মুখ উজ্জ্বল করিলেন, তাঁহাদের মধ্যে এক মনস্বী ও কৃতী পুরুষ ছিলেন ঢাকার সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়।

বাঙ্গালী তাহার সাহিত্য-সাধনায় রাজশেখরের নির্দিষ্ট দুই প্রকার মনীষার বা প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন—(১) কারয়িত্রী প্রতিভা ও (২)

ভাবয়িত্রী প্রতিভা। কারয়িত্রী প্রতিভা, ইংরেজিতে যাহাকে Creative genius বলে—তাহা হইতেছে অভিনব সাহিত্য সর্জনা, নূতন-নূতন রসসৃষ্টি, এবং সৎ বা সাধু সাহিত্যের প্রসার। ভাবয়িত্রী প্রতিভা, অর্থাৎ reflective genius, মুখ্যতঃ আলোচনাত্মক—যে সাহিত্য আমাদের উপলব্ধ হইয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গীণ আলোচনা ও বিচার। বাঙ্গালা ভাষার মতো উন্নতিশীল ভাষায় এই উভয়বিধ প্রতিভার লক্ষণীয় বিকাশ দেখা যায়। কবিতা ও কাব্য, গল্প ও উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি সাহিত্য-সর্জনা বাঙ্গালা ভাষায় এখন অব্যাহত রূপেই চলিতেছে। আধুনিক কালে যে-সমস্ত নূতন-নূতন সাহিত্যের ধারা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সেগুলিকে অবলম্বন করিয়া বাঙ্গালা ভাষা নিত্যই নব-নব রচনার দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ কোটির সাহিত্য-স্রষ্টার অভাব কখনও হয় নাই; এযুগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেম, নবীন, বিহারীলাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ, পরে রবীন্দ্রনাথ— ইঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যের ধারা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন, এমন বহু জীবিত কবি এখনও বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বর্ধন করিতেছেন। গল্প ও উপন্যাসে আধুনিক বাঙ্গালী লেখকগণ বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্র শরৎচন্দ্র প্রমুখ পথিকৃৎদের অনুসরণে ভারতের তথা বিশ্বের সাহিত্যের অতি উচ্চ মর্য্যাদার স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এদিকে বাঙ্গালা বাঙ্ময়ের অধ্যয়ন ও আলোচনায় বাঙ্গালীর ভাবয়িত্রী প্রতিভা তাহার কারয়িত্রী প্রতিভার সঙ্গে তাল রাখিয়া যেন চলিয়াছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সময় হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনায় বাঙ্গালী মনীষী পণ্ডিত কখনও অবহেলা করেন নাই, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে আমরা কতকগুলি অদ্ভুৎ শক্তিশালী লেখককে পাইয়াছি, এবং এই কাজে তাঁহাদের। উত্তরাধিকারীরও অভাব হয় নাই। আধুনিক সাহিত্য ভিন্ন বাঙ্গালার পুরাতন সাহিত্যের আলোচনায় চলিতেছে, এবং এবং এই আলোচনার ইতিহাস বা ধারা সংক্ষেপে উপরে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে যাঁহারা একনিষ্ঠ-ভাবে আত্মনিয়োজন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম সকল দিক হইতেই শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিতে হয়। মৃত ও জীবিত আলোচকদের মধ্যে যাঁহারা বাঙ্গালীর প্রাচীন সাহিত্য গভীরভাবে চর্চা

করিয়া সেই আলোচনার পথকে সুগম করিয়া দিয়াছেন এবং এই বিষয়ে একটি discipline বা পরিপাটি অথবা পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়া গিয়াছেন, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, তাঁহাদের মধ্যে সতীশচন্দ্র রায়ের অপেক্ষা যোগ্যতর পণ্ডিত আর কেহ-ই দেখা দেন নাই। সতীশচন্দ্র রায় বাঙ্গালা ১২৭৩ সালের ১লা কার্ত্তিক ঢাকা জেলার অন্তর্গত নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ধামগড় গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৩৩৮ সালেব ৫ই জ্যৈষ্ঠ ঐ স্থানেই আপন গৃহে পরলোক গমন করেন (ইংরেজি ১৮৬৬ হইতে ১৯৩১ সাল)। তাঁহার জীবন ছিল সম্পূর্ণ রূপে বিদ্যাচর্চায় উৎসর্গীকৃত। কোনও চটকদার ঘটনা তাঁহার জীবনে ঘটে নাই। একনিষ্ঠভাবে সারস্বত-সাধনার এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি হইতেছে পাঁচ খণ্ডে বৈষ্ণব-পদ-সংগ্রহ 'পদকল্পতরু'র সটীক সংস্করণ, ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩২২ বঙ্গাব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত কয় বৎসর ধরিয়া প্রকাশিত হয়। এই বিরাট পুস্তকের পঞ্চম খণ্ডে ২৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী তাঁহার লিখিত অতীব মূল্যবান ভূমিকা ও ১১৮ পৃষ্ঠা ব্যাপী শব্দসূচী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই পঞ্চম খণ্ড তিনি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। ইহাতে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র, অধুনা পরলোকগত ভবানীচরণ রায়ের লিখিত তাঁহার পিতার একটি ক্ষুদ্র জীবনকথা-মুদ্রিত হইয়াছে। এই জীবনকথা হইতে সাহিত্য বিষয়ে তাঁহার বহুমুখী জ্ঞান ও অভিনিবেশ এবং সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী ও অন্যান্য ভাষার, উপরন্তু ইংরেজি ও অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এইরূপ অধ্যয়ন ও বিচার-শক্তি লইয়া অতি অল্প সাহিত্য-সমালোচকই আমাদের দেশে প্রাচীন সাহিত্য আলোচনার কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইনি একজন অধিকারী পণ্ডিত ছিলেন। বি. এ. পরীক্ষাতে সংস্কৃতে অনার্স লইয়া প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন—তাঁহার সহিত প্রথম হন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন মহাশয়। তাঁহার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন এবং কর্মবীর অম্বিকাচরণ উকিল মহাশয়। সতীশচন্দ্র সংস্কৃতে এম. এ. পরীক্ষাতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সারা জীবন ধরিয়া তিনি বাঙ্গালা দেশের বৈষ্ণব সাহিত্য আলোচনা করিবার কালে হিন্দী ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন ; এবং ঐ ভাষাতে এতদূর

প্রাধান্য অর্জন করেন যে, ইহাতে কতকগুলি মূল্যবান্ প্রবন্ধ রচনা করেন, এবং হিন্দীর পণ্ডিত-সমাজে বিশেষভাবে সুপরিচিত হন। হিন্দী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ছাড়া, উত্তর-ভারতের তাবৎ আর্য-ভাষার সহিত তাঁহার অল্প-বিস্তর পরিচয় ঘটে। ইহা ভিন্ন ইংরেজি অনুবাদের সাহায্যে ইউরোপের প্রাচীন ও আধুনিক ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকগণের পুস্তক অধ্যয়ন করা তিনি তাঁহার সাহিত্য-সাধনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছিলেন, এবং ইংরেজি ফরাসী ইতালীয়ান জরমান রুষ গ্রীক ও লাতীন ভাষায় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির সহিত তিনি পরিচয় লাভ করেন। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের আনুষঙ্গিক অন্যান্য মানবিকী শাস্ত্রের সম্বন্ধে তাঁহার যেমন আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা ছিল, তেমনই ছিল অতন্দ্র পরিশ্রমের সহিত সেই সমস্ত বিষয়ের চর্চা। ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য উভয়বিধ দর্শনে অতি আধুনিক বিকাশও তাঁহার আলোচ্য ছিল। ভারতীয় অলংকার ও রস-শাস্ত্রেও তেমনই ছিল তাঁহার গভীর প্রবেশ। প্রাচীন বাঙ্গালা, বিশেষতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা তুলনা-মূলক পদ্ধতির এক অপরিহার্য অঙ্গ, এবং সেইজন্য তিনি হিন্দীর শ্রেষ্ঠ classics বা প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থগুলির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ছন্দঃশাস্ত্রে—কেবল সংস্কৃত বাঙ্গালা হিন্দী মৈথিলীর নহে, অধিকন্তু ইংরেজি ছন্দ সম্বন্ধেও তাঁহার গভীর ব্যুৎপত্তি ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি সঙ্গীতেও পারদর্শী ছিলেন—কেবল সংগীতের সম্বন্ধে উপর-উপর জ্ঞান নহে; তিনি কার্যকরভাবে একজন গায়ক ও উচ্চদরের বাদ্যশিল্পী ছিলেন, এবং এই বিষয়ে তাঁহার বহুবর্ষব্যাপী অধ্যবসায় ও সাধানাও ছিল। পাখোয়াজ ও তবলায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এবং কলিকাতার বিখ্যাত পাখোয়াজী মুরারিবাবুর শিষ্য ছিলেন। ফলিত জ্যোতিষেও তাঁহার অনুরাগ ছিল। এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় দেশীয় astrology বা ফলিত জ্যোতিষ লইয়া তিনি গবেষণা করিতেন। জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি কতকগুলি মৌলিক সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিবার সংকল্প করেন, কিন্তু কার্যতঃ তাহা হইয়া উঠে নাই। এতদ্ভিন্ন তিনি চিত্রবিদ্যার একজন সমঝদার ছিলেন, এবং বিশেষ করিয়া ইউরোপের আধুনিক কালের শিল্পকলা তাঁহার সানুরাগ আলোচনার বস্তু ছিল। এককালে তিনি ছোটো গল্প ও উপন্যাস লিখিবার সংকল্প করেন, কিন্তু তাহার উপযোগী 'কারয়িত্রী প্রতিভা'র পরিবর্তে অন্য প্রকারের প্রতিভাই তাঁহার জীবনে সম্যকভাবে

প্রকাশিত হয়। তবে তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত বইয়ের পদ্যানুবাদ করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত জীবনে সতীশচন্দ্র অত্যন্ত নিরভিমান মাধুর্যপূর্ণ সর্বজনপ্রিয় মানুষ ছিলেন। কাহারও সম্পর্কে তিনি কখনও দ্বেষ পোষণ করেন নাই, এবং সকলেই তাঁহাকে তাঁহার স্বাভাবিক বিনয় ও সৌজন্যের জন্য আন্তরিক-ভাবে শ্রদ্ধা করিতেন। সতীশচন্দ্রের সহিত আমার সাক্ষাৎপরিচয়ের সৌভাগ্য কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে, এবং যতদূর মনে হয়, ঢাকায় তাঁহার বাসাবাড়ীতে হইয়াছিল। সাহিত্য পরিষদেব সহিত সংশ্লিষ্ট থাকাতে, এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের, বিশেষতঃ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা আমার অধ্যাপনার মুখ্য উপজীব্য হওয়াতে, আমি তাঁহার প্রকাশিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াছি, এবং তদ্দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হইয়াছি। তাঁহার অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী', ভবানন্দের 'হরিবংশ', এবং বিশেষ করিয়া তাঁহার 'শ্রীশ্রীপদকল্পতরু'—এগুলি বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনায় আমার নিত্য সঙ্গী ছিল। দুই একটি বিষয়ে আমার বিচার তাঁহার মনঃপূত হওয়াতে, তিনি বিশেষ স্নেহের সহিত তাহার উল্লেখ করিয়া আমাকে উৎসাহিত করেন; ব্যক্তিগত ব্যবহারেও তাঁহার সেই প্রীতির পরিচয় পাইয়া আমি ধন্য হইয়াছি।

অবস্থাগতিকে ভাষাতত্ত্বের পথ ধরিয়া আমাকে বিদ্যাপতি প্রমুখ প্রাচীন মহাজনগণের পদের আলোচনা করতে হইয়াছিল, এবং বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্নের সহিত মিলিয়া চণ্ডীদাসের পদের সংগ্রহ ও সম্পাদনের কাজে হাত দিয়াছিলাম। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে আমাদের উভয়ের সম্পাদনায় 'চণ্ডীদাসের পদাবলী' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্পাদনার কালে আরও গভীরভাবে সতীশচন্দ্রের 'পদকল্পতরু' ও 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' আলোচনা করিবার আবশ্যকতা হইয়াছিল। তিন হাজার এক শ এক সংখ্যক পদের এক সম্পুট এই মহাগ্রন্থকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদসাহিত্যের ঋগ্বেদ বলিতে পারা যায়। এবং ঋগ্বেদ-সংহিতার মতো এই 'বৈষ্ণব-পদ-সংহিতা' গ্রন্থের টীকাকার অভিনব সায়ণাচার্য রূপে আবির্ভূত হন সতীশচন্দ্র রায়। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে এই পদকল্পতরু গ্রন্থের সংকলন-কর্তা বৈষ্ণবদাসকে এই বৈষ্ণব-পদ-সংহিতার ব্যাস ঋষি বলা যায়। সমগ্র বৈষ্ণব সাহিত্য এবং সঙ্গে-সঙ্গে

অলংকার ও রস-শাস্ত্র, সংস্কৃত সাহিত্যিক ও পৌরাণিক উল্লেখাদি, আবশ্যক ক্ষেত্রে অনুবাদ এবং পদসমূহের কাব্যসৌন্দর্যের বিশ্লেষণ—এই সমস্ত লইয়া সতীশচন্দ্রের পদকল্পতরু টীকা এক অপূর্ব ও অমূল্য বস্তু হইয়া বিদ্যমান। নানা পুঁথি মিলাইয়া পদগুলির পাঠ নির্ণয় করিবার চেষ্টা সতীশচন্দ্রের সংস্করণে প্রতি পদে দেখা যায়, এবং কাব্য-সাহিত্যের সম্পাদনায় এই বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। এইরূপ সুশিক্ষিত সুসংস্কৃত সহজ সরল ও আড়ম্বরবিহীন পাণ্ডিত্য আমাদের দেশে অত্যন্ত বিরল। ইহার আবশ্যক বিষয়ের জ্ঞানের পরিধি ও গভীরতা এবং সঙ্গে সঙ্গে ইঁহার বিনয়-নম্রতা ও আত্মাবিলুপ্তি, এই-সব দেখিয়া ইঁহাকে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচক সুপণ্ডিতগণের মধ্যে নেতা বলিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ হয় না।

সতীশচন্দ্রের সম্পাদিত গ্রন্থাবলী এবং সংস্কৃত হইতে তাহার অনুবাদের সংখ্যা সব মিলিয়া দশখানিরও অধিক নহে। এতদ্ভিন্ন তাঁহার পুত্রের লিখিত প্রবন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত তাঁহার সাতাশটি এবং হিন্দীতে রচিত সাতটি বিভিন্ন আলোচনার সূচী প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহার রচনা সম্ভার পরিমাণে বিরাট নহে, কিন্তু "একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি, ন চ তারাগণৈরপি"—তাঁহার সম্পাদিত মাত্র পদকল্পতরুর দ্বারাই তাঁহার পাণ্ডিত্যের বিশালত্ব এবং উপযোগিতা বুঝিতে পারা যাইবে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালা তথা ভারতীয় সাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে, এবং আশা করিতে পারা যায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের, বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা বৈষ্ণব সাহিত্যের, পাঠক তাঁহার নিকট হইতে জ্ঞান লাভ করিবে এবং অনুপ্রেরণা পাইবে। তথ্য ও তত্ত্ব উভয়দিক হইতেই তিনি বাঙ্গালা দেশের মধ্যযুগের বৈষ্ণবকাব্য-সাধনার ক্ষেত্রে সংস্কৃতের পরেই যেন একটি মর্যাদার মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন।

বঙ্গভাষী আমরা আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্য লইয়া গর্ব অনুভব করি, এবং কখনও কখনও সেই গর্ব প্রকাশ করিয়া থাকি, কিন্তু আমরা সেই সাহিত্যকে স্বরূপে বুঝাইবার জন্য উপযুক্ত পরিশ্রমে পরাঙ্মুখ হই। সতীশচন্দ্র আমাদের প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনার পথ বিশেষভাবে সহজ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। এই বৎসর গৌড়বঙ্গে তাবৎ সুধীগণ তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী পালন করিবেন, এবং তাঁহাকে স্মরণ করিয়া

কথঞ্চিৎ ঋষি-তর্পণের দ্বারা আত্মতৃপ্তি লাভ করিবেন। তাঁহার পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির সশ্রদ্ধ প্রণাম আমরা নিবেদন করিতেছি; কিন্তু তাঁহার স্মৃতি জীবিত রাখিবার জন্য তাঁহার রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলির পুনঃপ্রকাশ বিষয়ে আমরা কি অবহিত হইব না?

দীনেশচন্দ্র সেন ১৮৬৬-১৯৩৯

দীনেশচন্দ্র ও ইতিহাস-চর্চার প্রথম যুগ

ভবতোষ দত্ত

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামে সুপরিচিত বইখানা প্রকাশিত হলে সকলেই খুব বিস্মিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা-উপলক্ষে লিখেছিলেন—

"এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ যখন বাহির হইয়াছিল তখন দীনেশবাবু আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া দিয়াছিলেন। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য বলিয়া এতবড়ো একটা ব্যাপার আছে তাহা আমরা জানিতাম না; তখন সেই অপরিচিতের সহিত পরিচয়স্থাপনেই ব্যস্ত ছিলাম।"

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই প্রথম ইতিহাসখানা রচিত হওয়ার আগে এই বিষয় নিয়ে যে সব কাজ হয়েছে অথবা বই লেখা হয়েছে সেগুলি পর্যালোচনা করলে দীনেশচন্দ্রের অসীম কৃতিত্ব যেমন বোঝা যায়, তেমনি বোঝা যায় বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস কি ভাবে দীনেশচন্দ্রের উদ্যমে সংহত রূপ লাভ করেছিল? ইংরেজ শাসনকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের তথ্যগত ইতিহাস রচনা কঠিন ছিল না। যাঁরা এই ইতিহাসের বিষয় তাঁরা অনেকেই জীবিত ছিলেন, ছাপাখানার কল্যাণে তাঁদের বই প্রচলিত ছিল। কিন্তু কঠিন ছিল মধ্য ও প্রাচীন যুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করা, যার প্রায় সব উপকরণই ছিল পুঁথিতে বদ্ধ। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলনে এবং শিক্ষাবিস্তারের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় মধ্যযুগের বাঙ্গালা পুঁথি অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। মুকুন্দরাম ভারতচন্দ্র কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বা বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম ছাড়া আর কারো নামই প্রায় এ যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালির জানা রইল না। ১৯০১এ অক্ষয়চন্দ্র সরকার উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিত্যের গোড়ার দিকের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলেন—

"ত্রিশ সালে অর্থাৎ এখন হইতে আশী বৎসর পূর্বে বাঙ্গালা লেখার চর্চা ছিল, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে ব্যবসাদারের খাতায় আর আত্মীয় স্বজনকে 'বন্ধুবান্ধবকেও নয়' পত্র লেখায়; পড়ার চর্চা যথেষ্ট ছিল। কেবল পাঠশালে বলিয়া নয়, সকলেই রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিত। বৃদ্ধ গঙ্গাতীরে ঘাটে

বসিয়া, মুদি মুদিখানার পাটে বসিয়া, পুরোহিত ঠাকুর শিবের মন্দিরের ধারিতে বসিয়া, মোসাহেব মুকুয্যে মহাশয় বড় মানুষের বৈঠকখানায় বসিয়া অবাধে দশ বারোজন শ্রোতৃমণ্ডলির মধ্যে, কৃত্তিবাস, কাশীদাস পাঠ করিতেন। গোস্বামী ঠাকুর বিষ্ণুমন্দিরের দাওয়ায় বাবাজী ঠাকুর আকড়ায় আঙ্গিনার বৃক্ষতলে, বৈষ্ণব গৃহস্বামী পূজার দরদালানে, সেইরূপ শ্রোতৃমণ্ডলি মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিতেন। এতদ্ভিন্ন কবিকঙ্কণের চণ্ডী, রামেশ্বরের শিবায়ন, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, দুর্গাপ্রসাদের গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিনী প্রভৃতি গ্রন্থ এইরূপই নিয়ত পঠিত হইত।"[১]

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এগুলিই ছিল প্রচলিত সাহিত্য। পাদ্রী ওয়ার্ড লিখেছিলেন, সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রগণ অনেকেই দেশীয় ভাষায় রচিত রামায়ণ মহাভারত বিদ্যাসুন্দর এবং চণ্ডীর পুঁথি রাখে। কোনো কোনো বাড়িতে মনসাগীত ধর্মগীত শিবগীত ষষ্ঠীগীত পঞ্চানন গীত এসবও থাকে। বৈরাগী এবং অন্যান্য সাধারণ জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ছোটো ছোটো কাহিনী চলিত আছে যেগুলি ইংরেজি ভাষার উপকথা বা গাথার চেয়ে বিশেষ উন্নত নয়। এই সব অকিঞ্চিৎকর বিষয়গুলির উপজীব্য নানা পৌরাণিক কাহিনী সাধু সন্ন্যাসীর অলৌকিক কীর্তি অথবা দেবতার মাহাত্ম্য-বর্ণনা। কখনও কখনও নীতিমূলক গল্পও পাওয়া যায়, তবে অধিকাংশই কৃষ্ণলীলা বিষয়ের গল্প [২]

তারপর মুদ্রিত গ্রন্থের প্রচারের ফলে এবং ইংরেজি সাহিত্যের আদর্শে রচিত বাংলা সাহিত্যের ব্যাপক প্রবর্তনে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলার সাহিত্য শিক্ষিত সমাজের অন্তরালে চলে যেতে থাকে। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যতটুকু আলোচিত হয়েছিল, তাতে কোথাও এইসব সুপরিচিত গ্রন্থ ছাড়া অন্যগুলির উল্লেখ দেখি নি। এই অপরিচয়ের অন্তরাল থেকে দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেছিলেন। ইংরেজি শিক্ষা দেশের মধ্যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের মধ্যে দুরপনেয় ব্যবধানের সৃষ্টি করেছিল। দীনেশচন্দ্রের প্রয়াস ছিল দুয়ের মধ্যে নতুন করে যোগ স্থাপন করা। এ চিন্তা ঊনবিংশ

---

১. 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) গ্রন্থে পিতাপুত্র প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

২. *History, Literature, Manners etc. of the Hindoos* (1820) Part III, p. 502 দ্রষ্টব্য

শতাব্দীর বঙ্কিমচন্দ্র-প্রমুখ মনীষীরা করে গিয়েছেন। বঙ্গদর্শন পত্রিকার 'পত্রসূচনা'য়, 'লোকশিক্ষা' প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমস্যার অবতারণা করেছিলেন দীনেশচন্দ্র বাংলার নিজস্ব অন্তরলোকের সাহিত্যের বিস্তৃত পরিচয় শিক্ষিত সমাজের কাছে তুলে ধরে সেই সমস্যার একটা মীমাংসার পথ প্রদর্শন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ 'ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণে' (১৩১১) বলেছিলেন—

"পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের সৃষ্টি করিয়াছিল এখন তাহার উল্‌টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের ঐক্যসূত্র সন্ধান করিয়া পরস্পর ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গসাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে।"

মনে রাখা দরকার রবীন্দ্রনাথ বাংলাভাষা ও সাহিত্যের এই মহৎ দায়িত্বের কথা উল্লেখ করছেন দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিস্তৃত সমালোচনা লেখার পরে। এই প্রবন্ধে তিনি আরো বলেন—

"আমরা ইতিহাস পড়ি—কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জন-প্রবাহকে অবলম্বন করিয়া প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা স্মৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মুখস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠে না।"

এই কথাগুলি পড়লে মনে হয়, এ যেন দীনেশচন্দ্রের উদ্যমেরই তাৎপর্য-বিশ্লেষণ। বস্তুত দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' মধ্যযুগের বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে তথ্য সংকলন মাত্র নয়, এর পটভূমিতে ছিল দেশ এবং জাতির প্রতি

গভীর মমতাবোধ, একটি গঠনাত্মক দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ যখন স্বদেশী সমাজের পরিকল্পনা করেছিলেন, দেশ এবং জাতি সম্বন্ধে এমনি একটি মমতা এবং আদর্শই ছিল তার মূলে। তুলনা হিসাবে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' যেমন শুধুই মহাভারত নিয়ে পণ্ডিতী গবেষণা নয়, এর প্রেরণায় ছিল আর-একটি গঠনাত্মক আদর্শ, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তেমনি শুধু গবেষণা নয়, তার চেয়েও বেশি।

তথাপি এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে ইতিহাস বলতে মূলত যে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণাকে বোঝায়, উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বিষয়ে এই বইখানাই ছিল তার সুপরিণত সর্বোৎকৃষ্ট রূপ। সাহিত্যের ইতিহাস রচনার চেষ্টা আগেও হয়েছে। কিন্তু এতখানি পূর্ণতা কোনোটাতেই ছিল না। 'ইতিহাস' কথাটির মধ্যেই নিহিত ধারাবাহিকতার অর্থ। অতীতের ঘটনাগুলিকে ধারাবাহিক ক্রমে দেখাতে না পারলে তারা ঠিক ইতিহাস-পদবাচ্য হয় না। যুক্তি এবং কার্যকারণের সূত্রটি স্পষ্ট করে দেখাতে হয়; পারিপার্শ্বিক দেশকালের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিকায় স্থাপন করে তবেই ইতিহাসের পূর্ণ রূপ গঠন করতে হয়। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচিত হওয়ার পূর্বে যে কয়খানি বাংলা সাহিত্যবিষয়ে বই লেখা হয়েছিল, তার কোনোটাতেই এই আদর্শের সিদ্ধি ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের অতীতকে রক্ষা করবার প্রথম চেষ্টা যিনি করেছিলেন তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫র মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে প্রাচীন কবি ও কবিওয়ালাদের জীবনী প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যের একটা যুগের ইতিহাসকে রক্ষা করা। এই যুগ হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসর। প্রধানত শাক্তসঙ্গীত-রচয়িতা এবং কবিওয়ালাদের উল্লেখ করলেও অন্যান্য সাহিত্যধারার মধ্যে "কবিকঙ্কণ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিদ্যাধর (?), কাশীদাস, কীর্ত্তিবাস, কেতকী দাস, রামেশ্বর"—এঁদের জীবনী ও কীর্তি প্রকাশ করার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। কার্যত তিনি পেরেছিলেন ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ নিধুবাবু রামবসু হরুঠাকুর নিত্যানন্দ বৈরাগী রাসু-নৃসিংহ লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কয়েকজনের আলোচনা করতে। সুতরাং আলোচনার ব্যাপকতা বিচার করলেও ঈশ্বর গুপ্তের প্রয়াস পূর্ণাঙ্গ নয়। ইতিহাস হিসাবে অপূর্ণতার আরো লক্ষণ ছিল। এ যুগের কবিদের আলোচনায়

ব্যাপৃত হতে গিয়ে, যুগের অনেক ঘটনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক হলেও, পারিপার্শ্বিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে যোগকে তিনি স্পষ্ট করে তুলতে পারেন নি। সে রকম চেষ্টার আভাস যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় নি, তা নয়। যেমন ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গে তিনি বলছেন—

"এই মহাশয় অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্বে কিম্বা পরে যে সকল ভাষা কবিতা রচনা করিয়াছেন, অন্নদামঙ্গলের সহিত তাহার তুলনা কোন ক্রমেই হইতে পারে না। ইহাতে বিশিষ্টরূপেই প্রমাণ হইতেছে যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভার আশ্রয় লওয়াতেই নানাকারণে এই অন্নদামঙ্গল অনেক প্রকারে দোষশূন্য ও প্রকৃষ্ট হইয়াছে।"

এখানে ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের কবিমনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের যোগ নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রয়াস ইতিহাসকারেরই প্রয়াস। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনায় এই কার্যকারণ নির্ণয়ের চেষ্টা তেমন সুলভ নয়।

কিন্তু এতে ঈশ্বর গুপ্তের উদ্যমের মৌলিক অগ্রগামিত্ব, তাঁর অসাধারণ নিষ্ঠা ও গবেষণার মূল্য কিছুমাত্র অস্বীকৃত হচ্ছে না। তিনি বলেছিলেন—

"ইহার পূর্বে কোন মহাশয় এতদ্দেশীয় কোন কবির জীবনচরিত প্রকাশ করেন নাই—এবং এতৎ প্রকাশের কি ফল তাহাও কেহ জ্ঞাত হয়েন নাই—আমরা প্রথমেই ইহার পথপ্রদর্শক হইলাম।"

ঈশ্বর গুপ্তের এই কথাগুলি আত্মম্ভরিতা নয়। যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা দেশের ইতিহাসের জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের এই উক্তিও সেই অর্থেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—

"যেমন কুলি মজুর পথ খুলিয়া দিলে, অগম্য কানন বা প্রান্তরমধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্যসেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম। বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে আমার সেই মজুরদারির ফল এই কয়েকটি প্রবন্ধ। ইহার প্রণয়ন জন্য অনবসরবশতঃ এবং অন্যান্য কারণে ইচ্ছানুরূপ অনুসন্ধান ও পরিশ্রম করিতে পারি নাই। কাজেই বলিতে পারি না যে, ইহার দর বেশী। দর বেশী না হউক, ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না। যে দরিদ্র, সে সোণা রূপা জুটাইতে পারিল না বলিয়া কি বনফুল দিয়া মাতৃপদে অঞ্জলি দিবে না?"[৩]

৩. বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ, বিজ্ঞাপন

এই মনোভাবকে হুবহু ঈশ্বর গুপ্তের মনোভাব বলেই বর্ণনা করা যেতে পারে। সাহিত্য-ইতিহাস রচনার সার্থক ভূমিকা তিনি করে গিয়েছেন। তাঁর এই জীবনী-রচনাও ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মতোই সাহিত্য-জননীপদে অঞ্জলি-স্বরূপ। বিশুদ্ধ ইতিহাসের রূপ যদি এই রচনাগুলি নাও পেয়ে থাকে, তথাপি ঈশ্বর গুপ্ত যে এই প্রচেষ্টায় অনেক দূর এগিয়েছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। রমেশচন্দ্র দত্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এই প্রচেষ্টার সশ্রদ্ধ উল্লেখ করে বলেছেন—

Iswar Chandra Gupta, the first great poet of this century, was the first writer who attempted to publish biographical accounts of the previous writers; but his attempt necessarily met with imperfect success."

কেউ যদি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনচরিতটির সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের ভারতচন্দ্র ও রামনিধি গুপ্তের জীবনচরিত দুটির তুলনা করে দেখেন, তবে বুঝতে পারবেন তাঁর অপূর্ণতা সত্ত্বেও আলোচ্য ব্যক্তিদের দেশে এবং কালে স্থাপিত করতে তিনি কতখানি সফল হয়েছিলেন। নানা ঘটনার উল্লেখ, সময়-নির্দেশক নানা ঐতিহাসিক বিবরণের তুলনাত্মক আলোচনায় ঈশ্বর গুপ্তের জীবনীগুলি পূর্ণ। পুরনো দলিলপত্রও তিনি যথাসম্ভব পরীক্ষা করেছিলেন। বিশেষত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তথ্যসংগ্রহে ঈশ্বর গুপ্ত সে অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং পরিশ্রম করেছিলেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-রচনাকালে দীনেশচন্দ্রের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের সঙ্গে তা তুলনীয়।

পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার প্রাথমিক বাধা হচ্ছে উপকরণের অভাব। ঈশ্বর গুপ্ত যথাসাধ্য উপকরণ সংগ্রহ করে গিয়েছিলেন, কিন্তু তার পর দীর্ঘকাল উপকরণ সংগ্রহের সে-রকম চেষ্টা হয় নি। আগেই বলেছি, ইংরেজি-শিক্ষিত সমাজের মধ্যে যে বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠছিল সেগুলির ঠিক ইতিহাস রচনার সময় তখনও আসে নি, সমালোচনা বা মূল্যবিচারের চেষ্টা যে চলে নি তা নয়। ঈশ্বর গুপ্তের পর বাংলা সাহিত্যের আলোচনা-গ্রন্থ হিসাবে দুটি বই উল্লেখযোগ্য, যে-দুটি বই ঈশ্বর গুপ্তের আলোচনা-পদ্ধতিকেই মূলত অনুসরণ করেছিল। কবি হরিশচন্দ্র মিত্র ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিকলাপ' (১ম খণ্ড, আশ্বিন ১২৭৩) নামে একটি বই প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত যেমন ভিন্ন ভিন্ন কবিদের নিয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন,

সেই একই প্রণালীতে এতে 'আদিকবি কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ, নন্দকুমার চক্রবর্তী, কাশীরাম দাস এবং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উত্তম প্রণালীতে লিপিবদ্ধ' করা হয়েছিল। বইটা ছোটো; মোট পৃষ্ঠাসংখ্যা ৭৯।[৫]

এই আলোচনারীতির অনুসরণে পরবর্তী বই 'কবিচরিত' রচিত হয়। বইখানা লেখেন হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। এই বইয়ে আটটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায় উপক্রমণিকা। পরে সাতটি অধ্যায়ে আলোচিত কবিরা হচ্ছেন কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম দাস, রামপ্রসাদ সেন, ভারতচন্দ্র রায়, মদনমোহন তর্কালংকার এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। উল্লেখযোগ্য, কবিচরিতে প্রকাশিত জীবনীই ঈশ্বর গুপ্তের প্রথম জীবনচরিত।

লক্ষ্য করিবার বিষয় কবিচরিতের উপক্রমণিকাটি। এখানেই আমরা প্রথম ধারাবাহিক বাংলা সাহিত্যের একটি বিবরণের আরম্ভ বাংলা ভাষার উৎপত্তি বর্ণনা করে। এখানে বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে কিঞ্চিত আলোচনা পাই। লেখকের মতে 'জীব গোস্বামীর করচাই সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ। উহার বয়ঃক্রম প্রায় ৩৪০ বৎসর।' বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস কৃষ্ণদাস কবিরাজ—এই কয়জন লেখকদের পর্যালোচনা করে লেখক বাংলা সাহিত্যের এক সমৃদ্ধ যুগের পরিচয় দিতেছেন। দীনেশচন্দ্র সেন এবং তৎপরবর্তী ঐতিহাসিকেরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বৈষ্ণব যুগে যে একটি বৃহৎ এবং মহৎ অধ্যায় রচনা করবেন তার সূচনা হয়েছিল এখানেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বৈষ্ণব ছাড়া অন্যান্য কবিদের মধ্যে আলোচিত কৃত্তিবাস মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ প্রাণরাম চক্রবতী ভারতচন্দ্র রাধামোহন সেন রামমোহন সেন রামমোহন (ব্রহ্মসঙ্গীত-রচয়িতা হিসাবে) রামনিধি গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য আলোচিত কবি কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি, দুর্গামঙ্গল-রচয়িতা বঙ্গচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রঘুনাথ গোস্বামী দাশরথি রায় গোবিন্দ অধিকারী মধু কান এবং কবিওয়ালা নামে পরিচিত কবিরা।

ইংরেজি যুগের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে অনঙ্গমোহন-লেখক অক্ষয়কুমার দত্তকে। এ যুগের অন্যান্য লেখকদের আলোচনা 'কবিচরিতে"র পরবর্তী খণ্ডে থাকবে বলে হরিমোহন জানিয়েছেন। 'কবিচরিতে'র দ্বিতীয়

৪. *The Literature of Bengal* (1895)। ভূমিকা

৫ বইটি দুষ্প্রাপ্য। সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা থেকে এই বিবরণ গৃহীত।

খণ্ড প্রকাশিত হয় নি। কিন্তু দীর্ঘকাল পরে 'বঙ্গভাষার লেখক' (১৯০১) রচনা করে হরিমোহন 'কবিচরিতে'র আরব্ধ কাজ সম্পূর্ণ করেছিলেন। 'কবিচরিত' রচনা করতে গিয়ে লেখক যে সব বই ও পত্রিকার সাহায্য নিয়েছিলেন, তাও উল্লেখযোগ্য; যেমন হরিশচন্দ্র মিত্র প্রণীত কবিকলাপ, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত কবিকঙ্কণের সমালোচনা, নন্দলাল দত্তের কবিরঞ্জনের কাব্যসংগ্রহ, নিউ প্রেসে মুদ্রিত ভারতচন্দ্রের গ্রন্থসংকলন এবং প্রভাকর; বিবিধার্থসংগ্রহ, নবপ্রবন্ধসার, হিতসাধক প্রভৃতি সাময়িক-পত্র ও গ্রন্থ। বলা বাহুল্য এগুলি সবই দ্বিতীয় পর্যায়ের (secondary) প্রমাণপত্র (primary source) ব্যবহার করেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন। দীনেশচন্দ্র পুঁথি মিলিয়ে দলিল পরীক্ষা করে পাঠনির্ণয় করে ইতিহাস রচনা করেন। ঈশ্বর গুপ্ত তার আরম্ভ করেছিলেন।

মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' (১৮৭১) বস্তুত লেখা হয়েছিল কবিচরিতের এক বৎসর পরেই। এই বইটির বিশেষত্ব, ইতিহাস নামে বাংলা সাহিত্য-বিষয়ে এটাই প্রথম সম্পূর্ণ গ্রন্থ, যদিও বইটিকে মূলতই বলা যেতে পারে কবিচরিতের উপক্রমণিকা-প্রবন্ধেরই সম্প্রসারণ। এখানেও বাংলা ভাষার ইতিহাস উপক্রমণিকার মতোই বৈদিক যুগ থেকে বর্ণনা করা হয়েছে। উপক্রমণিকার মতোই বৌদ্ধ গাথা পালি প্রাকৃত ইত্যাদি ভাষান্তরগুলি আলোচিত। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ সম্বন্ধে হরিমোহনের মতের অনুসরণে মহেন্দ্রনাথও বলেছেন, জীব গোস্বামীর করচা ৩৪০ বৎসর পূর্বে রচিত হয়েছিল। হরিমোহন মধ্যযুগের যেসব কবিদের আলোচনা করেছিলেন, 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'ও ঠিক তাঁরাই আলোচিত।

মহেন্দ্রনাথের নিজস্ব কীর্তি হচ্ছে আধুনিক গদ্যলেখকদের অবতারণা। হরিমোহন দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করবেন বলে কবিচরিতে তাদের আলোচনা করেন নি। সে দিক থেকে 'বঙ্গভাষার ইতিহাস' ব্যাপকতর। মহেন্দ্রনাথের বইতে তিনটি অধ্যায়ই সেকালের পক্ষে অভিনব। বঙ্গভাষার বিদ্যালয় এবং বাঙ্গলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে দুই অধ্যায় এবং পরিশিষ্টে আধুনিক গদ্যলেখদের বিবরণ। কবিচরিতে বৈষ্ণব যুগের যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল মহেন্দ্রনাথ তাকে স্বীকার করে বলেছিলেন চৈতন্যা-বতরণের পরেই বাংলা ভাষার উন্নতির সূচনা। মনে হয় হরিমোহনের

কবিচরিত্রের (১৮৬৯) থেকেই বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে সাহিত্য সম্বন্ধে রসবিচারের দৃষ্টি পরিবর্তিত হতে থাকে। বৈষ্ণব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা এবং চৈতন্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যের পরিবর্তনের প্রতি হরিমোহন আমাদের অবহিত করেন। এর পরে রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজনারায়ণ বসু বা বঙ্কিমচন্দ্র কেউ এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন নি। দীনেশচন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' অন্যতম বৈশিষ্ট্যই ছিল বৈষ্ণব যুগের বিস্তৃত ইতিহাস রচনায়। দীনেশচন্দ্র ইংরেজিতে এই যুগ নিয়ে আলাদা বইও রচনা করেছিলেন। অথচ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের পরিকল্পনাতে পর্যন্ত বৈষ্ণব কবিদের উল্লেখের স্বল্পতা পরবর্তী তুলনায় চোখে না পড়ে পারে না। 'কবিচরিতে'র সমালোচনা-উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজিতে যে-প্রবন্ধ[১] লেখেন তাতে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের দুটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছিলেন, চৈতন্য-সাহিত্য এবং পুরাণ-সাহিত্য অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারত-মঙ্গলকাব্য। তিনি দুয়ের তুলনায় স্পষ্টভাবেই বলেছিলেন—

In poetic power they are decidedly inferior to the best of the Vaisnava poets.

বঙ্কিমচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে father of modern Bengali বললেও তাঁর অভিমত ছিল :

In the higher attributes of a poet Bharat Chandra is far inferior to many who have preceded and followed him.

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধটিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ঠিক বলা চলে না। প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের একটি সাধারণ সমালোচনা করেছিলেন। তাতে ইংরেজি শিক্ষিত নব্যদল বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করেন তার আভাস পাওয়া যায়। আধুনিক রসরুচি বাংলা সাহিত্যের কোন্ দিককে সার্থক বলে মনে করে এবং ইতিহাস-রচনায় কোন্ দিকে বিশেষ জোর দেওয়া উচিত, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আধুনিক কালে রচিত বাংলা সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। আধুনিক কালে রচিত বাংলা সাহিত্যকে বঙ্কিমচন্দ্র দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন, সংস্কৃতানুগত

১ Bengali Literature, *Calcutta Review*. 1871

এবং ইংরেজি-অনুগত। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত ভরসা ছিল দ্বিতীয় দলের উপর।

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা না করলেও তাঁর কয়েকটি লেখায় ইতিহাস-রচনার ছু-একটি সূত্রের নির্দেশ ছিল: 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন—

"সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারে নাই। কোমৎ বিজ্ঞান সম্বন্ধে যেরূপ তত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়াছেন, সাহিত্য সম্বন্ধে কেহ তদ্রূপ করিতে পারেন নাই। তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টতই প্রাকৃতিক নিয়ম এবং কোমতীয় চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কথাগুলি লিখেছেন। তাঁর এই নীতিটাই আমরা গ্রাহ্য করব কিনা সেটা আলাদা কথা, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস-রচনায় যে একটি নীতিসূত্রের প্রয়োজন, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটাই প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার যুগে একটা বড়ো ইঙ্গিত। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই ইঙ্গিত নিয়ে দীর্ঘকাল কোনো ইতিহাস লেখা হয় নি। সাহিত্যের ইতিহাস রচনা করতে গেলে যুগ জীবন ও সমাজের বিশিষ্ট প্রবণতাগুলির সন্ধান করতে হয়, দীনেশচন্দ্রের পূর্বে সেই কথা কারোই মনে হয় নি।

এইজন্য 'বঙ্গভাষার ইতিহাসে'র পরের বৎসরে প্রকাশিত রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) শেষ পর্যন্ত প্রস্তাবই, পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস নয়। তা হলেও এই বইখানিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার আদর্শ যতদূর হয়েছে, দীনেশচন্দ্রের পূর্বে এমন আর কোনো বইয়ের দ্বারাই হয় নি। রামগতি এখানে একটি প্রবন্ধ মাত্র রচনা করেন নি, পূর্বযুগ এবং আধুনিক যুগ মিলিয়ে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেছেন। রামগতি বাংলা সাহিত্যের যে আকৃতি নির্ণয় করেছেন তাঁর আগে এমন আর কেউ করেন নি। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যের যুগভাগ করলেন, প্রথম থেকে চৈতন্যদেবের পূর্ব পর্যন্ত আদ্যকাল,

চৈতন্যদেব থেকে ভারতচন্দ্রের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যকাল, ভারতচন্দ্র থেকে ইদানীন্তন কাল। আদ্যকালের আলোচিত কবি বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস ও কৃত্তিবাস। মধ্যকালের আলোচিত কবি বৃন্দাবনদাস জীবগোস্বামী কৃষ্ণদাস-কবিরাজ মুকুন্দরাম কেতকাদস ক্ষেমানন্দ কাশীরামদাস রামেশ্বর রামপ্রসাদ। ইদানীন্তন কালে ভারতচন্দ্র কবিওয়ালা থেকে পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যই আলোচিত। বলা বাহুল্য এই অংশটিই সর্ববৃহৎ।

দেখা যাচ্ছে, রামগতি ন্যায়রত্নের সময়ে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয় নি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের কালনির্ণয় করবার গবেষণা তিনি করেছিলেন, এটা রামগতির ইতিহাস-বোধের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য। তাঁর সাধ্যমতো তিনি ইতিহাসের পূর্বাপরতা বিচার করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাপতি ও গোবিন্দদাস-প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন:

"চৈতন্যদেব কর্তৃক বিদ্যাপতি-বিরচিত গীত শ্রবণ এবং গোবিন্দদাস কর্তৃক চৈতন্যলীলা বর্ণন—এই উভয়ের প্রদর্শন দ্বারা আমরা নিঃসংশয়রূপে প্রতিপালন করিয়াছি যে বিদ্যাপতি চৈতন্যদেবের পূর্বকালীন ও গোবিন্দদাস উত্তরকালীন ছিলেন।"

রামগতির এই আলোচনাপদ্ধতিই প্রমাণ করে ইতিহাস-রচনার কাজে তিনি কতখানি এগিয়ে ছিলেন। এইভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যের কিংবদন্তী এবং লোকপ্রবচনের ভিতর থেকে সত্য উদ্ধার করে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবদ্ধ রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি যে তিনটি যুগ ভাগ করেছেন, আলোচনার আরম্ভে তিনি সেই যুগের ভাষা ও সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণগুলিও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, তাতে বাংলা সাহিত্যের চিত্রটি আরো উজ্জ্বল হয়েছে। এই ইতিহাস রচনা করবার জন্য তিনি যে শ্রম স্বীকার করেছিলেন, তাতে নিষ্ঠাবান ঐতিহাসিকের পুত্র গিরীন্দ্রনাথ লিখেছেন:

"এই পুস্তকখানির প্রণয়ন সময়ে পিতৃদেবকে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ অর্থব্যয় ও যেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল তাহা হৃদয়ঙ্গম করা অন্যের পক্ষে সহজ নহে। এই উপলক্ষে তিনি ছোট বড় অনেক গ্রন্থকারের রচনা পাঠ করিয়াছেন। কত পাণ্ডুলিপি, কত গ্রাম ও প্রদেশের কত স্থান যে সন্ধান করিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়।"

৭, বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০

কিন্তু রামগতি ন্যায়রত্নের বইটির বিশেষ চিত্তাকর্ষক অংশ হচ্ছে আধুনিক যুগের আলোচনা। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেও উপন্যাসধারা কাব্যধারা নাটকধারা প্রভৃতির আলাদা শ্রেণী না করে গ্রন্থকার বা গ্রন্থের শিরোনামে তিনি এ যুগের সাহিত্যের পর্যালোচনা করেছেন। এতে ইতিহাসের ধারাবাহিক ক্রম ঠিক রক্ষিত হয় নি, সম্ভবত 'ইদনীন্তন' বলেই তার প্রয়োজন বোধ করেন নি। কিন্তু সেকালের সাহিত্য সম্বন্ধে সেকালেরই একজন আলোচকের অভিমতটাই আজ বিশেষ মূল্যবান হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত রামগতি নিজেই একজন সাহিত্যিক ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যাদের সংস্কৃতপন্থী দল বলেছেন রামগতি ছিলেন তাঁদেরই অন্তর্ভুক্ত। রামগতির এই আলোচনা ইতিহাস অপেক্ষা সমালোচনা হিসাবেই কৌতূহলজনক।

সম্ভবত তখন পর্যন্ত প্রাপ্ত সাহিত্যিক নিদর্শনের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করে অপেক্ষা সমালোচনামূলক বিবরণ রচনা করাই সম্ভব ছিল। তাই রামগতির পরেই রাজনারায়ণ বসু 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব'ই (১৮৭৮) লিখেছেন। রাজনারায়ণ বসু প্রধানত দুটি বইয়ের উপরেই নির্ভর করেছিলেন, রামগতির বই এবং লঙের Descriptive Catalogue, রাজনারায়ণের এই ছোটো বইটির মূল্যও আজ ইতিহাস হিসাবে নয়, সমসাময়িকের চোখে সেকালের সাহিত্যের মূল্যনির্ণয়ের প্রচেষ্টা হিসাবে। সেদিক থেকে একে বঙ্কিমচন্দ্রের Bengali Literature প্রবন্ধটির সমগোত্র করা যায়। এসব রচনার প্রধান লক্ষ্য প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা নয়, বাংলা সাহিত্যের মূল্যবিচার। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের কালানুক্রমিক ভাগ করেন নি; তিনি সাহিত্যের প্রকৃতি বিচার করে শ্রেণীভাগ করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর সুবিখ্যাত বই *Literature of Bengal* প্রকাশ করলেন; তাতেও তিনি প্রত্নতাত্ত্বিক পবেষণা করেন নি। স্বভাব-ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র ইতিহাসের সংস্কার দ্বারা চালিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের যে বিবরণ প্রস্তুত করেছিলেন, তা প্রখর ইতিহাস-চেনায় সমুজ্জ্বল, তথাপি লক্ষ্য করবার বিষয় রমেশচন্দ্র নিজে তাঁর এই বিবরণকে ইতিহাস বলেন নি। কারণ এই বইতে সত্য সত্যই তিনি বাংলা 'সাহিত্যে'র ইতিহাস লিখতে চান নি, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যকে

অবলম্বন করে বাঙালির মনোজীবনের গতি-প্রকৃতিকে নির্ণয় করা। এটাই যে তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ষোড়শ শতাব্দীর সাহিত্যের নবজন্মের বর্ণনাতেই তা বোঝা যায়—

Up to the end of fifteenth century our literature consisted simply of songs feelingly sung, about the amours of Krishna and Radhika. But the national mind was now awakened. The first effect of this change was the introdution of new religion, deep and earnest in its character, and far-reaching in its consequences. In literature, too, there was a hankering for something vaster and nobler than what had been inherited from the preceding ages ; there was an energy capable of something greater than the composition of songs.

উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের ফলে বাঙালির চিত্তে যে নবচেতনার সূত্রপাত হয়েছিল সে সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র বলেছেন :

The conquest of Bengal by the English was not only a revolution, but ushered in a greater revolution in thoughts and ideas ; in religion and society.[৮]

এ ধরণের কথা ইতিপূর্বে কেউ বলতে পারেন নি। যথার্থ ঐতিহাসিকের পক্ষেই তথ্যকে আশ্রয় করে গভীরতর ভাগবত সত্যকে উদ্ধার করা সম্ভব। রমেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্য-অবলম্বনে এই ভাবজীবনের পরিচয়ই দিতে চেয়েছিলেন। সেইজন্য Raghunath and his school of Logic এবং Raghunandan and his Institutes এবং General Intellectual Progress (nineteenth century) প্রভৃতি অধ্যায় তাঁর গ্রন্থে স্থান পেয়েছে, কারণ বাঙালির মননপ্রকৃতিকে বুঝতে হলে এগুলির সন্ধান নিতেই হবে।

রমেশচন্দ্রের এই বইখানা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রয়াসে

৮. এই মন্তব্যগুলি রমেশচন্দ্রের বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৮৯৫) বর্জিত হয়েছিল। J. N. Gupta প্রণীত *Wife and Work of Romesh Chundra Dutta* (1911) গ্রন্থে বর্জিত অংশগুলি সংকলিত আছে। পৃ ৬১-৬৫

একটি বড়ো পদক্ষেপ। এতে যথার্থ ইতিহাস-চেতনার সঙ্গে জাতীয় মনটিকে বোঝাবার মতো তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির সমন্বয় ঘটেছে। এতকাল এই অন্তর্দৃষ্টিরই অভাব ছিল। অবশ্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের সুপরিচিত প্রধান কয়েকজন কবিকে অবলম্বন করেই রমেশচন্দ্র এই দুর্লভ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। যদি বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন অধিকতর পরিমাণে পেতেন তবে হয়তো বাঙালি জাতির অন্তর্জীবনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তিনি লিখতে পারতেন। সেই সিদ্ধিতে পৌঁছেছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য,' (১৮৯৬) রচনা করেন।

তাই রবীন্দ্রনাথ এই বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯০১) সমালোচনা-উপলক্ষে লিখেছিলেন :

"দ্বিতীয়বার পাঠে গ্রন্থের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার সময় ও সুযোগ পাইয়াছি। এবারে বাংলার প্রাচীন সাহিত্যকারদের স্বতন্ত্র ও ব্যক্তিগত পরিচয়ে বা তুলনামূলক সমালোচনায় আমাদের মন আকর্ষণ করে নাই; আমরা দীনেশবাবুর গ্রন্থের মধ্যে বাংলাদেশের বিচিত্র শাখাপ্রশাখা-সম্পন্ন ইতিহাসবনস্পতির বৃহৎ আভাস দেখিতে পাইয়াছি।"

দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে পূর্বযুগের খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন প্রয়াস একত্র সম্মিলিত হয়ে বাংলা সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসে পরিণত হয়েছে। প্রচুর তথ্যসংগ্রহ, কালানুক্রমিক বিন্যাস এবং লোকচিত্তের উদ্‌ঘাটনের দ্বারা জাতির অন্তর্জীবনের বিবরণ রচনা—এই তিন দিক দিয়েই দীনেশচন্দ্রের বইখানা একটি সুস্পষ্ট ও সমগ্র রূপ-রচনায় সার্থক হয়েছিল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের অপ্রচুর সাহিত্যিক নিদর্শন সত্ত্বেও কীভাবে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন, তিনি নিজেই তার বিবরণ দিয়েছেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার পিস অ্যাসোসিয়েশন থেকে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ-লেখককে 'বিদ্যাসাগর-পদক' দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হয়। দীনেশচন্দ্র এই পদক লাভ করেন। এই প্রবন্ধ রচনা করতে গিয়েই তিনি রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ'র একটি পুঁথি পান। তাঁর উৎসাহ বেড়ে ওঠে। ত্রিপুরা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পল্লীতে ঘুরে ঘুরে বহু পুঁথি তিনি সংগ্রহ করেন। তিনি এই কাজে এশিয়াটিক সোসাইটির সাহায্য প্রার্থনা করে চিঠি লেখেন। তখনই তিনি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আনুকূল্য লাভ করেন। কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বহু কষ্ট স্বীকার করে তিনি যে পুঁথি সংগ্রহ

করেন, তারই উপর ভিত্তি করে রচনা করেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। দীনেশচন্দ্রের এই ক্লেশ ও শ্রম স্বীকার আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে; তিনিও ঠিক এমনি কষ্ট স্বীকার করেই কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্র প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করতে আরম্ভ করে বাংলা সাহিত্য-আলোচনার এক নবযুগের সূচনা করলেন। মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এই সম্বন্ধে আশা এবং উৎসাহ প্রকাশ করে বিস্তৃত প্রবন্ধ প্রকাশ করলেন নবপ্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায়।[৯] 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' প্রকাশিত হলে হীরেন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' পত্রিকায় এই গ্রন্থের এক বিস্তৃত সমালোচনাও প্রকাশ করেন।[১০]

প্রাচীন সাহিত্যের অজস্র নিদর্শনই যে তিনি উদ্ধার করেছিলেন তা নয়। বস্তুত এই কাজে যত পরিশ্রমই থাক, দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার পরিচয় অন্যত্র। অজস্র নিদর্শন উদ্ধার করে কালনির্ণয় করা এবং কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতায় তাদের স্থাপন করতেই দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া গেল। যে কালে প্রাচীন সাহিত্যের পুঁথি সামান্যই পাওয়া যেত, সেই সময়ে দীনেশচন্দ্র পুঁথি সংগ্রহ করে তারিখ নির্ণয় করে শূন্য অতীতকে ইতিহাসে পূর্ণ করে দিয়েছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁর যে ভুল হয়নি তা নয়। 'শূন্যপুরাণ' অর্বাচীন রচনা হলেও প্রাচীন যুগের সাহিত্য মনে করেই তিনি আলোচনা করেছিলেন। এ ধরণের ত্রুটি আরো ছিল। কিন্তু দীনেশচন্দ্র প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের যে পূর্ণাবয়াব রূপ নির্মাণ করেছিলেন সেইরূপ অক্ষয় হয়ে রইল।

এই রূপটিকে স্পষ্ট করে তুলবার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ নির্দিষ্ট করে দিলেন, হিন্দু বৌদ্ধ যুগ, চৈতন্য-যুগ, সংস্কার-যুগ, কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগ এবং ইংরেজ-যুগ। ইতিপূর্বে রামগতি যুগবিভাগের একটা চেষ্টা করেছিলেন। রমেশচন্দ্রও গীতিকবিতার যুগ, সংস্কৃত প্রভাবের যুগ এবং পাশ্চাত্য প্রভাবের যুগ—এইভাবে যুগভাগ করেছিলেন। দীনেশচন্দ্রের যুগভাগের সঙ্গে তুলনা করলেই তাঁদের পরিকল্পনার অসম্পূর্ণতা সহজেই চোখে পড়ে। দীনেশচন্দ্র যেভাবে যুগভাগ করেছিলেন কালসীমা তেমন সুস্পষ্ট না হলেও বাংলা সাহিত্যকে চিহ্নাঙ্কিত করে নেওয়া অনেক সহজ হয়েছে। ইংরেজি সাহিত্যে

৯. দ্র° বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা শ্রাবণ ১৩০১, 'প্রাচীন সাহিত্যালোচনা' প্রবন্ধ।
১০. সাহিত্য ১৩০৪ আষাঢ়।

যেমন এলিজাবেথান যুগ বা রেস্টরেশন যুগ প্রভৃতি নামকরণ করা হয়েছে দীনেশচন্দ্রও সেই রীতির অনুসরণেই বাংলা সাহিত্যের নামকরণ করেছিলেন।[১১] এক একটি যুগের প্রবৃত্তি ধরে যুগের নামকরণ করাতে বেশ বোঝা যায় যে ইতিহাস যে 'সাহিত্যে'র এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র যথেষ্ট সচেতন ছিলেন।

'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে'র এটাই সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব, এতে খাঁটি বাংলা সাহিত্য-অবলম্বনে জাতি ও সমাজের পূর্ণ পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হল। এই কাজের দিগ্‌দর্শন করিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র, কিন্তু এর পূর্ণতা এনেছেন দীনেশচন্দ্র। এখানে দীনেশচন্দ্র শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক নন, যথার্থ ঐতিহাসিক। এই মূল্য বিচার ও সমালোচনাতে, ভাবজীবনের পুনর্গঠনের কাজেই দীনেশচন্দ্রের প্রতিভার সর্বোত্তম বিকাশ ঘটেছিল। দীনেশচন্দ্রের এই কীর্তির পথ ধরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। সমাজ ও সাহিত্যের মধ্যে অচ্ছেদ্য যোগের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র— যখন তিনি বলেছিলেন সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও নিয়মের ফল। দীনেশচন্দ্র এই ইঙ্গিত গ্রহণ করেছিলেন। তথাপি সাহিত্য যে যান্ত্রিক সৃষ্টি নয়, সে যে প্রতিভারই দান, এ কথা তাঁর চেয়ে ভালো করে আর কেউ জানত না। তাই সাহিত্য-পর্যালোচনা করতে করতে তাঁর ভাষায় মুগ্ধতা এসেছে, আবেগের উচ্ছ্বাস এসেছে, স্বরের উচ্চাবচতা ধ্বনিত হয়েছে। আধুনিক ইতিহাস-রচনার মাপকাঠিতে এটা হয়তো ত্রুটি বলে গণ্য, কিন্তু তথ্যের কঙ্কালে তিনি যে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, দীনেশচন্দ্রের এই গৌরব নিত্য স্মরণীয়। তিনিই হলেন এ বিষয়ে পথিকৃৎ।

---

১১ পরবর্তী কালে জে. সি. ঘোষ বাংলা সাহিত্যকে গৌড় যুগ, নবদ্বীপ যুগ এবং কলিকাতা যুগ—এই তিন ভাগে বিভক্ত করেছিলেন। কিন্তু সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যকে বৎসর ধরে ভাগ করে দেখবার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৬-১৯২৩

ভবানী মুখোপাধ্যায়

১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গবাণী'তে পঞ্চানন তর্করত্ন লেখেন—"'বঙ্গবাসী'র একসময়ে রক্ষাকর্তা, বাংলা ভাষার অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যঙ্গ সাহিত্য-কেশরী স্বর্গীয় ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের ভবনে উপস্থিত, সেদিন বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকেও আমন্ত্রণ করেন। আমি গিয়া দেখিলাম একজন পঞ্চবিংশবর্ষীয় গৌরবর্ণ যুবা বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। আলাপ আপ্যায়ন হইল, ঘনিষ্ঠতা অল্প সময়ের মধ্যেই পাঁচকড়িবাবু করিয়া লইলেন এবং আমাকে পৃথকভাবে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি শিক্ষকতা ত্যাগ করিয়া সংবাদপত্র সেবার পথে যাইব কিনা? ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে আনিয়াছেন। আমি তাঁহার পত্র লইয়া যোগেন্দ্রবাবুর নিকট যাইব কিন্তু আমার ইহাতে কি উন্নতি হইবে? পাঁচকড়িবাবু তখন শিক্ষকতা করিতেন। তাঁহার বাক্‌পটুতা বুদ্ধিমত্তা ও লোকসংগ্রহের সামর্থ্য দেখিয়া ও তাঁহার তৎকালিক প্রয়োজন বুঝিয়া আমি তাঁহাকে কিছুদিন সংবাদপত্র সেবার পরামর্শ দিয়াছিলাম, কিন্তু আইন পরীক্ষা দিয়া উকিল হইবার দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছিলাম। অল্প দিন মধ্যেই 'বঙ্গবাসী' সংবাদপত্রের সংস্রবে পাঁচকড়িবাবু যখন আসিলেন, তখন তাঁহার কর্মপটুতা, লিপিকৌশল ও বুদ্ধিমত্তা সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছিল।"

"সে সময় 'বঙ্গবাসী'র সর্বস্ব স্বর্গীয় যোগেন্দ্রচন্দ্রবাবু তাঁহাকে সর্বগুণসম্পন্ন বলিয়া মনে করিতেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র তাঁহাকে ইংরাজী কি বাংলা উভয় ভাষাতেই শ্রেষ্ঠ লেখক বলিয়া মনে করিতেন। বঙ্গ সাহিত্য সিংহ অক্ষয়চন্দ্র সরকার আমার সমক্ষে ও পাঁচকড়ির অসাক্ষাতে পাঁচকড়িবাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। 'বঙ্গবাসী'-কার্যালয় হইতে প্রকাশিত তদানিন্তন দৈনিক ইংরাজী সংবাদপত্র 'টেলিগ্রাফ'এর সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু ছিলেন।"

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলাদেশের সংবাদপত্রজগতে একটি জীবন্ত 'লিজেণ্ড' ছিলেন। তাঁর নাম সেকালের শিক্ষিত বাঙালী মাত্রই জানতেন, তিনি যে একজন শক্তিমান সংবাদপত্র-সম্পাদক একথা কাউকে বলে দিতে হ'ত না। সংবাদপত্র 'দৈনিক নায়ক' বর্তমান কালের মাপ

কাঠিতে অতি ক্ষুদ্র সংবাদপত্র ছিল, তার প্রচারসংখ্যা বিপুল ছিল না। কিন্তু পাঁচকড়িবাবু কি লিখেছেন, সেকথা জানার আগ্রহ সকলের ছিল। হকার নাকি হাঁকত—'নায়ক বাবু, নায়ক, পাঁচুবাবু খুব শাসিয়েছেন' —পাঁচকড়ির এই খ্যাতিটাই সবকিছু ছাপিয়ে আছে—তিনি গালাগালি দিতে সিদ্ধহস্ত। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে গালাগালির পিছনে যদি যথেষ্ট যুক্তি না থাকে তা হলে সেই গালাগাল পাগলের প্রলাপে পরিণত হয়। পাঁচকড়ির উক্তি পাগলের প্রলাপ ছিল না। তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য, হিন্দুশাস্ত্রগ্রন্থে গভীর জ্ঞান, দুর্জয় সাহস এবং লিপিকুশলতাই তাঁর খ্যাতির সর্বপ্রধান কারণ।

সাংবাদিক হিসাবে তিনি ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমগোত্রীয় এবং তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর সেই নিজস্ব ধারাও লুপ্ত হয়েছে। তিনি দরিদ্র ছিলেন কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা করার দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অনেক মনীষীকে দেখেছেন। দেশবন্ধু, স্যার আশুতোষ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিষয়ে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর বিতর্ক হয়েছে এবং যে আলোচনা হয়েছে তা যুক্তির দিক থেকে উপেক্ষণীয় নয়। তিনি রবীন্দ্রনাথকেও দেখেছেন, তাঁর বিরুদ্ধেও লেখনী চালনা করেছেন। শরৎচন্দ্র একদা ভাগলপুরে পাঁচকড়ির ছাত্র ছিলেন। শরৎচন্দ্র প্রায়ই গল্প করতেন, পাঁচকড়ির সঙ্গে একদিন তাঁর পথে দেখা হয়। প্রাক্তন শিক্ষককে প্রণাম করার পর ছাত্র শরৎচন্দ্রকে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন—'দেখো শরৎ, তুমি তো লিখ্‌ছ, তোমার খ্যাতিও হয়েছে। তবে একটা কথা বলে দিই, যা তুমি নিজের চোখে দেখনি তা কখনো লিখ না। যা দেখছ তাই লিখে যাও।' শরৎচন্দ্র বল্‌তেন এই উপদেশটুকু আমি মেনে আস্‌ছি।

আমরা বাল্যকালে পাঁচকড়িকে দেখেছি, আমার জ্যেষ্ঠতাত স্বর্গীয় হরিসাধন মুখোপাধ্যায় (কলিকাতার একাল সেকাল ও অন্যান্য গ্রন্থের লেখক) মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ছিল, তাই আমাদের বাড়িতে তাঁর শুভাগমন ঘটেছে। তিনি সদালাপী পুরুষ ছিলেন এইটুকু মনে আছে। তাঁর আবৃত্তিতে গাম্ভীর্য ছিল কিন্তু প্রকৃতিতে তিনি পরিহাসপ্রিয় ছিলেন।

'নায়ক' পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র ছিল, বিজ্ঞাপন থাকত অতি অল্প, প্রায়

প্রতিদিনই কাঠের খোদাই করা ব্লকের কার্টুন থাকত। স্যার আশুতোষকে গোঁফসহ স্ত্রীলোকের বেশে গুঁফো সরস্বতী বানানো ছবি আমরাও দেখেছি। 'নায়ক' পত্রিকার আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল প্রথম পৃষ্ঠায় চটকদার ব্যানার হেড লাইন ছড়ায় লিখিত হ'ত, হকাররা সেই ছড়া চীৎকার করে আওড়াত। এমনই একটি ব্যানারের পদ আজো সামান্য স্মরণে আছে—'মুরারে তৃতীয় পন্থা এশিয়ার ভাগ্যে ছিন্ন কন্থা'—ইত্যাদি। সম্ভবত লীগ অব নেশনসের কোনো সিদ্ধান্তের ওপর এই হেড লাইন তৈরি করা হয়েছিল। 'নায়ক'এর স্বত্বাধিকারীরা বাংলার এক বিশিষ্ট জমিদার বংশোদ্ভূত ছিলেন। তাঁরা পাঁচকড়ি-বাবুকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন এই কথা আমরা জানি। এই 'নায়ক' অফিস থেকেই পরে 'অবতার' প্রকাশিত হয়। পাঁচকড়ির কিছু কিছু রচনা 'অবতারে'ও প্রকাশিত হয়েছে।

১৫ই নভেম্বর ১৯২৩-এ মাত্র সাতান্ন বছর বয়সে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু ঘটে। তাঁর মৃত্যুর পর অমৃতবাজার পত্রিকায় যে মন্তব্য প্রকাশিত হয়, সাংবাদিক পাঁচকড়ির বিশিষ্ট ভূমিকা তার পরিচায়ক—১৭ই নভেম্বর ১৯২৩ তারিখে লিখেছিলেন যে—"পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের সহযোগী ছিলেন এবং স্বদেশী আন্দোলনে পাঁচকড়ির শক্তিশালী লেখনীর অবদান উপেক্ষণীয় নয়।"

মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ভাগলপুর থেকে এসে 'বঙ্গবাসী'তে যোগদান করেন। তিন বছর কাজ করার পর ১৮৯৫ খৃস্টাব্দে তিনি ঐ পত্রিকার প্রধান সম্পাদক হয়েছিলেন। এরপর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রবর্তিত সাপ্তাহিক বসুমতীতে যোগদান করেন। বসুমতী ছাড়ার পর তিনি 'রঙ্গালয়' পত্রিকার সম্পাদক হন, তারপর ১৯০৮-এ 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। 'হিতবাদী' কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদের ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং সেইকালে বাংলাদেশে ও বাংলার বাইরে বাঙালীর কাছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য সাপ্তাহিক সংবাদপত্র ছিল। এইকালে তিনি 'বাঙ্গালী' নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। 'স্বরাজ' নামক পত্রিকা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় প্রকাশিত হয়, পত্রিকাটি স্বরাজ আন্দোলনের বিরোধী ছিল। শোনা যায়, দেশবন্ধুর ভ্রাতা এস আর দাশ মহাশয় এই পত্রিকার কর্ণধার ছিলেন। পাঁচকড়ি এই পত্রিকারও নিয়মিত লেখক ছিলেন। যে কালে ব্রহ্মবান্ধবের 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় গরম

গরম লেখা প্রকাশিত হ'ত, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলতেন, 'চাটিম চাটিম' সম্পাদকীয়, সেই সময় পাঁচকড়ি 'সন্ধ্যা'য় সম্পাদকীয় লিখতেন।

কিন্তু পাঁচকড়ির খ্যাতি 'নায়ক' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে 'নায়ক' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আর সাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধাদি তিনি লিখেছেন 'প্রবাহিনী', 'সাহিত্য', 'নারায়ণ' ও 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায়। এইগুলির মধ্যে 'প্রবাহিনী' ও 'সাহিত্য'র সঙ্গে তিনি সম্পাদনাসূত্রেও যুক্ত ছিলেন। পাঁচকড়ির মৃত্যুর পর তাঁর দেশবাসী জানতে পারেন যে, তিনি হিন্দী দৈনিক 'ভারতমিত্র'এরও সম্পাদক ছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যতীত সম্পূর্ণভাবে হিন্দী দৈনিকপত্র সম্পাদনা করার কৃতিত্ব বোধ করি আর কোনো বাঙালী সাংবাদিকের নেই।

পাঁচকড়ি আর একখানি হিন্দী পত্রিকা 'কলিকাতা সমাচার'এর সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। একই কালে তিনি কলিকাতা সমাচার (হিন্দী), দৈনিক চন্দ্রিকা, সাপ্তাহিক প্রবাহিনী পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং সেই কালেই সাহিত্য, নারায়ণ ও বিজয়া নামক তিনখানি মাসিক পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি স্বয়ং 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় লিখেছিলেন, "পাঁচু ভায়া ষট্পদ...ষট্পদ বলিয়া নতুন মাসিক ফুটিয়া উঠিলেই, পাঁচু যাইয়া নতুন ফুলে একেবারে বসেন। প্রমাণ 'সঙ্কল্প'।"

সেই সময় 'সঙ্কল্প' নামে একখানি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল অর্থাৎ পাঁচকড়ির সাংবাদিক হিসাবে জনপ্রিয়তা ছিল অসীম, সেই কারণে যে কোনো সাময়িক পত্রিকা তাঁর স্পর্শ ভিন্ন প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। যে অল্পকালে এই ধরাধামে তিনি ছিলেন, তার সঙ্গে এত কাজ করা এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সম্পাদন করা বড় সহজ কথা নয়।

পাঁচকড়িকে আধুনিক মাপকাঠিতে পূর্ণাঙ্গ জার্নালিস্ট বলা যায়। কারণ, সব রকম লেখাতেই তিনি দক্ষ ছিলেন। যে রম্যরচনার ইদানীং এত সমাদর, পাঁচকড়ি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে অসংখ্য রম্যরচনা লিখে গেছেন। সেই কালের অজস্র সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় তাঁর অজস্র রচনা ছড়ানো আছে। ছোটদের জন্য 'ধ্রুব' নামে একটি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশিত হ'ত, পাঁচকড়ি 'ধ্রুব' পত্রিকায় শিশুদের উপযোগী করে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন সহজভাবে, পৌরাণিক কথাও বলেছেন। তিনি আদর্শে

রক্ষণশীল ছিলেন, তাই 'বেদব্যাস', 'ধর্ম', 'প্রচারক' প্রভৃতি পত্রিকায় ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছেন।

পাঁচকড়ি ইংরাজী, বাংলা, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় যেমন সুপণ্ডিত ছিলেন তেমনই সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁর অধিকার ছিল। ভারতবর্ষের কয়েকটি মুখ্য ভাষা বিষয়ে এই জাতীয় জ্ঞান থাকায় তাঁর পক্ষে সংবাদপত্রসেবা সহজ হয়ে উঠেছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানত দলাদলির লেখক বলে অনেকের মনে একটা অস্পষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু পাঁচকড়ির গালাগাল এমনই চটকদার, তাঁর শ্লেষ এমনই মর্মভেদী এবং ক্ষুরধার ব্যঙ্গ ছিল চর্মভেদী যে, তাঁর বক্তব্য পাঠ করার জন্য সেকালের যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। পাঁচকড়ির চরিত্রের প্রধান গুণ এই যে, তিনি বিদ্বেষপরায়ণ ছিলেন না. ব্যক্তিজীবনে পাঁচকড়ি বিভিন্ন মানুষ, তাই যাঁরা তাঁর গালি খেতেন তাঁরাও তাঁর প্রতি কোনো বিরূপ ভাব মনে মনেও পোষণ করতে পারতেন না। স্যার আশুতোষ. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে-সব মনীষীদের তিনি আক্রমণ করতেন, সন্ধ্যায় তাঁদের বাড়িতে আগেভাগেই সেই কথা জানিয়া আসতেন। পাঁচকড়ির সৎসাহস ছিল, তিনি যা কিছু করেছেন তা যে নেহাৎ পেটের দায় একথা বলতে তাঁর বাধতো না। তিনি স্বয়ং আত্মকথনমূলক 'বিকায় যে' নামক প্রবন্ধটিতে অনেক সত্য কথা বলেছেন। আদর্শ সাংবাদিকের সত্যনিষ্ঠাই সর্বপ্রধান গুণ। 'বিকায় যে' ১৩২১ সনে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে 'প্রবাহিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্ভবত তাঁকে কেউ উত্তেজিত করে থাকবে তাই পাঁচকড়ি জবাবে লিখেছেন—"আমরা তো কলিকাতার সকল বড় সমাচার পত্রের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া এঁটো পাত চাটিয়া বেড়াইতেছি। আমরা জানি আজকাল খবরের কাগজ ব্যবসা হিসাবেই লোকে চালাইতে থাকে। অধিকারী মহাশয়গণ মনে করেন আমরা তো দেশ ছাড়া নহি. আমার উপকারে দেশের উপকার হইবেই।"

অধিকারী মহাশয়দের স্বরূপ সংক্ষেপে ব্যক্ত করে পাঁচকড়ি নিজের সাংবাদিক বৃত্তি গ্রহণের পটভূমিকায় বলেছেন যে শেষ পর্যন্ত 'পেটের দায় অথচ পেটের দায়ে আমি একাজে আসি নাই।' তিনি বলেছেন—'স্কুল মাস্টারী ছাড়িয়া যখন কলিকাতায় প্রথম খবরের কাগজের চাকরী করিতে আসি তখন সত্যই মনে করিয়াছিলাম যে দেশের ও দশের কাজ

করিতেছি। কিন্তু আমার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন সেনগুপ্ত, বিদ্যারত্ন। তিনি তাঁর 'দৈনিক' পত্রের সম্পাদক ছিলেন। ধীরে ধীরে কলিকাতার ব্যাপার যত দেখিতে লাগিলাম, ততই হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারিলাম যে, এসব দেশের কাজ নহে, পেটের কাজ, পেটের কাজ, পেটের দায়ে খবরের কাগজ চালানো হইতেছে। সেই অবধি ধুয়া ধরিয়াছি—পেটের দায়। যদিচ প্রকৃতপক্ষে গোড়ায় পেটের দায়ে আমি এ কাজে আসি নাই।'

পাঁচকড়ির এই ঘোষণা অতিশয় সাহসিক। এই ভাবেই তিনি সংবাদপত্র সেবা করেছেন, কাউকেই তিনি তোয়াজ করেন নি, তবে নিজের মুখে 'পেটের দায়' কথাটি স্বীকার করায় হয়তো ব্রাত্য বিবেচিত হয়েছেন। সকলে মুখ ফুটে বলতে পারেন না, পাঁচকড়ি বলেছেন। পাঁচকড়ির এই 'এনালিসিস' বিশেষভাবে চিন্তা করার যোগ্য।

কিন্তু সার্কাসের ক্লাউনের যে মনস্তত্ব সেই মনস্তত্ব সব রসিকতার পিছনে, গভীর রঙ্গরসের পিছনে থাকে মর্মস্পর্শী করুণ রস, সেই হাসি তা কি সকলে বোঝে। পাঁচকড়ি এই প্রবন্ধের শেষাংশে গভীর ক্ষোভে লিখেছেন :

'বিকায় যে—কথাটা রঙ্গের নহে তীব্র বেদনার, বড়ই ক্ষোভের ও লজ্জার। ব্রাহ্মণ আমি, আমাকে বিক্রয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কাগজে কলমে এক করিতে হয়। আজ এই কুড়ি বৎসর কাল কলিকাতায় খবরের কাগজে ভাঁড়ামী বিকায় বলিয়া সকলে আমাকে রাখে; আমাকে দেখিয়া, আমার আমিত্বের পরিচয় লইয়া কেহ আমার প্রতিপালন করিল না।

বিকায় যে—! তাই আমার আদর। কাজেই বলিতে হয় আমার ক্ষুধার অন্ন আমাকে অর্জন করিয়া লইতে হইতেছে।

তোমাদের কাছে বিকায় যে! তাই পাঁঠার ঘুগ্‌নী, হাঁসের ডিমের ডালনা, সাড়ে বত্রিশ ভাজা বেচিয়া উদারান্নের সংস্থান করিয়া থাকি। দেশ কই? দেশের ভাবনা ভাবেই বা কে? দেশ ও দশকে চিনেই বা কে। দেশ তো আমি, আমি উদ্ধার করিলে দেশ উদ্ধার হইবে, আমাকে পোষণ করিলে দেশের মঙ্গল হইবে।

দেশের দোহাই দিয়া কতজনে কোঠা বালাখানা গড়িল, দশ পাঁচ লাখ জমাইল। কাঠ কুড়নির বেটা চন্দনবিলাসী হইয়া দাঁড়াইল। তাই ক্ষুব্ধচিত্তে বলিতে হয়—এ তো দেশসেবা নহে, সাফ পেটের দায়।

শ্লেষের অন্তরালে যেমন পাথর চাপা ক্রন্দন লুকান আছে, ব্যঙ্গের পার্শ্বে দীর্ঘশ্বাস ফুটিতেছে—হে রসহীন, বোধহীন, রোগাতুর, তাহা তুমি বুঝিবে কি? কাঁদিলে কেহ শুনে না, বুঝে না, তাই হাসিতে হয়। হায় বিধি। হাসিও যে কত ব্যথার হাসি, তাহাও ইহারা বুঝিল না!'

পাঁচকড়ি যখন 'প্রবাহিনী' পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন তিনি খুশি হয়েছিলেন যে তিনি তাঁর সাহিত্যিক সত্তার বিকাশের একটা মাধ্যম এতদিনে পেলেন। পাঁচকড়ির অনেক মূল্যবান রচনা 'প্রবাহিনী' পত্রিকার পৃষ্ঠায় ছড়ানো আছে। তিনি ১৩২০ সনের ১৭ই মাঘ সংখ্যায় লিখেছিলেন : 'প্রবাহিনীকে বিদ্বজ্জন সমাজের চিত্তবিনোদিনী করিবার আমাদের অভিলাষ। ধর্মকথা, সমাজকথা, কাব্যশাস্ত্রের কথা—চিত্তবিনোদনের জন্য যেসব সভ্য-সমাজে চিরকালই নির্দিষ্ট রহিয়াছে সেই সকল কথা—কহিবার জন্যই আমি কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি।' কিন্তু পাঁচকড়ির অভিলাষ পূর্ণ হয় নি, কয়েক সপ্তাহ পরেই পাঁচকড়িকে সখেদে বলতে হয়েছে যে 'গালাগালি না দিলে কাগজ বিকায় না।'

'প্রবাহিনী পত্রিকার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর মতান্তর হওয়ায় তিনি একবার সম্পর্ক ত্যাগ করেন, কিন্তু তিনি অভিমান শূন্য তাই তাঁকে আবার ফিরে আসতে হয়। তখন তিনি বলেছিলে 'আবার আসিলাম, আমার মান নাই, অপমান নাই, রাগ নাই রোষ নাই, স্মৃতি নাই, বিস্মৃতি নাই—।'

পাঁচকড়ি এই দিক থেকেও খাঁটি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি সহজেই তাই দেখা করতে পারতেন, কারো উপর অভিমান বা ক্রোধ জমিয়ে রাখতে পারেন নি। পাঁচকড়ির জীবনাদর্শ গঠিত হয়েছিল ইন্দ্রনাথের আদর্শে। পাঁচকড়ির মৃত্যুর পর 'বঙ্গবাণী' মাসিকে পঞ্চানন তর্করত্ন পাঁচকড়িপ্রসঙ্গে লিখেছিলেন—'ইন্দ্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র যোগেন্দ্রচন্দ্র ও ব্রহ্মবান্ধবে যে প্রত্যেকের বৈশিষ্ট্য ছিল—পাঁচকড়ি তাঁহাদের সাহচর্যে সেই সমস্ত বৈশিষ্ট্যই নিজস্ব করিয়া লইতে পারিয়াছিলেন।'

'বঙ্গবাণী' মাসিকপত্রের সম্পাদক ছিলেন বিজয়চন্দ্র মজুমদার ও দীনেশচন্দ্র সেন। পাঁচকড়ি আশুতোষের আমন্ত্রণে এই মাসিকপত্রে অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এবং তাদের অধিকাংশ হিন্দুধর্ম ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক, বৈষ্ণব সাহিত্য সম্পর্কে একটি ধারাবাহিক রচনাও 'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত হয়।

গবেষক ব্রজেন্দ্রনাথ পাঁচকড়িকে দেখেছেন এবং তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, তাই উত্তরকালে তিনি সজনীকান্ত দাসের সহযোগিতায় প্রবন্ধ সংগ্রহ ক'রে তা দুটি খণ্ডে প্রকাশিত করেন। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় জীবনীও ব্রজেন্দ্রনাথের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে। পাঁচকড়ির 'রসালতত্ত্ব' নামক বিখ্যাত প্রবন্ধটিতে শুধু যে সামাজিক আচার এবং সরলতার পরিচয় পাওয়া যায় তা নয় কৃষি ব্যাপারেও যে তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়।

পাঁচকড়ির বঙ্কিম-প্রীতির কথা উল্লেখ করা কর্তব্য। বাল্যকাল থেকেই তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখেছেন। বঙ্কিম-জামাতা রাখালচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর এবং হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। এই সব কথা পাঁচকড়ি লিখে গেছেন। সাহিত্য সমালোচক হিসাবে পাঁচকড়ি যে কত সুদক্ষ ছিলেন তার পরিচয়ও পাওয়া যায় 'নারায়ণে' প্রকাশিত 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' নামক প্রবন্ধটিতে। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী ও সীতারাম সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি সর্বশেষে লিখেছেন :

"কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানা উপন্যাসে বাঙ্গালীকে দেশাত্মবোধের অনেক কথা ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী চরিত্রের কোথায় ত্রুটি-বিচ্যুতি তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইয়া গিয়াছেন। Art হিসাবে তিনখানা উপন্যাসে দোষ থাকিলেও, উপদেশের হিসাবে উহা পূর্ণাঙ্গ এবং নির্দোষ। সে উপদেশ-কথা সেই বুঝিবে, যে বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার শেষ পরিণতি বুঝিয়াছে, যে ধর্মতত্ত্বের সিদ্ধান্ত-সকল হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। শুশ্রুষু না হইলে তত্ত্বকথা বুঝানো যায় না। ওই তিনখানা উপন্যাস বাঙ্গালীর সম্মুখে বহুকাল পড়িয়া আছে, উহাদের পর্যাপ্তভাবে অভিনয় হইয়াছে, লোকে উহা পাঠ করিয়াছে, কিন্তু উহাদের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা ঠিকমত হয় নাই। দেশ কাল পাত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমি বলিতে বাধ্য যে, উহার বিশ্লেষণের সময় ও শুভ অবসর এখনও দেখা দেয় নাই। যেভাবে 'বন্দেমাতরম্' মহাগীতি ফুটিয়াছিল সেইভাবে এই তিনখানা উপন্যাসের তত্ত্বকথাও ফুটিয়া উঠিবে। সেটা বিধাতার কৃপাসাপেক্ষ, তাই আমি উহাদের নাম দিয়াছি ত্রয়ী। ত্রয়ী ইষ্টের করুণা ছাড়া বুঝা যায় না। এই তিনখানিও বুঝিবার দিনকাল আছে, যোগ্য মানুষ আছে।"

পাঁচকড়ি ধর্মতত্ত্ব কি সহজে ব্যাখ্যা করতেন তার দৃষ্টান্ত দেওয়া

প্রয়োজন। মাতৃপূজা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—'মাতৃপূজা আত্মার খেলা। দেহী আত্মা বংশানুক্রমের প্রভাবে কোন ভাবে সম্মুটা হইয়া আছেন, তাহা বুঝিতে ও জানিতে হইলে, যাঁহাদের কৃপায় আমি দেহী হইয়াছি, তাঁহাদেরই করুণা প্রার্থনা করিতে হয়। সে করুণা লাভ করিলে কুণ্ডলিনীকে অকালে জাগাইতেও কোনো বাধা থাকে না। তাই মহালয়ার পরেই দেবীপক্ষ—পররাত্রের উৎসব আরম্ভ হয়।

মাকে জাগাই ভাব দিয়া। মা আমার হিমালয়-কন্যা। এ হিমালয় নেপালের উত্তরের হিমালয় পর্বত আছে, তদ্দেশজাত মনোময়ী কন্যা। দেহের বামকোণে হৃৎপিণ্ড, তাহারই মধ্যে পর্বে পর্বে বিস্তৃত হিমালয় ভাব-গিরি আছে। দেহস্থ দক্ষিণকোণের কৈলাস পর্বত হইতে নামাইয়া হৃদয়ে—হিমালয় আনিয়া বসাইতে হইবে। ইহাই হইল দুর্গোৎসবের অকালবোধন। দক্ষিণায়নে—স্বল্পকালে মা কৈলাসে শিব-সংযুক্তা হইয়া থাকেন। ঐ সময়ে কৈলাস হইতে মাকে হৃদয় গেহে আনয়ন করা বড় কঠিন ব্যাপার। তাই ভাবময়ীকে আগমনী গান শুনাইতে হয়, মাকে কন্যারূপে আহ্বান করিতে হয়।'

ঠিক এই ভাবের সরল এবং সহজ ভাষায় তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আর বিশেষ দেখা যায় না।

পাঁচকড়ি রক্ষণশীল হলেও গোঁড়া ধর্মধ্বজী ছিলেন না, তাঁর সঙ্গে বিবেকানন্দের আলোচনা থেকে এই প্রমাণ পাওয়া যায়। দুর্গামূর্তি-সম্পর্কিত তাঁর প্রবন্ধেও এই পরিচয় আছে। এতদ্বারা মনে করা যায় যে, সমন্বয়সাধনের মতো মন তাঁর ছিল।

তিনি 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু সমাজপতির সঙ্গে পাঁচকড়ির মতাদর্শের অনেক পার্থক্য ছিল। পাঁচকড়ি নিজস্ব ভঙ্গিতে 'সাহিত্য' সম্পাদনা করেছেন। এই স্বাতন্ত্র্যকে তাঁর চরিত্রবৈশিষ্ট্য বলা যায়। পাঁচকড়ির উপন্যাস 'উমা' 'সাধের বউ' 'দরিয়া' আজ আর পাওয়া যায় না। 'উমা' উপন্যাসটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত উপন্যাসের কাহিনীগত মিল থাকায় সে সময় কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পাঁচকড়ি আত্মপক্ষ সমর্থনে তার উত্তর দিয়েছিলেন স্মরণে আসে।

১৯১৯ খৃঃ 'সাধের বউ' ও ১৯২০ খৃঃ 'দরিয়া' উপন্যাস দুখানি প্রকাশিত হয়েছিল। দরিয়ার গোড়ার কথায় তিনি লিখেছিলেন—"আজ 'দরিয়া'

পুস্তকে যাহা লিখিলাম, পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে উহা বাঙলার ও বাঙালীর সর্বজন পরিচিত ভাব ছিল। তাই শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাইচরিত' তখন অত বিকাইয়াছিল। এখন শুনিতেছি বাঙালীর পুরুষ পরম্পরাগত ভাবসম্পত্তির কথা আধুনিক শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় বুঝিতে পারেন না। আমি যাহাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই পুস্তক রচনা করিয়াছি, তাহার যদি ব্যাখ্যা করিতে হয় তাহা হইলে সাধকতত্ত্বের গোড়ার কথা বুঝাইতে হইবে। সে চেষ্টা না হয় অন্য পুস্তকে করিব।

'দরিয়া'য় পরকীয়াত্ব একটু চেষ্টা করিয়াছি। পরকীয়া বলিলে এখন অনেকে যাহা বুঝেন উহা তাহা নহে। উহা পরস্ত্রী গমনের নামান্তর নহে। যাহা পরের ভাব তাহাকে আমার ভাবের সহিত মিলাইয়া পূর্ণরূপে আত্মসাৎ করিতে পারিলে তবে পরকে আপনজন করিতে পারা যায়, তবে বিচিত্র বিশ্বসৃষ্টিকে আমার বলিয়া এক করা চলে। Universal Brotherhood কথার কথা নহে। ভাব বৈষম্যবশতঃই নয়—নারীর মধ্যে, জাতিসকলের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং বিরোধ ঘটে। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃস্টান. শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, এশিয়াবাসী ও ইউরোপবাসী—এই যে বিভেদ ও বিচার ও জাতি পার্থক্য, ইহা ভাবগত বৈষম্যের জন্য ঘটিয়াছে। এ বৈষম্য দূর করিবার চেষ্টা জগতে সর্বাগ্রে বৌদ্ধ প্রচারকগণ করিয়াছিলেন। ধর্মের পথে তাঁহারা নরসমাজের একীকরণ-ব্রত গ্রহণ করেন। তাঁহাদের পরে ইসলাম অন্য রকমে জগতটাকে মোসলেম বানাইয়া এক করিতে চাহেন। পরকীয়াতত্ত্ব এই চেষ্টার সাধনপদ্ধতি। সহজ পণ্ডিতগণ বলেন যে, ও পথে জগতের বৈচিত্র্য দূর হইবার নহে ; ওপথে দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাব এড়াইয়া উপরে ওঠা যায় না। তাই তাঁহারা পরকীয়া সাধনার নানা ক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। 'দরিয়া'য় একটা ক্রম আমি দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। এ সাধনার অনেকগুলো ক্রম ভগবান রামকৃষ্ণদেব তাঁহার জীবনে ফুটাইয়া দেখাইয়া দিয়া গিয়াছেন। আধুনিক বাঙালী তাহা দেখিয়া ঠিকমত বুঝিতে পারে নাই। কেশবচন্দ্র 'নববিধান' ধর্মের প্রবর্তনা করিয়া গোড়ার প্রথম স্তরটা বাঙালীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। সেই তত্ত্বটাকে রোচক ও অর্থবাদে মোড়ক করিয়া 'দরিয়া' পুস্তকে আমি খোলসা করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সে চেষ্টা সার্থক হইল কিনা বলিতে পারি না।"

বিষয়বস্তুর এই বৈচিত্র্যে 'দরিয়া' একটি বিশিষ্ট উপন্যাস।

বৃহৎ পরিবার পালনের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে পাঁচকড়িকে সাংবাদিকের জীবনে ঘোরতর সংগ্রাম করতে হয়েছে। তিনবার বিবাহ করেছিলেন একথা নিজেই উল্লেখ করে পরিহাস করতেন। কিন্তু একটি বিষয় বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করার যে পাঁচকড়ি ফলের দিকে না তাকিয়ে করেছেন, পেটের দায়ে কাজ করেছেন একথা স্বীকার করার মতো সৎসাহস তাঁর ছিল। জীবনসংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত পাঁচকড়ির অকালমৃত্যু তাই তাঁর সমকালীনদের মধ্যে গভীর বেদনার কারণ হয়েছিল। রসরাজ অমৃতলাল বসু সেদিন লিখেছিলেন—'আমাদের আনন্দ-তটিনী হইতে একটি নৃত্যশীল তরঙ্গ চিরদিনের জন্য ডুবিয়া গেল।'

পাঁচকড়ির জীবন যেন নৃত্যশীল তরঙ্গ। কিন্তু নৃত্যশীল তরঙ্গ এই কথা বলাই কি যথেষ্ট। পাঁচকড়ির জীবন একটা স্ফুলিঙ্গের মতো। মূর্তিমান পাবকের মতো শুচিশুভ্র মন নিয়ে তিনি সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছিলেন, দারিদ্র্য তাঁকে টেনে নামিয়েছে হাটে বাজারে। মনে মনে তার জন্য ক্লেশ বোধ করেছেন, কিন্তু নিজের কাজ তিনি দায়িত্বজ্ঞান-সম্পন্ন সৈনিকের মতো করেছেন।

পাঁচকড়ি স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি ইনস্টিটিউশন ছিলেন, তাই তিনি স্মরণীয়। তাঁর যে রচনা সংগৃহীত হয়েছে তা যেমন বাঙালী মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য তেমনই যেসব রচনা আজো ছড়ানো আছে তা সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন। পাঁচকড়ি বিগত যুগের বাঙালী সাংস্কৃতিক জীবনের একটি প্রতীক এইকথা তাঁর জন্মশতবার্ষিকীতে স্মরণীয়।

পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৬৭-১৯৫৯

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের প্রথম যুগে যাঁরা রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে বিদ্যালয়ের কাজে এসে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন এমন কথা কেউ বলবে না। দু-একজন অবশ্যই অসাধারণ ছিলেন, তাঁদের কথা আলাদা। কিন্তু অন্যান্যদের বেলায় এ কথা নির্বিবাদে বলা যেতে পারে যে বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাঁদের সমকক্ষ ব্যক্তির অভাব দেশে তখনও ছিল না, এখনও নেই। অথচ নিজ নিজ ক্ষেত্রে এঁরাও অনেকেই অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এঁরা স্বেচ্ছায় এমন-সব কার্যভার স্বহস্তে গ্রহণ করেছিলেন, আজকের সাংসারিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিরা যাকে হঠকারিতা বলে মনে করবেন। মনে হবে আপন সাধ্যসীমা ভুলে গিয়ে তাঁরা সাধ্যাতীতের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সকল অবিশ্বাসীর অবিশ্বাসকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে আপন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছেন। বাস্তবিক পক্ষে তাঁরা যে ভাবে কাজ করেছেন তাকে একমাত্র সাধনা নামেই অভিহিত করা যায়, মাস-মাহিনার চাকুরে দ্বারা এ জাতীয় কাজ কখনোই সম্ভব নয়। যে কাজে বহুজনের মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন কখনো কখনো সম্পূর্ণ একক চেষ্টায় সে কাজ সম্পন্ন হয়েছে। কর্তা অকিঞ্চন, কীর্তি সুমহান; আপতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে কর্তার তুলনায় কীর্তি বহুগুণে বৃহৎ। বস্তুতঃ তা নয়, কীর্তি কখনো কর্তাকে ছাড়িয়ে যায় না। বাহ্যতঃ যা দৃষ্টিগোচর ছিল না সেই শক্তি তাঁদের চরিত্রের মধ্যে নিহিত ছিল। সুবৃহৎ কার্যে সব চেয়ে বেশি প্রয়োজন নিষ্ঠা এবং অভিনিবেশ। বিদ্যাবুদ্ধি তো ছিলই, তদুপরি উক্ত দুই গুণসন্নিপাতে সাধারণ মানুষের দ্বারাও অসাধারণ কার্য সম্পাদন সম্ভব হয়েছিল।

এর কৃতিত্ব অনেকাংশে শান্তিনিকেতনের প্রাপ্য, কারণ এরূপ মানুষ শান্তিনিকেতন নিজ হাতে তৈরি করেছে। আমাদের দেশে স্থানমাহাত্ম্য বলে একটা কথা আছে; সেটা কেবলমাত্র স্থান-বিশেষের মাটি-জল-হাওয়ার গুণ নয়। সে স্থানই মহৎ যে স্থান মানুষের কাছ থেকে বড় কিছু দাবি করতে জানে। দাবি করবার অধিকার সব স্থানের থাকে না। সে

অধিকার অর্জন করতে হয়—অর্জন করতে হয় নিজের দান-শক্তির দ্বারা। যে দিতে জানে সেই দাবি করতে জানে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে শান্তিনিকেতনের দান অপরিসীম। শান্তিনিকেতনই দেশকে প্রথম শিখিয়েছে যে বিদ্যালয় কেবলমাত্র বিদ্যাদানের স্থান নয়, বিদ্যাচর্চার স্থান; শুধু বিদ্যাচর্চা নয়, বিদ্যা-বিকিরণের স্থান। বিদ্যার্জনের পথ সুগম করে দেওয়া বিদ্যাকেন্দ্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। যে সময়ে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহও এসব কথা ভাবে নি শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় তার শৈশবেই সেসব কথা ভেবেছে এবং সেজন্যে নিজেকে প্রস্তুত করেছে। শান্তিনিকেতনের স্থানমাহাত্ম্য বলতে এই অর্থেই বলেছি। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ নিজের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন শান্তিনিকেতনের সেবায়। সেই জোরে তিনি যাঁদের আহ্বান করেছিলেন তাঁদের কাছ থেকে নিঃসংকোচে সর্বশক্তি নিয়োগের দাবি করতে পেরেছিলেন।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশায় যখন রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে বঙ্গীয় শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হন তখন বঙ্গীয় পণ্ডিত সমাজে তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। বয়সে নবীন, অভিজ্ঞতায় অপ্রবীণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপটুকু পর্যন্ত নেই, প্রামাণিক কোনো গ্রন্থ রচনা করে পাণ্ডিত্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নি। এরূপ সুবৃহৎ কাজের জন্যে তাঁর প্রস্তুতি কতখানি সে বিষয়ে সাধারণের মনে সংশয় থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না; থাকলে এমন নিশ্চিন্ত মনে এই বিশাল কার্যভার তাঁর উপরে ন্যস্ত করতে পারতেন না। এই সম্পর্কে একটি কথা অনেক সময়ে আমার মনে হয়েছে। শান্তিনিকেতনের প্রথম যুগে রবীন্দ্রনাথের অধ্যাপক-নির্বাচন অনেকটা যেন শেক্সপীয়ারের প্লট-নির্বাচনের মতো। হাতের কাছে যেমন-তেমন একটা গল্প পেলেই হল, শেক্সপীয়ার চোখ বুজে তাকেই গ্রহণ করেছেন। প্রতিভাবানের হাতে ছাই ধরলেও সোনা হয়ে যায়। অত্যন্ত শীর্ণ বিবর্ণ কাহিনীও রক্তমাংশ-অস্থিমজ্জার সংযোগে পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছে, রঙে রসে পূর্ণতা লাভ করেছে, নিষ্প্রাণ কাহিনী প্রাণের স্পন্দনে অপূর্ব বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। পণ্ডিত সমালোচকদের মতে মূল কাহিনীতে শেক্সপীরীয় ঐশ্বর্যের আভাসমাত্র ছিল না। অবশ্য এমন হওয়া অসম্ভব নয় যে একমাত্র শেক্সপীয়ারের কবিদৃষ্টিতেই সেইসব শীর্ণ কাহিনীর অনুচ্চারিত সম্ভাবনাটুকু ধরা পড়িছিল। সম্পর্কেও

এ কথা প্রযোজ্য। আপাতদৃষ্টিতে যেমন সাধারণ তাঁরও প্রচ্ছন্ন সম্ভাবনা রবীন্দ্রনাথের সর্বদর্শী দৃষ্টিকে এড়াতে পারে নি। জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারীকে অধ্যাপনার কাজে ডেকে এনে একজনকে দিয়ে লিখিয়েছেন ছেলেমেয়েদের উপযোগী করে বাংলা ভাষায় প্রথম বিজ্ঞান-গ্রন্থমালা, আরেকজনকে দিয়ে বাংলা ভাষার বৃহত্তম অভিধান। বিধুশেখর শাস্ত্রী ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ টোলের পণ্ডিত, সেই মানুষ কালক্রমে বহুভাষাবিদ পণ্ডিতে পরিণত হলেন—ভারতীয় পণ্ডিতসমাজে সর্বাগ্রগণ্যদের অন্যতম। ক্ষিতিমোহন সেনও সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, তাঁরও জিজ্ঞাসা নতুন পথে প্রবাহিত হল—মধ্যযুগীয় সাধুসন্তদের বাণী সংগ্রহ করে ভারতীয় জীবনসাধনার বিস্মৃত-প্রায় এক অধ্যায়কে পুনরুজ্জীবিত করলেন। এসমস্তই সম্ভব হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অনুপ্রেরণায়। তিনি দাবি করেছেন, এঁরা প্রাণপণে সেই দাবি পূরণ করেছেন। দাবি পূরণ করতে গিয়ে এঁদের শক্তি দিনে দিনে বিকাশ লাভ করেছে। ক্ষিতিমোহনবাবু বলতেন, জান, আমরা ছিলাম সব মাটির তাল, গুরুদেব নিজ হাতে আমাদের গড়ে নিয়েছেন, নইলে যে বিদ্যা শিখে এসেছিলাম তাও ঠিক মতো ব্যবহার করা আমাদের সাধ্যে কুলোতো না।

রবীন্দ্রনাথ যে চোখ বুজে এঁদের গ্রহণ করেছিলেন এমন নয়, চোখ মেলেই করেছিলেন। মানুষ যাচাই করবার বিশেষ একটি রীতি তাঁর ছিল। প্রথমেই দেখে নিতেন দৈনন্দিনের দাবি মিটিয়ে মানুষটির মধ্যে উদ্বৃত্ত কিছু আছে কি না। রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের সাধনা উদ্বৃত্তের সাধনা। সংসারের পনেরো-আনা মানুষই আটপৌরে, তাদের দিয়ে নিত্য দিনের গৃহস্থালির কাজটুকু শুধু চলে, বাড়তি কিছু দেবার মতো সম্বল এদের নেই। জমিদারি মহল্লা পরিদর্শন করিতে গিয়ে আমিনের সেরেস্তায় নিযুক্ত হরিচরণকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, দিনে সেরেস্তায় কাজ কর, রাত্রিতে কি কর? হরিচরণ বলেছিলেন, সন্ধ্যাবেলায় তিনি একটু সংস্কৃতের চর্চা করেন, একখানা বইএর পাণ্ডুলিপিও প্রস্তুত আছে। পাণ্ডুলিপিটি চেয়ে নিয়ে দেখে নিলেন। মানুষ কিভাবে অবসর যাপন করে তাই দিয়ে তার প্রকৃত পরিচয়। যার মধ্যে উদ্বৃত্ত কিছু নেই তার অবসর কাটে না। ঐ সামান্য বাক্যালাপ থেকেই হরিচরণবাবুর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাটি কবি দেখতে পেয়েছিলেন। এই কারণেই অত্যল্পকাল মধ্যে ম্যানেজারের নিকট নির্দেশ এল, তোমার সংস্কৃতজ্ঞ কর্মচারীটিকে শান্তিনিকেতনে পাঠিয়ে দাও। কবি

তখন বিদ্যালয়ের প্রয়োজনে 'সংস্কৃতপ্রবেশ' নামে একটি পুস্তক রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার সহজ প্রণালী উদ্ভাবনই ঐ পুস্তকের উদ্দেশ্য ছিল। হরিচণবাবু আসবার পরে কবি তাঁর অসমাপ্ত পাণ্ডুলিপিটি হরিচরণ-বাবুর হস্তে অর্পণ করেন। অধ্যাপনা-কার্যের অবসরে তিনি কবির নির্দেশ মত ঐ পুস্তকরচনা সমাপ্ত করেন।

১৩০৯ সালে অর্থাৎ বিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠার বৎসরকাল মধ্যেই হরিচরণবাবু শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কর্মনিষ্ঠার দ্বারা অল্পকাল মধ্যেই নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন, নতুবা কাজে যোগ দেবার পর দু বৎসর অতিক্রান্ত হতে না হতেই ৩৭।৩৮ বৎসরের এক যুবককে ঐ সুবৃহৎ অভিধান রচনার কার্যে আহ্বান করতেন না। অপরপক্ষে শান্তিনিকেতনে শুরু থেকেই বিদ্যাচর্চার যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা তিনি বোধ করেছেন সে কথা আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গে হরিচরণবাবু নিজ মুখেই ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের প্রস্তাব তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতো মনে হয়েছে। তিনি তৎক্ষণাৎ নম্রহৃদয়ে নতমস্তকে কবির আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। ১৩১২ সালে অভিধান রচনার সূচনা, রচনাকার্য সমাপ্ত হল ১৩৩০ সালে। মাঝে আর্থিক অনটনের দরুণ শান্তিনিকেতনের কর্ম ত্যাগ করে তাঁকে কিছু কালের জন্য কলকাতায় যেতে হয় অভিধান-সংকলনের কাজ বন্ধ থাকে। এটি তাঁর নিজের পক্ষে যেমন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও তেমনি ক্লেশের কারণ হয়েছিল। তাঁকে অবিলম্বে শান্তিনিকেতনে ফিরিয়ে আনবার জন্যে কবি নিজেই উদ্যোগী হলেন। রবীন্দ্রনাথের আবেদনক্রমে বিদ্যোৎসাহী মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী অভিধান-রচনাকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে হরিচরণবাবুর জন্য মাসিক পঞ্চাশ টাকার একটি বৃত্তি ধার্য করেন। ১৩১৮ সাল থেকে অভিধান-সংকলনকার্য শেষ হওয়া পর্যন্ত তেরো বৎসর কাল তিনি এই বৃত্তি ভোগ করেছেন। বাংলা দেশের গৌরবের কথা যে, ইংরেজি ভাষার প্রথম অভিধান-রচয়িতা ডক্টর জনসন যে সহায়তা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন হরিচরণবাবুর বেলায় তা ঘটে নি। মহারাজের মহানুভবতার কথা শেষ পর্যন্ত কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছেন: আর রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর জন্যেই উপযাচক হয়ে মহারাজের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন সে কথাও মুহূর্তের জন্য বিস্মৃত হন নি। মুদ্রণকার্য শুরু হবার পূর্বেই মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্রের মৃত্যু হয়। যাঁর সহায়তায়

অভিধান রচনা সম্ভব হল তাঁকে স্বহস্তে একখণ্ড অভিধান কৃতজ্ঞতার অর্ঘ্যস্বরূপ অর্পণ করতে পারেন নি, এই দুঃখ শেষ পর্যন্ত তাঁর ছিল। ১০৫ খণ্ডে সমাপ্ত অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পূর্বে রবীন্দ্রনাথও বিদায় নিলেন। হরিচরণবাবুর করুণ উক্তি—যিনি প্রেরণাদাতা, যাঁর অভীষ্ট এই গ্রন্থ তিনি স্বর্গত, তাঁর হাতে এর শেষ খণ্ড অর্পণ করতে পারি নি। কিন্তু হরিচরণবাবু সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যা হয় নি। বলেছিলেন, মহারাজের বৃত্তিলাভ বিধাতার অভিপ্রেত, অভিধান সমাপ্ত হবার পূর্বে তোমার জীবনান্ত হবার আশঙ্কা নাই। কবিবাক্য মিথ্যা হয় না, এ ক্ষেত্রেও হয় নি।

পাণ্ডুলিপির কাজ শেষ হয় ১৩৩০ সনে। তার পরেও প্রায় দশ বৎসর কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে—অর্থাভাবে মুদ্রণকার্যে হাত দেওয়া সম্ভব হয় নি। এরূপ বিরাট গ্রন্থ প্রকাশের সামর্থ্য বিশ্বভারতীর ছিল না। অবশ্য মাঝে এই কয়েক বৎসরও তিনি অভিধানের নানা পরিবর্তন-পরিবর্ধনের কাজ নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। অবশেষে ১৩৩৯ সালে মুদ্রণকার্য শুরু হয়। তিনি নিজেই তাঁর যৎকিঞ্চিৎ সম্বল নিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ক্রমশঃ প্রকাশের আয়োজন করেন। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহশয় মুদ্রণ ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং শান্তি-নিকেতনের অনুরাগী কিছুসংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তি নিয়মিত গ্রাহক হয়ে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন।

১৩১২ সালে রচনার সূচনা, ১৩৫২ সালে মুদ্রণকার্য সমাপ্ত। জীবনের চল্লিশটি বছর এক ধ্যান, এক জ্ঞান, এক কাজ নিয়ে কাটিয়েছেন। এ এক মহাযোগীর জীবন। বাঙালি চরিত্রে অনেক গুণ আছে, কিন্তু নিষ্ঠার অভাব। এ দিক থেকে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙালি জাতির সম্মুখে এক অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। নিষ্ঠার যথার্থ পুরস্কার অভীষ্ট কার্যের সফল সমাপ্তি। এর অধিক কোনো প্রত্যাশা তাঁর ছিল না। সুখের বিষয় লৌকিক পুরস্কারও কিছু তাঁর ভাগ্যে জুটেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সরোজিনী স্বর্ণপদক দিয়ে সম্মানিত করেছেন। শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ প্রাচীন ভারতীয় রীতিতে ষোড়শোপচারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেছিলেন। সর্বশেষে বিশ্বভারতী তাঁকে 'দেশিকোত্তম' (ডি. লিট) উপাধিদানে সম্মানিত করেন।

অভিধান-জাতীয় গ্রন্থের গুণাগুণ বিচারের ক্ষমতা আমার নাই। এ বিষয়ে

বিশেষজ্ঞরাই মতামত দেবার অধিকারী। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি অভিধানে কিছু কিছু ঘাটতি আছে। এরূপ বৃহৎ ব্যাপারে—বিশেষ করে একক চেষ্টায়—কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা অসম্ভব নয়। সাহিত্য আকাদেমির উদ্যোগে অভিধানের পুনর্মুদ্রণ হচ্ছে; পুনর্মুদ্রণের পূর্বে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা একবার পুনর্মার্জনার ব্যবস্থা করে নিলে বোধ করি ভালোই হত। অন্যান্য দেশে এরূপ কার্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো বিদ্বৎ পরিষৎ অর্থাৎ পণ্ডিত গোষ্ঠীর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে, একক চেষ্টায় এরূপ বিরাট কাজের দৃষ্টান্ত বিরল। এই অভিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য—বাংলা এবং সংস্কৃত সাহিত্য থেকে প্রত্যেক শব্দের বহুবিধ প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আহরণ। এই কার্যে যে শ্রম এবং জ্ঞানের প্রয়োজন হয়েছে তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আমরা যারা বিশেষজ্ঞ নই তাদের কাছে অভিধানে এই অঙ্গটি মহামূল্য, ব্যক্তিগত ভাবে আমি এর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী।

আমি যখন শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিই তখনও অভিধানের মুদ্রণকার্য শেষ হয় নি। লইব্রেরি গৃহের একটি অনতিপ্রশস্ত প্রকোষ্ঠে তাঁকে নিবিষ্ট মনে কাজ করতে দেখেছি।

প্রথম যুগের কর্মীদের সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় একটি করে চৌপদী লিখে দিয়েছিলেন। একান্ত মনে কাজে মগ্ন হরিচরণবাবুকে দেখে তাঁর সম্পর্কিত শ্লোকটি আমার মনে পড়ে যেত—

কোথা গো ডুব মেরে রয়েছ তলে
হরিচরণ! কোন্ গরতে?
বুঝেছি! শব্‌দ-অব্‌ধি-জলে
মুঠাচ্ছ খুব অরথে!

কোথায় কোন্ গর্তে বসে হরিচরণ শব্দবারিধি থেকে মুঠো মুঠো 'অর্থ' কুড়োচ্ছেন—বর্ণনার সঙ্গে নিবিষ্টচিত্ত অভিধানিকের মূর্তিটি দিব্যি মিলে যেত।

বলা বাহুল্য, তখন তিনি বিশ্বভারতীর কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন, বয়স পচাত্তর উত্তীর্ণ। তখনকার দিনে কে কবে অবসর গ্রহণ করতেন জানবার কোনো উপায় ছিল না, কারণ অবসর গ্রহণের পরেও তাঁরা পূর্ববৎ নিজ আসনে নিজ কাজে অভিনিবিষ্ট থাকতেন। কাজের সঙ্গে মাস-মাহিনার কোন সম্পর্ক ছিল না।

অভিধান-মুদ্রণ শেষ হবার পরেও তাঁকে নিত্য দেখেছি। প্রাতঃভ্রমণ এবং সান্ধ্যভ্রমণ নিত্যকর্ম ছিল। ক্ষীণদৃষ্টিবশতঃ পথে দেখা হলে সব সময় লোকজন চিনতে পারতেন না। কখনো চিনতে পারলে সস্নেহে কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করতেন। বিরানব্বুই বৎসর বয়সে (১৯৫৯ সালে) তিনি দেহরক্ষা করেছেন। শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কের শক্তি অটুট ছিল। শেষবয়সে তাঁকে দেখলে একটি কথা প্রায়ই মনে হত। ইংরেজ ঐতিহাসিক তথা সাহিত্যিক গিবন তাঁর *Decline and Fall of the Roman Empire* নামক গ্রন্থের রচনা সমাপ্ত করে বলেছিলেন, হঠাৎ মনে হল জীবনের সব কাজ ফুরিয়ে গিয়েছে, কিছুই আর করবার নেই। মনে খুব একটা অবসাদের ভাব এসেছিল। গিবন উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে দীর্ঘ বারো বৎসর কাল একান্ত মনে নিযুক্ত ছিলেন, আর হরিচণবাবু জীবনের চল্লিশ বৎসর কাল অনন্যমনা হয়ে এক কাজে মগ্ন ছিলেন। কর্মাবসানে তাঁর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল জানতে কৌতূহল হত। গ্রন্থ সমাপ্তির পরেও চৌদ্দ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। যখনই দেখেছি তাঁকে প্রসন্নচিত্ত বলেই মনে হত। এরূপ সাধক মানুষের মনে কোথাও একটি প্রশান্তি বিরাজ করে। এজন্য সুখে-দুঃখে কখনো তাঁরা বিচলিত হন না।

রচিত গ্রন্থাবলী

বঙ্গীয় শব্দকোষ

রবীন্দ্রনাথের কথা

সংস্কৃত-প্রবেশ। তিন খণ্ড

ব্যাকরণ-কৌমুদী। চার ভাগ

Hints on Sanskrit Composition & Translation

পালিপ্রবেশ। শব্দানুশাসন

কবির কথা

প্রমথ চৌধুরী ১৮৬৮-১৯৪৬

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

১

'প্রশস্ত ললাটে ও গভীর দৃষ্টিতে তাঁর প্রখর বুদ্ধিমত্তার দীপ্তি উদ্ভাসিত মনে হোলো। গৌরবর্ণ দোহারায় সাদা আদ্দির বুঁটিদার পাঞ্জাবি, পরনে সাদা ঢিলে পায়জামা। দুহাতের তর্জনী ও মধ্যমার ফাঁক দুটো সিগারেটের ধোঁয়ায় লালচে হলদে হয়ে গেছে।'[১] আধুনিক বুদ্ধিজীবীর এই চেহারা আমরা প্রথম প্রমথ চৌধুরীর মধ্যেই দেখতে পেয়েছিলাম এবং কোনো সন্দেহ নেই এই চেহারা-চরিত্র আমাদের বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞাতে অজ্ঞাতে সেই থেকে অনুকরণ করে আসছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠার পর বিংশ শতকে তিনিই প্রথম 'বুদ্ধিজীবী' সাহিত্যিক, অর্থাৎ চিন্তায় ও প্রকাশের ক্ষেত্রে কল্পনা ও হৃদয়াবেগের চেয়ে তিনি বুদ্ধি ও যুক্তিকেই নির্ভর করেছিলেন বেশি। তাঁর জন্মশতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে (৭ই আগস্ট, ১৮৬৮) এই কথা বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়।

প্রমথ চৌধুরীর পৈতৃক বাড়ি পাবনা জেলার হরিপুর গ্রামে, শৈশব কেটেছে যশোহরে, মানসিক বিকাশ ঘটেছে কৃষ্ণনগরে, সাহিত্যচর্চা বিশেষ ভাবে কলকাতায়। যশোহরের দুচারটি অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী সাহিত্যে ছায়া ফেলেছে। তবু যশোহরের শৈশবজীবন তাঁর সাহিত্যজীবনে ততটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না, যতটা মনে হয় কৃষ্ণনগরের জীবন। যশোহর ছেড়ে কৃষ্ণনগরে এসেই প্রমথ চৌধুরীর ইন্দ্রিয় চেতনার উন্মেষ। কারণ কৃষ্ণনগরের পরিবেশ তাঁকে মানসিক খোলা হাওয়ার জগতে নিয়ে আসে। ভবিষ্যতের সংস্কারমুক্ত ঋজু মন তৈরির ভিত্তি হয়ে যায় ওখানেই। রূপ রসের দীক্ষাও হয়। আত্মকথায় তিনি বলেছেন :

> কৃষ্ণনগরে পদার্পণ করা মাত্র ইন্দ্রিয়গোচর পদার্থ সব আমার নাক, কান, চোখের ভিতর দিয়ে ঢুকতে লাগল।...আমি নানা বস্তুর রূপ দেখলুম আর তাদের নামও শিখলুম। দার্শনিকেরা যাকে বলেন নাম রূপের জগৎ সেই জগতের সঙ্গে আদানপ্রদানের কারবার আরম্ভ হল।'

সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগরের বিচিত্রজগতের ছেলেদের সঙ্গে মিশে বাস্তব

১ চলমান জীবন, প্রথম পর্ব : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হোলো এবং এই নানাশ্রেণীর মানুষের ভাষা শুনেই তাঁর ভাষাজ্ঞান হোলো। তাঁর বিশিষ্ট ভাষাভঙ্গি তিনি পাঠ্যপুস্তক থেকে যতটা পেয়েছেন তারচেয়ে অনেক বেশী পেয়েছেন কৃষ্ণনাগরিকদের মুখে। বাক্‌চাতুরী ও রসিকতা সেকালের কৃষ্ণনগরের ভাষার প্রধান ঐশ্বর্য ছিল। আত্মকথায় তিনি বলেছেন :

আমি জন্মেছিলুম পদ্মাপারের বাঙ্গাল, কিন্তু আমার মুখে ভাষা দিয়েছে কৃষ্ণনগর।

কাছেই বৈষ্ণবপীঠ নবদ্বীপ হলেও কৃষ্ণনগরের সংস্কৃতি অনেকটাই সাম্প্রদায়িক মতামতমুক্ত উদার মনের পরিহাসরসে সিক্ত এবং কৃষ্ণনগরের রসিকতা বিশেষ আর্টের পর্যায়ে পড়ে। এখনও পর্যন্ত শিক্ষিত-অশিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মুখে আশ্চর্য রসিকতার সহজাত বৈদগ্ধ্যে বিস্মিত হতে হয়। যাই হোক, বোধ হয় ফরাসী সাহিত্য পাঠই শুধু প্রমথ চৌধুরীর রসিক মন তৈরী করে নি, কৃষ্ণনাগরিক সংস্কৃতিও তার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

তাছাড়া কৃষ্ণনগরের মৃৎ-শিল্পীর তৈরি মাটির পুতুলও তাঁকে রসের শিক্ষা দিয়েছে। আত্মকথায় বলেছেন :

আমি তাদের হাতের চমৎকার আহ্লাদী পুতুল দেখেছি, যার দাম দু'পয়সা। ওর ভিতর এমন গড়নের কৌশল আছে যা দেখে হাসি পায়। মুখব্যাদন ক'রে এ পুতুল লোককে হাসায় না, হাসায় তাদের গড়নের গুণে। আজকাল শিশুপাঠ্য বইয়ের ছবিগুলি প্রায়ই ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর রস যে হাস্য রস নয়, সে জ্ঞান কৃষ্ণনগরের পুতুল নির্মাতাদের ছিল।

কৃষ্ণনগরের স্থাপত্য, কৃষ্ণনগরের দেওয়ান কর্তিকেয়চন্দ্র রায়ের ওস্তাদী গানচর্চা ও মার্গ সঙ্গীতের পরিবেশ তাঁকে রূপরসের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে।

প্রমথ চৌধুরীর নাগরিক মনে কিছুটা পাড়াগাঁয়ের ছাপও যে ছিল না তা নয়। তাঁর 'আহুতি'[২] গল্পেই তার প্রমাণ মিলবে। এর কারণ শৈশবের পল্লীজীবনস্মৃতি। তিনি যে শহরের মানুষ, তা সে কৃষ্ণনগর বা কলকাতা যাই হোক, তাতে পল্লীগ্রামের ছাপ তখনও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। এখন আমরা দু-তিন জেনারেশন যে পরিমাণে পল্লীসংস্কারমুক্ত নাগরিক সাজতে পেরেছি, উনিশ শতকের মানুষের সেই পরিমাণে নাগরিক হওয়া সম্ভব ছিল না। তিনি নিজেই 'আত্মকথায়' বলেছেন :

২. 'আহুতি' (গল্প সংগ্রহ), ১৯১৯ ; 'আহুতি' প্রথম গল্প।

'আমার মনে ও চরিত্রে শহরের ও পাড়াগাঁয়ের প্রভাব কতটা আছে বলতে পারি নে, তবে দুইয়েরই কতটা আছে। তার ফলে আমার মনে পরস্পর বিরোধী সংস্কার থাকা সম্ভব।'

হয়ত উনিশ শতকের আবহাওয়ায় যাঁরা মানুষ তাঁদের এই সংস্কার কিছুটা বেশি থাকাই স্বাভাবিক, হয়তো প্রমথ চৌধুরীর কিছুটা কম। কিন্তু ও-সংস্কার সে যুগে একেবারেই না থাকাটা প্রায় অসম্ভবই ছিল।

২

প্রমথ চৌধুরী কৃতী ছাত্র ছিলেন। দর্শন ও ইংরিজি সাহিত্য ছিল তাঁর বিষয়। তাঁর ছাত্রজীবনের কৃতিত্বের কারণ হিসেবে তাঁর অধ্যাপকের মত হোলো যে তিনি নিজের ভাষায় স্বচ্ছন্দে প্রকাশ করতে পারতেন। অর্থাৎ সাহিত্য রস বোধ প্রকাশে তাঁর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বজায় থাকতো ছাত্রজীবন থেকেই। চাকরী বাকরি তিনি করতে চান নি। সাংসারিক লাভালাভ সম্পর্কে তিনি উদাসীন ছিলেন। পড়াশোনা নিয়েই থাকতে ভালোবাসতেন। ব্যারেষ্টারী পড়তে বিলেত গেলেন। কিন্তু রূপরসিকের মন নিয়ে নানাদেশ ঘুরলেন। ফিরে এসে প্র্যাকটিস করলেন না। পয়সা রোজগার দরকার ছিল না, উদ্দেশ্যও ছিল না। রাজপরিবারের সঙ্গলাভ করলেন ফিরে এসে। ব্র্যাণ্ডি-শ্যাম্পেনও চললো। বিলাসী আবহাওয়ায় মৌতাত এলো। তবে তারই মধ্যে চোখ কান খোলা রইল। দেশ-বিদেশের শিল্প, সাহিত্য, ছবি, স্থাপত্য এবং সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় মানুষ তাঁর চোখ এড়ালো না। মোটামুটি, আর্থিক-দুশ্চিন্তা-মুক্ত জমিদারী সমাজের মানুষ total man হবার সাধনায় মগ্ন হোলেন এবং সেই সাধনায় তাঁর বালিগঞ্জের বাড়ি 'কমলালয়'কে সাহিত্য, সঙ্গীত, দর্শন বিজ্ঞান, ভাষাতত্ত্ব, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব সমস্ত কিছু চর্চার পীঠস্থান ক'রে তুলেছিলেন।

বড়দাদা আশুতোষ চৌধুরী বিলেত থেকে ফেরার পর (১৮৮৬) বাড়িতে দেশ বিদেশের সাহিত্য আলোচনার পরিবেশ তৈরী হোলো। আশুতোষ চৌধুরীর বন্ধু ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সূত্রে পঁচিশ বছর বয়সের তরুণ কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আঠারো বছরের বুদ্ধিমান কিশোর প্রমথ চৌধুরীর পরিচয় হোলো। প্রমথ চৌধুরীর মানসিক প্রস্তুতির পরবর্তী স্তরটি তৈরি হতে লাগলো এই সময়ে। চৌধুরীদের মট্‌স্

লেনের বাড়ি শিল্প সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে উঠলো। প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী সাহিত্য-চর্চার হাতে খড়ি এই সময়ে। আত্মকথায় তিনি বলেছেন :

দাদার সঙ্গে কলকাতা প্রত্যাবর্তনের পর আমার জীবনের মোড় ফিরে গেল। দাদা যে সব নতুন লেখকের বই নিয়ে এসেছিলেন, আমি পূর্বে কখনো তাদের নাম শুনি নি,—যথা রসেটি ও সুইনবার্ণ প্রভৃতির কবিতা। আর ছবি সম্বন্ধে Pre-Rephaelite-artএর সঙ্গে প্রথম পরিচিত হই। দাদর বাড়ির আবহাওয়া art aesthetic ছিল।'

এ ছাড়া এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সূত্রধরে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ঠাকুর বাড়ির সঙ্গীত, নাটক ও সাহিত্য চর্চার প্রভাব প্রমথ চৌধুরীর মনে রীতিমতো ছাপ ফেলেছিল। যে সময় রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' কাব্য লেখা চলছে সেই সযয় মট্‌স্ লেনের বাড়িতে তিনি আসতেন। অনেক পরে এই ঘটনাকে স্মরণ করে তিনি লিখেছেন :

'এই আলোচনার ফলে কবিতা সম্বন্ধে আমার মন যেন জেগে উঠল। তিনি করে কি বলেছেন, তা অবশ্য আম্যর মনে নেই। তবে যেমন তিনি আমাদের পরিবারে সঙ্গীতের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছিলেন, তেমনি আমাদের মধ্যে কাব্যচর্চারও আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন, এই পর্যন্ত বলতে পারি। খুব সম্ভব আমি তাঁর দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'য়েছি।

কিন্তু তিনি তো রবীন্দ্রনাথের বিপরীত মার্গের লেখক। রবীন্দ্রনাথ মূলত কবি, তাঁর গদ্যও কল্পনা শক্তির ঊর্ধ্ব চাপে কবিতার রাজ্যে গিয়ে পৌঁছোয় আর প্রমথ চৌধুরীর গদ্য যুক্তির পথ ধরে, কুশলী শিল্পী সেখানে কথার পর কথা গেঁথে চলেন। তাহলে কী রকম প্রভাব? সে ক্ষেত্রে বলবো রবীন্দ্রনাথের হৃদয়বেগ উচ্ছ্বসিত কল্পনা তাঁকে যুক্তির শাণিত পথে যাবার প্রেরণা দিয়েছিল। কল্পনাশক্তি হৃদয়াবেগ দেখেই যুক্তি ও বৈদগ্ধ্যের রথ ধরবার নির্দেশ দিয়েছিল তাঁর বোধ-বুদ্ধি। এখানে প্রভাব বিপরীতের। এ ছাড়া সে যুগের কয়েকজন পশ্চিমী-সাহিত্য-রসিকের নাম উল্লেখ করা উচিত যাঁরা রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী উভয়কেই সাহিত্যের আবহাওয়ায় বেড়ে উঠতে সাহায্য করেছিলেন। এঁরা হলেন আশুতোষ চৌধুরী, সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত ও প্রিয়নাথ সেন। আশুতোষ চৌধুরীর কথা আগেই বলেছি। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন ফরাসী সাহিত্যের নিষ্ঠাবান পাঠক ছিলেন। লোকেন পালিতও ফরাসী সাহিত্যরসিক, দিনরাত সাহিত্য-আলোচনা করতেন। প্রিয়নাথ সেনও ফরাসী সাহিত্যরসিক ও

লেখক। এঁদের সাহচর্য রবীন্দ্রনাথের মতো প্রমথ চৌধুরীকেও ভাষা-চর্চা ও সাহিত্য আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল।

এ ছাড়া প্রমথ চৌধুরী সংস্কৃত ও ইটালিয়ান ভাষা শিখেছিলেন ছাত্রজীবন শেষ হবার পর। পাঁচটি ভাষায় রসিক হলেও তিনি পল্লবগ্রাহী ছিলেন না। জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনি মূলগামী ও অনুচ্ছ্বসিত।

মোটকথা শৈশবের পল্লীস্মৃতি, কৃষ্ণনগরীয়ভাষা ও রসিকতার পরিবেশ, ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যচর্চার পরিবেশ, বিদেশী সাহিত্যরসিকদের সংস্পর্শে, নিজের বাড়ির পড়াশুনার আবহাওয়া, নিজের বই কেনা ও পড়ার নেশা তাঁর মন ও রুচি তৈরি করেছিল এবং সব চেয়ে বড় কথা, তাঁর মন, রুচি ও ভাষা সম্পূর্ণ তৈরি হবার পর তিনি কলম ধরেছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের রচনায় হাতমক্‌শো করার প্রমাণ বিশেষ পাওয়া যাবে না।

'সবুজপত্র' প্রকাশিত হবার আগে (১৩২১-এর আগে) প্রমথ চৌধুরীর কয়েকটি মাত্র রচনা সাময়িক পত্রিকায় ছড়িয়েছিল। কেবল বই আকারে বেরিয়েছিল কবিতার বই 'সনেট' পঞ্চাশৎ' (১৯১৩)। সাধুভাষায় লেখা তাঁর পাঁচটি রচনা আছে : প্রবাসস্মৃতি (গল্প), জয়দেব (প্রবন্ধ), আদিম মানব, ফুলদানী (মেরিমের গল্পের অনুবাদ), টরকয়টো টাসো ও তাঁহার সিদ্ধ বেতালের কথোপকথন (ইতালীয়ান থেকে অনুবাদ)। 'জয়দেব' (১২৯৭) প্রবন্ধটিতে তিনি জয়দেবকে কবি হিসেবে উঁচুতে স্থান দেন নি। 'ফুলদানী'র বিরুদ্ধে সমালোচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিছুটা নৈতিক আপত্তি ছিল। প্রমথ চৌধুরী তাতে পাল্‌টা আপত্তি করেন। আপত্তির কারণ, তিনি শুচিবায়ুগ্রস্ত ছিলেন না এবং রুচির আভিজাত্যের 'অসামাজিক' গল্প লিখেও অশ্লীলতা থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন।

প্রমথ চৌধুরী যখন 'সবুজপত্র' পত্রিকা প্রকাশ করেন তখন তাঁর কোনো ব্যবসায়িক উদ্দেশ্য ছিল না। উন্নত রুচির পত্রিকা বলেই নিয়মিত লেখকের সংখ্যাও বেশী থাকতো না। পত্রিকার জন্য প্রমথ চৌধুরীকে অনেক লোকসানও দিতে হয়েছে। তবু নিজের রুচিকে বজায় রেখে দেশের আর পাঁচজনের চিত্তকে জাগানো এবং রুচির আভিজাত্য আনাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো পত্রিকা যে ব্যবসায়িক

সাফল্য আনতে পারে না . তা বলাই বাহুল্য। সবুজপত্র যে গদ্যরচনার-রীতির নূতন করে চর্চা আরম্ভ করেছিল তাই নয় ; কালের দিক থেকেও এই পত্রিকার বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগের বিদ্রোহী চিন্তার বাহক হয়ে উঠেছিল সবুজপত্র। তাই পত্রিকার রচনা ও বাক্য বিন্যাসে বিদ্রোহের বক্র-তীর্যক ভঙ্গীটিও অত্যন্ত সুস্পষ্ট। 'সবুজপত্র' নামটি এবং পত্রিকাটির মলাটের সবুজ রঙ তরুণ রঙ, প্রাণধর্মের প্রতীক। 'বীরবলের হালখাতা'র অন্তর্ভুক্ত 'সবুজপত্র' লেখাটিতে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

আমাদের কর্মযোগীরা আর জ্ঞানযোগীরা অর্থাৎ শাস্ত্রীয় দল, আমাদের মনকে রাতারাতি পাকা করে তুলতে চান। তাঁদের বিশ্বাস যে. কোনরূপ কর্ম কিংবা জ্ঞানের চাপে আমাদের হৃদয়ের রসটুকু নিংড়ে ফেলতে পারলেই আমাদের মনের রঙ পেকে উঠবে।......এঁরা ভুলে যান যে জোর ক'রে পাকাতে গিয়ে আমরা শুধু হরিৎকে পীতের ঘরে টেনে আনি, মৃত্যুকে যেন প্রাণের দ্বারস্থ করি। এ দেশের ভক্তিযোগীরা অর্থাৎ কবির দল, কাঁচাকে কচি করতে চান। এঁরা চান যে আমরা শুধু গদগদ ভাবে আধো-আধো কথা কই. এঁদের রাগ সবুজের সজীবতার উপর। এঁদের ইচ্ছা সবুজের তেজটুকু বহিষ্কৃত করে দিয়ে ছাঁকা রসটুকু রাখেন। এঁরা ভুলে যান যে. পাতা কখনো কিশলয়ে ফিরে যেতে পারে না ; প্রাণ পশ্চাৎপদ হতে জানে না। তার ধর্ম হচ্ছে এগোনো, তার লক্ষ্য হচ্চে হয় অমৃতত্ব নয় মৃত্যু।... আমাদের আশা আছে যে, সবুজ ক্রমে পেকে লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু আমাদের অন্তরের আজকের সবুজ রস কালকের লালরক্তে তবেই পরিণত হবে, যদি আমরা স্বধর্মের পরিচয় পাই এবং প্রাণপণে তার চর্চা করা। তাই দেশি কি বিলাতি পাথরে-গড়া সরস্বতীর মূর্তির পরিবর্তে বাঙলার কাব্যমন্দিরে দেশের মাটির ঘটস্থাপনা ক'রে তার মধ্যে সবুজ পত্রের প্রতিষ্ঠা করতে চাই।......সবুজের পূর্ণ অভিব্যক্তির জন্য আলো চাই আর বাতাস চাই। অন্ধকারে সবুজ ভয়ে নীল হয়ে যায়। বদ্ধ ঘরে সবুজ দুঃখে পাণ্ডু হয়ে যায়। আমদের নবমন্দিরে চারিদিকে অবারিত দ্বার দিয়ে প্রাণবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের যত আলো অবাধে প্রবেশ করতে পারবে। শুধু তাই নয়, এ মন্দিরে সকল বর্ণের প্রবেশের সমান অধিকার থাকবে। ঊষার গোলাপী, আকাশের নীল, সন্ধ্যার লাল, মেঘের নীললোহিত, বিরোধালংকারস্বরূপে সবুজপত্রের গাত্রে সংলগ্ন হয়ে তার মরকতজ্যোতি কখনো উজ্জ্বল কখনো কোমল করে তুলবে। সে মন্দিরে স্থান হবে না কেবল শুষ্ক পত্রের।

উনিশ শতকের কবি মণীষীদের রচনায় আমরা এই নবীন বরণের কথা শুনেছিলাম। বিংশ শতকের সূচনাতেই পত্রিকার মাধ্যমে এই তারুণ্যের জয়ধ্বজা তুললেন প্রমথ চৌধুরী। জীবন সমালোচনা দিয়েই সবুজপত্রের সূচনা। জীবনের একটি উজ্জ্বল ও প্রসন্ন রূপ প্রমথ চৌধুরীর মনোজগতে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু আচারের বেড়াজাল তাকে বাইরে স্পষ্ট রূপে

প্রকাশ করতে দিচ্ছিল না। তাই জীবনের দুর্লক্ষণগুলিকে ('সবুজপত্রের মুখপত্র', প্রবন্ধ সংগ্রহ দ্রষ্টব্য) তিনি আঘাত হানলেন। কাজেই তাঁর সাহিত্যবিদ্রোহ আসলে জীবন-বিদ্রোহেরই অন্য নাম। প্রচলিত পত্রপত্রিকার মতো বিজ্ঞাপন, ছবি, ফিচার কিছুই থাকতো না সবুজপত্রে, কারণ সাধারণের জন্য এই পত্রিকা নয়; আর্থিক ক্ষতিপূরণের জন্যও নয়। একেবারেই একতরফা ব্যাপার। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও পরে যে নতুন চিন্তাধারা বাঙলা দেশের সংস্কৃতিকে ঘা দিচ্ছিল তাকে দেশীয় রীতিতে মিলিয়ে নেওয়াই ছিল সবুজপত্রের উদ্দেশ্য। বক্তব্যে ও বলার ভঙ্গীতে নতুনত্ব দুই-ই সবুজপত্রের বৈশিষ্ট্য এবং এ ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীকে আন্তরিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন চিরতরুণ রবীন্দ্রনাথ।

কিন্তু বাঙলাসাহিত্যে এই আধুনিক যুক্তিবাদ, ভাষার সংহতিগুণ, বুদ্ধির আধিপত্য, বাক্‌নৈপুণ্য এই সব নতুন লক্ষণে অন্বিত করার মতো মানসিক প্রস্তুতি প্রমথ চৌধুরী পেলেন কোথা থেকে? তাঁরই বিভিন্ন রচনা এবং তাঁর শিষ্যদের মন্তব্য থেকে মনে হয় ফরাসী সাহিত্য, ভারতচন্দ্রের কাব্য ও কৃষ্ণনাগরিক সংস্কৃতি এবং প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্রসাহিত্যের টীকাকার ও ভাষ্যকারদের রচনা থেকে তিনি এই সব গুণগুলো পেয়েছিলেন।[৩] 'নানাকথা' বই-এর 'ফরাসী-সাহিত্যের বর্ণপরিচয়'-এর মধ্যে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন:

(ক) 'ফরাসী মনের চোখ চিরদিনই আলোর দিকে চেয়ে রয়েছে।......এই আলোকপ্রিয়তার ফলে সে সাহিত্য অপূর্ব স্বচ্ছতা, অপূর্ব উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।'

(খ) 'ফরাসী জাতি হাসতে জানে, তাই তারা কথায় কথায় ক্রোধান্ধ হয়ে ওঠে না। তীক্ষ্ণহাসির যে কি মর্মভেদী শক্তি আছে, এ সন্ধান যারা জানে তাদের পক্ষে কটুকাটব্য প্রয়োগ করা অনাবশ্যক।'

(গ) 'ফরাসী সাহিত্যের উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দুইই লেখকদের সংযম অভ্যাস করতে শিক্ষা দেয়। কেননা সংযম ব্যতীত কি মনোজগতে, কি কর্মজগতে, কোনো বিষয়েই নৈপুণ্য লাভ করা যায় না।'

(ঘ) 'লেখকদের নিকট ভাষা একাধারে উপাদান ও যন্ত্র। আমাদের দেশে সর্ব শ্রেণীর শিল্পীরা বৎসরে অন্ততঃ একবার যন্ত্রপূজা করে থাকে, একমাত্র একালের সাহিত্য-শিল্পীরাই তাঁদের যন্ত্রের পূজা করা দূরে থাক, মেজে ঘষে পরিষ্কারও করে না। ফরাসী-সাহিত্য আমাদের এই যন্ত্রকে লঘু করতে, তীক্ষ্ণ করতে শেখায়।'

৩. বাঙলা সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরী: রথীন্দ্রনাথ রায়; ১৯৫৮। এই বই-এর 'সবুজপত্র তার দেশকাল' অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

. এই মন্তব্যগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এগুলি শুধু ফরাসী-সাহিত্যের লক্ষণ নয়, প্রমথ চৌধুরীর রচনারও লক্ষণ, এমনকি তাঁর সাহিত্যের আদর্শও বটে।

ভারতচন্দ্রের একজন রসজ্ঞ পাঠক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী। তাঁর রচনাতে তার ভুরিভুরি প্রমাণ মিলবে। ভারতচন্দ্রকে তিনি প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেন নি। তিনি বলেছিলেন :

(ক) 'ভারতচন্দ্রেব সাহিত্যেব প্রধান রস কিন্তু আদিরস নয়, হাস্যরস। এ রস মধুর রস নয়, কারণ এ রসের জন্মস্থান হৃদয় নয়, মস্তিষ্ক; জীবন নয়, মন। (ভারতচন্দ্র : প্রবন্ধসংগ্রহ ১)'

(খ) 'আমাব বিশ্বাস, ভারতচন্দ্র যদি ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তাঁর প্রতিভা অনুকুল অবস্থার ভিতর আরও পরিস্ফুট হযে উঠত, এবং তাঁর রচনা ফরাসী সাহিত্যের একটি মাষ্টারপিস বলে গণ্য হত।' (ফবাসী সাহিত্যেব বর্ণপরিচয়. প্রবন্ধ সংগ্রহ১)

তাছাড়া ভারতচন্দ্র কৃষ্ণনাগরিক; এবং কৃষ্ণনাগরিক বলেই প্রমথ চৌধুরী নিজেকে গর্বিত বোধ করেছেন। প্রায় দু-শতাব্দীর ব্যবধান হলেও নাগরীক মানসিকতায় এই দুই লেখক সমগোত্রীয়। এই গোত্রেরই আর একজন, দ্বিজেন্দ্রলাল। প্রমথ চৌধুরীর বাক্‌বৈদগ্ধ্য ও দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান কৃষ্ণনাগরিকের রসিক চিত্ত থেকেই উৎসারিত। আর ভারতচন্দ্রের ভাষার ঔজ্জ্বল্য, কৌশল ও সংহতিগুণ সেই কৃষ্ণনাগরিক ঐতিহ্যকে তাঁদের সামনে তুলে ধরেছিল।

ভাষার সংহতিগুণকে প্রমথ চৌধুরী পেয়েছিলেন আরও একটি জাগায়। শাস্ত্রীয় টীকাকারদের যুক্তিতর্কের সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা, বাক্‌নৈপুণ্য ও শব্দপ্রয়োগের সংহতিগুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 'মহাভারত ও গীতা' (প্রবন্ধ সংগ্রহ ১) প্রবন্ধে দেখা গেছে, তিলকের ভাষ্যকে আরও সংহতিগুণে মণ্ডিত করতে গেলে যে সংস্কৃতে লেখাই উচিত ছিল তাই তিনি মনে করতেন। কাজেই প্রমথ চৌধুরীর মার্জিত রুচির তীক্ষ্ণ মানসিকতার উৎসে যেতে গেলে ফরাসী-সাহিত্য, বাঙালী কবি ভারতচন্দ্রের বুদ্ধিদীপ্ত হাস্যরসের সাহিত্য এবং সংস্কৃত ভাষার সূক্ষ্মবুদ্ধির গাঢ়বন্ধ প্রকাশভঙ্গির মধ্যেই যেতে হয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যের দিক্ পরিবর্তনের অনেকখানি দায়িত্ব সবুজপত্রেরও আছে। সেদিকও সবুজপত্রের মূল্য অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথের তারুণ্য

সবুজপত্রকে মনে প্রাণে স্বীকার করেছিল এবং বুদ্ধিবাদের প্রাধান্যকে কবি মেনে নিয়েছিলেন বলে সবুজপত্রের যুগ থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্য, গল্প উপন্যাস, ভাবে ভাষায় নতুন রূপ নিতে থাকে। 'বলাকা' কাব্য ও 'ফাল্গুনী' নাটক এই চিরতরুণ প্রাণশক্তির জয়গানেই মুখর। 'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরেবাইরে' দুটি উপন্যাসই হৃদয়াবেগের আতিশয্য ও অতিভাষণের দোষ থেকে মুক্ত। প্রমথ চৌধুরীর উজ্জ্বল বুদ্ধির চাকচিক্য রবীন্দ্রনাথের মনে যে আলো ফেলেছিল তারই প্রকাশ হয়েছে এই দুটি উপন্যাসে। প্রমথ চৌধুরীর পক্ষে এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়। অমিয় চক্রবর্তী তাঁর 'সাহিত্যগুরু প্রমথ চৌধুরী' প্রবন্ধে (সাম্প্রতিক, মে, ১৯৬৩) বলেছেন :

রবীন্দ্রনাথ বলতেন যে সবুজপত্রে পাঠাবার আগে তাঁব নূতন রচনা বিশেষ সাবধানে সংশোধন না কবলে তিনি নিশ্চিন্ত হতেন না। ইতিপূর্বে তাঁর পাণ্ডুলিপিতে কখনো এত বর্জন পরিমার্জন হয় নি। 'চোখেব বালি' ও 'ঘবেবাইবে' এই দুই উপন্যাসের ভাষার তুলনা করে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এজন্যে প্রমথ দায়ী।' এ কথা সত্য বে, পূর্বেই ববীন্দ্রনাথ চলতিভাষা ব্যবহারে তুলনাহীন শিল্প দেখিয়েছিলেন, কিন্তু সে যেন ক্বচিৎ ঘটনাক্রমে। সজ্ঞান ভাবে এবং স্থায়ীরূপে সবুজপত্রের যুগেই তিনি চলতি ভাষাকে সকলপ্রকাব গদ্যরচনাব ভাষা ব'লে গ্রহণ করলেন।

সবুজপত্রে বাঙলা সমালোচনার একটামানদণ্ড নতুন করে দেখা দিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এ ব্যাপারে প্রমথ চৌধুরীকে চিঠিতে লিখেছেন (চিঠিপত্র ৫) :

'প্রতিমাসে সমালোচনার যোগ্য বই পাবে না, কিন্তু মাসিকপত্রের লেখাগুলোর প্রতি লক্ষ্য ক'রে কিছু না কিছু বলার জিনিস পাবে। বিরুদ্ধ কথাও যথোচিত শিষ্টতা রক্ষা করে কিভাবে বলা উচিত তার একটা আদর্শ দেখাবার সময় এসেছে।'

এই সংযমের পরিচয় সবুজপত্রের অনেক treatise জাতীয় রচনায় ফুটে উঠেছে। প্রমথ চৌধুরীর নিজের রচনাগুলির কথাই ধরা যেতে পারে। তাঁর 'বস্তুতন্ত্রতা বস্তু কী', 'চুটকি', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কথার কথা', 'বঙ্গভাষা বনাম বাবু বাংলা ওরফে 'সাধুভাষা', বনাম চলিত ভাষা', 'আমাদের ভাষা সংকট' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করে বলা যায়, আশ্চর্য সংযমে, পরিচ্ছন্নতায়, যুক্তির তীক্ষ্ণতায় ও হৃদ্যতায় প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধগুলি অবজেক্টিভ সমালোচনার ক্ষেত্রে আদর্শ হয়ে থাকবে। এ ছাড়া নব যুগের সাহিত্যের আদর্শ নিয়ে যে বাদবিতণ্ডা চলেছিল, সবুজপত্র সেক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। মোটকথা সবুজপত্র বিংশশতকের বাঙলা সাহিত্যের প্রথম মুখপত্র, প্রমথ চৌধুরী যার নায়ক, রবীন্দ্রনাথ যার পরিচালক।

৫

প্রমথ চৌধুরী একাধারে কবি, গল্পকার ও প্রবন্ধকার। তবে মূলতঃ প্রবন্ধকার বলে তাঁর কবিত্ব ও গল্পের দিকটা অবহেলিত হয়েছে। অথচ ঠিক উল্টোটাই হবার কথা। সাধারণ পাঠকের কাছে গল্প বা কবিতার আবেদন আগে, তার পরে প্রবন্ধের। অথচ প্রমথ চৌধুরীর ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের চেহারাটাই আমাদের মনে সবচেয়ে বেশি ফুটে ওঠে। এর কারণ 'তিনি মাথার চুল হইতে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রবন্ধকার। তাঁহার সমস্ত রচনা—উপন্যাস, ছোটগল্প, অর্থনীতি ও সমাজনীতি বিষয়ক গ্রন্থ, এমনকি কাব্য পর্যন্ত প্রবন্ধধর্মী'।[৪] অমিয় চক্রবর্তীকে প্রমথ চৌধুরী নিজেই লিখেছিলেন :[৫]

'আমি আসলে গদ্য লেখক তা আমি জানি। কিন্তু এই rhyme-এর চর্চা করলে শব্দের পুঁজি বেড়ে যায়। অনেক শব্দ বাদ দিতে হয় আর একটি শব্দের সঙ্গে মেলেনা বলে। আমার কবিতা লেখার ভিতর এ উদ্দেশ্যও বোধ হয় ছিল।'

অবশ্য শুধু শব্দের পুঁজি বেড়ে যায় বলে কবিতা লিখেছেন বললে তাঁর কবিতার যথার্থ মূল্য দেওয়া হয় না। কাজেই ও উক্তিটিকে তাঁর কবিতার গদ্যময়তা ও শব্দক্রীড়াচাপল্যের যে স্বভাব সেই অর্থেই নিতে হবে। 'পদচারণ' বই-এর উৎসর্গ পত্রে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে তিনি লিখেছেন :

'গদ্যের কলমে লেখা এই পদ্যগুলি যে আপনাকে উপহার দিতে সাহসী হয়েছি, তার কারণ, আমার বিশ্বাস, এগুলির ভিতর আর কিছু না থাক. আছে rhyme এবং সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ reason।'

সনেট পঞ্চাশৎ (১৯১৩) প্রমথ চৌধুরীর প্রথম কবিতার বই। পঞ্চাশটি সনেটের সংকলন। তখনও তিনি সবুজপত্র বার করেন নি। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদি পূর্বসূরীরা বাঙলায় সনেটের ফর্ম দিয়ে গেছেন, কাব্যগুণে মণ্ডিত করে গেছেন। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী ফর্মের দিক থেকে পূর্বসূরীদের ট্রাডিশানাল পথ ধরলেন না। সোজাসুজি সনেটের ফর্মকে বাঙলায় নিলেন। সাধারণ সনেটের অষ্টক ও ষট্‌কের বিন্যাসপদ্ধতি প্রমথ চৌধুরীর ফরাসীরীতি প্রভাবিত সনেটে রক্ষিত হয় নি। প্রমথ

৪. বাঙলাসাহিত্যের বিকাশের ধারা : শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৫৯ : পৃ ২৩৩, (প্রথম সংস্করণ)।

৫. সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা : প্রমথ চৌধুরী : পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত ; ৭ই আশ্বিন, ১৮৮৩ শকাব্দ, গ্রন্থপরিচয়, পৃ ১৫৭। চিঠির তারিখ ৫. ১১. ৪১।

চৌধুরীর সনেটগুলির অষ্টক দুটি একই ধরনের চতুষ্পদীর গ্রন্থন : কখখক কখখক। কিন্তু ষট্‌কের বিন্যাসই এর মূল বৈচিত্র্য। শেক্‌স্‌পিরীয় সনেটের ষট্‌ক একটি চতুষ্পদী ও একটি দ্বিপদীর গ্রন্থন। সব শেষের দ্বিপদীটি শেক্‌স্‌পিরীয় সনেটের ঐশ্বর্য, পূর্ববর্তী তিনটি চতুষ্পদীর আবেগ-অনুভূতি এই দুই চরণের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। 'সনেট কেন চতুর্দশপদী' (নানাকথা) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছেন :

> ফরাসী ভাষায় ইতালীয় ভাষার ন্যায় পদে পদে ছত্র ব্যবধান দিয়ে চরণে চরণে মিলসাধন করা স্বাভাবিক নয়; এইজন্য ফরাসী সনেটে ষট্‌কের প্রথম দুই চরণ দ্বিপদীর আকার ধারণ করে।

প্রমথ চৌধুরী তার সনেটগুলির অন্ত্যচতুষ্পদীতে সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন, কখনও কঘঘক ('ভাস'), কখনও কঘকঘ ('সনেট'), ঘঙঘঙ ('ভর্তৃহরি'), ঘঙঙঘ ('জয়দেব'), ঘঘ-ঘঘ ('চারকবি')।

'সনেট পঞ্চাশৎ'-এর কবিতাগুলিকে অনেকে কবিতা হিসেবে খুব উঁচু দরের মনে করেন না। কিন্তু high seriousness-কেই যদি কবিতার একমাত্র মানদণ্ড না ধরি, কোমলতা সূক্ষ্মতাকেই যদি কবিতার সর্বস্ব মনে না করি, স্বতঃস্ফূর্তি শুধু নয় সঙ্গে সঙ্গে শিল্পবোধকেও যদি কিছুমাত্র মূল্য দিই, তবে প্রমথ চৌধুরীর অনেকগুলি সনেটের বিশেষ মূল্য আছে। শব্দচয়নের শ্রমসাধ্য নৈপুণ্য, ভাষা ও ভঙ্গির কঠিন দীপ্তিতে এবং রচনাবন্ধের সামগ্রিক গাঢ়তায় তাঁর সনেটগুলি কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন স্বাদ এনেছিল। অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বস্তুজগতের স্থূলশূক্ষ্ম মিশ্রিত সহজ রূপকে আনতে গিয়ে ছন্দের বাঁধনকে অস্বীকার করেছিলেন সেই অভিপ্রায়কে প্রমথ চৌধুরীর সনেটের কঠিন বন্ধনেই আমরা অনেকখানি সার্থকরূপে পেয়েছিলাম। হয়তো শিল্পসচেতনতার ঝোঁকটা বেশি হয়ে গিয়েছিল, হয়তো অনেকক্ষেত্রেই কবিতাগুলি বেশি পোষাকি বা ফিট্‌ফাট্ মনে হয়েছিল এবং তার জন্যই হয়তো ভাবের ঘরে চুরি হয়ে গিয়েছিল কোথাও কোথাও, তবু অনেক ক্ষেত্রেই ব্যঙ্গ, কটাক্ষ, কৌতুক, তীক্ষ্ণ পরিমিত পদ্যভঙ্গির ভাষায় আশ্চর্য মানিয়েছে, কোথাও বা কারুকার্যের দীপ্তি ভাবের seriousness-কেও আশ্চর্যভাবে ফুটিয়েছে। 'আত্মকথা', 'গজল', 'ব্যর্থজীবন' সনেটগুলি যেমন কৌতুকস্নিগ্ধ স্মিতকটাক্ষপূর্ণ কবিতা, তেমনি আবার 'রূপক', 'পূরবী', 'প্রতিমা', 'মুশ্‌কিল আসান' তীক্ষ্ণ ভাষা ও গভীর ভাবের সমন্বয়ে স্মরণীয়

সৃষ্টি। 'সনেট পঞ্চাশৎ'-এ সব মিলিয়ে জীবনের উদ্দীপনা ও উষ্ণতাকে পাবার আকাঙ্ক্ষা কবিতাগুলিকে প্রাণস্পন্দন দিয়েছে।

পদচারণে (১৯১৯) 'পাঠকের মনকে প্রতি ছত্রে ফুটিয়ে দেবার' চেষ্টা, যা সনেট পঞ্চাশৎ-এর অনেক কবিতায় দেখা গেছে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেছিলেন ঠিকই তা কেটে গেছে। তবে আগের মতোই রহস্য কৌতুক-স্নিগ্ধতা, কখনো গাম্ভীর্যপূর্ণ বিষাদ, কখনো তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ, কখনো বিশুদ্ধ সৌন্দর্যাসক্তি সনেট ছাড়াও অন্যান্য ছন্দবৈচিত্র্যের মধ্যে এই কবিতার বইটিতে ধরা পড়েছে। তবে দুটি কবিতার বই-এর সব কবিতাই যে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'নির্মমভাবে নিখুঁত' তা নয়, অনেক কবিতাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাবলীল অর্থাৎ পরিশ্রমের 'রক্তের দাগ' তাতে নেই। 'সনেট পঞ্চাশৎ'এর কয়েকটি কবিতার নাম করেছি, পদচারণের 'ফস্‌লে গুল্‌মে ময়্‌সে তৌবা', 'বর্ষা' (কান্তভাব), 'কবিতা' ('সনেট চতুষ্টয়') 'খেয়ালের জন্ম' (Terza rima), 'শরৎ', 'তত্ত্বদর্শীর সিন্ধুদর্শন' ইত্যাদি কবিতাগুলি রহস্যে গাম্ভীর্যে বিষাদে ব্যঙ্গে বাঙলা কাব্যের উল্লেখযোগ্য সম্পদ বলেই মনে হয়।

মোটকথা ইংরিজি কবিতা বা সনেট পড়ার সংস্কার নিয়ে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা বিচার করলে তাঁরা কবিতাকে অনেক ক্ষেত্রে অকাব্য বলেই মনে হবে। ফরাসী মেজাজকে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন, তাঁর মনের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন এবং সেই জন্যই 'ফরাসীসুলভ সংস্কারজ্ঞান' এবং 'শিক্ষিত ও মার্জিত বুদ্ধি' দিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। 'ফরাসী সাহিত্যের বর্ণপরিচয়' (নানাকথা) প্রবন্ধে প্রমথ চৌধুরী বলেছিলেন :

> জাতির দেহে কিংবা মনে কোন ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নেই এবং তাঁরা কস্মিন কালেও তাঁদের মগ্নচৈতন্যের ওপর বিশ্বাস সফরপাস্থী করেন নি। এই কারণে ফরাসী কবিতার তুলনায় আবেগহীন ও কল্পনার ঐশ্বর্যে বঞ্চিত, সে কবিতা মানব মনের গভীরতম দেহ স্পর্শ করেনা।

এই ফরাসী কাব্যজগতের পরিপ্রেক্ষিতে প্রমথ চৌধুরীর কবিতা বিশিষ্ট মূল্য পাবে বলেই বিশ্বাস।

গল্পের ক্ষেত্রে, কবিতার মতেই প্রমথ চৌধুরী প্রচলিত রীতি-নীতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। ছোট গল্পের নাটকীয়তা তাঁর গল্পে আছে, তবে কাহিনীর গতি অব্যাহত নয়। গল্পের ভূমিকা অনেক সময়েই গল্পের

চেয়ে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। অনেক সময়েই নিটোল একটি গল্প শেষ হতে গিয়ে শেষপর্যন্ত বিচার-বিতর্ক ও তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ব্যঙ্গে 'নষ্ট' হয়ে গেছে। মোটকথা গল্প বলার আশ্চর্যগুণের সঙ্গে সমালোচকের সদাজাগ্রত বিচার-বুদ্ধি তাঁর গল্পগুলিকে না-গল্প না-প্রবন্ধের রাজ্যে নিয়ে গেছে। বিশুদ্ধ গল্প-রসিকের চোখে গল্পগুলি মারা গেছে। এখানেও তাঁর প্রাবন্ধিক মন গল্পকে পুরোপুরি তার ধর্ম বজায় রাখতে দেয়নি। একেবারেই মজলিসী মন তাঁর কোন শিল্পকেই নিখুঁতরূপে থাকতে দেননি।

প্রস্‌পের মেরিমের গল্পের অনুবাদ 'ফুলদানি'[৬] লিখে বাঙলা গল্পসাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। ফরাসী সাহিত্যিক মেরিমে তাঁর মাত্রাজ্ঞান ও সংযমে প্রমথ চৌধুরীকে মুগ্ধ করেছিলেন। তাছাড়া মেরিমের নিপুণ পর্যবেক্ষণশক্তি, হাস্যরস ও ট্র্যাজিক আয়রনি তাঁকে আকর্ষণ ক'রে থাকবে। তারপর প্রমথ চৌধুরীর মৌলিক গল্প হোলো 'প্রবাস স্মৃতি' (ভারতী'তে প্রকাশিত)। সাধু ভাষায় লেখা এই গল্পটিতে মেরিমের মত অপরিচিত জগৎ, সংহত রচনাশক্তি, লঘু কৌতুক ও আকস্মিক আঘাত দেওয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। ছোট গল্পের আর্ট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে 'ছোটগল্প' 'গল্পলেখা', 'ফরমায়েসি গল্প', 'একটি সাদা গল্প' এই সব গল্পগুলি লেখা। এগুলির মধ্যে গল্প কী ভাবে গল্পের আর্ট আলোচনায় নষ্ট হয়ে গেছে তারই প্রমাণ রয়েছে। কখনো কৌতুক জমতে জমতে গাম্ভীর্য এসে যায়, আবার গাম্ভীর্য যথোচিত গভীরতা না পেয়ে হঠাৎ হাসিতে উচ্চকিত হয়ে উঠে। সামগ্রিক ফলশ্রুতিটা অম্লমধুর হয়ে ওঠে। গুরু বিষয়কে লঘু করা আর লঘু বিষয়কে গুরু করাই ছিল প্রমথ চৌধুরীর বীরবলী বৈশিষ্ট্য। কতকগুলি গল্পের মূলরস স্যাটায়ার ও প্যারাডক্স। 'রাম ও শ্যাম', 'বড়বাবুর বড়দিন' এবং অহিভূষণের সাধনা ও সিদ্ধি' এই ধরণের লক্ষণে বিশিষ্ট, 'অ্যাডভেঞ্চার স্থলে' 'অ্যাডভেঞ্চার—জলে', 'ভাববার কথা'—না-গল্প না-প্রবন্ধ।

প্রমথ চৌধুরীর গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুই গল্পের নায়ক নীললোহিত ও ঘোষাল। মিথ্যা কথার আশ্চর্য কুশলী শিল্পী নীললোহিত।

---

৬. 'সাহিত্য' পত্রিকায় Proper Merimee-র Eturuscan Vase নামক গল্পের অনুবাদ। আত্মকথা : প্রমথ চৌধুরী : পৃ ৯৫ দ্রষ্টব্য।

৭. আকবরের সভাসদ বীরবলের রসিকতা ও বাক্‌চাতুর্য প্রমথ চৌধুরীকে এই ছদ্মনাম গ্রহণে প্রেরণা দিয়ে থাকবে।

সম্ভব অসম্ভবকে এক ক'রে সে অদ্ভুত রস সৃষ্টি করতে পারতো। নীললোহিত নীললোহিতের স্বয়ম্বর, নীললোহিতের আদিপ্রেম, নীললোহিতের সৌরাষ্ট্র লীলা ইত্যাদি গল্প সম্ভব অসম্ভব মিশ্রিত কথাকুশলীর অপূর্ব সৃষ্টি। অবশ্য সবক্ষেত্রে উদভট কাহিনীর ফাঁকগুলি ভরাট হয়নি নীললোহিতের 'আদিপ্রেম' গল্পে। 'ঘোষালের ত্রিকথা'-র তিনটি গল্প। ফরমায়েসি গল্প ঘোষালের হেঁয়ালি, বীণাবাই; বুদ্ধি ও বাক্‌চাতুর্যে ঘোষাল দক্ষ। কথা বেচে খাওয়াই তাঁর পেশা। সেই কথার বশে রাখার গল্পই 'ফরমায়েসি' গল্প। কতকগুলি বিচিত্র চরিত্রে নরনারীকে টেনে এনে পাঁচমেশেলি আলোচনায় হেঁয়ালি সৃষ্টি হয়েছে ঘোষালের হেঁয়ালি'-তে। ক্লাসিক্যাল ফরাসী লেখকদের সংযত কলমে যেন মধ্যযুগীয় রোমান্স রস সৃষ্টি হয়েছে।

নরনারীর প্রেম সম্পর্কিত গল্পগুলিতে অনেকক্ষেত্রে 'ট্র্যাজিডির সূত্রপাত' ও 'সহযাত্রী' গল্প দুটি এই ধরনের। 'সম্পাদক ও বন্ধু', 'ছোটগল্প', 'মেরি ক্রিসমাস' অম্লমধুর কাহিনী। 'দিদিমার গল্প' 'আহুতি', 'জুড়িদৃশ্য', 'যখ' এই গল্পগুলিতে অভিশপ্ত ও ভৌতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে প্রমথ চৌধুরী নিজস্ব স্বভাবকে অতিক্রম করেছেন যদিও রচনারীতিতে তাঁর বৈশিষ্ট্য বজায় আছে। 'ভূতের গল্প' ও 'ফার্ষ্টক্লাশ ভূত' ঠিক পুরাপুরি ভৌতিক আবহাওয়া সৃষ্টি করেনি। তবু বলবার কৌশলে গল্পদুটির মূল্যকে অস্বীকার করা যায় না। 'ঝোট্টন ও লোট্টন', 'স্বল্পগল্প', 'প্রগতি রহস্য' এই গল্পগুলি পুরো কাহিনী নয়, কাহিনীর আভাস এগুলিতে আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে দেশের লোকসাহিত্যে যারা ভূরিভোজন ভালবাসে—তারা ভাববে ফাঁকি দিয়েছে কিংবা ভাববে ঠাট্টা। (চিঠিপত্র, ৫, ১২৮ নং)।

আসলে প্রমথ চৌধুরীর গল্পের ভিতর আলাপ আলোচনা, তর্কবিতর্ক ঢুকেছে, কোথাও ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণ হয়নি, কোথাও বা ভূত পুরোপুরি ভূতের মতো হয়নি। কিন্তু তা নিয়ে দুঃখ ক'রে লাভ নেই। কারণ প্রচলিত রীতিতে যা লেখা হয়নি তা প্রচলিত রীতিতে পড়াও চলবে না। অমিয় চক্রবর্তীর ভাষায় বলা যেতে পারে যে প্রমথ চৌধুরীর গল্প পড়ে 'শিল্প-ব্যাপারে সংজ্ঞার ব্যর্থতা যে কতখানি তা বোঝা যায়; জাগ্রত গুণান্বিত লেখায় বহুধর্মের যোগেই স্বধর্ম।'[৮] 'চারইয়ারী কথা' (১৯১৬) বইটির একটু আলাদা উল্লেখ প্রয়োজন, কারণ আমাদের মনে হয় প্রমথ চৌধুরীর

৮. 'প্রমথ চৌধুরীর গল্প' : অমিয় চক্রবর্তী : সাম্প্রতিক : ১৯৬৩ : পৃ ১১১।

গল্প সাহিত্যের এটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এর চারটি গল্পে একটি ভাবগত ঐক্য আছে প্রেমের অসঙ্গতিকে রূপ দেবার ক্ষেত্রে। প্রেমকে বক্রদৃষ্টিতেই পর্যবেক্ষণ করেছেন লেখক। প্রেমের বিচিত্রগতি আকস্মিকতা ও নিষ্ঠুর পরিসমাপ্তি প্রেমের রোমান্টিক ধারণার প্রতি লেখকের ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপেরই ফল। প্রথম গল্পে জ্যোস্নালোকমুগ্ধ রাত্রিতে কবিকল্পিত মানসী মূর্তি গড়ে উঠে উন্মাদিনীর নিষ্ঠুর হাসিতে তা শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় গল্পে রূপসী প্রেমিকার চৌর্যবৃত্তিতে প্রেমের মোহ কেটে গেছে। তৃতীয় গল্পে অস্থিরমতি প্রেমলোভাতুর নায়িকা প্রৌঢ়ত্বে এসে প্রেমিককে হঠাৎ প্রত্যাখ্যান করে বসেছে। চতুর্থ গল্পে পরলোকবাসিনী প্রেমিকার অপ্রকাশিত প্রেম টেলিফোনের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিবেদিত হয়েছে। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই অ্যান্টিক্লাইমাক্সের হঠাৎ আঘাতে প্রেমের স্বপ্ন কেটে গেছে। এবং চারটি গল্পেই সংলাপচাতুর্য, প্রকাশের সংযম-সংহতি সাবলীলভাবে প্রকাশ পেয়ে প্রমথ চৌধুরীর রচনা রীতির চরম সমুন্নতিকে তুলে ধরেছে।

প্রবন্ধ সাহিত্যে প্রমথ চৌধুরীর আগেই বাঙলায় পরিণত রূপ নিয়েছিল। তথ্যভারাক্রান্ত এবং ব্যক্তিগত দুরকম প্রবন্ধই বিশেষ করে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের চর্চায় প্রৌঢ়তায় পৌঁছেছিল। ব্যক্তিগত বা ফ্যামিলিয়ার প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পর প্রমথ চৌধুরীর হাতে নতুন বৈচিত্র্য নিল। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ তাঁর কল্পনাশক্তির বলে সাহিত্য হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধে অন্তরঙ্গ আলাপের ভঙ্গি, ভাষার মার্জিত বাহুল্যবর্জিত সংহতিগুণ এবং উইটের ব্যবহার সাহিত্যগুণ এনেছে। তাঁর প্রবন্ধের বিষয় বহুমুখী কারণ তাঁর পড়াশোনার বিস্তার ও বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তাঁর নিজস্ব সংগ্রহে বিষয়-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো। সংস্কৃত সাহিত্য, বৌদ্ধ সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, স্মৃতি, পুরাণ, চিত্রকলা ও সংগীত, য়ুরোপীয় সাহিত্য (বিশেষ করে ইংরিজি, ফরাসী ও ইতালিয়ান), বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর অবাধ যাতায়াত ছিল।[১] সংস্কৃত সাহিত্যের কবি ও

১. প্রমথ চৌধুরীর নিজস্ব সংগ্রহের কিছু অংশ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। সে গ্রন্থের কিছু কিছু নমুনা দিচ্ছি।

(ক) ধর্ম সংক্রান্ত:

Ecce Homo: Macmillan & Co, 1888

Apologia Del Taosimo: A. F. Fomigini (1924)

নাট্যকার জয়দেব, ভাস, শূদ্রক, বাণভট্ট তাঁর বিশ্লেষণী শক্তিতে নতুন আলো পেয়েছে। 'মহাভারত ও গীতা'র সমালোচনায় তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করবার মতো। 'হিন্দু সংগীত', 'সুরের কথা', 'রূপের কথা' সংগীত ও রসতত্ত্বের দৃষ্টান্তমূলক আলোচনা। বাঙলা সাহিত্যের সমালোচনায় তাঁর গভীর দৃষ্টি লক্ষ্য করবার মতো। 'ভারতচন্দ্র', 'রামমোহন রায়' 'সাহিত্যে চাবুক', 'চিত্রাঙ্গদা', 'কাব্যে অশ্লীলতা' 'আলঙ্কারিক মত', মলাট সমালোচনা', 'বঙ্গসাহিত্যে নবযুগ', 'বর্তমান বঙ্গসাহিত্য' ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি সমালোচনা সাহিত্যে বিশ্লেষণ ও দৃষ্টিভঙ্গির নতুনত্বে আদর্শ হয়ে থাকবে। ফরাসী সাহিত্যের আলোচনা এবং সনেট সম্পর্কিত আলোচনা দুটি (ফরাসী সাহিত্যের 'বর্ণপরিচয়' ও 'সনেট কেন চতুর্দশপদী') বিদেশী সাহিত্য, সমাজ, জাতি পরিচয়, শিল্পবোধ সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান ও স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্য সমালোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে নতুন ক'রে স্রষ্টা হয়ে বসেছেন এ তথ্য কারুর অজানা নেই। কিন্তু নিরপেক্ষভাবে অবজেকটিভ দৃষ্টিভঙ্গিতে সমালোচনা প্রমথ চৌধুরীই রীতিমতো আরম্ভ করেন। সমালোচকের অনুভূতি বিশ্লেষণী শক্তি এবং নিরাসক্তি অদ্ভুতভাবে মিশে গিয়েছিল তার মধ্যে। সমালোচকের ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ও রাজনীতির জ্ঞান যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রতিভাকে উপলব্ধি করবার মতো অনুভূতিও সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। এ সমস্ত কিছুর

মিলিন্দ পঞ্‌হো, ১৩১৫ বিধুশেখর ভট্টাচার্য
Hinduism and Buddhism : Charles Eliot 3 vols. London 1921
Sacred Books of the Buddhists (2 vols) Ed. Maxmular, London, 1899
Le Mahavastu Por E Senart, Paris, M Dccoxc VII
Aryamanjusri Mulakalpa. Ed. Ganapati Sastri
Havard Oriental Series—ইত্যাদি

(খ) দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন ইত্যাদি
Hindu Law of Inheritance : (Eng. Tran). S. S. Sotlur, 1911
Capital : Karl Marx : (Eng. Tran.) Samuel Moore and Edward Aveling. 1920
Storia Della Filosofia : Cinese antica : Guiseppe Tucci
Les Legende—Mario Mevnier
Chez Les Prophites Socialistes par C, Bougle, Paris. 1918
Dialogues of Pleto (5 vols) Tr. B. Jowett, Oxford, 1875
Le Banquet ou De L'amour per Mario Mevnier, Payot, Paris 1923
Descarte par Jacques Chevalier, Paris, 1921
Works of Croce
Scientific Humanism : Stoddard, 1926—ইত্যাদি

অভাব ছিল না তাঁর। তাঁর ওপর ছিল তাঁর সংযমবোধ। এই সব গুণে তিনি অবজেকটিক সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের পরেই স্থান করে নিতে পেরেছেন বলেই মনে হয়। ব্যক্তিগত প্রবন্ধের রস তাঁর সব প্রবন্ধেই আছে। তবু সমালোচ্য বস্তুর অবজেকটিভিটি নষ্ট হয় নি। সে ক্ষেত্রেও রস পাঠকের উপরি পাওনা। কিন্তু বিশেষভাবে 'বীরবলের হালখাতা'-র (১৯১৭) কয়েকটি প্রবন্ধে যেমন 'ফাল্গুন' ও 'বর্ষার কথা', বিশুদ্ধ পার্সোনাল গুণ ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ধরনের কয়েকটি প্রবন্ধ আছে। রবীন্দ্রনাথের তো ভুরিভুরি। এ ছাড়া 'বর্ষা' এবং 'বর্ষার দিন' ('সবুজপত্র', জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩২৯ এবং 'বিচিত্রা', ভাদ্র ১৩৩৪) প্রবন্ধ দুটিও বাঙলা রম্য রচনা সাহিত্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

যদিও প্রমথ চৌধুরীর বিশিষ্ট ভঙ্গি অনেক সময়েই বক্তব্যকে ছাপিয়ে গেছে, বক্তব্যকে গৌণ করেছে, বক্তব্যকে অনুচিতভাবে হালকা করেছে এবং অনেক সময় বক্তব্যকে সরিয়ে অন্য প্রসঙ্গ এনেছে, তবু এসব দোষ ছাড়া তাঁর ব্যক্তিত্বে ও রচনায় এমন কিছু যা তাঁর পরবর্তী যুগে অনুভব করা

(গ) ইতিহাস

History of the Rise of the Mahommedan Power in India, Translated from the original persian by M. Kasim Ferishta
Later Mughals : Irvine (2 vols). Cal 1922
Asoka : M. Macphail

The Legacy of Greece : Ed K. W. Livingstone. Oxford, MDCCCCXIII
History of the Ancient Civilisation : Charles Seignobos, London, MCM VII—ইত্যাদি

(ঘ) সংগীত ও শিল্প

The Cabinet Portrait Gallery : Cassell & Company Ltd. 1891
The Principles of Singing : Albert B. Bach, MDCCCXCIV
Mediaeval Sinhalese Art : Coomarswamy 1908
Dutch Painting of the Seventeenth Century : C. H. Collins Baker, London 1926
Leonardo Da Vinci : Dr. George Gronan, 1414
Islamische Miniature Maleri Kihel
The Outline of Art : Ed. by Sir William Orpen
Egyptian Art —Gaston Maspero
Sangita Sara or A Treatise on Hindu Music by Kshetra Mohon Goswami, Sec. Ed. Cal 1879
বাহুলীন তত্ত্ব : কালীপদ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রণীত : কলিকাতা : সন ১২৮১ সাল।
—ইত্যাদি

গেছে। তাঁর পরিশীলিত মন, মার্জিত রুচি, তীক্ষ্ণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা, নানা বিদ্যায় উৎসাহী মন, মজলিসী ভঙ্গি এবং সর্বোপরি এক নিগূঢ় প্রাণশক্তি তাঁর দোশদর্শী পাঠকেও মুগ্ধ করেছিল। তাঁর ভাষার আশ্চর্য শোষণশক্তি—সাধু-অসাধু, দেশী-বিদেশী শব্দের মিশ্রণ, মৌখিক ভঙ্গির আশ্চর্য প্রয়োগ, সংহতিগুণ, পারিপাট্য, ভাস্কর্যধর্মিতা, প্রয়োজনের অনতিরিক্ত অলঙ্কারের মাধুর্য, শ্লেষ-বক্রোক্তি-প্যারাডাক্সের নিপুণ বিন্যাস এবং সব কিছুর ওপর দৃঢ়তা মিলিয়ে jewelled prose সমসাময়িক লেখকদের বিস্মিত করেছে। এই জন্যই প্রমথচৌধুরীকে ঘিরে বাঙলাগদ্যের অনেক ক্ষমতাবান শিল্পী দেখা দিয়েছিলেন। এবং তাঁদের হাতে বাঙলাগদ্যের আশ্চর্য ক্ষিপ্র গতি, শোষণশক্তি, প্রকাশের দুঃসাহস, পেলবতা, কাঠিন্য, ঋজুতা, বক্রতা, গভীরতা, ও রসিকতার চূড়ান্ত পরীক্ষা হয়ে গেছে। অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, সতীশচন্দ্র ঘটক, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, বরদাচরণ গুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী ইত্যাদি লেখক প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ প্রভাবে কলম ধরেছিলেন। ঠিক সবুজপত্র-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত না হলেও যাঁর বিদ্যাবুদ্ধির সাধনা ও গদ্যরীতি প্রমথ চৌধুরীর প্রদর্শিত পথে চলেছিল তিনি হলেন অন্নদাশঙ্কর রায়। যাই হোক এই লেখকরা সকলেই যে প্রমথ চৌধুরীর দোষগুণ হজম করেছিলেন তা নয়। প্রমথ চৌধুরীর দোষত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এঁরা কমবেশি সচেতন। তবু অন্নদাশঙ্কর এঁদের মধ্যে সচেতনভাবেই ভঙ্গিসর্বস্বতার ভয়ানক খাদটিকে সন্তর্পণে এড়িয়ে গিয়ে প্রমথ চৌধুরীর যোগ্য উত্তরাধিকার পেয়েছেন। এবং মনে হয় রবীন্দ্রনাথের গদ্যরীতির আদর্শ পাশাপাশি থেকে এই সব লেখকদের ভারসাম্য রেখেছে।

মন ও সাহিত্যের মুক্তির কথা যিনি নানাভাবে তাঁর ধারালো ভাষায় বলে গেছেন, যাঁর মার্জিতরুচি, বৈদগ্ধ্য, জিজ্ঞাসু প্রবৃত্তি ও স্বাধীন চিন্তাশক্তি রবীন্দ্রনাথের কালেও আমাদের মুগ্ধ করেছে, তাঁকে এখনও আমরা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। যে হৃদয়াবেগ, বাহুল্য ও অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে তিনি কলম ধরেছিলেন তার থেকে বাঙালী এখনো মুক্ত নয়। এই যদি বাঙালীর স্বভাব হয় তবে 'কিন্তু প্রমথ চৌধুরী বাঙালী সত্তায় চিরদিনই রইলেন, তাঁকে আমরা বারবার আবিষ্কার করব।'[১০]

---

১০ সাহিত্যগুরু প্রমথ চৌধুরী : অমিয় [illegible] সাম্প্রতিক : পৃ ১০৩।